নব পর্য্যায়] মাঘ, ১৩৩৪ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্র

(অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত)

কল্যাণীয়েষু,

প্রজা খাজনা বন্ধ করাতে সামরিক গোমস্তা ব্যোমযান থেকে বোমা বর্ষণ ক'রে খাজনা আদায় ক'রতে বেরিয়েছিল এমন একটা সংবাদ কিছু কাল পূর্ব্বে শোনা গিয়েছে। আমার মনে হয় শনিবারের চিঠির সঙ্গে সেই শাসন-প্রণালীর কিছু একটু সাদৃশ্য আছে।

শনিবারের চিঠিতে ব্যঙ্গ করবার ক্ষমতার একটা অসামান্যতা অনুভব করেছি; বোঝা যায় যে, এই ক্ষমতাটা আর্ট্-এর পদবীতে গিয়ে পৌঁছেচে। আর্ট্ পদার্থের একটা গৌরব আছে—তার পরিপ্রেক্ষিত খাটো ক'রলে তাকে খর্ব্বতার দ্বারা পীড়ন করা হয়। ব্যঙ্গসাহিত্যের যথার্থ রণক্ষেত্র সর্ব্বজনীন মনুষ্যলোকে, কোনো একটা ছাতাওয়ালা-গলিতে নয়। পৃথিবীতে উন্মার্গযাত্রার বড়ো বড়ো ছাঁদ, type আছে, তার একটা না একটার মধ্যে প্রগতিরও গতি আছে। যে-ব্যঙ্গের বজ্র আকাশচারীর অস্ত্র,

তার লক্ষ্য এই রকম ছাঁদের পরে। এই typeএর অভিব্যক্তি নানা আকারে নানা দেশে নানা কালে,—এই জন্যে, এ-কে যে-ব্যঙ্গ আঘাত করে তা আর্টিষ্টের হাতের জিনিষ হওয়া চাই, কেন না তাকে চিরকালের পথে যাত্রা ক'রতে হবে। আর্ট যা'কে আঘাত করে তাকে আঘাতের দ্বারাও সম্মান করে। ক্ষুদে ক্ষুদে রাবণ অলিতে গলিতে বাস করে, সর্ব্বদা হাটে বাটে তাদের বিচরণ, কিন্তু বাল্মীকির রামচন্দ্র ক্ষুদে রাবণদের প্রতি বাণ বর্ষণ করেন নি, যে মহারাবণের একদেহে দশ মুণ্ড বিশ হাত তার উপরেই হেনেছেন ব্রহ্মাস্ত্র।

তারুণ্য নিয়ে যে-একটা হাস্যকর বাহ্বাস্ফোটন আজ হঠাৎ দেখ্‌তে দেখ্‌তে মাসিক সাপ্তাহিকের আখড়ায় আখড়ায় ছড়িয়ে প'ড়ল এটা অমরাবতীবাসী ব্যঙ্গ-দেবতার অট্টহাস্যের যোগ্য। শিশু যে আধো-আধো কথা কয় সেটা ভালোই লাগে, কিন্তু যদি সে সভায় সভায় আপন আধো-আধো কথা নিয়েই গর্ব্ব ক'রে বেড়ায়, সকলকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চায় "আমি কচি খোকা," তখন বুঝ্‌তে পারি কচি ডাব অকালে ঝুনো হ'য়ে উঠেচে। তরুণের স্বভাবে উচ্ছৃঙ্খলতার একটা স্থান আছে, স্বাভাবিক অনভিজ্ঞতা ও অপরিণতির সঙ্গে সেটা খাপ খেয়ে যায়, কিন্তু সেইটেকে নিয়ে যখন সে স্থানে অস্থানে বাহাদুরী ক'রে বেড়ায়, "আমরা তরুণ, আমরা তরুণ!" ক'রে আকাশ মাত ক'রে তোলে, তখন বোঝা যায় সে বুড়িয়ে গেছে, বুড়ো-তারুণ্যের অজ্ঞানকৃত প্রহসনে হেসে উঠে জানিয়ে দিতে হবে, সে, এটাকে আমরা মহাকালের মহাকাব্য ব'লে গণ্য করিনে। চিরকাল দেখে এসেচি তরুণ জ্বর নিজেকে তরুণ ব'লে কম্পান্বিত ক'রে দেখায়, তরুণ স্বাস্থ্য নিজেকে সম্পূর্ণ ভুলেই থাকে।—আজকাল তারুণ্য হঠাৎ একটা কাঁচা রোগের মতো হ'য়ে উঠ্‌ল, সে নিজেকে ভুলচে না, এবং পাড়াসুদ্ধ লোককে চব্বিশ ঘণ্টা মনে করিয়ে

রাখ্‌চে যে, সে টন্‌টনে তরুণ, বিষফোড়ার মত দগ্‌দগে তার রঙ। শুধু তাই নয় তরুণরা যে তরুণ, বুড়োদের অধ্যাপকপাড়া থেকে তার প্রমাণপত্র সংগ্রহ করা চল্‌চে। এর মধ্যে কৌতুকের কথাটা হচ্চে এই যে, তারুণ্যটা হ'ল বয়সের ধর্ম্ম, ওটা স্বভাবের নিয়ম,—ওটার জন্য রুষীয় সাহিত্যশাস্ত্র থেকে নোট মুখস্থ ক'রে কাউকে এগজামিন পাশ ক'রতে হয় না,—বিধাতার বিধানে ঐ বয়সটাতে মানুষ আপনিই আসে। কিন্তু আজকালকার দিনে তারুণ্যের বিশেষ ডিগ্রী-ধারীরা নিজেদের দুঃসহ তরুণতা সম্বন্ধে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদের থীসিস্ লিখ্‌তে সুরু করেচে। তারা বল্‌চে আমরা তরুণ-বয়স্ক ব'লেই সবাই আমাদের সমস্বরে বাহবা দাও,—আমরা যুদ্ধ করেচি ব'লে না, প্রাণ দিয়েচি ব'লে না, তরুণ বয়সে আমরা যা-ইচ্ছে-তাই লিখেচি ব'লে। সাহিত্যের তরফে বল্‌বার কথা এই যে, যেটা লেখা হয়েচে সাহিত্যের আদর্শ থেকে তাকে হয় ভালো নয় মন্দ ব'ল্‌ব, কিন্তু **তরুণ** বয়সে লেখার একটা স্বতন্ত্র আদর্শ খাড়া করতে হবে এতো আজ পর্য্যন্ত শুনিনি। বাংলা দেশে সাহিত্যের বিচারে দুই-জাতের আইন, দুই-জাতের জুরি রাখ্‌তে হবে, একটা হ'চ্চে আঠারো থেকে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের লেখকদের জন্যে, আর একটা বাকি সকলের জন্যে, এই বিধানটাই পাকা হবে নাকি? এখন থেকে লেখকদের কুষ্ঠি মিলিয়ে তবে লেখার ভালো-মন্দ ঠিক করতে হবে? কোনো তরুণ-বয়স্কের লেখার নির্লজ্জতাদোষ ধরলে নালিশ উঠবে যে, সেটাতে কেবলমাত্র লেখার নিন্দা করা হোলো না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যেখানে যত তরুণ আছে সবাইকেই গাল দেওয়া হোলো! যা হোক্, আমার বক্তব্য এই যে, যথার্থ সাহিত্যের হাসি বিরাট্, দূরগামী! সে নিষ্ঠুর, কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের উপরে নয়, হাস্যকর **মানুষের** পরে। ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ বিশেষ উক্তি সম্বন্ধে ভুল করার

আশঙ্কা আছে, চিরদিন সে রকম হ'য়ে এসেচে, কিন্তু বহু মানুষ নিয়ে বিধাতা মাঝে মাঝে যে অদ্ভুত রসের অবতারণা করেন, তার মধ্যে একটা সর্ব্বজনীনতা আছে। ডন্ কুইক্‌সোটে যদিচ য়ুরোপীয় মধ্যযুগের এবং পিক্‌বিকে ইংরেজী বিক্টোরীয় যুগের সাহিত্যিক হাসি ধ্বনিত, তবু সে-হাসি সকল মানুষের অন্তরের হাসি, কোনো দেশে তার সীমা নেই, কোনো কালে তার অবসান নেই। বাঙালী তরুণের স্বভাবে যদি কোনো হাস্যকরতা ব্যাপকভাবে এসে থাকে, তবে সাহিত্যে তার হাসি তেম্‌নি বড়ো ক'রে দেখা দিক্, এই হ'চ্চে আমার সাহিত্যিক দাবী, এটা আমার সামাজিক দাবী নয়। তুমি তর্ক ক'র্‌বে সবাই সর্বান্টেস্ বা ডিক্‌নস্ হ'তে পারে না—সে তর্ক আমি মানিনে. সাহিত্যে বড়ো-ছোটোর ভেদ আছে, মূল আদর্শে ভেদ নেই। যার কলমেই সাহিত্যিক শক্তি দেখ্‌তে পাব তার কলমের কাছেই সাহিত্যিক দাবী কর্‌ব—এই দাবীর দ্বারাই সাহিত্যের আদর্শ জোর পায়।

সাহিত্যের দোহাই ছেড়ে দিয়ে সমাজহিতের দোহাই দিতে পারো। আমার নিজের বিশ্বাস, "শনিবারের চিঠি"র শাসনের দ্বারাই অপর পক্ষে সাহিত্যের বিকৃতি উত্তেজনা পাচ্চে। যে সব লেখা উৎকট ভঙ্গীর দ্বারা নিজের সৃষ্টিছাড়া বিশেষত্বে ধাক্কা মেরে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সমালোচনার খোঁচা তাদের সেই ধাক্কা মারাকেই সাহায্য করে। সম্ভবত ক্ষণজীবীর আয়ু এ-তে বেড়েই যায়। তাও যদি না হয়, তবু সম্ভবত এ'তে বিশেষ কিছু ফল হয় না। আইনে প্রাণদণ্ডেরও বিধান আছে, প্রাণহত্যাও থাম্‌চে না।

ব্যঙ্গরসকে চিরসাহিত্যের কোঠায় প্রতিষ্ঠিত কর্‌বার জন্যে আর্টের দাবী আছে। 'শনিবারের চিঠি'র অনেক লেখকের কলম সাহিত্যের কলম, অসাধারণ তীক্ষ্ণ, সাহিত্যের অস্ত্রশালায় তার স্থান,—নব-নব

হাস্যরূপের সৃষ্টিতে তার নৈপুণ্য প্রকাশ পাবে, ব্যক্তিবিশেষের মুখ বন্ধ করা তার কাজ নয়। সে কাজ করবারও লোক আছে, তাদের কাগুজী লেখক বলা যেতে পারে, তারা প্যারাগ্রাফ-বিহারী। ইতি ২৩ পৌষ, ১৩৩৪।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আর একটা কথা যোগ ক'রে দিই। যে সব লেখক বে-আব্রু লেখা লিখেচে, তাদের কারো কারো রচনাশক্তি আছে। যেখানে তাদের গুণের পরিচয় পাওয়া যায়, সেখানে সেটা স্বীকার করা ভালো। যেটা প্রশংসার যোগ্য তাকে প্রশংসা করলে তাতে নিন্দা করবার অনিন্দনীয় অধিকার পাওয়া যায়।

চাটাই বিছায়ে কাটাই প্রহর
ঢাকাই পরোটা খাই—

শ্রী অনুপ্রাসরঞ্জন সেন

আগুন লেগেছে 'বাগুনে'র ক্ষেতে, বুঝি ফাগুনের গুণে,
'উনায়ে' উনুন নুন দিল কেন, ঘুণ ধ'রে গেল চূণে।
ডুমো গালে চুমো খেতে ঘুম দিল খোকা পথক্রম পাশে,
লুচি-মুখো মুচি কাচা আম-কুচি খেয়ে মুখ মুছি হাসে।
চাঁদের ফাঁদেতে বাঁধা প'ড়ে খাঁদা লোকে চাঁদা করি কাঁদে,
বাঁধে বাঁধে লোক চলে নানা ছাঁদে গামছা ফেলিয়া কাঁধে।

ভূর্জ্জপত্রে হায়—
কে পাঠাল লিপি, সূর্য্যের বুকে তূর্য্য কি শোনা যায়।
গুর্জ্জরে আজ খর্জ্জুর বনে দুর্জ্জয় হ'ল কে,—
লোপ করি গোঁফ, বিলাতী কলপ লেপি সোল অলকে।
বৃষ্টি পড়িছে, সৃষ্টিছাড়ারা 'কৃষ্টি'র লাগি কৃশ,
দৃশদ্‌বতীর তীরে ম্রিয়মান দাঁড়ায়ে তৃষিত বৃষ।
হায়রে গ্রহের ফের—
হৃগুতা দিয়ে কে বোজাবে আজ ছিদ্র দারিদ্র্যের ?
মুক্তার লাগি চুক্তি করিয়া শুক্তি তুলিনু তীরে,
মৌরীবনেতে গৌরী-বধূর কৌড়ি হারাল কিরে!
জ্বরে জর জর বজরায় ফিরি নজরা হানিয়া ঘাটে,
হৃদয়-দরজা প্রিয়াপদরজ লা লাগি বুঝি বা ফাটে!
'ঠাঠা-পড়া' রোদে তাই—
চাটাই বিছায়ে কাটাই প্রহর, ঢাকাই পরোটা খাই।

প্রসঙ্গ-কথা

শ্রী বলাহক নন্দী

আমার উচিত শাস্তি হইয়াছে। মিছামিছি কতকগুলি বিদেশী নাম ও বিদেশী বুলি আওড়াইবার বাতিক দেখিয়া সম্পাদকমহাশয় আমাকে আগেই সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, লেখায় বিদ্যা ফলাইবার চেষ্টা শিষ্টাচারবিরুদ্ধ, বিদ্যা থাকিলেও শিষ্টাচার

বিরুদ্ধ, বিদ্যা না থাকিলে ত কথাই নাই। তাঁহার উপদেশ অপ্রিয় হইলেও সত্য। এই অশিষ্ট আচরণের কৈফিয়ৎ হিসাবে আমার দুইটি কথা বলিবার আছে। প্রথমতঃ, আমি ইতিপূর্ব্বে কখনও বাংলা লিখি নাই। তাই বাংলা লিখিতে আরম্ভ করিয়া নিজের বুদ্ধিমত না চলিয়া মহাজন-প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলাম। দেখিলাম, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত, শ্রীযুক্ত দিলীপ কুমার রায়, শ্রীযুক্ত ধূর্জ্জটী প্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ মনীষীগণ—যাঁহারা আমাদের সাহিত্য-সমাজের চূড়া, তাঁহারা সকলেই নিজেদের রচনায় বহু দেশী ও বিদেশী নামের উল্লেখ করিয়া থাকেন। এই কারণে পাঠক-বর্গও তাঁহাদিগকে বিশেষ রকম ভয় করিয়া চলে ও সম্মান দেখায়। আমার শক্তি ও যোগ্যতা সীমাবদ্ধ হইলেও যশাকাঙ্ক্ষা অপরিমিত, তাই অনুকরণে যে বিপদ আছে সে কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম।

আমার দ্বিতীয় ওজরে অহমিকা-দোষ নাই। আমি ভাবিয়াছিলাম দেশের সুধীসম্প্রদায় আমার মত নগণ্য লোকের অপেক্ষা বিদেশের রসিক-জনের কথা শুনিয়া বেশী আনন্দলাভ করিবেন। তাঁহাদের কথা যদি সুপ্রযুক্ত ও সময়োপযোগী হয় তবে ত আপত্তির আর কোন কারণই থাকিতে পারে না। কিন্তু 'প্রগতি' আমার জারিজুরি ধরিয়া ফেলিয়া আমাকে একেবারে শোয়াইয়া দিয়াছেন। যাহারা 'অতি-আধুনিক' সাহিত্য সম্বন্ধে অতি আধুনিক নহেন তাঁহাদিগকে হয়তঃ বলিয়া দেওয়া প্রয়োজন যে 'প্রগতি' দেশবিখ্যাত কল্লোল-পত্রিকার কন্যা। ঢাকায় বিবাহ হইয়াছে। পিতা (না মাতা ?) পশ্চিমবঙ্গের ভার লইয়াছেন। কন্যা, 'যেনাস্য পিতরো যাতাঃ' এই শাস্ত্রীয় বচন অনুসরণ করিয়া, দেলিলা যেরূপ স্যামসনের শক্তি অপহরণ করিয়াছিল, সেইরূপ পূর্ব্ব-বঙ্গের যুবকবৃন্দের

শিরদাঁড়া ভাঙ্গিবার ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। 'প্রগতি' বলিতেছেন—

"মস্ত বড় পাণ্ডিত্যের মুখোস্ পরে' ছদ্মনামের অন্তরালে বসে' নিশ্চিন্ত মনে এই সব ধার করা বুলি আওড়ান শুয়ে থাকার চেয়েও সোজা।" *

* * * *

শুইয়া থাকার অপেক্ষাও সহজ কিনা তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। তবে কাজটা যে সহজ তাহা আমিও জানি। কিন্তু ইহাতে আমার লজ্জিত হইবার কোনও কারণ আছে বলিয়া মনে করি না। বরঞ্চ আমার বিশ্বাস ক্ষমতার বাহিরে কোনও কাজ করিতে গিয়া উপহাসাস্পদ হওয়াই লজ্জার কথা। মিঃ আল্‌ডুস্ হাক্‌স্‌লী এক জায়গায় বলিয়াছেন, "Those of us for whom the proper study of mankind is books—।"

---

* 'ধারকরা বুলি' এই কথাটির পিছনে যে ইঙ্গিতটি আছে তাহা মানিয়া লইতে পারিলাম না। বুলিমাত্রই—তা সে ভাষাই হউক, কিম্বা বিদ্যাই হউক—ধার করা। পিত্রার্জ্জিত ধন উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া যায়, কিন্তু পিত্রার্জ্জিত বিদ্যা পাইবার উপায় নাই। শুনিয়াছি একমাত্র শুকদেবই মাতৃগর্ভে সমস্ত বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। আমাদের মত সাধারণ মানুষের পক্ষে বিদ্যা ও ভাষা উভয়ই acquired character, inherited character নয়। 'প্রগতি' নামটিই যখন জীব-বিজ্ঞানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তখন প্রগতি সম্পাদক নিশ্চয়ই acquired ও inherited character-এর মধ্যে কি প্রভেদ তাহা জানেন। বোধ করি তিনি এ বিষয়ে নব্য-লামার্কীয় অভিমত পোষণ করেন। লামার্ক হইতে ডারউইন পর্য্যন্ত সকল বিজ্ঞানবিদ্‌দের ধারণা ছিল যে acquired character সন্তানে বর্ত্তে। পরে ভাইসমানের গবেষণার ফলে acquired character সন্তানে বর্ত্তে না বলিয়াই সিদ্ধান্ত হয়। নব্য-লামার্কীয়রা নাকি আবার পুরাতন মত ফিরাইয়া আনিতে চাহেন। আমি গত দুই তিন বৎসরের মধ্যে বংশানুক্রম সম্বন্ধে মেণ্ডেলিজ্‌মের প্রসার ভিন্ন আর কি কি নূতন গবেষণা হইয়াছে তাহার সংবাদ রাখিতে পারি নাই। যদি 'প্রগতি'ও নব্য-লামার্কীয়দের অভিমত সত্য হয় তবে খুবই আশার কথা। আমি যে নামগুলি অনেক কষ্টে মুখস্থ করিয়াছি সেইগুলি আর আমার পুত্রকে নূতন করিয়া মুখস্থ করিতে হইবে না। পিত্রার্জ্জিত বিদ্যার ফলেই সে অনায়াসে তর্কযুদ্ধে বিজয়ী হইয়া ফিরিয়া আসিতে পারিবে।

বৃদ্ধ সিল্‌ভেস্‌ত্‌র্‌ বনারের মত আমিও যদি লাইব্রেরীর ইজিচেয়ারে বসিয়া ধরার পালা সাঙ্গ করিয়া যাইতে পারি, তবেই জীবনের চরম সার্থকতা হইল জ্ঞান করিব। "জীবনের স্বপ্ন যে যে ভাবে দেখিতে চায় দেখে। আমি সে স্বপ্ন আমার লাইব্রেরীতেই বসিয়াই দেখিয়াছি।" হাতে কলমে নগ্ন সত্য ও নগ্ন নারীর সাধনা করিবার জন্য সবল, নির্ভীক, দ্বিধা-সঙ্কোচহীন বীরের অভাব হইবে না। 'প্রগতি'তেই এক সত্যান্বেষী 'বিবসনা'র উদ্দেশে গাহিয়াছেন—

'যৌবনের তীরে আজি বসে' আছি মুক্ত করি দ্বার
উৎকণ্ঠিত মন,
হে কুণ্ঠিতা, এসো এসো, নগ্ন করো শুভ্র দেহভার,
খোলো আচ্ছাদন।
দেহের লাবণ্যে তব ভরি' নেবো বাসনার কূপ,
পিপাসার্ত্ত আঁখি দিয়া পিয়া তব নিরাবৃত রূপ
করিব নিঃশেষ,
তোমার রূপের স্রোতে নিমজ্জিয়া হ'বো অপরূপ
নগ্ন নিরুদ্দেশ !!'

শুধু নগ্ন বা শুধু নিরুদ্দেশ নয়, নগ্ন ও নিরুদ্দেশ একসঙ্গে। এযে সত্যের সন্ধানে একেবারে নাগা সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইয়া যাওয়া! আমার দীন অক্ষমতা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি। আমি অখণ্ড সত্য চাইনা। মধুর মিথ্যাকেই যতদিন পারি আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিব।— "সকল জিনিষের স্বরূপ দেখিতে পাইলে আমাদের পক্ষে এক মুহূর্ত্তও বাঁচিয়া থাকা সম্ভবপর হইত না। যে আশা, যে মোহ জীবনকে মধুময় করিয়া রাখিয়াছে, যে আশা, যে মোহ জীবনকে অনেক সময়েই সহনীয় মনে করায়, মিথ্যাই তাহার উৎস, ছলনাই তাহার অবলম্বন।"

* * * *

আমার বিদ্যার দৌড়, আমার ক্ষমতা, আমার অক্ষমতা, কোনো

কিছুর সম্বন্ধেই আমার কোনও অভিমান নাই। লারোশফুকো বলিয়াছেন, ‘প্রকৃত সত্যপরায়ণ লোক সে-ই, যে নিজের সম্বন্ধে কোন অহঙ্কার পোষণ করে না। (Le vrai honnete homme est celui qui ne se pique de rien.)। কিন্তু ‘অতি-আধুনিক’ ভাষা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহার জন্য এখনও অনুতপ্ত হইতে পারিলাম না। আমি ‘তরুণ’ লেখকদের ভাষার দোষ ধরিতে সাহসী হইয়াছি দেখিয়া ‘তরুণ’ সমালোচক অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছেন। তিনি বলেন, “আধুনিক সাহিত্যিকদের ভাষা নাকি ভালো নয়। এ অভিযোগ আর যাই হোক নতুন বটে।” দৃষ্টান্তের জন্য আর মিছামিছি পরিশ্রম করি কেন? ‘তরুণ’ সমালোচক যে নমুনাটি দিয়াছেন তাহাই উদ্ধৃত করিয়া দিই।

“দীর্ঘ চব্বিশ বছরের নির্ব্বাসিতা নারী বাঙলার সবুজ সান্ত্বনা-সিঞ্চিত নীড়ের জন্য দুই বাহুর ব্যাকুল ডানা যেন বিস্তার করে’ দিয়েছে। বল্লে—সবুজ মাঠ কতদিন দেখিনি প্রভাত,—নু’য়ে পড়া নীল আকাশ। এখনো নদীতে বকের ডানার মতো শাদা পাল তুলে’ ঘোম্‌টা দেওয়া বৌর মতো নৌকা নাচে? পানকৌটি ডুব দেয় জলে। মাছ-রাঙ্গা,—গাঙশালিক? ছেলেরা উঠোনে তেম্‌নি কানামাছি খেলে? মেয়েরা মাঘমণ্ডলের ব্রত করে? হাঁরে, আর তেম্‌নি কাঠ-গোলাপ ফোটে,—সজনে ফুল? হাওয়ায় তেম্‌নি পাটের খোপা দোলে আর? সালিধানের চিরা পাওয়া যায়? কাউনের চা’ল?”

এমন মিষ্টি ষ্টাইল নাকি ন্যাকা?

“কাঙাল গলিটার পারে এক হিন্দুস্থানি ছেলের বিয়ে হচ্ছে আজ,—দারুণ হল্লা বেধেছে। সব কি অকারণ, শ্রাবণের বোদা, বোবা আকাশ থেকে মাটির এই অর্থহীন নিঃশব্দ বিস্তার। দেয়ালে একটা টিক্‌টিকি ঘুরে’ বেড়াচ্ছে,—বোকা। একটা বিড়াল বিনিয়ে বিনিয়ে শোক কর্‌ছে,—ন্যাংটো হাওয়া সার্সিতে মাথা ঠুক্‌ছে। মানদো বাড়ীটার সারা গায়ে যেন গুটি উঠেছে,—সব বাজে। উচিত বুড়ি পৃথিবীর কাণ ধরে’ কসে’ কতকগুলি চড় মারা,—যাতে টেঁসে যায় একেবারে!”

এমন বুড়ি মাতৃভাষার গায়ে গুটি-উঠান ষ্টাইলও নাকি ভাল নয়?

*   *   *   *

"খুখুরো পচা ঘর, দোরের গোড়ায় দাঁড়িয়ে তুফান একটা তুড়ি দিলেই সাবাড়; মৃত্যুশয্যায় বাপ, মা'র আয়ুতেও ফুঁ লেগেছে, সব কটি অপোগণ্ড শিশুই রোগা ডিগডিগে, কিন্তু সবাই পেট-গজন্দর। এ জীবনটা একটা অনাবাদি জমি। চার হাজার টাকা কতদিনই বা, একটা পিলেওলা ভুষিমাখানো মেয়ে ব্যাঙাচি, তার সঙ্গেই নট্‌খটি করে' জীবন কাবু ও কাবার করে' দিতে হ'বে।"

এমন "মন নাড়া দেওয়া, অনাড়ম্বর সৌন্দর্য্য"-পূর্ণ ষ্টাইল পড়িয়াও *নাকি মূর্খদের হাসি পায়?*

*   *   .   *   *

আমাদের দেশে ভাল গল্প কেন এত কম দেখিতে পাই তাহার কারণ বাহির করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছি। এখন বুঝিতে পারিলাম কারণ আর কিছুই নয় আমাদের বুদ্ধি বৈদগ্ধ ও শালীনতাবোধের অভাব। করুণ ও হাস্যকরের মধ্যে ব্যবধান এক পা মাত্র, এই সুপরিচিত বচনটি ভুলিয়া গেলে গল্প লেখা যায় না। উপরের দৃষ্টান্ত তিনটি পড়িয়া আমার শুধু হাসির চোটে পেট ফাটিতে বাকী ছিল একথা আমি বুকে হাত রাখিয়া বলিতে পারি। কিন্তু 'তরুণ' সমালোচক 'এই মাটিতে মৃদঙ্গ হয়' বসিয়া আবেগের আতিশয্যে একেবারে ডগমগ হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি বলেন, "লেখক যেন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গে কথা বল্‌ছেন—তাই একেবারে সাদাসিধে ও অত্যন্ত খোলাখুলি। একটু যে এলোমেলো, তা—ও তা'রি জন্যে। সেইজন্যে কথাগুলি বলা মাত্রই বুকে এসে লাগে।" আমাদের লিখিত ভাষায় যে একটা বিপ্লব চলিতেছে তাহা ত প্রত্যক্ষ দেখিতেছি; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কথিত ভাষায়ও যে এর চেয়ে অনেক বড় একটা বিপ্লব হইয়া গিয়াছে তাহা এই প্রথম শুনিলাম। বীরবলও যখন এই পরিবর্ত্তনের খবর রাখেন না

(তিনি কি রিপ্ ভ্যান উইঙ্কলের মত ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন ?) তখন আর কাহার কাছে দাঁড়াই ? ইতিহাসে এরকম একটা দৃষ্টান্ত আছে বটে। শুনিয়াছি একবার ফরাসীদেশে ভদ্রসমাজে আলাপ করিবার ভাষা এর চেয়ে অনেক কম উগ্র 'সাধাসিধে' ভাব ধারণ করিতে গিয়াছিল ও তাহার জন্য মলিয়েরকে 'লে প্রেসিয়োজ' লিখিতে হইয়াছিল।

* * * *

"দেহটা শুধু একটা দান, মাশুল ; কিন্তু হৃদয় তোমাকে দিলাম, মাগ্না। তোমাকে আমি পূজা করি, তুমি আমার শ্রদ্ধাশ্রু-অঞ্জলি নাও। আমার সুখের রাতে তোমার দুঃখের দ্বিপ্রহর বেশি যেন মনে হয়।"

এই ভাষা আমাদের ঘরোয়া ভাষা, মেয়েদের মুখে লাগিয়াই আছে, একথাটা শুনিয়া মার্ক টোয়েনের একটা রসিকতা মনে পড়িল। দামাস্কাশে একটি অতি প্রাচীন রাস্তা ছিল। গত ড্রুজ বিদ্রোহের সময় ফরাসী সৈন্যেরা সেটিকে তোপ দাগিয়া উড়াইয়া দিয়াছে। রাস্তাটি অত্যন্ত বাঁকাচোরা হইলেও তাহার নাম ছিল ষ্ট্রেইট ষ্ট্রীট্। ষ্ট্রেইট ষ্ট্রীটের প্রকৃতরূপ দেখিয়া মার্ক টোয়েন বলিয়াছিলেন, "It is straighter than a cork-screw but not as straight as a rainbow." প্রাঞ্জল ভাষার অতি আধুনিক নমুনা দেখিয়া আমারও বলিতে ইচ্ছা হইতেছে হয়তঃ ইহা "straighter than a corkscrew (এবিষয়েও ঠিক নিঃসন্দেহ হইতে পারিলাম না), কিন্তু ইহা as straight as a rainbow নিশ্চয়ই নয়।

* * * *

আমি বলি এই ভাষা খারাপ। 'তরুণ' সমালোচক বলেন, "তাঁদের ভাষা হয়তো রবীন্দ্রনাথ বা আনাতোল ফ্রাঁসের ভাষার সমপন্থী নয়।

কিন্তু সমপন্থী না হয়েও সমকক্ষ হ'তে পারলে দোষ কি ?" দোষ অবশ্য কিছুই নাই কিন্তু বাধা আছে। সে বাধা তাঁহাদের ক্ষমতা, শিক্ষা ও বিনয়ের অভাব। এ ভাষা যে কেন রবীন্দ্রনাথ অথবা আনাতোল ফ্রাঁসের সমপন্থীও নয় সমকক্ষও নয় তাহা আমি 'তরুণ' সমালোচককে কি করিয়া বুঝাই ? ইংরেজীতে একটা কথা আছে, "Culture is the faculty of making distinctions." তবুও আমার ক্ষমতায় যতটুকু কুলায় চেষ্টা করিয়া দেখি, নহিলে 'প্রগতি' হয়ত আবার বলিয়া উঠিবেন, "যুক্তি দিয়ে পোক্ত করবার চেষ্টা নেই, যা' মুখে আসে বল্লেই হ'ল।"

* * * *

লেখকের রচনা-পদ্ধতি ও স্কুলের ছেলের রচনা-পদ্ধতিতে এই তফাৎ যে একজনের দৃষ্টি ভিতরে ও আর একজনের দৃষ্টি বাহিরে। নূতন লেখক, ছোট ছেলে মেয়ে, পাখী, বন্য অসভ্য জাতি চটকদার জিনিষের মায়া কাটাইতে পারে না। খড়কুটা, একটু রেশমের টুকরা, একখণ্ড রঙ্গীন কাচ, সিগারেটের বাক্স, অপ্রচলিত শব্দ দেখিলেই তাহা কুড়াইয়া নিয়া হয় বাসা বাঁধে, নয় অলঙ্কার করিয়া পরে নয় সযত্নে খেলনার বাক্সে তুলিয়া রাখে, নয় লেখায় জুড়িয়া দেয়। বড় লেখকদের রচনারীতি ঠিক তাহার উল্টা। মিঃ মিড্ল্টন মারি বলিয়াছেন, "We must look for the origin of true style in a mode of emotional or intellectual experience which is peculiar to each individual writer."

লেখকের বক্তব্যের পিছনে একটা অকৃত্রিম ও নিজস্ব অনুভূতি না থাকিলে তাঁহার ভাষা ভাল হইতে পারে না। জীবনে আমরা যাহা দেখি, যাহা শুনি, সে সকলই যদি আমাদের প্রাণে সত্যকার সাড়া না জাগায় তবে আমরা সত্যকার লেখা লিখিতে পারি না। যে রচনায়

এই প্রেরণাই নাই সেখানে রাশি রাশি সৌখীন শব্দ সাজাইয়া দিলেও মর্ম্মস্পর্শী ষ্টাইল হয় না। দীর্ঘ চব্বিশ বৎসরের প্রবাসিনী নারীর মুখে যে বক্তৃতাটি দেওয়া হইয়াছে সেটিকে প্রৌঢ়া বাঙ্গালী মহিলার উক্তি না মনে হইয়া কবিযশলিপ্সু বালকের করুণ হইবার করুণ চেষ্টা বলিয়াই মনে হয়। যে প্রৌঢ়া বাঙ্গালী মহিলা ডোডো পাখী অথবা গরুড়ের মত "দুই বাহুর ব্যাকুল ডানা বিস্তার" করিয়া দিতে পারেন, তাঁহার মন কেমন জানি না, তবে সাধারণ বাঙ্গালী মহিলারা যে পাল তুলিয়া নৌকা যাইতে দেখিলে "ঘোমটা দেওয়া বৌর মত নৌকা নাচ্ছে" বলিবেন না তাহা যে কোনও বাঙ্গালীম্মন্য ব্যক্তি শপথ করিয়া বলিতে পারিবে। নাচ ও ঘোমটার মধ্যে বিরোধ প্রবাদেই বিখ্যাত।

* * * *

সত্য কথা বলিতে কি, এ ভাষা নূতন জিনিষ নয়। ইহা সকল দেশের উপন্যাস পাঠকদের অতি পুরাতন বন্ধু—'নভেলিজ' নামে সুপরিচিত। উপন্যাস লেখকের ভাষামাত্রই 'নভেলিজ' নয়, ইংরেজীতে যাহাদিগকে 'নভেলিষ্ট টাইরো' বলে তাহাদেরই ভাষার নাম 'নভেলিজ।' করুণরসে নিজে গলিয়া যাওয়া আর পরকে গলান এক জিনিষ নয়। এই সামান্য কথাটা ভুলিয়া যান বলিয়াই নবীন লেখকেরা প্রায়ই পাঠকদিগকে হাসাইতে গিয়া কাঁদাইয়া ফেলেন, কাঁদাইতে গিয়া হাসাইয়া ফেলেন।

"এখনো নদীতে বকের ডানার মতো শাদা পাল তুলে' ঘোমটা দেওয়া বৌর মতো নৌকা নাচে? পানকৌটি ডুব দেয় জলে? মাছরাঙা, গাঙশালিক? ছেলেরা উঠোনে তেম্‌নি কাণা-মাছি খেলে? মেয়েরা মাঘ-মণ্ডলের ব্রত করে? হ্যাঁরে, আর তেমনি কাঠ-গোলাপ ফোটে? সজনে ফুল? হাওয়ায় পাটের খোপা দোলে আর? সালি ধানের চিরা পাওয়া যায়? কাউনের চা'ল?"

এমন খেজুরের গুড়ের মত মিষ্ট, এমন খেজুরের রসের মত মাদক

ভাষার স্রোতে পড়িলে কি গদ্যতান্ত্রিক সমালোচকেরও গদ্যময় সমালোচনা করিবার মত আত্মসংযম থাকে? অতিকষ্টে পলায়মান কাণ্ডজ্ঞানকে ফিরাইয়া আনিয়া সমালোচক হয়তঃ জিজ্ঞাসা করেন, তবে কি কবিকে কবিত্ব করিবার সুযোগ দিবার জন্য বাংলাদেশের যত পানকৌটি, যত মাছরাঙা, যত গাঙশালিক সব মরিয়া গিয়াছে? কাঠগোলাপ, সজিনা ফুলও আর ফুটে না? কৃষকেরাও পাট ও ধানের চাষ ছাড়িয়া দিয়াছে? তখন কবি আবার প্রশ্ন করেন, "উদয়তারার সাড়ি কই, সই, কই বেণীবন্ধন?" (cf. mais ou sont les neiges d'antan)। এই আকুল কাকুতির সম্মুখে সমালোচকের আত্মসংযম বালির বাঁধের মত ভাসিয়া যায়। তিনি একেবারে কূপোকাৎ হইয়া পড়েন। বেদেরা অবোধ্য দুর্ব্বোধ্য শব্দ একত্রে গাঁথিয়া সাপের মন্ত্র তৈয়ার করে। আমাদের ভাষার বেদেরাও নোটবুকের সাহায্যে আমাদের দেশের পাঠক-পাঠিকারূপ বিষদাঁত ভাঙ্গা ফণী ও ফণিনীদিগকে বশ করিবার চেষ্টায় আছেন। সহরের লোকের উপর এই সাপের মন্ত্রের যতই প্রভাব থাকুক না কেন, আমি গ্রামের ছেলে, ইহার সাহায্যে আমাকে ভুলাইবার চেষ্টা বৃথা।

*   *   *   *

'মাঘ-মণ্ডলে'র কথাই বলি। আমার বোনের তখনও 'মাঘমণ্ডল' করিবার বয়স হয় নাই। কিন্তু আমার বাল্যসঙ্গিনীরা, যাহাদের সঙ্গে আট দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রতিদিন লুকোচুরী খেলিয়াছি, তাহারা সকলেই 'মাঘমণ্ডল' ব্রত করিত। মাঘ মাসের শেষরাত্রে পাড়ার যত মেয়েরা মিলিয়া নদীর ঘাটে স্নান করিতে যাইত ও স্নান সারিয়া মাঘ-মণ্ডলের ছড়া আবৃত্তি করিতে করিতে কখনও বা গান করিতে করিতে বাড়ী ফিরিয়া আসিত। আমাদের বাড়ীর সম্মুখ দিয়াই নদীর

ঘাটে যাইবার পথ। আমরা তাহাদের গান শুনিতে পাইলেই তাড়াতাড়ি বিছানা ও লেপ ছাড়িয়া পাশের বাড়ীতে ছুটিয়া যাইতাম। ইচ্ছা করিত, তাহাদের সঙ্গে সুরকী, চা'ল ও কাঠ কয়লার গুঁড়া লইয়া নিকান উঠান চিত্র করিতে লাগিয়া যাই। কিন্তু অস্নাত, অনিপুণ বালকদের ব্রতের জায়গার ত্রিসীমায়ও যাইবার অধিকার ছিল না। তাই আমরা শুক্‌নো পাতা, পাকাটি, খড়কুটা একত্র করিয়া জ্বালাইয়া দিয়া মেয়েদের আগুন পোহাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াই নিজেদের ধন্য মনে করিতাম। বেলা আটটা নয়টা পর্য্যন্ত ব্রত চলিত। খেলার সময়ে মেয়েদের সম্বন্ধে আমাদের মনে কোন 'শিভাল্‌রি' স্থান পাইত না। কিন্তু ব্রতের সময় মনে হইত, তাহারা যেন আমাদের চেয়ে এক ধাপ উপরে উঠিয়া গিয়াছে। দিন-রাত রামায়ণ ও মহাভারত পড়ার ফলে সেই বয়সে স্বর্গে যাইবার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল ছিল। মেয়েদের আচার অনুষ্ঠান উঠানের এক পাশে বসিয়া হাঁ করিয়া দেখিতে দেখিতে ভাবিতাম, ইহারা ব্রতের পুণ্যফলে স্বর্গে চলিয়া যাইবে, আর আমরা অকর্ম্মণ্য হতভাগারাই মর্ত্ত্যে পড়িয়া থাকিব। তখন ব্রতের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া, ছেলে করিয়া পৃথিবীতে পাঠাইবার জন্য ভগবানের অন্যায় বিচারের উপর বড়ই রাগ হইত।

* * * *

অল্প বয়সেই দেশ ছাড়িয়া আসি। তার পর অনেক কাল কাটিয়া গিয়াছে। আমার বাল্য-সখা ও বাল্য-সখীরা কে কোথায় আছে, বাঁচিয়াই আছে কিনা বলিতে পারি না। দেশও সেই ছেলেবেলার দেশ নাই। 'জল-হায়াসিন্‌থে' নদী ঢাকিয়া গিয়াছে। এর চেয়ে অনেক বড় বড় পরিবর্ত্তনও দেখা দিয়াছে। এখন আর বাড়ী হইতে 'জল-হায়াসিন্‌থের'

ঘন সবুজ পাতা ও নীল ফুলের শোভা দেখিবারও উপায় নাই। রাস্তার ওপারে, নদীর ধারে, যেখানে আমরা ক্রঞ্জি ও লর্ড রবার্টস্ সাজিয়া পার্ডেবার্গের যুদ্ধের পুনরভিনয় করিতাম, সেখানে ঢালু পাড় ভরাট্ করিয়া বড় বড় করগেট টিনের চালা তোলা হইয়াছে। তাহাতে মনোহারী জিনিষের দোকান, পাটের গুদাম, চা'ল ডালের আড়ত আরও কত কি বসিয়াছে। শেষরাত্রে সেই রাস্তায় মোটরগাড়ী যাইবার একটা কোলাহল উঠে। ভোরের 'টাইম্' ধরিবার জন্য বিশ ত্রিশখানা ফোর্ডকার, 'বাস্,' 'লরী' ষ্টেশনের দিকে যায়। তাহাদের 'হর্ণের' আওয়াজে চারিদিক জাগিয়া উঠে। যুগ-সভ্যতা দেশের সকল জায়গায়ই বিস্তার লাভ করিতেছে ইহাতে দুঃখের বিষয় কিছুই নাই। তবে সেকালের কথা মনে হইলে মনটা ক্ষণিকের জন্য কেমন চঞ্চল হইয়া উঠে। কলিকাতার সুসভ্য কোলাহলের মধ্যে বসিয়াও আমার মাঝে মাঝে রেণাঁর মত মনে হয়—

'I have at the bottom of my heart a city of Is which still rings out its bells to call to prayer a recalcitrant congregation. At times I pause to listen to these trembling vibrations which seem as if they floated up from immeasurable depths, like voices from another world. Since old age began to steal over me, more especially during the repose which summer brings with it, I have loved to gather up these distant echoes of a vanished Atlantis."

তাই 'অতি-আধুনিক' সাহিত্যের 'বিবাহের চেয়ে বড়'র মত গল্পে আমার শৈশবের স্মৃতি-বিজড়িত 'মাঘ-মণ্ডল'কে টানিয়া আনিতে দেখিলে মনে হয় কেহ যেন দেবী-প্রতিমা আনিয়া মদের দোকান সাজাইয়াছে।

* * * *

মেকি ও আসলে কি তফাৎ তাহা পঞ্চাশ পৃষ্ঠা যুক্তির অপেক্ষা দুইটি দৃষ্টান্ত দিলেই বেশী পরিষ্কার হইবে। 'অতি আধুনিক' লেখকদের ভাষার

পরিচয় আমরা পাইয়াছি। আমি আধুনিকও নহেন, পুরাতনও নহেন, কিন্তু চিরন্তন, এইরূপ দুইজন লেখক হইতে দুইটি দৃষ্টান্ত দিব,—

অগ্রহায়ণের শেষাশেষি আমরা হাসিমপুরে গেলাম। নূতন দেশ, চারিদিক দেখিতে কি রকম তাহা বুঝিলাম না—কিন্তু বাল্যকালের সেই গন্ধে এবং অনুভবে আমাকে সর্ব্বাঙ্গে বেষ্টন করিয়া ধরিল। সেই শিশিরে-ভেজা নূতন চষা ক্ষেত হইতে প্রভাতের হাওয়া, সোনা-ঢালা অড়'র এবং সরিষা ক্ষেতের আকাশভরা কোমল সুমিষ্ট গন্ধ, সেই রাখালের গান, এমন কি, ভাঙ্গা রাস্তা দিয়া গরুর গাড়ি চলার শব্দ পর্য্যন্ত আমাকে পুলকিত করিয়া তুলিল। আমার সেই জীবনারম্ভের অতীত স্মৃতি তাহার অনির্ব্বচনীয় ধ্বনি ও গন্ধ লইয়া প্রত্যক্ষ বর্ত্তমানের মত আমাকে ঘিরিয়া বসিল, অন্ধ চক্ষু তাহার কোন প্রতিবাদ করিতে পারিল না। সেই বাল্যকালের মধ্যে ফিরিয়া গেলাম।—কেবল মাকে পাইলাম না। মনে মনে দেখিতে পাইলাম দিদিমা তাহার বিরল কেশগুচ্ছ মুক্ত করিয়া রৌদ্রে পিঠ দিয়া প্রাঙ্গণে বড়ি দিতেছেন, কিন্তু তাঁহার সেই মৃদু কম্পিত প্রাচীন দুর্ব্বল কণ্ঠে আমাদের গ্রাম্য সাধু ভজনদাসের দেহতত্ত্ব গান গুঞ্জনস্বরে শুনিতে পাইলাম না, সেই নবান্নের উৎসব শীতের শিশির-স্নাত আকাশের মধ্যে সজীব হইয়া জাগিয়া উঠিল, কিন্তু ঢেঁকিশালে নূতন ধান কুটিবার জনতার মধ্যে আমার ছোট ছোট পল্লী সঙ্গিনীদের সমাগম কোথায় গেল? সন্ধ্যাবেলা অদূরে কোথা হইতে হাম্বাধ্বনি শুনিতে পাই,—তখন মনে পড়ে মা সন্ধ্যাদীপ হাতে করিয়া গোয়ালে আলো দেখাইতে যাইতেছেন; সেই সঙ্গে ভিজা জাবনার খড় জ্বালানো ধোঁয়ার গন্ধ যেন হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে, এবং শুনিতে পাই পুকুরের পাড়ে বিদ্যালঙ্কারদের ঠাকুর বাড়ি হইতে কাঁসর ঘণ্টার শব্দ আসিতেছে।

*   *   *   *

My life in the plantation in winter was a constant watching for spring. May, June, and July were the leafless months, but not wholly songless. On any genial and windless day of sunshine in winter a few swallows would reappear, nobody could guess from where, to spend the bright hours wheeling like house-martins about the house, revisiting their old breeding-holes under the eaves, and uttering their lively little rippling songs, as of water running in a pebbly stream. When the sun declined they would vanish, to be seen no more until we had another perfect spring-like day.

On such days in July and on any mild misty morning, standing on the mound within the moat I would listen to the

sounds from the wide open plain, and they were sounds of spring—the constant drumming and rhythmic cries of the spur-wing lapwings engaged in their social meetings and "dances," and the song of the pipit soaring high up and pouring out its thick prolonged strains as it slowly floated downwards to the earth,

In August the peach blossomed. The great old trees standing wide apart on their grassy carpet, barely touching each other with the tips of their widest branches, were like great mound-shaped clouds of exquisite rosy pink blossoms. There was then nothing in the universe which could compare in loveliness to that spectacle, I was a worshipper of trees at this season, and I remember the feelings I experienced when one day a flock of green paroquets came screaming down and alighted on one of the trees near me.

*   *   *   *

রবীন্দ্রনাথের কথা শিক্ষিত-সমাজে বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু হাডসন হইতে এইটুকুমাত্র উদ্ধৃত করিয়া আমার তৃপ্তি হয় না। যদি কেহ এই দৃষ্টান্তটি পড়িয়া হাডসনের প্রতি আকৃষ্ট হন, তবে তাঁহার কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ, তিনি যেন অন্ততঃ **Far Away and Long Ago** নামক বইখানা পড়িয়া দেখেন। হাডসনের জন্ম দক্ষিণ আমেরিকায়। বাল্য ও কৈশোর প্রকৃতির একান্ত সংসর্গে কাটাইয়া পরজীবনে তাঁহাকে জীবিকার জন্য লণ্ডনে আসিয়া বাস করিতে হয়। তিনি নিজে বলিয়াছেন, দক্ষিণ আমেরিকায় থাকার সময়ে তাঁহার বিশ্বাস ছিল, তিনি গাছ না দেখিয়া ও পাখীর গান না শুনিয়া এক দিনও বাঁচিয়া থাকিতে পারিবেন না। তবুও তাঁহাকে লণ্ডনে আসিয়া হোটেলওয়ালা হইতে হয়। লণ্ডনের কুয়াসা, ধোঁয়া ও জনতার মধ্যে তাঁহার প্রাণ দক্ষিণ আমেরিকার মুক্ত প্রান্তর, নীল আকাশ, গাছ, শত

রং মাখা পাখীর জন্য হাহাকার করিয়া ফিরিত। তাহারই ফল Far Away and Long Ago। এই বইখানিতে তাঁহার ছেলেবেলার কথা ঝরণার জলের মত স্বচ্ছ ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন। দীর্ঘ বই-খানির কোথাও করুণ হইবার বিন্দুমাত্র প্রচেষ্টা নাই অথচ অনেক সময়েই চোখের জল ধরিয়া রাখা যায় না। আমরা সকলেই ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের Ode on the Intimations of Immortality পড়িয়াছি। হাডসন্‌ পড়িতে পড়িতে আমার কেবলি মনে হইয়াছে—

There was a time when meadow, grove, and stream.
The earth, and every common sight,
To me did seem
Apparelled in celestial light,
The glory and the freshness of a dream.

—এই কথাগুলিতে বিশ্বাস করিবার অধিকার যদি কাহারও থাকিয়া থাকে, তবে সে হাডসনের। তাঁহার ষ্টাইল সম্বন্ধে সার্টিফিকেট দিতে যাইব এরূপ ধৃষ্টতা আমার নাই। এ বিষয়ে গ্যাল্‌স্‌ওয়ার্দি প্রমুখ বিখ্যাত ইংরেজ লেখকগণ যাহা বলিবার বলিয়াছেন।

* * * *

রেণাঁ সত্যই বলিয়াছেন, যে যাহা ভালবাসে তাহার তারই সম্বন্ধে লেখা অথবা বলা উচিত। জীবনের পথে চলিতে চলিতে আমাদের কুৎসিৎ, নীচ, যাহা-কিছুর সংস্পর্শে আসিতে হয়, তাহার একমাত্র উত্তর নীরব অবজ্ঞা ও বিস্মৃতি। আমার এক একবার মনে হয়, 'তরুণ' সাহিত্য রসাতলে যাউক। যাহাদের পড়িয়া আনন্দ পাইয়াছি, তাহাদের সম্বন্ধেই কিছু বলি। কিন্তু যে সাহিত্য জুতার পেরেকের মত পায়ের তলায় নিদারুণ ভাবে প্রতি মুহূর্ত্তে ফুটিতেছে, তাহাকে ভোলা কি সহজ? তাই যে প্রসঙ্গ আরম্ভ করিয়াছি তাহাকেই ধরিয়া থাকিতে

হইবে। রবীন্দ্রনাথ অথবা হাড্‌সন ও 'তরুণ' সাহিত্যিকদের ভাষার মধ্যে কি তফাৎ তাহা একটি উপমা হইতেই 'তরুণ' সমালোচক বুঝিতে পারিবেন। রবীন্দ্রনাথের লেখা যেন পল্‌টনের মাঠ ও 'অতি আধুনিক' লেখা যেন ঠাঠারি বাজার। পলটনের মাঠ ও ঠাঠারি বাজার ঢাকার দুইটি গদ্যময় জায়গা, কিন্তু 'তরুণ' সাহিত্যিকের কল্পনায় তাহারা নারীর চরম সম্মান ও চরম অসম্মানের রূপক হইয়া উঠিয়াছে। 'তরুণ'-সাহিত্য-গুরুর ভাষাই উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি (শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য সাহিত্যরসিক পণ্ডিতগণ মনে করেন ইঁহার ভাষাতেই লক্ষবর্ষ সাধনার ফলে বাংলা ভাষা শতদলের মত বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে।)—

"রেল-রাস্তা পেরলেই মাঠ,—সমস্ত হাওয়া একচেটে ক'রে রেখেছে। এদিকে ঘেঞ্জি সহরতলি ধোঁকে, লক্‌গজে পুঁয়ে পাওয়া সহর।...ব্যাধি জীর্ণ বুড়ো থুথুরো সহর ঐ তাজা সবুজ অগাধ মাঠের দিকে ভিজা চোখে চেয়ে থাকে। নুলো বাড়িয়ে ডাকে, মিনতি জানায়। পল্টনের মাঠের সঙ্গে ঠাঠারি বাজারের কথা চলে।...মাঠ যেন সংসার নিকেতনের সব্রীড়কটাক্ষা লজ্জা নববধূ আর ও যেন বারবনিতা"

ঠিক কথা। রবীন্দ্রনাথ ও হাড্‌সনের ভাষা chaste, আর "অতি-আধুনিক" ভাষা meretricious.

* * * *

কিন্তু আমি অবিচার করিতেছি না ত? আমি ইঁহাদের ভাষা বুঝি না তাহা স্পষ্টই স্বীকার করি। না বুঝিবার একটু কারণও আছে। 'তরুণ' সমালোচক বলিতেছেন, "আধুনিকদের রচনা-ভঙ্গীর জন্য continental লেখকদের প্রভাব, বিশেষ ক'রে হামসুন ও গর্কীর প্রভাব দায়ী।" তাই বলুন? শুধু ইংরেজী ও বাংলা জানার ফলেই আমরা ইংরেজী লিখিতে গিয়া বাংলা লিখি, বাংলা লিখিতে গিয়া ইংরেজী লিখি। ইহার উপর যদি কাহারও আবার নরওয়েজিয়ান্‌ও রুশভাষা

জানা থাকে তবে তাঁহাদের ভাষা যে Esperantoর মত ভাষার তিলোত্তমা হইয়া উঠিবে তাহা আর বিচিত্র কি? আমি নরওয়েজিয়ান জানি না সুতরাং অতি আধুনিক ভাষার নরওয়েজিয়ান ভঙ্গী আমার চোখে ধরা পড়িবার নয়। একবার রুশভাষা শিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু "শ্রেডিজেম্‌নাভো মোরিয়া মালেঙ্কোয়ে ক্রোশেচ্‌নোয়ে ট্সারস্ট্‌ভো মানাখো"র বেশী অগ্রসর হইতে পারি নাই। এইটুকু বিদ্যার জোরে গোর্কীর প্রভাব যাচাই করা সম্ভবপর নয়। তাই আমি একটা সাংঘাতিক ভুল করিয়া বসিয়াছিলাম। অতি-আধুনিকদের ভাষার মধ্যে "যুক্তি দিয়ে পোক্ত করা," "রোদনের দিনে বোধন," "কাবু ও কাবার," "বন-উচ্ছের তুচ্ছ পাতা," "কাম-বেদানার দানা," "পদ্মার জলে পদ্ম ভাসান," প্রভৃতি প্রয়োগ দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম ইঁহাদের ভাষার উপর দাশুরায়ের প্রভাব অত্যন্ত বেশী।

* * * *

'অতি-আধুনিক'দিগকে উপদেশ দিতে যাইব এরূপ সাহস আমার নাই। তবে ইঁহারা নিজেই যখন গোর্কীকে ইষ্ট-দেবতা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন সেই জন্যই গোর্কীর গুরু চেখভের দুই একটা কথা তুলিয়া দিতে ভরসা পাইতেছি। চেখভ একবার গোর্কীকে লিখিয়াছিলেন—

"তোমার যতটুকু সংযম থাকা উচিত ততটুকু সংযম নাই। থিয়েটারে একশ্রেণীর দর্শক দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা বাহবা ও হাততালি দিবার উৎসাহে অভিনয় অপরকে শুনিতে দেয় না, নিজেও শুনে না। তুমি অনেকটা তাহাদের মত। তুমি কথাবার্ত্তার ফাঁকে ফাঁকে স্বাভাবিক দৃশ্যের যে সব বর্ণনা দাও, তাহাতেই বিশেষ করিয়া এই সংযমের অভাব দেখিতে পাই। তোমার বর্ণনা পড়িতে পড়িতে মনে হয় এইগুলি আরও একটু সংযত, আরও একটু সংক্ষিপ্ত হইলে ভাল হইত। বারবার করুণ, উচ্ছৃঙ্খল, পেলব, এই শব্দগুলি ব্যবহার করার জন্য তোমার বর্ণনাগুলি কৃত্রিম ও একঘেয়ে বাড়িয়া মনে হয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই পাঠকের মন অসাড় ও ক্লান্ত হইয়া পড়ে।"

* * * *

এতকথা বলিতে বলিতে আসল কথাটা বলিতেই ভুলিয়া গিয়াছি। ষ্টাইল কি ? সাধারণ লোকের ধারণা ষ্টাইল ভাষার অলঙ্কার অথবা পোষাক। যে সমাজে মিশিতে যাইতেছি তাহার রুচি ও মর্য্যাদা অনুযায়ী পরিয়া নিলেই হইল। তাই কথা কহিবার গেঞ্জি-পরা ভাষা হইতে আরম্ভ করিয়া, সাধারণ প্রবন্ধের খদ্দরপরা ভাষা, গল্প ও উপন্যাসের ১৯ নম্বর গ্লাসগো-পরা ভাষা, কবিতার মুগার পাঞ্জাবী ও শাল পরা ভাষা, 'অতি-আধুনিক' সাহিত্যের আদ্দির ঘুন্টিদার পাঞ্জাবী ও লপেটা পরা, আতর মাখান, সুরমা আঁকা, ঘাড় ও কাণের উপরের চুলছাঁটা ভাষা পর্য্যন্ত একটা ক্রমোন্নতি-শীল পর্য্যায় দেখিতে পাই। কিন্তু আসলে পোষাকে ও ভাষাতে একটা গুরুতর প্রভেদ আছে। ঘুন্টিদার পাঞ্জাবী পরা ব্যক্তিটির যখন ঘাড় ও কাণের উপর চুল গজায় তখন সে ইচ্ছা করিলে শাল দোশালা পরিয়া ভদ্রসমাজে যাইতে পারে। ঘুন্টিদার পাঞ্জাবী পরা ভাষার লেখক এই সুবিধাটুকু হইতে বঞ্চিত। তাহার মনই ঘুন্টিদার ফিন্‌ফিনে পাঞ্জাবী ও লপেটা-পরা, আতর-মাখানো, সুরমা আঁকা, ঘাড় ও কানের উপরের চুল-ছাঁটা গাড়োয়ানি ছাঁদের হইয়া গিয়াছে। সেই জন্যই বুফোঁ বলিয়াছেন, মানুষটা যা ষ্টাইলও তাই (le style c'est l'homme meme) আর ফ্লোবেয়ারও সেই কথাটা মানিয়া লইয়াছেন। এই কথাটির টীকা স্বরূপ রেমি দ্য গূরমোঁ ও আনাতোল ফ্রাঁসের দুইটী উক্তি তুলিয়া দিতেছি। "ষ্টাইল গলার স্বর অথবা চুলের রঙের মত জন্মগত ধর্ম্ম। লিখিবার ক্ষমতা চেষ্টা করিয়া আয়ত্ত করা যায়, ষ্টাইল আয়ত্ত করা যায় না। ইচ্ছা করিয়া একটা ষ্টাইল ধরা চুলে কলপ লাগাইবার মত। রোজ স্নানের সময় উঠিয়া যাইবে আবার নূতন করিয়া লাগাইতে হইবে।" "ষ্টাইল একটা ক্ষমতা। আমরা যেমন গলার স্বর লইয়া জন্মাই, তেমনি ষ্টাইলও লইয়াই জন্মাই।" নবীন লেখকদের ষ্টাইল ভাল না

হইবার প্রধান কারণ তাহারা সহজ, স্বাভাবিক, সরল হইতে জানে না। Sincerityর অভাব অলঙ্কার দিয়া ঢাকিতে চায়। কিন্তু শুধু গরম মশলা দিয়া রান্নার মত, শুধু অলঙ্কার দিয়া ভাষার সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিবার প্রচেষ্টাও একান্তই নিষ্ফল।*

* * * *

আমি 'তরুণ' সাহিত্যিকদের অনেকেরই বাঁশী শুনিয়াছি কিন্তু তাঁহাদের কাহারও মূর্ত্তি দেখি নাই। তাই ষ্টাইলের আরসী হইতেই তাঁহাদের রূপ কল্পনা করিতে চেষ্টা করি। এই অভ্যাসের ফলে আমার চোখের সম্মুখে সর্ব্বদাই একটা ফ্যান্সিড্রেস নাচের দল ভাসিয়া বেড়ায়। এই পিয়েরো, এই আর্‌ল্‌ক্যৌ, এই 'কাবারে-বয়' ও "গার্ল", কখন ও বা নট, কখনও বা সং, কখনও বা অষ্টাবক্র মুনি। কিন্তু একি করিতেছি? যে অপকর্ম্মের জন্য ক্ষমাভিক্ষা করিয়া এই প্রসঙ্গ আরম্ভ করিয়াছিলাম আবার তাহাই করিয়া বসিয়াছি,—সেই ধারকরা বুলি, সেই পাণ্ডিত্যের মুখোস্, সেই ছদ্মনামের অন্তরালে নিশ্চিন্ত মনে শুইয়া থাকা! হাত একবার বেসুরায় পাকিলে তাহাকে সুরে ফিরাইয়া নেওয়া কষ্টসাধ্য। সুরে ফিরাইয়া নিয়াই বা কি হইবে? আমার মত লোকের creative সাহিত্যে স্থান কোথায়? শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু, শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রভৃতি স্রষ্টাদের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের কাব্য উপন্যাসের দৈন্য ও বিড়ম্বনাই প্রতিদিন অধিকতর অসহ্য বোধ হইতেছে। আমি ত হীন সাহিত্যিক গ্লাডিয়েটর মাত্র। পুরাতন সম্রাটরা সিংহাসনচ্যুত হইয়াছেন। Caesar Augustus Divus এর পর Agrippina পুত্র Neroকে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত দেখিয়া মরিতেছি ইহাই আমার চরম সৌভাগ্য! Ave, Caesar Imperator, Morituri Te Salutant.

* এখানে আমার পাঠকদের মধ্যে যাহারা জাঁ জাক্ ক্রসোঁর 'আনাতোল ফ্রাঁস আঁ পাঁতুফ্‌ল্' পড়িয়াছেন তাঁহাদের "mon enfant,mefiez-vous de la patisserie. La patisserie, c'est le factice, c'est l'adventice." এই কথাগুলি মনে পড়িবে।

মনোদর্পণ

(মনস্তত্ত্বমূলক একাঙ্ক গীতিনাট্য)

শ্রী হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

—কুশীলবগণ—

কবি—'অল-তরুণডাঙ্গা ব্যথিক ক্লাবে'র একজন বিশিষ্ট সভ্য, অবিবাহিত, এখনো ছাত্র। কবিপ্রতিভা উত্তরে হ্যারিসন রোড, দক্ষিণে মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, পূর্ব্বে ঢাকার পল্টনের মাঠ ও পশ্চিমে লক্ষ্মণাবতী বা লক্ষ্ণৌ পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

নারী—স্থানীয় ভদ্রমহিলা, 'এ, টি, বি, সি'র সভ্যদের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকিলেও তাহাদের অত্যধিক প্রীতির উচ্ছ্বাসে ত্যক্ত-বিরক্ত। এই সভার সভ্যদের নিকট ইনিই চিরন্তনী নারীর প্রতীক।

ফকীর—সন্ধ্যার পরে কেরোসিনের ডিবা জ্বালাইয়া 'যাহা মুস্কিল তাঁহা আসান' গাহিয়া বেড়ায়।

[স্থান—তরুণডাঙ্গা। কাল সায়ংসন্ধ্যা। কবি ক্লাবঘরের বারান্দায় বসিয়া আছেন। পথে লোকচলাচল কিছু কম। রাস্তায় গ্যাসের আলো সবেমাত্র জ্বালা হইয়াছে। ক্লাবঘরের দরজা ভিতর হইতে বন্ধ।]

কবি (স্বগত)। চানাচুরআলা হানা দিয়ে যায় দূরে,
পলকের মাঝে জ্বালা হ'ল গ্যাসালোক—
ব'সে ব'সে সারা এ মরু সাহারাপুরে
বাতায়নবনে ফুটিল না কালো চোখ!
এখনো এ পথে এলোনা প্রেয়সী শশী
বেথুনের 'বাস' পাশ দিয়ে গেল কই?
আর কতখণ আনমনে রই বসি—
উড়ে যায় শোকে হৃদি-মরায়ের ছই।

[পথের উপরের একটি বাড়ীতে ইলেক্‌ট্রিক আলো জ্বলিয়া উঠিল, কবির ব্যগ্রচক্ষু সেদিকে দেয়ালের গায়ে গজালের মত নিবদ্ধ হইল, কবি চশমাজোড়া খুলিয়া রুমালে মুছিয়া আবার পরিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে গান ধরিলেন।]

ওকি ওই দূর গগনে
উদিল সোঁদাল্ শশী ?
জ্যোছনা জরিণ-শাড়ী
ভূতলে পড়্‌ল খসি ?
চিপা ওই গলির বাঁকে
পোলারে নিঁয়ে কাঁখে
চাহিল ঘোম্‌টা ফাঁকে—
না জানি কোন্ প্রেয়সী !
বল্‌ছি—

[এমন সময় 'নারী' বড়রাস্তায় ট্রাম হইতে নামিয়া গলির মোড়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কবি তাঁহাকে দেখিয়া চকিত হইয়া গান থামাইলেন।]

কবি (স্বগত)।—আপনার মনে ছিনিমিনি খেলি, বিকিকিনি সারাবেলা—
বুকের তলায় কখন পড়িয়া গুঁড়াবে দেহের ঢেলা,
বুঝিতে পারি না ঠিক
মৃত্যু আঁধার তখনই ঘনায় আঁখি যবে অনিমিখ।
আমি যবে ছিনু আন্‌মনা,—তুমি মন্-বনে দিলে 'পাড়া' !
কুসুম-দলন ব্যথায় শিহরি উঠিনু লক্ষীছাড়া !
ছিনু তন্দ্রার ঘোরে—
সান্দ্র আঁধারে নিঃসাড়ে এসে আঘাত করিলে দোরে ·

এই গোপনতা নহেক তোমার আমি যে তোমার লাগি
অতন্দ্র নভে শুকতারা সম পথ পরে একা জাগি।

নারী (স্বগত)। ভালো জ্বালাতন কর্‌লে যা হোক—
আচ্ছা ছিনে জোঁক!
গিল্‌তে যেন চাইছে মোরে,
ক্যাঁক্‌ড়া-হেন চোখ!

[কবি এদিক ওদিক চাহিয়া পথ নির্জ্জন দেখিয়া মাথা চুলকাইয়া নারীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—]

কবি। অনেক দূরে গিয়েছিলেন বুঝি—
বেরিয়েছিলেন হ'ল অনেকক্ষণ,
পথে কোথাও কষ্ট হয়নি কিছু—
বদন-কমল দেখায় বি-বরণ!

নারী (স্বগত)। আঃ মলো যা—আচ্ছা বিপদ দেখি—

[পরে একটু মজা করিবার ইচ্ছায়]

নারী। একটু ক্লান্তি বেড়িয়ে এলেই হয়—
আপনি হেথায় একলা যে আজ ব'সে?

কবি। দেখ্‌ছি আমার জানেন পরিচয়!
অনেক দিনই দেখেছি দূর হ'তে—
আলাপ করার ছিল অনেক লোভ;
ক্লাবের সভ্য কেউ ত আজ আর নাই
তাতে আমার নেইক কোন ক্ষোভ।
একটু দাঁড়ান প্রাণ খুলে আজ দেখি—
দেখার অন্ত হবেই না তা জানি,
আজ্‌কে আমার বড়ই কপাল জোর—
একটু দাঁড়ান, দেখি বদনখানি—

একদৃষ্টে দেখিতে দেখিতে কবির মহান ভাবাবেশ হইল, স্থান কাল-পাত্র ভুলিয়া তিনি ব্যাকুল ভাবে বলিয়া উঠিলেন—]

কবি নিজেরে জানো না ওগো অপরূপা নারী—
সুমুখে দাঁড়াও রে মোহিনী মনোহারী—
জড়-দর্পণে নিজেরে দেখেছ তুমি ;
কি ছায়া ধরিল মনোদর্পণ-ভূমি,
ক্ষণেক দাঁড়াও, তোমারে শোনাই সখি—

নারী (স্বগত)। দেখি এ বাঁদর কত যেতে পারে বকি'-

কবি। তোমারে নেহারি সখি মন-মুকুরে—
গাগরী মিথুন ভাসে বুক-পুকুরে।

শিখীর কলাপ তোমারে ঘিরিয়া আছে,
দেখিতে পাও কি তোমার আয়না-কাচে ?
সাড়ীতে তোমার ঝলিছে উদয় তারা—
ও-কেশ-কলাপে নবঘন জলধারা—

নারী। ভাল ভাল বেশ, শুনিয়া হলেম খুসী—
[স্বগত] ঘরে গিয়ে বাছা খাও খোল আর ভুষি—

কবি। কবির নয়নে নারীর গোপন রূপে—
উশীর শিহরি ভরে প্রতিরোমকূপে !
হে নারী ললিতা ওগো নারী নিরুপমা—

নারী। আসি তবে আজ, করুন আমারে ক্ষমা—

কবি। দেখেছ কি মোরে নয়ন মেলিয়া হায়—
বুকে কত ব্যথা পলে পলে মূরছায়—

নারী। মনোদর্পণে আমিও কি যেন দেখি—
আর কেহ হবে কিম্বা আপনি সেকি ?

কবি। দেখেছ, হে সখি, মোরে বিবরিয়া কহ,
স্মরণে রাখিব তব কথা অহরহ।

নারী। মন-আয়নায় আপনারে হেরি, কবি
লেজ-বিশিষ্ট শাখা-হরিণের ছবি।
চোখেতে চশমা এই জোড়াটাই বটে,
কেন হেন ছবি ভাসে মোর মন-পটে ?
হৃদয় আমার করিল কি প্রতারণা !

কবি। থাক্‌রে নিঠুরা, আমি আর শুনিব না।

নারী (ব্যঙ্গের সহিত)।
আমার পিছনে পেখম দেখেছ ?—নয় !
তব পিছে আমি হেরি তব পরিচয়,—
জড়দর্পণে নিজেরে দেখেছ তুমি—
ধরে এই ছায়া মনোদর্পণ ভূমি—

(স্বগত) ছি ছি ছি তোমরা এমনি বাঁদর জাতি,
উচিত শাস্তি তোমাদের মুখে লাথি।

[সরোষে প্রস্থান]

[আহত কবির দূরায়মানা নারীর দিকে অনিমেষে চাহিয়া থাকিয়া
সহসা 'ব্যথা, ব্যথা, ব্যথা' বলিয়া আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করণ,
পতন ও মুর্চ্ছা]

ফকির। যাহা মুস্কিল তাঁহা আসান—
রাখ্‌খো ইয়াদ সব ইন্‌সান।

যবনিকা পতন

ঝড়ের রাতে

শ্রী দিবাকর শর্ম্মা

[একখানি পত্রিকা পাইলাম। "বাস্তবিকা" হইতে উক্ত নামে শ্রীমান্ হরিকুমার ও কুমারী পলাতকা পালিতের যুগল সম্পাদনে বাহির হইয়াছে। মলাটে লেখা 'ঋতু পত্রিকা'। এ-খানি হেমন্ত সংখ্যা। সুদীর্ঘ মুখবন্ধ পড়িবার অবকাশ পাই নাই। প্রথমেই একটি গল্প পড়িলাম। আদ্যন্ত নকল করিয়া পাঠাই। কেমন লাগে লিখিবেন।

ইতি—শ্রীদিবাকর।]

"ঝড়ের রাতে"

মেল ট্রেণ থামে, থামেও না; চলে হুস্ হুস্!

মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে চলে সে, ডোবার জলে মাছ ধরে কালো ডাগর মেয়েরা—তাদের দেখে দাঁড়ায় না। মাঠের মাঝে তেঁতুল-লক্ষ্মী, বাবলা-বৌয়ের দল সারি সারি দাঁড়িয়ে দেয় হাতছানি। চেয়ে দেখেনা তাদের পানে,—মেলট্রেণ চলে হুস্ হুস্।

ইণ্টার ক্লাশের ছোট কামরা! পলক একা ব'সে তাকিয়ে থাকে, শূন্য দুখান গদী-আঁটা বেঞ্চের দিকে। যারা ছিল তাদের কথা মনে জাগে—একরাশ তরুণী নেমে গেলেন সেই জংশনে—যেন তাদের অঙ্গ-তাপে আসনদুটি ভরা আছে। মাঝে মাঝে বসে গিয়ে তার উপরে. আব মেজেতে দোক্তার রসে লাল্‌চে কালো পানের পিকের উপর মুখ নামিয়ে থুথু ফেলে দুঃখী পলক!

জন্ম-দুখী। কত ব্যথাই না পেয়েছে! পড়্‌ত কলেজে, পাশের বাড়ীর মেয়ের জন্যে বুকের আগুনে প্রেমের হোম করত। পা পিছ্‌লে

প'ড়ে গিয়ে চিলে কোঠা থেকে আঘাত পেল। কলেজের ওয়ার্ডে রাখ্‌লে নিয়ে ছেলেরা।—ওষুধ খাবার ফাঁকে বিবি নার্সের মুখে চুমু দিত। এমনি ক'রে একটি মাস। একদিন ডাক্তার দেখে তাকে দিলে ছুটি। মেসে জায়গা নেই, পরের বাড়ী ঢোকার অপরাধে বুড়ো প্রিন্সিপ্যাল কলেজের খাতা থেকে গম্ভীর মুখে দিলেন নাম কেটে—যেন তিনি নীতি-রাজ্যের বাদ্‌শা—পোপ!

পলক দেশে ফিরে এল। আজ সে নতুন পলক, পান করেছে নতুন সুধা। সেই সুধায় মাতাল হ'য়ে এল সে। এই নতুন মানুষটিকে কেউ চিন্‌লে না, চিন্‌লে শুধু ওপাড়ার শুভঙ্করী। পলক তাকে আদর ক'রে ডাকে শুভা—বিশবছরের ঝুম্‌কো লতা, ফুল ফোটেনি। ঘরে বুড়ো মামা কাণা, কেঁদে বলে বিয়ে দিয়েছিলুম বারো বছরেই, বছর পরে তারা তাড়িয়ে দিলে। কেন? মামা জবাব দেয় না, কাঁদে। শুভা গালে হাত দেয়, ভাবে সাত বছর আগেকার কথা। তার অবুঝ-কালের মন্তর-পড়া স্বামীর ভাগ্নে দিগম্বরের মুখ মনে পড়ে—চোখ দুটো তার ছল্‌ ছলিয়ে ওঠে। প্রথম প্রথম মামীকে এড়িয়ে চলে সে, দু'মাস যেতে আর পারে না। দিনের ভাগ্নে রাতের মামা হয়, যেন রূপকথার রাজপুত্তুর—দিনে দত্যি রাতে দেবতা। সেই তার প্রাণলক্ষ্মীর গলায় দোলা প্রথম মালা, বিজয় মালা। শুভার মুখ হাসিতে ওঠে ভ'রে। কড়া চাপিয়ে উনুনে খিল্‌খিলিয়ে হাসে, তার স্বামীর কথা মনে ক'রে—সে আর বিয়ে করে নি। তেল তেতে ওঠে কল্‌কলিয়ে—নিম্‌কি ভাজে।

পলক আসে রান্না ঘরে। বাঁ হাতে চিবুক ধ'রে ডান হাতে খাওয়ায়—নিজেও খায়। মামাকে বলে—ছেঁচ্‌কি রাঁধি। কানা মামা চোখে দেখে না, বলে—বেশ হ'য়েছে।

এমনি ক'রে একটি বছর। ঝুম্‌কো লতায় ফুল ফোটে ফোটে, এমন

সময় জন্মাল এক প্রেমকাঁটা—একটি শিশু। পড়সী শুধোয়, কি ও? পলক বলে,—বেড়াল কাঁদে। সবাই হাসে। হাসির জ্বালায় জ্বলে উঠে দুঃখী পলক বেরিয়ে পড়ে। বন বাদাড়ের আঁধার পথে কাঁটা ফোটে, তবু চলে—দূর ষ্টেশনের আলোর পানে, জংশন।

সেখানে নামে এক ঝাড় শ্যাম্‌লী লতা। পলকের বুক ফেটে যায়—আর দুটো ষ্টেশন পরে হ'ত! তবু ওঠে সেই গাড়ীতেই চোখ বুজে। বেঞ্চের উপর গাল রেখে তাতিয়ে নিয়ে উঠে বসে, আর কেউ নেই, একা। মেলট্রেণ চলে, হুস্, হুস্।

বড় ষ্টেশন। মেল থামে। 'গরম দুধ' হেঁকে যায় ঘাগ্‌রা-ঘেরা আহিরিণী—ভরা গাঙ্গে গা ডুবিয়ে ডাহুকী যেন আসে। বয়স কত ঠাওর হয় না। পলক ডাকে—দুঃখী পলক! দুটো হেসে কথা কয়। দুধ খায় না তবু কেনে।

নাম কি তোমার?

রাম-পিয়ারী।

ফির্‌বার পথে পিয়ারী বলে ডাক্‌ব তোমায়, আস্‌বে?—দুঃখী পলক ব্যাকুল চোখে তার মুখের পানে চেয়ে শুধোয়।

শুক্‌নো ঠোঁটে হাসি ফোটে—পিয়ারী বলে, আস্‌ব। একটু গিয়ে মুখ ফেরায়, তেরছা চোখে হেনে যায় একটি শাশ্বত খোঁচা—বুকে হাত চেপে দুঃখী পলক ব'সে পড়ে।

গার্ড বাঁশী দেয়। গাড়ী ছাড়ে ছাড়ে। দরজা খুলে ঢুকে পড়ে এক তরুণী—যেন একটি স্বর্ণলতা সবুজ শাড়ীর পাতায় ঢাকা। দাম চুকিয়ে কুলীরা যায়। গাড়ী ছাড়ে।

পলকের চোখে পলক পড়ে না। মেয়েটি ঘুরে দাঁড়ায় চোখ দুটো বড় ক'রে শুধোয়—আপনি এ গাড়ীতে!

পলকের বুক কাঁপে,কথা কয়না। মেয়েটি নিজেই বলে,মেয়ে-গাড়ী যে!

মেয়ে-গাড়ী! মুখ বাড়িয়ে পলক বলে—নামি তবে?

মেয়েটি হাসে, বলে—নামবেন কি? গাড়ী যে চল্‌ছে!

তবে?

থাকুন না এই গাড়ীতেই। যাবেন কোথায়?

লক্ষ্ণৌ।

বেশ হ'য়েছে আমিও যাব! দু'জনে এক সাথে। কান্নায় পলকের গলা শুকোয়, ফুঁপিয়ে ওঠে—দুঃখী পলক!

মেয়েটি বুঝ্‌তে পারে, কাছে এসে বলে,—আপনাকে থাক্‌তে হবে এখানেই। কেউ এলে বল্‌ব—ঝি, শাড়ী আছে, পরিয়ে দেব।

পলক আকাশের চাঁদ হাতে পায়, হেসে উঠে,—বেশ হবে সে। রোমান্স হবে।

আমি খেয়া,—মেয়েটি বলে। লক্ষ্ণৌতে বেড়াতে যাচ্ছি। একাই।

কে আছেন?

সবাই। থাক্ সে কথা—ব'লে ঘুরে দাঁড়ায়। ইচ্ছে ক'রেই যেন সবুজ সাড়ীর আঁচলটা পলকের গায়ে বুলিয়ে দেয়। পলক কাঁপে। দুঃখী পলক!

সন্ধ্যা নামে। গাড়ীতে বিজলী বাতি। সাম্‌নের বেঞ্চে কাৎ হ'য়ে খেয়া ষ্ট্রীণ্ডবার্গ খুলে বসে। পলক গতিয়ের পাতায় হাত বুলোয়। দুজনের কথা নেই। গাড়ী ঢালু পথে নাম্‌ছে—ঝাঁকানি। তারি সঙ্গে তাল রেখে খেয়ার দেহের ভরা-গাঙে বুকের সোনার গাগরী দুটী দুল্‌ছে। দুঃখী পলক আড়-চোখে চায়, আর দোলন গোণে। হঠাৎ খেয়া ব'লে ওঠে—রাত হ'ল যে, খাবেনা?

যেন কতকালের পরিচয়! পলক শিউরে ওঠে, বলে—ক্ষিদে তেষ্টা ভুলেই গেছি।

খেয়া ছোট্ট একটি নিশাস ফেলে বলে—শুধু পেটের ক্ষিদে ভুল্‌লেই কি হয় ?

তারপর ষ্টোভ ধরিয়ে গুন্‌গুনিয়ে তান ধরে, একটা স্কচ্‌ গজল।

ষ্টোভের আলোয় শাড়ীর ফাঁকে খেয়ার নিটোল দেহ দেখা যায়—পলক নিশাস ফেলে—দুঃখী পলক !

খেতে বসে। বলে, এত এল কোত্থেকে ? এত কি ?

ছোলা মটর পাঁপর-ভাজা লুচি, পুরী ?

সঙ্গে ছিল। এস খাই দু'জনে—খেয়া বলে।

এক থালায় দু'জন মুখোমুখী খায় আর হাসে—খাওয়া নয়ত যেন খেলা, হাত-কাড়াকাড়ি।

মাঝে মাঝে পলক আড়-চোখে চায় ব্যাগের দিকে। খেয়া বোঝে। কি ও ?

ওষুধ।

বের করনা !

না, থাক্‌—পলক বলে।

খেয়া গিয়ে ব্যাগ খোলে, চ্যাপটা শিশি বেরিয়ে আসে। খেয়া হাসে, বলে—এ নৈলে ঘুম হয় না আমার।

এক চুমুক খেয়ে খেয়া বলে—আঃ ! পলক ভাবে এ যেন তার মর্ম্ম-ছেঁড়া রক্তধারা খেয়া পান কর্‌ছে। শিশির ওষুধ ফুরোয়। ছোলা ভাজা ফুরোয় না। জান্‌লা দিয়ে খেয়া ফেলে দিয়ে বলে—যাক্‌গে।

মেল ট্রেণ চলে হুস্‌ হুস্‌। পলক Bel Ami খুলে বসে, পড়ে না। আর বেঞ্চে Heptameronের পাতায় চোখ বুলোয় খেয়া। মাঝের ফাঁক টুকু যেন একটা নদী, এ পারে তার চখা ও পারে তার চখী।

দুঃখী পলক বই পড়ে না—ফাঁকটির দিকে চেয়ে কাঁদে। খেয়া দেখে উঠে আসে, বলে,—কাঁদ্‌ছ! ছি লক্ষ্মীটি!

পলক চোখ মুছে বলে, না। খেয়া বলে—কাল সন্ধেবেলায় লক্ষ্ণৌ নাম্‌ব। আরো আঠারো ঘণ্টা।

পলক চম্‌কে বলে—এত শীগ্‌গির!

খেয়া বলে,—তোমার কাছে লুকোব না। বিয়ে হয়েছে আমার, অনেক দিনই। যাচ্ছি বাবার কাছে একাই, যাওয়া আসা একাই করি।

পলকের মুখ শুকোয়। বলে, তুমি পরের! ... ...

পলকের বুকে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে খেয়া বলে—আমি তোমার! আমি তোমার! এই আঠারো ঘণ্টার জন্যে আমি তোমারি! জীবনটা ত ছোট নয় বন্ধু, অনেক বড়! একটা যেন বড় বাগান, তার সব ঋতুতেই, সকল রাতেই ফুল ফোটে। তার একটা ঋতুর—একটা রাতের ফুল আমি তোমায় দিলুম—ব'লে গরম চুমোয় পলকের মুখ ভাপ্‌সে দেয়। দুঃখী পলক! খেয়ার বুকে এলিয়ে পড়ে—যেন ঝোড়ো দাঁড়কাক তার নীড় পেয়েছে!

ঝড়ের রাত পুইয়ে যায়, সকাল হয়; সূর্য্যি ওঠে।

চারটে বাজে। লক্ষ্ণৌ এল। পলককে বুকে টেনে চুমু দিয়ে খেয়া বলে—এইটি আমার শেষ ফুল। নতুন ফুল ফুট্‌বে আবার লক্ষ্ণৌ গিয়ে, সন্ধে হ'লে। তখন তুমি কোথা! পথের খেলা পথেই শেষ। আবার নতুন পথে নতুন পথিক, নতুন পরিচয়! পলকের হাত পা টাটায়, কথা কয় না।

লক্ষ্ণৌ:

যাবে কোথায়?—পলক শুধোয়।

আমার বাবা নিতাই রাহা—খেয়া বলে।

পলক একটু থামে, শেষে বলে, নাম শুনেছি, দেখিনি। আমার মামা।

খেয়া হাসে, বলে—কি হয় তাতে? ঝড়ের রাতের আইন আছে? লতায় লতায় গাছে গাছে হাম্‌লা-হাম্‌লি,—কোন্ পাখী কার নীড়ে ছিট্‌কে পড়ে, কোন্ বিহগীর পাখার তলে কোন্ পাখীটি রাত কাটায়, ঝড়ের রাতের অন্ধলীলা—কেই বা দেখে? সকাল হ'লে যে যায় নীড়ে ফিরে চলে—তাই না?

দুঃখী পলক! পলক বলে,—হায়! ঝড় যদি চিরকাল রইত!

ঝড় যে দম্‌কা আসে, দম্‌কা যায়—খেয়া বলে।

মেলট্রেণ আর চলে না, থামে। লক্ষ্নৌ!

খেয়া দরজা খুলে বলে—ঝড়ের রাত ভোর হ'য়েছে, এখন আবার যে যা ছিলুম। এস দাদা!

পলক নিশাস ফেলে, বলে—পথের স্বপন শেষ হ'য়েছে। চল বোন্!

ব্যাগ হাতে পলক নামে—দুঃখী পলক, ঝড়ের রাতে ঝ'রে পড়া যেন একটি কুমড়ো ফুল,—পাঁপড়ি খসা—কাদা মাখা।"

———

লুই পাস্তোর*

(সনেট)

শ্রী বে-নয়া ১৯০৫

বিজ্ঞান-তপস্যা-মগ্ন চিত্ত তোমার
ফ্রান্সের গৌরবের প্রতি হয়নি বে-পরোয়া—
জার্ম্মাণীর ডক্টরেটে অকাতরে মারিলে পয়জার,
আঠার সত্তর সালে,—প্রাচীন প্রতিভা তব ফরাসার কাছে
আজও তাই রহিয়াছে নয়া।
গ্যেটের মত ল্যাবরেটারীতে ফুল ফোটাতে পারনিক' তুমি।
না পেরেছ সবজান্তা দা-ভিঞ্চির মত শিল্পমধু কর্ত্তে আহরণ,
বৃহত্তম করিয়াছ কিন্তু বিজ্ঞানের সীমাশ্রিত ভূমি
পরিচয় তার Stereochemistry নামক নূতন বর্দ্ধন।
মান্ধাতার আমলে কায়দাকানুন মদ চোয়ানর ছিল যা',
নূতন তথ্য Fermentation'র তোমার মগজে উদ্ভাবন;
Phlogistonist প্রতি ল্যাভোয়াসিয়ের মত বুজরুকীতে মেরে ঘা
Neanderthal জ্ঞানীদের মুখে অম্লানেতে দিলে নিষ্ঠীবন।
বিশ্ব-খ্যাপা জানোয়ারের দংষ্ট্রা হ'তে দিলে অব্যাহতি,
আ-কসৌলি Tropical School, সর্ব্বত্র তাই পাচ্ছ নতি।

---

* অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের অনুরণনে।

লেখক বনাম পাঠক *

শ্রী যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব-জগৎ যেমন আলো ও ছায়ায় চিত্রিত, শ্যাম-ধূসর সব্‌জি-জগৎ যেমন আদা ও কাঁচকলায় বিযুক্ত, সমগ্র সাহিত্য-জগৎ তেম্‌নি লেখক ও পাঠকে বিভক্ত। যাঁহারা কেবলমাত্র পড়েন, কিছুই লেখেন না তাঁহারাই প্রকৃত পাঠক। আর যাঁহারা কেবলমাত্র লেখেন, কিছুই পড়েন না তাঁহারাই অকৃত্রিম লেখক। যাঁহারা লেখেন আবার পড়েন,—এক কথায় লেখা-পড়ার চর্চ্চা করেন,—সাহিত্যধর্ম্মে তাঁহারা নিম্নাধিকারী। প্রাণীজগতে পাতি-হাঁস, ভেক প্রভৃতি উভচর জীবের ন্যায়, নষ্ট-তাঁতি-বৈষ্ণবকুল ব্যক্তির ন্যায়, তাঁহারা হতবল ও অপাংক্তেয়। আর যাঁহারা লেখেনও না পড়েনও না, তাঁহারা সাহিত্য জগতের অন্তর্ভুক্ত নহেন। সাহিত্যের কোন সংবাদ রাখেন না বলিয়া তাঁহারা নিরপেক্ষ; তাঁহাদের পঞ্চায়েৎ দরবারেই সাহিত্যের শেষ বিচার;—সমগ্রভাবে লইলে এই বিপুলা পৃথ্বীতে তিনিই অনন্ত কাল!

ছায়া না থাকিলে আলো নিরর্থক, কাঁচকলা ভিন্ন আদা অচল, পাঠক ভিন্ন লেখকও বিফল। তথাপি লেখক পাঠকের এই অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ অন্যান্য চিরন্তন দ্বৈত সম্বন্ধের ন্যায়ই দুর্জ্ঞেয়। আদিতে প্রকৃতি না পুরুষ, বীজ আগে না বৃক্ষ আগে, দই পরে না সন্দেশ পরে, দেশ বড় না রাজা বড়, রামে মরি না রাবণে মরি, শ্যাম রাখি না কুল রাখি—এই সব কঠিন কঠিন সনাতন প্রশ্নের অবিসংবাদিত মীমাংসা

* সৎ-সাহিত্য-সংস্কার সভায় অপঠিত

যেমন অদ্যাপি হয় নাই, লেখক-পাঠকের তুলনা-মূলক সঠিক সম্বন্ধ-বিচারও তেমনি অমীমাংসিত রহিয়া গিয়াছে। স্থূল দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে অগ্রে লেখক পরে পাঠক। কারণ একজন না লিখিলে অন্যে পড়িবে কি? কিন্তু যাহা লেখা হইল সে কতটুকু? লেখার মধ্যেই যাহা লেখাকে অতিক্রম করিয়া রহিয়াছে অর্থাৎ যাহা মোটেই লেখা হয় নাই, তাহা পাঠ করিবার শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিই ত পাঠক। আরও বিবেচনা করিয়া দেখুন, মহাভারত অপেক্ষা বড় লেখা ত আজ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। সেই মহাভারতকর্ত্তা বেদব্যাস লেখক ছিলেন, না পাঠক ছিলেন? সকলেই জানেন, ব্যাসদেব অনর্গল শ্লোক আওড়াইয়া গিয়াছিলেন, আর সিদ্ধিদাতা গণেশ চারি হস্তে কাগজ, কালি, কলম, বালি লইয়া মূর্ত্তিমান টাইপ-রাইটাররূপে অবিরাম লিখিয়া গিয়াছিলেন, তবে ত মহাভারতের সৃষ্টি হইয়াছিল। সুতরাং বেদব্যাস যে লিখিতে জানিতেন না ইহার দ্বিতীয় প্রমাণ অনাবশ্যক; অথচ তিনিই যে মহাভারত-লেখক ইহাও সুবিদিত। অন্যপক্ষে দেখুন,—লিখিয়া মরিল বেচারী গণেশ, নাম হইল বেদব্যাসের, কারণ গজমুণ্ড থাকা প্রযুক্ত গণেশ সে-কথা ব্যক্ত করিতে পারিল না। অতএব আমি ঠিক বুঝাইতে না পারিলেও মোটের উপর আপনারা বোধ হয় নিশ্চয় বুঝিলেন যে, লেখক-পাঠকের সঠিক সম্বন্ধ-নির্ণয় একান্ত দুরূহ ব্যাপার।

মোটামুটি দেখা যায় লেখক স্রষ্টা আর পাঠক দ্রষ্টা। জগৎ-সৃষ্টির মূলে ছিল নির্ব্বিকার ব্রহ্মের অহেতুকী যশোলিপ্সা,—'আমি এক, বহু হইব।' সমস্ত সাহিত্য-সৃষ্টির মূলেও লেখকের এই নিষ্কাম যশকামনাই নিহিত রহিয়াছে। আমি যাহা লিখিব তাহারই সহস্র সহস্র কপি নব নব সংস্করণে বহু-বহুধা বিস্তৃত করিয়া বাজারে প্রকাশিত হইব। বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে লক্ষ লক্ষ পাঠকের চিত্ত-মুকুরে এক

আমি রবির ন্যায় বহুরূপে প্রতিবিম্বিত হইব, এই অকারণ বিশ্বপ্রেমই না সাহিত্য লীলার হেতু! সাধারণ লেখকের কথা ছাড়িয়া দিয়া আদি ঋষি-কবির সৃষ্টির কথাই ধরা যাউক্। ছাপার অক্ষরের রামায়ণের সুলভ সংস্করণ কলিকাতা মহানগরীর মধ্যে বটতলা হইতেই প্রথম প্রচারিত হইল কেন? কারণ আর কিছুই নহে,—কবিগুরু ত্রেতাযুগে যখন তৎপ্রণীত রামায়ণগানের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত করেন তখন তমসাতীরস্থ বটবৃক্ষমূলেই তাঁহার মহল্লা বসিত। তখন মাসিক বা সাপ্তাহিক পত্রিকা না থাকায় আদি কবিকে তরুণ লব কুশের সাহায্য লইতে হইয়াছিল। তাহাদের মারফতে গ্রন্থখানি রামচন্দ্রকে উৎসর্গ করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, যাহাতে রাজসভায় গীত হইয়া আজ-কালকার ব্যয়-বহুল বিজ্ঞাপনের কার্য্য বিনাখরচে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় তাহারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কারণ রামচন্দ্র যে সীতাকে আর গ্রহণ করিবেন না ত্রিকালদর্শী ঋষির নিকট তাহা কখনই অবিদিত ছিল না। কিন্তু বাল্মীকি ত কেবলমাত্র ঋষি ছিলেন না,—তিনি একাধারে ঋষি ও কবি। সুতরাং রামলীলার মধ্য দিয়া নিজেকে প্রচার না করিয়া, এক বহুধা না হইয়া, তাঁহার উপায়ান্তর ছিল না।

যেমন জগতে, তেমনি সাহিত্যেও স্রষ্টার হাতে সৃষ্টির নানা আকার ও প্রকারভেদ ঘটিতেছে। জগতে জেব্রাও আছে, উষ্ট্রও আছে, ফুলও আছে, কণ্টকও আছে। এই বৈচিত্র্যই সৃষ্টির প্রাণ। আমরা বহু কাল হইতে জানি যে, মধু ইচ্ছা করিবার জন্য ষট্‌পদ, ব্রণ ইচ্ছা করি-বার জন্য মক্ষিকা, ও তামাক ইচ্ছা করিবার জন্য ভদ্রলোকের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু কি মহৎ উদ্দেশ্যে মশক সৃষ্টি হইয়াছে, কেনই বা সন্ধ্যার প্রাক্কালে লক্ষ লক্ষ প্রাণী কোন এক আর্দ্র পবনে জন্মগ্রহণ করিয়া মশারিবিহীন হতভাগ্য মানবশিশুদের অকারণ দংশন পূর্ব্বক

বিভুগুণ গান করিতে করিতে অচিরকালমধ্যে ভবলীলা সাঙ্গ করে,—ইহার তত্ত্ব আমাদের সম্পূর্ণ অবিদিত ছিল। বিজ্ঞানের কৃপায় এতদনে আমরা জ্ঞাত হইয়াছি,—ঈশ্বরদেহে আলোকরশ্মির ন্যায়, নরদেহে ম্যালেরিয়ারূপী একটি কম্পমান তীব্র সত্যকে বহন করিয়া তাহার স্বাস্থ্যহানি করিবার জন্যই মশকের সৃষ্টি। এই আবিষ্কারের সঙ্গে-সঙ্গেই, সিঙ্কোনাবৃক্ষ-ত্বক্‌ যে কেন এমন উৎকট তিক্তরসযুক্ত হইয়া সৃষ্ট হইয়াছিল তাহার মর্ম্মও উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল। সাহিত্যেও এমনি সৃষ্টিবৈচিত্র্য চলিতেছে। সকল লেখকই স্রষ্টা,—একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যায়, কাহারও সৃষ্টি নিরর্থক নহে। ফুল ও অলি, মশা ও মশারি, ম্যালেরিয়া ও কুইনাইন পাশাপাশিই চলিবে। জগৎ বা সাহিত্য কোনটাই স্বাস্থ্যনিবাস হইবার জন্য সৃষ্ট হয় নাই। দেশের সকল সংযম ও সাধনা ত বহুদিন হইতে দেশ ছাড়িয়া সন্ন্যাসীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ বনে বাসা বাঁধিয়াছে; আবার স্বল্পাবশিষ্ট স্বাস্থ্যটুকুও যদি দেশ ছাড়িয়া সাহিত্যের গুহায় আশ্রয় লয়, তবে দেশে বাস করাই অসম্ভব হইবে।

লেখক যদি স্রষ্টা, তবে পাঠক অবশ্যই দ্রষ্টা। দ্রষ্টৃত্বও ব্রহ্মেরই স্বরূপ। স্রষ্টা ব্রহ্মে ও দ্রষ্টা ব্রহ্মে পার্থক্য আছে। স্রষ্টা অন্ধ (যেমন কিউপিড্‌, হোমর, ধৃতরাষ্ট্র), আর দ্রষ্টা ঠুঁটো (যেমন সঞ্জয়, জগন্নাথ, কংগ্রেস)। স্রষ্টা অন্ধকারে হাতড়াইয়া যাহা হউক একটা কিছু সৃষ্টি করিয়া দ্রষ্টাকে বলেন, "দেখ ত হে!" দ্রষ্টা নুলো হাতে তালি দিয়া বলেন, "বেশ হয়েচে, বাঃ! কিন্তু সাদাটা কালো ক'রে কালোটা সাদা কর্‌লে কি রকম হ'ত বলা যায় না।" স্রষ্টা অশ্রান্তচিত্তে পুনরায় প্রাণান্ত পরিশ্রমে সাদাকে কালোয় ও কালোকে সাদায় পরিবর্ত্তিত করিয়া করুণভাবে দ্রষ্টার মুখের পানে অন্ধচক্ষু মেলিয়া থাকেন। দ্রষ্টা

ব্রহ্ম তখন হাই তুলিয়া তুড়ি দিতে দিতে (?) তুরীয়ভাবে পৌঁছিয়াছেন। একবার দেখিয়াই বলেন, "তাই ত হে, এটা ঠিক মৌলিক বোধ হচ্ছে না, যেন কা'র ফর্মাসে গড়েছ মনে হচ্চে। ফর্মাসে সৃষ্টি হয় না, মৌলিক কিছু কর।" স্রষ্টা ব্রহ্ম তখন ক্রুদ্ধ হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহারও এক বহুধা না হইলে উপায় নাই। অগত্যা ক্রোধ সম্বরণপূর্ব্বক স্রষ্টা মৌলিক সৃষ্টি করিলেন। দেখা গেল, সৃষ্ট জীব চক্ষুদ্বারা শ্রবণ করে, ত্বক্ দ্বারা দর্শন করে, মাথা দিয়া হাঁটে, নাসিকা দ্বারা আহার গ্রহণ করে। দ্রষ্টা ঈষৎ চক্ষুরুন্মীলন পূর্ব্বক বলিলেন, "এ সব অস্বাভাবিক হচ্চে,—গতযুগে যা হ'য়ে গিয়েচে, এ যুগে তুমি তা পারচ না।" স্রষ্টা অতিমাত্র রুষ্ট হইয়া বলিয়া উঠেন,—"আমার মনের আনন্দে আমি যা সৃষ্টি করচি তা একান্ত আমারই; তোমার ভাল-লাগা মন্দ-লাগায় আমার কিছুই যায় আসে না।" দ্রষ্টা হাসিয়া ঘুমাইয়া পড়েন। স্রষ্টা আবার তাঁহাকে ঠেলা দিয়া জাগাইয়া বলেন,—"এইবার দেখ ত হে, বোধ হয় তোমারও ভাল লাগিবে।" স্রষ্টার তখন বয়স হইয়াছে, সৃষ্টির মধ্যে ধোঁয়া, কুয়াসা ও নীহারিকার ভাগ বেশী। দ্রষ্টারও নেশা জমিয়াছে। চোখ না মেলিয়াই বলেন, "বাঃ, চমৎকার! কিছুই ঠিক বোঝা যাচ্চে না. অথচ কত গভীর, কত সুন্দর! এই ত চাই; তোমার সৃষ্টি আর আমার দৃষ্টি অনেকটা মিলে আসচে; আর একটু ঝাপসা কর—তা হ'লেই, ব্যস্—ওম্ ওম্ ব্যোম্ ব্যোম্ শঙ্কর!"—

তখন শঙ্করের চরণতলে পুনর্ব্বার প্রলয়তাণ্ডব আরম্ভ হইয়াছে। ডম্বরুর ডিমি ডিমি ধ্বনির মধ্যে, মুদ্রিত নেত্রের ঊর্দ্ধে বিশাল ললাটপটে শিশুশশী নূতন সৃষ্টির আনন্দ পাইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে।

লেখক-পাঠক-তত্ত্ব বিচার করিতে বসিয়া আদা ও কাঁচকলা হইতে

প্রলয়পয়োধিতীর পর্য্যন্ত পৌছিয়াছি ;—ইহার অধিক চেষ্টা করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত। তথাপি যদি আপনারা আমার বক্তব্য বিষয় না বুঝিয়া থাকেন, তবে আমার বা আপনাদের দোষ কিছুই নাই, দোষ আমাদের বাংলা ভাষার। যত শীঘ্র এ ভাষার মূলোৎপাটনমূলক সংস্কার আরম্ভ হয় ততই শ্রেয়ঃ।

কাকুতি

শ্রী মধুকরকুমার কাঞ্জিলাল

হৃদয়ে বেদনা হায়! চেগে ওঠে সশব্দে সঘনে,
তব স্নিগ্ধ অন্তর-গগনে
আমি আর রহিব না শুনি ;
হীরা চুনি
পান্না মরকত
দিব চাও যত,
শুধু মোরে ফিরাইয়া দাও মোর পূর্ব্ব অধিকার,
প্রাণপ্রিয়ে, কি বা তোরে বলি অধিক আর ?
নভচ্যুত অকস্মাৎ হয় যদি শশী
যদ্যপি নির্দ্দোষী ;
কোথায় পড়িবে গিয়া এই ভয়ে তার
কম্পিত হয় গো হিয়া, যথা বার বার ;
তেমনি আমার প্রাণ ভয়ে আজ কালো ;
কি করিব, তুমি যদি নাহি বাস ভালো,
এই স্থূল বপুটিরে নিয়ে,
কোথা আর যাব বল প্রিয়ে ?

ঝরা শেফালির মতো—

(কথিকা)

শ্রী বিগলিত ব্যানার্জ্জি লিখিত ও শ্রী পেলব রায় চিত্রিত

সেদিন কাজল হাওয়ায় জোছনার পাপড়ি ফুটে উঠেছিলো—

দূরে যূথিকাশুভ্র নদীসৈকতে বকুলবালিকারা—

বাদল-প্রেমে মাতামাতি করছিলো,

আকাশ বাতাস কী যেন হারানো তানে—

আকুল হ'য়ে উঠেছিলো।

যৌবনোচ্ছল চন্দনার পালকের মতো…

স্নিগ্ধ সবুজ বনানীর প্রান্তে,

গিরিশিরে, কুয়াসা অশরীরী বনানীর মতো…

কাহার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়েছিলো।

মলয়ার হাসির মতো,

অগীত সঙ্গীতের প্রতিধ্বনির মতো…

মানস-খঞ্জনার গতির মতো,…

ঘুমন্ত রাজপুরীর জোছনা-তাপিত অলিন্দে রাজকুমারী মধুমালতী পাদচারণা করছিলেন।

প্রতি পদক্ষেপে নির্ম্মম মর্ম্মরের যুগযুগান্ত-সঞ্চিত রুদ্ধ আবেগ গুমরে উঠছিলো।

লূতাতন্তু-চিক্কণ

অভ্রস্বচ্ছ নীলাম্বরী ভেদিয়া

দোদুল-যৌবন-মায়াবিনী মরীচিকার মতো,
চিরন্তনী আশার মতো,
স্বর্ণমৃগের সুরভি নিশ্বাসের মতো,
আলেয়ার আলোর মতো
ক্ষণে ফুটে ক্ষণে মিলিয়ে যাচ্ছিলো।......
নৈশগগনে শারদচন্দ্রমা মধুমালতীর দিকে নিথর নির্লাজ লোলুপ কিরণ হান্‌ছিল।......
মানস-সরগামিনী মরালীর মতো
তরুণীর মন আজ নিরাশার গন্ধে আকুল হ'য়ে
কোন্ অচিন্ দেশের অরূপ রতনের আশে পাখা মেলেছে কে জানে!
উদাস চাহনির ম্লান হাসির শিহরণে তার হিয়ার গোপন অতলে
শেষ সুরের রাগিণীর অশ্রুত মূর্চ্ছনা ধ্বনিত হচ্ছিলো।
অচাওয়া অপাওয়ার মথিত হাহাকারে
তন্বীর পেলব দেহ-বল্লরী থেকে থেকে কাঁপ্‌ছিলো;
যেন বাতাহত প্রদীপ-শিখা এখনি নিভবে!
হারে বিধাতা! সে কোন্ পাবক যাহার মোহন দহন-শিখা বিধুরা বালার কোমল প্রাণপতঙ্গকে মরণ-সরস পরশ-লোভে আকুল করেছে।
জান্‌লোনা কেউ...
শুন্‌লো না সে...
গোপন স্বপন-লোকের আকুল গুঞ্জন,—ব্যাকুল ব্যথার।
ছিন্ন হ'ল—
বিবশা মধুমালতীর চেতনা-জাল, নীরব, নিঠুর।
গেলরে নিভে ফিনিক্ ফোটা জোছনা গন্ধ।
শ্যামল চকিতে মৃদুল বায়ু মরমে মুরছি।

স্তম্ভিত চরাচর ভাষাহীন শব্দহীন।
ঝরা শেফালির মতো...
খসা কামিনীর মতো...
ঢ'লে পড়্লেন রাজকুমারী সোপান-মর্ম্ম 'পরে।
যেন চাঁদ গ'লে অমিয়-ঘটার ঢল্ নাম্‌ল।
সে বিকল বিরহ-বাণীর তপ্ত নিশ্বাস রেণু রেণু হ'য়ে আকাশে বাতাসে অখিল নিখিলে র'য়ে গেল।

(কচিসংসদের ডায়ারী হইতে)।

উট্‌রাম সাহেবের টুপি

শ্রী বেচারাম মাইতি

ছেলেবেলায় ওয়াশিংটন আরভিংয়ের লেখা স্কেচ-বুকে রিপ ভ্যান্ উইঙ্কিলের কথা পড়িয়া যেমন আমোদ পাইয়াছিলাম, বয়সকালে তেমনি আমাদের স্বদেশী রিপ ভ্যান্ উইঙ্কিল রামদাদাকে চাক্ষুস দেখিয়া বেদনা-মিশ্রিত আমোদ পাইতাম। আমরা তখন নারকেলডাঙ্গায় থাকি। রামদাদা ছিলেন আমাদের প্রাতিবেশী। তাঁর পৈতৃক কিছু সম্পত্তি ছিল; কলকাতায় গোটাতিনেক বাড়ী আর একটা চালের কল। অল্প বয়সেই পিতৃ-বিয়োগ হওয়াতে রামদাদাকেই প্রথমটা লেখাপড়ার সঙ্গে-সঙ্গে বাড়ীর ভাড়া আদায় আর কলের তদারক করিতে হ'ত। ইহার ফলে সংসারের এমন দুরবস্থা হইল যে, তাঁহার জননী পুত্রকে রেহাই দিয়া নিজেই কর্ম্মচারী মারফৎ এসব দেখা-শুনা করিতে লাগিলেন।

রামদাদা যৌবনে ভারী কল্পনাপ্রবণ ও দেশপ্রেমিক ছিলেন। তখন বঙ্গ-ভঙ্গের আন্দোলনে দেশ সরগরম। রামদাদাও মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। ফরাসী-বিপ্লবের ইতিহাস, ম্যাটসিনি গ্যারিবল্ডির জীবনকথা, সিপাহী-বিদ্রোহের কথা ইত্যাদি পড়িয়া পাঁচজনের মত তাঁহার মনেও দেশমাতাকে স্বাধীন করার খেয়াল ওঠে। ফলে তিনি রাজবিদ্রোহীদের দলে ভিড়িয়া যান। বৃদ্ধা মাতা কাঁদিয়া মাথা খুঁড়িয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিতে পারেন নাই। দেশকে স্বাধীন করিতে হইবে এই ইচ্ছাটাই তখন তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। মানিকতলার বাগানে বোমার দলের মধ্যে তিনিও ধরা পড়েন কিন্তু বিচার চলিতে চলিতেই বিকৃতমস্তিষ্ক বলিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। বোমার দল ধরা পড়ার পরেই তাঁহার মাথার কিছু গোলযোগ ঘটিয়াছিল। জেলের মধ্যে তিনি দিনরাত 'স্বাধীন ভারত, স্বাধীন ভারত' বলিয়া চীৎকার করিতেন ও কাঁদিতেন, ডাক্তারে পরীক্ষা করিয়া বলে যে, লোকটি আস্ত পাগল।

ছাড়া পাইয়া তিনি বাড়ীতেই থাকেন। মায়ের অপরিসীম যত্ন ও চেষ্টায় তাঁহার কাঁদুনী ভাবটা শীঘ্রই কাটিয়া গিয়াছিল কিন্তু 'স্বাধীন-ভারত' ভাবটা কাটিতে সময় লাগিয়াছিল। বহুদিন পর্য্যন্ত তাঁহার ধারণা ছিল যে, ১৯০৮ সালই চলিতেছে। ইংরেজরা ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইল বলিয়া! কাহারো সঙ্গে দেখা হইলেই জিজ্ঞাসা করিতেন, কি ভায়া আমাদের বারীনের খবর কিছু জানো? কানাইলালের অসুখ দেখিয়া আসিয়াছিলাম, কেমন আছে বলিতে পার? আমরাও দাদাকে খুসী করিবার জন্য বলিতাম, রামদা, আজকের কাগজ বুঝি পড় নাই? এই দেখ উহাদের মোকদ্দমা ত ফাঁসিয়া গেল। এনার্কিষ্টদল আবার জোর কাজ সুরু করিয়াছে। জানিতাম, রামদাদা কখনো কাগজ

দেখিতে চাহিবেন না। তাঁহার ধারণা ছিল, সরকারের তরফ হইতে কাগজ দেখিতে তাঁহাকে বারণ করা হইয়াছে। কাগজ পড়িলেই আবার তাঁহাকে জেলে পুরিবে।

পাঁচছয় বৎসরের মধ্যেই এ ভাবটা তাঁহার কাটিয়া যায়। কিন্তু কোনো কারণে উত্তেজিত হইলেই তিনি আবার সেই ১৯০৮ সালে ফিরিয়া যাইতেন। গত ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় চারিদিকেই যখন যুদ্ধের কথাবার্ত্তা চলিত তখন তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে, এনার্কিষ্টদের সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের যুদ্ধ চলিতেছে। রোজই যুদ্ধের খবর জিজ্ঞাসা করিতেন। আমরা বলিতাম ইংরেজরা এবার কাবু হইল বলিয়া। দাদা মহা খুসী হইয়া উঠিতেন এবং ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলে কি ভাবে চলিতে হইবে সে সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। স্বাধীন ভারতবর্ষের রাজকার্য্য পরিচালন-বিষয়ে তিনি একটা প্রকাণ্ড খসড়া তৈয়ার করিয়া ফেলিয়াছিলেন। পাড়ার ছেলেবুড়ো সকলকে ডাকিয়া মাঝে মাঝে সেটি পড়িয়া শোনাইতেন।

দাদার বরাবর ধারণা ছিল তাঁহার পিছনে পুলিশ আছে। আসলে টিকৃটিকি পুলিশ কখনো তাঁহার কোনো খোঁজ লইত না। তাঁহার সম্বন্ধে অন্তত তাহারা নিশ্চিন্ত ছিল। রামদাদার মায়ের মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা দিদিই তাঁহাকে দেখা-শোনা করিতেন। রামদাদা বিবাহ করেন নাই। একবার তাঁহার দিদি তাঁহার বিবাহের কথা পাড়িয়াছিলেন। দাদা ধমক দিয়া বলিয়াছিলেন, বিবাহ করিয়া ক্রীতদাসের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া কি হইবে। আগে ভারতবর্ষ স্বাধীন হউক, তাহার পর বিবাহের কথা ভাবা যাইবে। বিবাহ করার ইচ্ছা যে তাঁহার ছিল না তাহা নহে। মাঝে মাঝে আমাদিগকে বলিতেন ওহে, এবার আমার জন্যে কনে-টনে একটা দেখ, যেমন শুনিতেছি,—

বিবাহ করিবার সময় ত আসিল! আমরা বলিতাম, সে ত ঠিকই আছে দাদা, এখন তুমি ইচ্ছা করিলেই হয়! দাদা বলিতেন, এই ন্যাশনাল পার্লামেণ্ট 'ওপেন' করিলেই দিন স্থির করা যাইবে, কি বল?

তারপর যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল, ১৯২৭ সালও শেষ হইতে চলিল। দাদাকে সেই ভীষণ এনার্কিষ্ট যুদ্ধের খবর এখনও দিতে হয়। দাদা জিজ্ঞাসা করিতেন, কি রে, এখনও যুদ্ধ শেষ হইল না। ইংরেজদের কি অন্য কোনো 'পাওয়ার' সাহায্য করিতেছে? বারীনের অর্গ্যানিজেশন ত খুব ভাল ছিল—এমন হইবার ত কথা নয়! একটু ইতঃস্তত করিয়া উত্তর দিতাম, আর দাদা, বলেন কেন, মুসলমানেরা যে বিশ্বাসঘাতকতা করিল! দাদা উৎসুক হইয়া বলিতেন, বটে! ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলে ত তাহাদিগকে লইয়া বিপদে পড়িতে হইবে দেখিতেছি! হিন্দুমুসলমান 'রায়টের' সময় বলিতাম, দাদা, মুসলমানদের সঙ্গে একটা বোঝা-পড়া হইতেছে। এটা চুকিয়া গেলেই আবার ইংরেজের সঙ্গে লাগিতে হইবে। দাদা বলিতেন, বারীনকে বলিয়া একটা মিট-মাট করিয়া ফেল। গৃহবিবাদ ভাল নয়।

দোকানে রাখিবার জন্য দাদা একটি গাদা বন্দুকের লাইসেন্স্ লইয়াছিলেন। দাদা প্রত্যহ দুটা তিনটার সময় সেই বন্দুক কাঁধে নূতন খালের ওপারে সল্টলেক্ বা 'বাদায়' গিয়া পাখী শিকার করিতেন। রাত্রে বাড়ী ফিরিতেন। মাঝে মাঝে 'বাদা' হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিতেন, ভারত স্বাধীন হইলে 'বাদা'টা বুজাইয়া ফেলিয়া ওখানে জাতীয় সৈন্যদের কুচকাওয়াজ করাইতে হইবে। ফোর্ট-উইলিয়মটা রাখা ঠিক হইবে না।

সেদিন বেঙ্গল কেমিকালের ফ্যাক্টরীতে সামান্য কংগ্রেসের সভ্য-

দিগকে একটা পার্টি দেওয়া হইয়াছিল। আমাদের ক'জনেরও নিমন্ত্রণ ছিল। সন্ধ্যার আগে ফিরিবার জন্য মাণিকতলা মেনরোডের উপর ফ্যাক্টরীর গেটের সাম্‌নে দাঁড়াইয়া কয়জনে জটলা করিতেছি, হঠাৎ দেখি হাফপ্যাণ্ট-কোটধারী রামদাদা বন্দুকহাতে হন্তদন্তভাবে প্রায় ছুটিয়া কলিকাতার দিকে চলিয়াছেন, ভয়ানক উত্তেজিত ভাব। বুঝিলাম, দাদার মাথায় 'স্বাধীন ভারতে'র আবির্ভাব হইয়াছে। হাতে বন্দুক, পাছে একটা অঘটন ঘটাইয়া ফেলেন, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি গিয়া তাঁহাকে ধরিলাম। বলিলাম, "দাদা এ ভাবে কোথায় চলেছ? দাদা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, "কি? এখনো শোনো নাই? ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে?" উৎসাহের সহিত বলিলাম, "তাই নাকি? খবর জানি না ত?" দাদা হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, "তোমরা না খবরের কাগজ পড়? এই দেখ।"—বলিয়া হলুদ ও ঘি-তেলমাখা একটা কাগজ আমাদের সাম্‌নে ধরিলেন। দেখিলাম, দু'-তিন-দিন আগের 'দৈনিক বসুমতী'। ওই কাগজে মুড়িয়া রামদার দিদি তাঁহার সঙ্গে জলখাবার দিয়াছিলেন। পড়িয়া দেখি বড় বড় অক্ষরে কাগজের গোড়াতেই লেখা—"স্বাধীনতা প্রস্তাব।" বুঝিলাম কংগ্রেসের ইণ্ডিপেণ্ডেন্‌স্ রেজল্যুশনের বাংলা সংস্করণ। বলিলাম, "তাই ত! তা এ ভাবে চলেছ কোথায়?" দাদা বলিলেন, "ব্যাপারটা সত্যি কি না, দেখ্‌তে যাচ্ছি", বলিয়াই হন্ হন্ করিয়া চলিতে লাগিলেন, দাদার বন্দুকটা আগে হইতেই হাতে লইয়াছিলাম, সেটা আমার কাছেই রহিয়া গেল।

তাঁহাকে বাধা দেওয়া নিষ্ফল জানিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। বেচারার জন্য দুঃখ হইল। হায়রে স্বাধীন ভারত!

অনেক রাত্রে এদিকে সেদিকে আড্ডা দিয়া বাড়ী ফিরিয়া দাদার

খোঁজ লইলাম, দেখি দাদা বৈঠকখানায় হতাশভাবে বসিয়া আছেন, সাম্‌নে সেই ময়লা দৈনিক বসুমতী। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি দাদা, কি দেখলে ?" রামদাদা উত্তর দিলেন না। আবার বলিলাম, "কি হয়েছে বলই না, দাদা!" দাদা হতাশকরুণ-স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "যাও, তোমরা সবাই জোচ্চোর, মিথ্যুক, ইংরেজ হট্‌বার ছেলে নয়। ভারতবর্ষ আর স্বাধীন হ'ল না। তোমাদের সেই কনেটির অন্য জায়-গায় বিয়ে দাও।" বলিলাম, "কি দেখ্‌লে বলই না রামদা, আমরা ত শুনেছি আর এক বছর পরেই ভারত স্বাধীন হবে।"

দাদা বলিলেন, "না, তারও আশা নাই। কি দেখ্‌তে গিয়েছিলাম জানো ? উটরাম সাহেব টুপী খুঁজে পেয়েছে কি না! পায়নি, তেমনিভাবে ঘোড়ায় চেপে পেছনে চেয়ে আছে। যে দিন হারাণো টুপী মাথায় উঠবে, সেদিনই ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ বিদায় নেবে—টুপী পাচ্চে না ব'লেই ত ও যেতে পাচ্ছে না—"

আমি হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলাম। বুঝিলাম দাদার মাথায় উন-পঞ্চাশ পবন ভর করিয়াছে। কি বলিব স্থির করিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

রামদাদা বলিলেন, "হাঁ ক'রে রইলে যে, কিছু বুঝতে পারছ না ? পার্কষ্ট্রীট চৌরঙ্গীর জংশনে জেনারাল উটরামের ষ্ট্যাচু দেখনি ? সেখানে ওর টুপীটা হারিয়ে গেল, ঘোড়ার লাগাম টেনে পেছন ফিরে টুপীটা দেখতে গিয়ে আর খুঁজে পেল না, সেই ত হয়েছে গোল—নইলে কি আর এতদিন—"

বলিলাম, "দাদা টুপী একটা মাথায় দিয়ে এলেই হয়।" রামদাদা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "ভাই, বারীন ত সেই ভুলটাই কর্‌লে। কিন্তু তোমাদের এই কাগজগুলো কি মিথ্যুক বল ত ? বলে,

ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীন হ'লে টুপী পেতেই হবে। মা আমাকে কি স্বপ্ন দিয়েছেন জানো?—ভারতমাতা? ভয়ানক স্বপ্ন!—"

বলিতে বলিতে রামদাদার মুখভঙ্গী সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, তাঁহার চোখে আর পলক পড়ে না, নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত, কপাল ঘর্ম্মাক্ত। আমারও কেমন ভয় করিতে লাগিল। মনে হইল, যেন বহু দূর হইতে যুগযুগান্তের পূর্ব্বের কোন লোককে দেখিতেছি। হিপ্‌নটিজমে বিশ্বাস করিতাম, অর্দ্ধোন্মাদ রামদাদা কি আমাকে হিপ্‌-নটাইজ করিলেন?

সেদিন যাহাই ঘটিয়া থাকুক, সেদিনের কথা মনে হইলে এখনো আমি শিহরিয়া উঠি। রামদাদা এক অস্বাভাবিক গম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন—মনে হইল তিনি যেন বহু দূর হইতে কথা কহিতেছেন।—

"—শ্রাবণ অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রি, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছিল, আমরা দল বাঁধিয়া আনন্দমঠের সন্তানদের মত সেই অন্ধকারে পা টিপিয়া টিপিয়া মায়ের মন্দিরের দিকে চলিয়াছি। বারীনের হাতে জ্বলন্ত মশাল, কানাইয়ের সৌম্য-সহাস মুখে অস্বাভাবিক দীপ্তি; প্রফুল্ল আর ক্ষুদিরামের আত্মা যেন মায়ের উত্তপ্ত অঞ্চলের মত আমাদের ঘিরিয়া আছে। উপীনদা গুণ গুণ করিয়া সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে চলিয়াছেন, 'বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি। ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।'—অন্ধকার নিবিড় হইয়া আসিল। আমরা এক কল্লোলময়ী নদীর তীরে ঝাউবনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। অদূরে এক শ্মশানভূমি। অসংখ্য চিতার আলোকে তীরভূমি আলোকিত, মাংস-পোড়ার গন্ধে নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল, অতি 'নকটে শৃগাল-সারমেয়ের সম্মিলিত চীৎকার রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর জ্ঞাপন

করিল। নলিনী জিজ্ঞাসা করিল, আর কত দূরে বারীন? বারীন বলিল, বিশ্বাস হারাইও না।

অকস্মাৎ তুমুল ঝটিকা উঠিল। নদীবক্ষ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। চিতার আগুণ নিভিয়া গেল। বারীনের হাতের মশালও নিভিল। অন্ধকারে অনুভব করিলাম অসংখ্য পিচ্ছিল-গাত্র সরীসৃপ আমাদের আশেপাশে কিলবিল করিতেছে। নদীজল কূল ছাপাইয়া তীরভূমি অতিক্রম করিয়া ছুটিয়াছে। বারীন চীৎকার করিয়া কহিল, আর বুঝি রক্ষা করিতে পারিলাম না। মায়ের মন্দির বুঝি এই কাল রাত্রে ভাসিয়া যায়। বারীন উন্মত্তের মত দৌড়াইতে সুরু করিল। আমরাও ছুটিতে লাগিলাম। শুনিতে পাইলাম, পিছনে উন্মত্ত জলরাশি গর্জ্জন করিতে করিতে ছুটিয়াছে। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান চিন্তা লোপ পাইল। উর্দ্ধশ্বাসে বারীনের অনুসরণ করিয়া এক বিশাল প্রস্তর-মন্দিরের প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। যাহা দেখিলাম, তাহা বর্ণনা করিবার শক্তি আমার নাই। মন্দিরবেদী ত্যাগ করিয়া ভারতমাতা ছিন্নমস্তা মূর্ত্তিতে মন্দির প্রাঙ্গণে নৃত্য করিতেছেন। রক্তধারায় প্রাঙ্গণ প্লাবিত। বারীন 'মা মা' বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। অমনি দেখিতে দেখিতে অবাধ জলস্রোত আসিয়া পড়িল। সেই জলস্রোতের সহিত ভারত-মাতার রক্ত মিশিয়া লোহিত আবর্ত্তের সৃষ্টি করিল। বারীন ডুবিল, কানাই ডুবিল, নলিনী ডুবিল, আমি ডুবিলাম, ভারত-মাতা কোথায় তলাইলেন!

নিমেষ মধ্যে পট পরিবর্ত্তিত হইল। দেখিলাম আমরা পার্কষ্ট্রীট চৌরঙ্গীর জংশনের কাছে সকলে মিলিয়া 'মা মা' বলিয়া চীৎকার করিতেছি। ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী মা সহসা মিউজিয়াম হইতে অবতীর্ণ হইয়া সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতেছিস্

কেন? দেখিতেছিস্ না উটরামের টুপী পড়িয়া গিয়াছে, উটরাম টুপী খুঁজিয়া না পাইলে তো আমার প্রতিষ্ঠা হইবে না। দে, উহার টুপী খুঁজিয়া দে।' বলিয়াই মাতা হল এণ্ড এণ্ডারসনের দোকানের ভিতর ঢুকিয়া গেলেন। বারীন অন্ধকারে টুপী হাতড়াইতে লাগিল। অমনি কতকগুলা শিকল ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিল আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল।"—

দাদা চুপ করিলেন। আমার মাথা ঝিম ঝিম করিয়া উঠিল। গোপীনাথ সাহার কথা মনে পড়িল, 'হল এণ্ড আণ্ডারসন' মনে পড়িল। আস্তে আস্তে বলিলাম, "দাদা, টুপী রাস্তায় পড়েছে, যে পেয়েছে সেই নিয়ে গেছে, অনেক ফিরিঙ্গী বাচ্ছা ত ওপথে যাতায়াত করে, ওটুপী কি আর পাওয়া যাবে?"

রামদাদা মৃদুস্বরে বলিলেন, "তাই ত দেখছি, টুপী বুঝি আর পাওয়া যাবে না! তবে তোমাদের কাগজগুলো এত মিছে কথা লেখে কেন?"

আমি বলিলাম, "ওই রকমই!"

অরসিকের প্রতি

"But it is a safe rule to make, that Voltaire's meaning is deep in proportion to the lightness of his writing—that it is when he is most in earnest that he grins most.

—Lytton Strachey.

"লজ্জায় মরে গেলুম বাবা !"

হুইট্‌মেনিয়া

আনন্দবর্দ্ধন

"No, they are not hoaxers. They are ecstatics. Two or three of them have had a seizure, and the whole coterie is raving, for nothing is more contagious than certain nervous states."

Anatole France.

এক জাতীয় লেখকদের সম্বন্ধে উপরোক্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়া আনাতোল ফ্রাস প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে, মানুষের সাহিত্যিক দোষগুণ ততটা তাহাদের ইচ্ছার অধীনে নহে যতটা হইলে আমরা তাহাদিগকে বেশ প্রাণ খুলিয়া গালি দিতে পারি। আর্ট এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে এমন বহু প্রকার "অভিব্যক্তি" ছড়াছড়ি যাইতেছে, যাহার সমালোচনা Aesthetics এর দিক দিয়া না হইয়া medicine এর দিক দিয়া হওয়া উচিত। আনাতোল বলিতেছেন—

"I understand why the adepts of the new art should love their disease and even pride themselves on it; and even if they have some little contempt for those who are not refined by so rare a nervous affection, I shall not complain. It would be bad taste to reproach them for being ill."

অর্থাৎ কিনা আনাতোল কর্ত্তৃক বর্ণিত সাহিত্যিকবৃন্দের মধ্যে দুই একজন পাণ্ডাজাতীয় ব্যক্তির প্রথমত এক প্রকার স্নায়বিক বিকার উপস্থিত হয়; তৎপরে স্নায়বিক ব্যাধি মাত্রেরই প্রকৃতিগত ছোঁয়াচে-

দোষ প্রযুক্ত উক্ত ব্যাধি গণ্ডীর অপরাপর সকলের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। এই গেল অবস্থা। আনাতোল বলিতেছেন যে ব্যাধিগ্রস্তের প্রতি রাগ করা কদাপি উচিত নহে; এমন কি রোগীরা যদি স্বাস্থ্যবানের নীরোগ অপকর্ষের প্রতি শ্লেষ ও অবজ্ঞা প্রকাশও করেন, তথাপিও নহে।

আমারও তাহাই মনে হয়। কিন্তু শুধু ব্যাধি বলিয়া নিশ্চিন্ত হইলে চলিবে না। ব্যাধির কথা উঠিলেই তাহার প্রতিকারের কথা উঠে।

আনাতোল ফ্রাঁস যাঁহাদের কথা লইয়া আলোচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সহিত আমাদের সম্বন্ধ অল্পই—নাই বলাই ঠিক; কিন্তু স্নায়ুবিকার আমাদের আর্ট ও সাহিত্যেও বিরল নহে। বর্ত্তমানে বরং তাহা ক্রমে ক্রমে বাড়িতেছে বলিয়াই মনে হয়। এই প্রকার ব্যাধি যে শুধু কোন এক বিশেষরূপেই প্রকাশ পায় তাহা বলা যায় না। ইহার মূল ও স্বভাব অনুসন্ধান করিলে ইহার মধ্যে বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। আমার উদ্দেশ্য একে একে আর্ট ও সাহিত্যের বিশেষ বিশেষ ব্যাধিগুলিকে ভাল করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখান। প্রথমত আমরা যে ব্যাধির প্রকোপ বর্ত্তমান সাহিত্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তাহারই আলোচনা করিব। এই ব্যাধির নাম হুইটমেনিয়া। নাম হইতেই বুঝা যায় যে ইহা স্নায়বিক ব্যাধি ও ইহার মূলে স্নায়ুর অনুকোষ (Tissue) সংক্রান্ত বিকার কিছু নাই, আছে ক্রিয়ার (Function) বিকার।

মেনিয়া জাতীয় ব্যাধির কারণ ও লক্ষণ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে (১) মানুষের মনে যদি কোন কামনা, বাসনা বা অভিলাষ পূর্ণ প্রবলতা লাভ করিয়াও অপূর্ণ থাকিয়া যায় তাহা হইলে মানুষ

কাম্যকে না পাইয়া দুধের সাধ ঘোলে মিটাইবার আবেগে বাসনাকে ছদ্মবেশ পরাইয়া বিকৃত উপায়ে পরিতৃপ্তি লাভের চেষ্টা করে, অথবা (২) আসলকে না পাইয়া নকলকেই আসল বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া সুখসিদ্ধি করে। (৩) মানুষ যদি কোন লজ্জাকর বিষয়ে বা চিন্তায় লিপ্ত থাকে তাহা হইলে সে হেয়কে শ্রেয়রূপ দিবার জন্য নানা প্রকার আচরণের ও তর্কের সৃজন করে। এই প্রকার নানাবিধ কারণে মানুষের মনে মেনিয়ার সঞ্চার হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে কোন কোন ব্যক্তি ধর্ম্মজীবন যাপনেচ্ছাকে কেমন অবাধে লাম্পট্যধর্ম্মে পরিণত করিয়া গুপ্তকামনাকে চরিতার্থ করেন। কেহবা শক্তিশালী হইবার বাসনাকে, দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিয়া নিবৃত্তি করেন। কেহ যৌন-চিন্তাকে আর্ট অথবা ইউজেনিক্‌সের আবরণে জীয়াইয়া রাখেন। বাৎস্যায়ণ বা হ্যাভেলক এলিসের দোহাই দিয়া অনেক যৌন-আসামী খালাস পাইয়াছে, এমন কি জজের প্রশংসা-লাভেও সক্ষম হইয়াছে। স্বাভাবিক দেহ-প্রদর্শন ব্যাধিকে অনেকে পলিটিক্যাল মঞ্চে লম্ফ ঝম্প করিয়া দাবাইয়া ও অর্দ্ধ-তৃপ্ত করিয়া রাখিয়াছেন। নারীর অধিকারের কথা আওড়াইয়া অনেক অতিমানব নিজের পরবধূবহিষ্করণ প্রবৃত্তির সাফাই গাহিয়াছেন।

আর এক প্রকার মেনিয়া আছে যাহার কারণ জন্মগত বুদ্ধিহীনতা। বুদ্ধিমানেতে যাহা আদর্শ ও উত্তমে mission, অল্পবুদ্ধি-লোকেতে তাহাই fanaticism ও মেনিয়ায় দাঁড়ায়। আনাতোল যখন লিখিয়াছিলেন, "The mentally poverty-stricken must also have their ideal. Is it not true that the wax figures exposed in the windows of the hair-dressers inspire schoolboys with poetical dreams?" তখন তিনি ক্ষীণ-বুদ্ধির আদর্শ

বা যাহা বুদ্ধিমানের নিকট পাগলামী বলিয়া গণ্য হয়, তাহার কথাই বলিয়াছিলেন। এক জাতীয় জার্ম্মাণীর মাল—দেব-দেবীর চিত্র-দর্শনে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের দরোয়ান মহলে ভক্তি ও শ্রদ্ধার বান ডাকিয়া যায়—মাংসবহুল উলঙ্গ নারীদেহের প্রতিলিপিকে কেহ কেহ উচ্চ অঙ্গের আর্ট ভাবিয়া মোহিত হন—অর্থহীন শব্দাড়ম্বরকে কোন কোন কবি ও পাঠক ভাব নামে ভূষিত করিতে পশ্চাৎপদ হন না—মাড়োয়ারীরা অর্থব্যয় করিয়া নিজেদের প্রাসাদগুলিতে গ্রীক, রোমান, মুরীশ, গথিক স্প্যানীশ ও পি-ডবলিউ-ডি স্থাপত্যের সমন্বয় সাধন করেন—এ সকল রুচি আদিম অভিব্যক্তির বর্ত্তমান সংস্করণ।

হুইটমেনিয়া-আক্রান্ত লেখকদিগের মধ্যে যে সকল লক্ষণ দেখা যায় তাহাতে মনে হয় যে তাহাদের মেনিয়া রকমারী। কেহ হুইটম্যান নামক কবির আদর্শ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নিজ অক্ষমতা প্রযুক্ত সে আদর্শের নিকৃষ্টরূপ পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন; এবং যতই নিজ ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছেন ততই নিজের হুইটমেনিয়া হুইটম্যানের স্কন্ধে আরোপ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কেহ বা নিজ নিকৃষ্টতাকে হুইটম্যানের নামে বাজারে চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কেহবা ভুল বুঝিয়া হুইটম্যানকে রামস্থলে রাবণ রূপে দেখিয়াছেন।

হুইটম্যান লোকটি কি রকম ছিলেন তাহা একটু দেখা প্রয়োজন, কারণ, যেমন যথার্থ ভীমসেনের পরিচয় না পাইলে যাত্রার দলের ও সাংসারিক ক্ষেত্রের বিভিন্ন ভীমদিগের বিকৃতির চূড়ান্ত অবস্থা ঠিক বুঝা যায় না; তেমনি হুইটম্যানকে না চিনিলে, হুইটমেনিয়্যাক্‌দিগের অদ্ভুতত্ব ভাল করিয়া উপলব্ধি করা যায় না। হুইটম্যান সম্বন্ধে ও' কোনর (O' Connor) তাঁহার বিখ্যাত প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন—

"...a man of striking masculine beauty,—a poet—, powerful and venerable in appearance, large, calm,

superbly formed ; ...resembling and generally taken by strangers for some great mechanic or stevedore, or seaman or grand labourer of one kind or another... his uncovered head, majestic, large, Homeric, and... his strong shoulders with the grandeur of ancient sculpture...the whole form surrounded with manliness as with a nimbus, and breathing in its perfect health and vigour, the august charm of the strong."

হুইটম্যান প্রকৃতিদেবীর প্রিয় পুত্র ছিলেন। তাঁর স্বভাবে, তাঁর দেহে, তাঁর ব্যবহারে, কথায়, কবিতায় সকলে সৃষ্টির বিরাটত্ব ও বৈচিত্র্যের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইতেন। তাঁর প্রাণ যেন অনন্ত সমুদ্র। সীমাহীন অরণ্যানী, অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গমালা, অসংখ্য গ্রহনক্ষত্রখচিত আকাশ, সর্ব্বগ্রাসী অগ্নি, সর্ব্বধ্বংসী ঝড় তুফান, পথিপার্শ্বস্থ নাম-না-জানা ঘাসের ফুল, শিশিরবিন্দু, সরল শিশুর হাসি-কান্না, নবীন হৃদয়ে পবিত্র একমুখী প্রেম প্রভৃতি প্রকৃতির ভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠ উপকরণ নিচয় দিয়া গঠিত হইয়াছিল। তিনি বিশ্বমানবকে ডাকিয়া প্রকৃতির সহিত তেমনি করিয়া পরিচয় করিয়া দিয়াছেন, যেমন করিয়া মানুষ পথহারা বালককে তাহার মায়ের কোলে তুলিয়া দেয়, "এই যে মা" বলিয়া। তিনি সকলকে শক্তির, পবিত্রতার, নির্ভীকতার, উন্নতির, আগাইয়া চলার ও অন্যান্য পুরুষোচিত আদর্শের প্রতি ফিরাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। হুইটম্যান নবীনকে ডাকিতেছেন,

Come my tan-faced children,
Follow well in order, get your weapons ready.
Have you your pistols? Have you your sharp-edged
axes

Pioneers! O Pionners!

For we cannot tarry here,
We must march my darlings, we must bear the brunt of danger,
We the youthful sinewy races, all the rest on us depend,
Pioneers! O Pioneers!

All the rest we leave behind,
We debouch upon a newer, mightier world, varied world,
Fresh and strong the world we seize, world of labour and the march,
Pioneers! O Pioneers!

We primeval forests felling,
We the rivers stemming, vexing we and piercing deep the mines within,
We the surface broad surveying, we the virgin soil upheaving
Pioneers! O Pioneers!

O to die advancing on!
Are there some of us to droop and die! Has the hour come?
Then upon the march we fittest die, soon and sure the gap is filled,
Pioneers! O Pioneers!

হুইটম্যান পুরুষ ছিলেন এবং পুরুষ ব্যতীত আর কিছু ছিলেন না। আদিম পেলিওলিথিক মানব যেমন করিয়া হয়ত প্রকৃতির শোভা দেখিয়া ও কর্ম্মের আবেগ অনুভব করিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছিল, হুইট-

ম্যানের হৃদয় বুঝিবা তেমনি করিয়াই সৃষ্টির বিশালতা ও জীবন্ততাকে অর্দ্ধ উপাসক ও অর্দ্ধ প্রেমিকের চক্ষে দেখিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল।

হুইটম্যান উন্মুক্ত প্রান্তর, জঙ্গল, পাহাড়, নদনদী, খোলা হাওয়া, গতি ও কর্ম্ম, শক্তি ও আনন্দকে জীবনে বরণ করিয়াছিলেন।

Edmund Gosse তাঁহার Walt Whitman শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

"He (Whitman) explained...these were the people he liked best, athletes who had a business in the open air; that these were the plainest and the most affectionate of men, those who lived in the light and air and had a study to keep their bodies clean and fresh and ruddy; that his soul went out to such people."

তাই Whitman তাঁর Song of the Open Road কবিতায় লিখিয়াছেন।

Allons! Yet take warning!

He travelling with me needs the best blood, thews, endurance,
None may come to the trial till he or she bring courage and health,
Come not here if you have already spent the best of yourself,
Only those may come who come in sweet and determin'd bodies,
No diseased person, no rum-drinker or venereal taint is permitted here.
(I and mine do not convince by arguments, similies,
We convince by our Presence.)

অর্থাৎ কি না, শুধু যদি কেহ হুইটম্যানের ভাব অনুকরণ করিতে সক্ষম হন, তাহা হইলেই তিনি হুইটম্যানের আপনার হইবেন না। তাঁহাকে শরীরেও স্বভাবেও শক্তিশালী, নীরোগ ও সরল—হুইটম্যানের মত—হইতে হইবে ; কেন না, "আমি ও আমরা তর্ক ও উপমার সাহায্যে লোককে দলে টানি না, আমাদের সাক্ষাৎ পাইলেই লোকে বুঝিতে পারে আমরা কি, আমাদের আদর্শ কি।"

হুইটম্যানের প্রতিবিম্ব আমরা কবি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে অনেকটা দেখিতে পাই—কথায়, কবিতায়, আকারে। তিনি বলিতেছেন ;—

আমারে ফিরায়ে লহ, অয়ি বসুন্ধরে,
কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে,
বিপুল অঞ্চলতলে। ওগো মা মৃণ্ময়ি,
তোমার মৃত্তিকা মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই ;
দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মত ... ...
প্রবাহিয়া চলে' যাই সমস্ত ভূলোকে
প্রান্ত হতে প্রান্তভাগে, উত্তরে দক্ষিণে,
পূরবে পশ্চিমে ... ...
... ... নীলিমায়
পরিব্যাপ্ত করি দিয়া মহাসিন্ধুনীর
তীরে তীরে করি নৃত্য স্তব্ধ ধরণীর
অনন্ত কল্লোলগীতে ; ... ...
... ... শুভ্র উত্তরীয়প্রায়
শৈলশৃঙ্গে বিছাইয়া দিই আপনায়
নিষ্কলঙ্ক নীহারের উত্তুঙ্গ নির্জ্জনে,

নিঃশব্দ নিভৃতে।

... ... ব্যথিত সে বাসনারে

বন্ধমুক্ত করি দিয়া শতলক্ষ ধারে

দেশে দেশে দিকে দিকে পাঠাব কেমনে

অন্তর ভেদিয়া। বসি শুধু গৃহকোণে

লুব্ধচিত্তে করিতেছি সদা অধ্যয়ন

দেশে দেশান্তরে কারা করেছে ভ্রমণ

কৌতূহলবশে; আমি তাহাদের সনে

করিতেছি তোমারে বেষ্টন মনে মনে

কল্পনার জালে।

স্বদুর্গম দূরদেশ

পথশূন্য তরুশূন্য প্রান্তর অশেষ,

... ...

একখানি গ্রাম, তীরে শুকাইছে জাল

জলে ভাসিতেছে তরী, উড়িতেছে পাল,

জেলে ধরিতেছে মাছ, গিরিমধ্যপথে

সঙ্কীর্ণ নদীটি চলি' আসে, কোনোমতে

আঁকিয়া বাঁকিয়া ... ...

... ... উষ্ট্রদুগ্ধ করি পান

মরুতে মানুষ হই আরব সন্তান

দুর্দ্দম স্বাধীন ... ...

হিংস্র ব্যাঘ্র অটবীর—

আপন প্রচণ্ড বলে প্রকাণ্ড শরীর

বহিতেছে অবহেলে ··· সে দৃপ্ত গরিমা,
ইচ্ছা করে একবার লভি তার স্বাদ ;—
ইচ্ছা করে বার বার মিটাইতে সাধ
পান করি বিশ্বের সকল পাত্র হ'তে
আনন্দ মদিরা-ধারা নব নব স্রোতে।

বর্ত্তমান দেওয়ালে-ঘেরা সভ্যতার কারাগারে আবদ্ধ মানব-প্রাণ বার বার কাঁদিয়া মুক্তি চাহিতেছে। আধুনিক নীচতা, জঘন্যতা, নির্জ্জীবতা, শ্রীহীন সমাজে বাস করিয়া সকলেই বার বার চাহিয়াছে উন্নত সরল, সতেজ, সুন্দর যাহা, তাহাকে। হুইটম্যান আমাদের হৃদয়ে এই সুন্দর সতেজ উন্নত সরল প্রাণবত্তার খোরাক জোগাইয়াছেন। তাই আমরা তাঁহাকে পাইয়া মুগ্ধ। তাই সুইনবার্ণ তাঁহাকে ডাকিয়া বলিয়াছেন।

Send but a song oversea for us
Heart of their hearts who are free,
Heart of their singer, to be for us
More than our singing can be;
Ours, in the tempest at error,
With no light but the twilight of terror;
Send us a song oversea.
O strong-winged soul with prophetic
Lips hot with the blood-beats of song,
With tremor of heartstrings magnetic,
With thoughts as thunders in throng,
With constant ardours of chords
That pierce men's souls as with swords
And hale them hearing along,

A note in the ranks of a clarion,
A word in the wind of cheer,
To consume as with lightening the carrion
That makes time foul for us here;
In the air that our dead things infest
A blast of the breath of the west,
Till East way as West way is clear.

এ যেন আমাদের হুইট্‌ম্যানের সুইনবার্ণ লিখিয়াছেন। আজকার বাংলায় আমরাও চাই হুইটম্যানকে। তিনি বৃষ্টির মত, ঝড়ের মত, প্লাবনের মত, আগুনের মত যেন আমাদের সমাজের, রাজনীতির, চরিত্রের, দেহের সকল পঙ্কিলতা, দুর্গন্ধ, অক্ষমতা ও অন্যান্য আবর্জ্জনা ধুইয়া, উড়াইয়া, ভাসাইয়া, পুড়াইয়া সৃষ্টির বক্ষ হইতে মুছিয়া দেন! কিন্তু হায়, কোথায় হুইটম্যান? রাম নাম করিয়া ভূতের আবির্ভাব হইল যে! চাই যাহা তার উল্টা পাইলাম। চাহিলাম হুইটম্যানকে, পাইলাম একদল হুইটমেনিয়াক। ইহারা কবিতাও লেখে, মুক্তির বুক্‌নিও আওড়ায়, কিন্তু কিছুই সাচ্চা নয়। ছদ্মবেশী পাপ। নাম লইয়াছে উত্তমের, স্বভাবে অধম। নীচে যাহা উদ্ধৃত করিতেছি তাহা কি হুইটম্যানের বসন্ত-বর্ণনা?

করে বসন্ত বনভূমি সুরত-কেলি
পাশে কাম-যাতনায় কাঁপে মালতী বেলি'!
... ...
সখি মদনের বাণ-হানা শব্দ শুনিস্
ঐ বিষমাখা মিশ-কালো দোয়েলার শিষ!
... ...
আসে ঋতুরাজ, ওড়ে পাতা জয়ধ্বজা
হল অশোক শিমুলে বন পুষ্পরজা,

তার পাংশু চীনাংশুক
হ'ল রাঙ্গা কিংশুক,
উৎসুক উন্মুখ
যৌবন তার
যাচে লুণ্ঠন-নির্ম্মম দস্যু-তাতার।

বনবধূ উচাটন
মদন-পীড়ায়,
তার কামনার হরষণে ডালিম ডাঁশায়। *

উপরোক্তরূপ স্বাভাবিক ও সরল কবিত্বে আধুনিক 'তরুণ সাহিত্য' ভরপূর। যথা, এক কবি বলিতেছেন,

আর পারিনে সাধ্‌তে লো সই এক ফোঁটা এই ছুঁড়িকে।
ফুট্‌বে না যে ফোটাবে কে বল্‌লো সে ফুল-কুঁড়িকে॥

*　　*　　†　　*

সুতোর গুঁতো শ্রান্ত শিথিল টান্‌তে ও মন্‌-ঘুড়িকে।
আর শুনেছিস সই ?
ওলো হিমের চুমু হা'র মেনেছে এইটুকু আইবুড়িকে।†

আর এক শক্তিশালী হুইটমেনিয়াক্ নিম্নলিখিত ভাবে নিজের অন্তরের কথা ফাঁস করিয়াছেন।

আমার জীবন মোরে সস্নেহে দিয়েছে উপহার
একখানি শুভ্র কচি ব্যথা—শান্ত স্নিগ্ধ সুকোমল
সন্ধ্যার প্রথম তারা সম…

* কাজি নজরুল ইসলাম—মাধবী প্রলাপ

† কাজি নজরুল ইসলাম—পূবের হাওয়া-পৃ ৩৮

সর্ব্বনাশ, এই কি হুইম্যান! এ যে দিনে ডাকাতি! অন্তত একটা নকল হুইটম্যানী ভাব রাখ। তা নয়—যা ইচ্ছা তাই! মনে পড়ে কে যেন কবে কোথায় একটা জুতার ক্যাটালগকে চীনাকাব্য গ্রন্থ বলিয়া চালাইয়াছিল। হুইটম্যানী দলের লেখকের পক্ষে উপরের কবিতাখানি প্রকাশ করাও প্রায় ঐরূপই হইয়াছে।

কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র এক স্থলে তাঁর নিজের পরিচয় দিয়াছেন,

আমার চোখের জল
মোর দীর্ঘশ্বাস,
হতাশা, বেদনা
তাহাদের সাথে পুনঃ হবে পরিচয়?
যত দুঃখ ফেলে রেখে যাব
তাহারা শুধাবে ডেকে,
ডেকে কহিবে কি প্রিয়া,
"আমারে ভুলিয়া ছিলে কেমন করিয়া?"

এত Pioneers এর গান নহে, Song of the Open Road, ত নহেই। ইহার নাম Song of the Melancholy Church Mouse কি ঐ প্রকার কিছু হইতে পারিত। এই সকল কবিতা পড়িয়া মনে হয় যেন কোন ম্যালেরিয়া-রোগী কোন হাঁপানী-ক্লিষ্ট "তরুণী'র প্রেমে হতাশ হইয়া কুইনাইন খাইতে খাইতে এই সব লিখিয়াছে। আর কাজি সাহেবের কবিতা! থাক সে কথা! অপরাপর হুইটমেনিয়াকরাও এইরূপ অথবা ঐরূপ, আর কিছু নহে।

আমার বক্তব্য প্রায় শেষ হইল। পশ্চিমের নবজাগ্রত Paganism আমাদের সাহিত্যের ঘাটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে; কিন্তু তাহার সে Hellenic Grandeur নাই। সে সমুদ্রে ভাসিয়া ভাসিয়া, শেওলা মাখিয়া, ক্ষীণ [illegible] eroticism, অথবা effeminate কাঁদুনীতে পরিণত হইয়াছে। তাহার ভিতর বিশাল, বিরাট, শুভ্র, উন্নত, সতেজ, অনন্ত শক্তিশালী কিছু নাই—যাহা আছে তাহা বিরাটের পচানি, শুভ্রের তলানি এবং উদ্দেশ্যহীন কপচানি।

সখি-সংবাদ *

নব বিষ্ণুশর্ম্মা

খ্যাঁক্-শেয়ালী বল্‌ল ডেকে, "কাঠবেড়ালী সই,
উই-চিংড়ে ওই এসেছে, বন-মরালী কই ?
বনের যত তরুণ-মনের নরুণ-ফোটা ব্যথা—
বন-চাঁড়ালের পাতায় লিখে করুণ সে সব কথা
মাসে মাসে সবার কাছে পাঠানোটাই ঠিক—
হাঁদা গোদা বাঘ ভালুকে কর্‌ছে ভারী দিক্ !
কচি-কাঁচা ব্যাঙ্-বাঙাচি, রামছাগলের ছানা,
পুঁই-পাদাড়ে ভোঁদড় যত টিক্‌টিকি রাতকানা,
গন্ধ গোকুল, গুব্‌রে পোকা, কাঠঠোক্‌রা, ফিঙ্গে—
সিঙ্গী হাতীর পায়ের চাপে ফুঁক্‌ছে খালি শিঙ্গে ;
মনের কথা পাতায় লিখে করতে হবে জাহির,
সকাল-সন্ধ্যে শুনছ ত সই, শব্দ 'ত্রাহি ত্রাহি'র।
সঙ্ঘবদ্ধ হবই মোরা কচি-কাঁচার দল—
মাসিক লিখে গল্প-গাথায় কর্‌ব কোলাহল !"
কাঠবেড়ালী শুনল ব'সে কান ক'রে তার খাড়া—
বল্‌লে শেষে, তেরছা চোখে, লেজটি দিয়ে নাড়া,
"বল্‌লে যা সই, ঠিক তা বটে, একটু লাগে গোল—
কি লাভ ইথে নিজেই যদি পেটাই নিজের ঢোল।
লিখে লিখে উজাড় হবে বনচাঁড়ালের ঝাড়—
বাঘ ভালুকে মনের সুখে মট্‌কে খাবে ঘাড় !
তুমি সখি এইত সেদিন আস্‌শ্যাওড়ার ঝোপে,
শশক-ছা'কে চিবিয়ে খেলে !—আজকে মোদের শোকে,
মোদের দুখে, চোখের জলে বক্ষ ভেসে যায়—
ব্যাঘ্র ভালুক সইতে পারি তোমায় সহা দায় !"
এই না ব'লে কাঠ-বেড়ালী উঠ্‌ল গিয়ে গাছে—
খ্যাঁকশিয়ালী জুটল গিয়ে খ্যাঁকশেয়ালের কাছে।

---

* La Fontaine এর অনুসরণে।

[এসেছে তরুণ এসেছে নূতন ভরসা,
পতিত অতীত—বৃদ্ধের আশা ফরসা !
এসেছে তরুণ, কুট হামসুন-ধরমী,
Pan-Hunger-মরমী !
এসেছে নবীন মৃত ও অতীতে দলিয়া,
বেদনা-অশ্রু দুই চোখে ছলছলিয়া—
এসেছে, তরুণ এসেছে,
শাড়ী ও সেমিজে পথে পথে ভালবেসেছে।]

মণি-মুক্তা

শ্রী ডুবুরি কর্ত্তৃক আহৃত।

I impose nothing ;
I propose nothing ;
I am only setting forth.

[বিখ্যাত ইংরেজী পত্রিকা 'রিভিউ অফ্ রিভিউজ'এর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া 'আত্মশক্তি' বাংলাদেশের তরুণ-তরুণীদিগকে তাঁহাদের প্রাণের কথা লিখিয়া পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, ইহার কোনও প্রয়োজন ছিল না। বাংলার তরুণ 'তরুণ'-সাহিত্যের মারফৎ তাঁহার মনের ছবি অনেকদিন আগেই জগতের সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছেন। আমরা শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু, শ্রীযুক্ত মনীশ ঘটক, শ্রীযুক্ত জীবনানন্দ দাশগুপ্ত প্রভৃতি বিখ্যাত 'তরুণ' লেখকদের রচনা হইতে তরুণদের বাণী সঙ্কলন করিয়া দিলাম]

*   *   *   *

তরুণের আত্মকথা

সত্যিকথা বলবো, নীলিমা? যখনি যেখানে কাঁচা বয়েসের মেয়ে দেখতুম, ইচ্ছে হত ছুটে গিয়ে ওকে আমার নিজের ঘরে টেনে নিয়ে আসি, তারপর—ওর সঙ্গে কথ কই, ওকে খুব আদর করি। আমাদের বাড়ীর পাশের রাস্তা দিয়ে মেয়ে-ইস্কুলের গাড়ি আসা যাওয়া করতো—কতদিন তাদের কারো সঙ্গে ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করবার ব্যর্থ চেষ্টা আমি করেছি।

উলঙ্গ আবনি তনু লুব্ধদৃষ্টি আমারে দেখাও
অঙ্গাঙ্গ-নির্য্যাস দিয়া মোরে তুমি লুপ্ত করি দাও
রূপের আঁধারে।

কবরী বিমানে খোলো,
মায়ার বসন তোলো
নিশ্বসিয়া কহ কথা, লয়ে যাও রহস্ত আগারে
ঝঙ্কার মঞ্জীর পায়ে নাচো গাহো নয়ন-সম্মুখে
বর্ষণের নৃত্যে ভুলি, বক্ষবাস ফেলে দাও খুলে
মুখ রাখো মুখে।

আমার এই নির্জ্জন ঘরটিতে বসে' একটা সুরটমল্লার বাঁশিতে বাজাচ্ছিলাম, আর বাইরে ভারি মিষ্টি ছন্দে বৃষ্টি ঝরছিল। ফটকে একটা মোটর দাঁড়াল, ক'রা বেড়াতে এলেন। সিঁড়ি দিয়ে উঠে' আমার ঘরের পাশ দিয়ে যেতেই আমি একটু অন্যমনস্কতার ভাণ করে' ওদের দেখে নিলাম। মনে হ'ল ঐ নীল বেনারসী-পরা মেয়েটিকে ভাল করে' দেখব।...ভাবলাম, অমনি একটি জ্বলন্ত অগ্নি-শিখাকে আমার এই বাহু-বন্ধনে নিষ্পেষিত করে' জুড়ুতে চাই। সমস্ত দেহে একটা অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য অনুভব করলাম।...

একবার বউদি'র কাছে ছুঁচ-সুতো আনতে গিয়ে সেই মেয়েটির যৌবন-ভারাতুর দেহটিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে পরিপূর্ণ করে' দেখে নিলাম। মেয়েটি দু'টি পা জোড় করে মাদুরের ওপর বসে' ছিল। আমি ওর সুন্দর গড়ন কটিদেশে তাকাচ্ছিলাম, ও একটু অপ্রতিভ হ'য়ে শাড়ির আঁচলটা আরও একটু টেনে দিল।

যে কামনা নিয়ে মধুমাছি ফেরে বুকে মোর সেই তৃষা!

* * * *

আমি প্রজাপতি,—মিঠা মাঠে মাঠে সোঁদালে সর্ষেক্ষেতে;
—রোদের শফরে খুঁজি না ক' ঘর,
বাঁধি না ক' বাসা,—কাঁপি থরথর
অতসী ছুঁড়ির ঠোঁটের উপর
শুঁড়ির গেলাসে মেতে!

এক মুঠো রসে-টস্‌টসে' আঙুর নিঙড়োলে যা'র দু' ফোঁটা মাত্র হয়, সেই জিনিষেরই এক বোতল নিয়ে চলেছি—তাই মাথার মগজ টগ্‌ বগ্‌ করে' ফুটছে শিরার বাঁধন টুটে' রক্ত উপ্‌চে' পড়্‌তে চাচ্ছে, শ্যাম্পেনের ফেণার মত, জোয়ারের জলের মত।

কোথায় চল্‌ছি ?

স্বর্গের উদ্যানে ভগবানের মানা ডিঙিয়ে পৃথিবীর বুকে নির্ব্বাসন যে বরণ করে' নিয়েছিলো, চলেছি সেই ঈভ-এর সন্ধানে, উদাসী প্রণয়ীর ছিন্ন-মস্তকে চুম্বন করে' জয়ের গৌরবে যা'র বুক দুলে' ওঠে, চলেছি সেই সালোমে-র খোঁজে।

গাব আজ আনন্দের গান
যে আনন্দ আন্দোলিত সুগন্ধনন্দিত স্নিগ্ধ চুম্বন-তৃষ্ণায়
বঙ্কিম গ্রীবার ভঙ্গে, অপাঙ্গে, জঙ্ঘায়
লীলায়িত কটিতটে, ললাটে ও কটু ভ্রূকুটিতে,
চম্পা অঙ্গুলিতে—
পুরুষ-পীড়ন তলে যে আনন্দে কম্প্র মুহ্যমান,
গাব সেই আনন্দের গান।
যে আনন্দে সতেজ প্রফুল্ল নব, দম্ভদৃপ্ত, নির্ভীক, বর্ব্বর,
ব্যাকুল বাহুর বক্ষে কুন্দকান্তি সুন্দরীরে করিছে জর্জ্জর,
শান্তির উৎসব নিত্য যে আনন্দে স্নায়ুতে শিরায়,
যে আনন্দ সম্ভোগ-স্পৃহায়,—
যে আনন্দে বিন্দু বিন্দু রক্তপাতে গড়িছে সন্তান,
গাব সেই আনন্দের গান।

—*—

তরুণ-জগৎ

'সে ছিল আমাদের সবাকার বঞ্চিতা'

পাড়ার মেয়েদের চোখে সে ছিল আমাদের সবাকার বঞ্চিতা—'আহা, সেই রূপের ছিরি, তা'র আবার অত দেমাক—মিন্সেগুলো যেন কী'; কেতুর কাছে সে ছিল 'জগতের

সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরী', বেণুর কাছে 'জগতের সর্ব্বাপেক্ষা মনীষী মহিলা'; আর আমাদের সবার কাছেই সে ছিল পদ্মার ঢেউ।

'পদ্মার মুখে মধুর গন্ধ পদ্মার বুকে মদের গন্ধ'

ফুলের গন্ধে আর মদের গন্ধে ঘর ভরে' গেছে। সিগ্রেটের ধোঁয়ায় আবছা। অনেক-রাতে-ওঠা চাঁদের আলো ঘরে ঢুকে' অপরাধ করেছে বলে' ক্ষমা চাচ্ছে যেন।... সে রাত কত স্বপ্নের ছবিই আমরা বুনেছিলাম, সমস্ত ভবিষ্যৎটা ছবির মত সুস্পষ্ট হ'য়ে ফুটে' উঠেছিলো আমাদের চোখের সুমুখে। কত স্বপ্ন! তা'তে নিশীথের তারার কম্পন, তা'তে পুষ্পের সৌরভের সুধা, তা'তে মদিরার চুম্বনের নেশা।...

সেই তো পদ্মার জন্মদিন।...

নিজের হাত দু'টো ছাড়িয়ে নিয়ে হঠাৎ দুই হাত দিয়ে পদ্মাকে জড়িয়ে ধর্‌লাম। ওর মিঠে মুখখানি আমার মুখের উপর, ওর নরম বুক আমার বুকে এসে লাগ্‌ছে— তা'র নীচে ওর ছোট্ট হৃদয়ের ভীরু শব্দটুকু শুনতে পাচ্ছি।...লতার মত ওর হাত দু'টি আমায় ঘিরে' আছে। ...পদ্মার মুখে চুমো দিলাম, পদ্মার বুকে চুমো দিলাম:—পদ্মার মুখে মধু-র গন্ধ, পদ্মার বুকে মদের গন্ধ, পদ্মার সর্ব্বাঙ্গে আমার দেয়া ফুলের গন্ধ।

তার পর পদ্মা আমার মুখে চুমো দিলে, আবার চুমো দিলে, আবার চুমো দিলে— পদ্মা আমায় চুমো দিলে, আমায়, আমায়, আমায়:—

'দোরের পাশের মেয়েটার সময়ের দাম আছে'

দোরের পাশে মেয়েটিকে দেখে প্রভাত নিশ্চয়ই তা'কে অশ্রু বলে ভুল করেনি। যদিও সেই সুচারুতা পেলব সর্ব্বাঙ্গ,—যদিও বসে' থাক্‌বার ভঙ্গীটি দুঃখী বিরহিনীরই মতো।

পরিশ্রান্ত জীর্ণ শরীর বিছানার ওপর ঢেলে দিয়ে প্রভাত খানিকক্ষণ জিরোয়,— মেয়েটি পায়ের কাছে বসে। নারীর নৈকট্যের জন্য ওর সমস্ত দেহ ভুখা, ভিখারী হ'য়ে উঠেছে।

মেয়েটির খস্‌খসে শুক্‌নো বিবর্ণ হাতখানি টেনে এনে ওর কপালে রাখে, পরে জামার বোতাম খুলে' বুকের ওপর,—তৃপ্তি পায় না।

মেয়েটি এক ফাঁকে উঠে' আলোটা কমিয়ে দিয়ে এসে ফের বসে। প্রভাতের সমস্ত দেহ পিচ্ছিল সরীসৃপের মতো ঘৃণায় কিল্‌বিল ক'রে ওঠে। জোর করে বলে—আলোটা বাড়িয়ে দাও, ঐ আলোই তোমার অবগুণ্ঠন।

মেয়েটির সময়ের দাম আছে, তাই বিরক্ত হ'য়ে ওঠে।

প্রভাত ওর হাত টেনে নিয়ে অবুঝের মতো বলে—বন্ধু, সখি—

উঠে' চলে' যায়। অন্ধ দোরে দোরে ফেরে,—অশ্রুকে পায় না।

দুঃখী রাস্‌্যা ও মন্তেকার্লো

ফিয়র্ডের দেশে যাব, ফোর্ডের দেশে যাব, শেলি-বায়রণ-ব্রাউনিঙ্‌-এর কাব্য-মন যা'র সঙ্গে মিতালি করেছিল, সেই ইতালিতে, যে-দেশে সব চেয়ে বেশী জল পাওয়া যায়, আর সব চেয়ে ভালো জলপাই ফলে, সেই গরম রক্ত আর গরম রোদ্দুরের দেশ স্পেনে;—তুষার-শুভ্র রাস্‌্যাকে দেখ্‌ব—দুঃখী রাস্‌্যাকে, মহান্‌ রাস্‌্যাকে।...

ইতিমধ্যে আমি একবার মন্তে কার্লোয় গিয়েছিলাম। রুলেট্‌এ আড়াই হাজার ফ্রাঁ হেরেছি। তা ও কিছু নয়; অমন সবাই হারে। আমার সঙ্গে গিয়েছিলেন আমার একটি ফরাসী মহিলা-বন্ধু—ম্যাদ্‌মোয়াজেল্‌ মারী দ্যুর্প। মন্তে কার্লো ভারি সুন্দর জায়গা;—হোটেলগুলোও চমৎকার···

'হাম্‌সুন্‌ হাঁটুতে হাঁটু ঠেকিয়ে বসে'

বাংলার কোণে ব'সে বিপুল জগতের সঙ্গে কথা কই,—Tolstoy মেঝের ওপর পা ছড়িয়ে বসে—Dostoevsky কাঁধের ওপর হাত রেখে দাঁড়িয়ে মধুর করে' হাসে, রাতের খাবারটুকু Gorkyর সঙ্গে একত্র খাই; Hamsun হাটুতে হাঁটু ঠেকিয়ে বসে' বন্ধুর মতো গল্প করে' যায়—জ্বরো কপালে Bojer তার কোমল হাতখানি বুলিয়ে দেয়,—নীল সাগরের কল্লোলিত মায়া তার চোখে, [Anatole] France কতদিন আমার এই ঘরে বসে' জিরিয়ে গেছে। সেদিন কুটে কালো ঝড়ো মেঘের মতো Browning এসেছিল—সঙ্গে Barrett রুখু মাথা,—রোগা চোখে অপূর্ব্ব বিহ্বলতা; ঘরে ঢুকেই বল্লে—আমাদের একটু জায়গা দিতে পার এখানে? কতদূর থেকে পালিয়ে এসেছি। তিনজনে মেঝের ওপর বসে' কত গল্প করলাম।

'বাড়ীটার যক্ষ্মা হয়েছে'

বাড়িটা যেন সত্যিকার বাড়ি না হ'তে পারার জন্যে নতজানু হ'য়ে দু'টি হাত জোড় করে' ক্ষমা চাইছে. এমনি তা'র চেহারা। যক্ষ্মার রোগী কাশ্‌তে-কাশ্‌তে দম আটকে হাঁ আর বুঁজ্‌তে পারেনি যেন। দেখ্‌লে রাগে পিত্তি জ্বলে' যায়, আবার দুঃখও হয়।

কতদিন চুণকাম করা হয় নি, কেউ জানে না, দেওয়ালের গায়ে চণ্টা উঠে' এখানে-ওখানে তামাটে ইট্‌ বেরিয়ে পড়েছে, কাটা-ঘায়ের ফাঁক দিয়ে লাল মাংস উঁকি দিচ্ছে যেন।

'চলে নাগরী কাঁখে গাগরী'

কলসী কাঁখে পাড়ার মেয়েরা জল আনিতে যায়। চমৎকার তাহাদের চলার ঐ ভঙ্গীটুকু।

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বসিয়া বসিয়া শুধু ইহাই দেখি।

বাতাস কী দুষ্ট!

নিতান্ত বেহায়ার মত মেয়েদের আঁচল, মুখের ঘোমটা পথের মাঝেই চকিতে খসাইয়া উধাও হয়।

কলসীতে জল-তরঙ্গ বাজে। ছলাৎ ছল্‌ ছলাৎ ছল্‌।

জল চল্‌কাইয়া কাপড় ভিজিয়া যায়। নবোদ্গত যৌবনের কী পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য!

ঐ সুন্দর নীলাম্বরী-পরা তরুণী বধূটি—কি সুষ্ঠু, সুসংযত ওর ঐ অঙ্গসৌষ্ঠব, কি সুন্দর ওর ঐ লীলায়িত গতিছন্দ, হাতের সোনার চুড়িগুলির আওয়াজ কি মিষ্টি!

ঘোমটা-ঢাকা ওর ঐ মুখখানি কিন্তু দেখিনি একদিনও।

'রোগা পট্‌কা গলি—কেশে কেশে যেন ধুঁক্‌ছে'

বিনোদ গায়ের আলখাল্লাটা খুলে ফেললে। আমাদের পুরোনো হোঁচট্‌-খাওয়া মুখ-থুবড়ে-পড়া মেসটা যেন হঠাৎ কথা ক'য়ে উঠল।—যেন মেতা মিলেছে।

একটা জীর্ণ থুথ্‌রো বুড়ো বাড়ীর সঙ্গে যে একটা জ্যান্ত মানুষের এমন সামঞ্জস্য থাক্‌তে পারে, ভাবিনি।

দাঁত-বের-করা রাস্তা,—পায়ে খোয়া শুধু ফোটে না, কামড়ায়। মনে হয় ওর মেজাজ যেন সব সময়ই খিট্‌খিটে। রোগাপট্‌কা গলি,—কেশে কেশে যেন ধুঁক্‌ছে,—এমনি মনে হয়।—তালপাতার সেপাই।

পাশেই বুড়ো বাড়ীটা জুজুবুড়ীর মতো ঘুপ্‌টি মেরে ব'সে,—যেন ফোক্‌লা দাঁতে হাস্‌ছে।

—

'মা নয়, বোন নয়, বউ নয়, সে তোমার কে হয়?'

শুধু, পায়ের ওপর দুটি হাত রেখে একটি দুঃখী মেয়ে বোবার মতো ব'সে আছে,—যেন বিসর্জ্জনের প্রতিমা। মুখখানি ভারি মলিন ও উদাস, তাইতে এত সুন্দর।—মা নয়, বোন নয়, বউ নয়, যেন আর কেউ।

———

'এই মেয়ের দল আমাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেল্‌তে লাগল'

এই মেয়ের দল আমাকে নিয়ে যেন ছিনিমিনি খেল্‌তে লাগ্‌লো। অনায়াসে নাচিয়ে বেড়ানোর পক্ষে আমার মত অমন সুপাত্র তারা বোধ হয় তখন পর্য্যন্ত পায়নি। তাছাড়া, আমার বাপের টাকা আছে, নিজের চেহারাটা নেহাৎ মন্দ নয়—কেউ কেউ যে আমার সম্বন্ধে কোনো বিশেষ অভিপ্রায় পোষণ না করতেন, এমনও মনে হয় না। মাঝে-মাঝে চাউনির বিজলী হেনে তাঁরা সে কথাটা আমায় জানিয়ে দিতেও ছাড়তেন না। ওদের লীলাচাতুরী, কলা—ছলা-ছলনাই বা কত ছিল! কথা কইবার সময় মুখটাকে খাম্‌কা খুব কাছে এনে হঠাৎ সরিয়ে নেওয়া, চল্‌তে চল্‌তে শাড়ির আঁচল উড়িয়ে চাবির গোছা দুলিয়ে আমার গায়ে ছোট্ট চড় মারা, ড্রেসিং রুম থেকে চুল বাঁধতে বাঁধতে হঠাৎ দরজার আড়াল থেকে আমায় ডেকে নিয়ে কানে কানে একটা নেহাৎ অর্থহীন কথা বলে চট করে' সরে' যাওয়া—এসব তো ছিল তাদের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার! সন্ধান যে একটিরও ব্যর্থ হয়নি, তা আমি স্বীকার করবো।

‘ভাসুর (তারিণী) ও ভাদ্রবৌ (ফুলি)—তবে ঠিক অর্থোডক্স্ নয়’

সেইদিন রাত্রি দেড়প্রহরের সময় ফুলির ঘরের পেছন দিক্‌কার বেড়ায় অতি সাবধানে তিনটি টোকা পড়ল।

ফুলি চাপা গলায় বলল, কে?

আমি।

ফুলি উঠে নিঃশব্দে দরজা খুলে দিল, বাইরের লোকটা ঘরের ভিতর এসে দাঁড়াল, জিজ্ঞাসা করল, কেতু চলে গেছে?

হ্যাঁ, খাইয়ে দাইয়ে বিদায় করে দিয়েছি।

তোমায় নিয়ে গেল না যে?

টাকাগুলো দিলে না তা নেবে কি?

তারিণী ফুলির থুৎনিটা দু’ আঙুল দিয়ে নেড়ে দিয়ে বল্‌ল, ক্ষেপী।

‘কুঠে বুড়ীর আস্তানা’

স্যাঁৎসেতে মাটির মেজের ওপর, ছেড়া মাদুর, খবরের কাগজ, তালি দেওয়া কাঁথা,—যার যেমন জুটেচে, পেতে, ফক্‌রে ও সদি ছাড়া ঘরের আর বাসিন্দা কটি সার সার পড়ে আছে। ধনুকের মতো বেঁকে, দেয়ালের ধারে নুলো হাঁ করে ঘুমুচ্ছে, তার পাশেই কুঠে বুড়ী। ঘায়ের যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে সে উস্‌খুস করচে। তার পাশে খানিকটা জায়গা খালি। সেটা সদির গেদ্দি। তার এ ধারে কানা গুবরে কাণা চোখটা মেলে নাক ডাকাচ্ছে। মাঝে বাকি জায়গাটুকু খালি। এ ধারের বেড়ার গায়ে খালি ভুঁয়ে উপুড় হয়ে পড়ে নফর, কি একটা কুৎসিৎ রোগের যন্ত্রণায় কাৎরাচ্ছে।

ঝাপ ঠেলে সদি ঘরে ঢুকল। তার বাঁদিকের গালের মাংস নেই—ছু পাটি দাঁত দেখা যাচ্ছে। ঢিবি কপালের ওপর উস্কখুস্ক চুলগুলি ঝিঁড়ে করে বাঁধা। পরণের ছেঁড়া কাপিটা একধারে অনেকটা উঠে গেচে, আর একধারে হাঁটু পর্য্যন্ত নাবানো। গায়ের শতছিন্ন আঁচলটা না থাকারই মতো।

তার মুখে কোনো ভাবের ছাপ পড়ে না, কিন্তু চোকের কোণে তখনও জলের ছাপ শুকোয়নি।

ঝাপ ঠেলার শব্দে কুঠে বুড়ি চোক মেল্‌ল।

কে। মর মর?—মলো?

(মুলোটা পাশ ফিরল। একটা ধনুক যেন বাঁ-কাৎ থেকে ডান কাতে ঘুরে এল)

কু। উহুঃ! উঃ উঃ…

মু। (গলা তুলিয়া) লাগল!

কু। (যে হাতটা তখনও খসে পড়েনি, সেইটি দিয়ে মুলোর মুখে এক থাবড়া কসে)……মর্‌ মর্‌। যম তোকে ভুলে আচে।

সদি। আহা বকিস কেনে? ওকি আর জেনে গুঁতো দিয়েচে তোকে?

কু। রূপুসি! কেলি শেষ করে দুপুর রাতে কোঁদল কর্‌তে এলেন। বলি রূপ দেখে ক'জনার মন মজ্‌লো, ক'জনার ট্যাকে হাত বুলোলি?

স। মর্‌ মাগি! ভাল ২লমুত বেঁকিয়ে এল!

[মার খেয়ে মুলো বুড়িকে আঘাত করবার জন্য হাত ছুড়তে লাগল। কিন্তু আঘাত যথাস্থানে পৌঁছতে হলে যে রকমের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থাকা আবশ্যক, তা তার ছিল না, তাই তার আকুলি বিকুলিতে বিকৃত অঙ্গগুলো শুধু তিড়িক্‌ তিড়িক্‌ করে লাফাতে লাগল।]

'তরুণ সমালোচনা'

*   *   *   *   *

বাঙলা গদ্য যে কত সুন্দর হওয়া সম্ভব, তা ও গল্পটি না পড়া পর্যান্ত কেউ ধারণা করতে পার্‌বেন না। একেবারে সহজ অনাড়ম্বর—না আছে শ্রুতি-মধুর কথার সুরের মোহ, না আছে উপমার ছড়াছড়ি, না অপরূপ বাক্যবিন্যাসের মায়াজাল। যে-ভাষায় সাধারণ লোকে সাধারণ কথা বলে আগাগোড়া ঠিক সেই ভাষায় লেখা। অথচ কী-ই বা সে ভাষার জোর, আর কী-ই বা শ্রী! পড়তে-পড়তে কখনো আটকায় না, আর একবার পড়লে কখনো ভোলা যায় না। এর পাশাপাশি পড়্‌লে রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' রীতিমত affected জটিল ও artificial মনে হয়। মনে হয়, যথেষ্ট প্রয়াস করে' চার পৃষ্ঠা ধরে রবীন্দ্রনাথ যে-কথাটি বলছেন, সে কথা প্রেমেন্দ্র মিত্র অনায়াসে এক প্যারাগ্র্যাফের মধ্যে বলতে পার্‌তেন। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে redundance বা অতিশয়োক্তি-দোষ অত্যন্ত বেশী।

p. 464

মিথ্যাচার *

বেতাল

বেদনার ক্রুশ-ভার স্কন্ধে বহে প্রদীপ্ত তরুণ,
পথে পথে অতরুণ প্রবীণেরা করে উপহাস,
শুধু রুদ্ধ বাতায়ন-অন্তরালে নয়ন অরুণ
Mary Magdalene-কুল কাঁদে আর ফেলে তপ্তশ্বাস।

সেদিন চিনিল তাঁরে হয়ত দ্বাদশ অনুচর,
কৃষক শ্রমিক তাঁতি কিম্বা কোনো অশিক্ষিত জেলে ;
ক্রুশবিদ্ধ তরুণের জয় গান গাবে চরাচর,—
জেনেছিল ঋষি শুধু অন্তরের গূঢ় দৃষ্টি মেলে।

তরুণ সে ছিল জানি, সে ত কভু কাঁদেনি ব্যথায়—
তার কথা মুখে আনি বৃথা কর আত্ম-প্রবঞ্চনা !
নীল হ'ল দেহ তার অন্তরের রুদ্ধ বেদনায়,
বিচারের লাগি তবু করে নাই কাতর প্রার্থনা।

কেমনে সহিবে ব্যথা—তোমরা যে অসত্য-পূজারী !
শিখিয়াছ আত্মরতি. জান শুধু করিতে ক্রন্দন—
ঘৃণ্য বামাচারা যত, কামলুব্ধ অন্ধ অনাচারী !
মুখে আনি তাঁর নাম বৃথা কর চিত্ত বিনোদন !

অভিমন্যু মার খেয়ে করে নাই কভু ব্যর্থ ক্ষোভ,
ললাটে হানিয়া কর কারো কাছে চাহেনি বিচার,
মরিতে সে জানে নাকো, বাঁচিবার বৃথা তার লোভ,
নীতিহীন দুর্ব্বৃত্তেরা অন্যায়ের মাগে প্রতীকার !

---

* 'তরুণ' কবি ও সম্পাদক নিজেদের যীশু ও অভিমন্যুর সহিত তুলনা করিয়াছেন।

সমাজ-সংস্কার-নীতি ভাবে যারা কঠিন শৃঙ্খল,
দারিদ্র্যের গর্ব্ব করে—অথচ কাঁদিছে নিশিদিন—
তাদের বীরত্ব খ্যাতি !—দেহে মনে যাহারা বিকল,
পথ কুক্কুরের চেয়ে তারা সবে আরো দীন-হীন !

দেশের দুর্ভাগ্য অতি—তরুণের এ কাঙালিপনা !
যাহারা প্রদীপ্ত তেজে উচ্চশিরে চলিবে সংসারে,
কোথা তারা ? ক্রুশ স্কন্ধে রাজপথে আজো জুটিল না—
গৃহকোণে কাঁদে শুধু অক্ষম নিষ্ফল হাহাকারে !

প্রাপ্ত-পত্র

[মতামত ও বর্ণিত ঘটনার সত্যাসত্য সম্বন্ধে পত্রপ্রেরকগণ দায়ী—সঃ—শঃ চিঃ]

মাননীয় শ্রীযুক্ত 'শনিবারের চিঠি' সম্পাদক মহাশয় সমীপে—

মহাশয়,

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নাম আমরা সকলেই শুনিয়াছি। আজকাল সকলেই বলিয়া থাকেন, শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের আকর্ষণে যে তিনটি গ্রহ অধুনাতন বাংলাসাহিত্যের আকাশে গতিশীল হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত অধ্যাপক মহাশয় একজন, অপর দুইজন—শ্রীযুক্ত সুরেশ চক্রবর্ত্তী ও 'ভ্রাম্যমান' দিলীপকুমার। ইঁহারা একটি স্বতন্ত্র সৌরগোষ্ঠী, ইঁহাদের রশ্মিচ্ছটায় শ্রীযুক্ত চৌধুরী মহাশয় ম্লান হইয়া যাইতেছেন ! সুখের কথা, কারণ 'পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ং।' শ্রীযুক্ত ধূর্জ্জটিপ্রসাদ এবার 'প্রগতি'-পত্রিকায়, এক পত্রে প্রকাণ্ড একখানি বৃন্দাবনী নামাবলী পাঠাইয়া উক্ত পত্রিকার 'নাসিকী'র মানরক্ষা করিয়াছেন। তিনি নিজেই বলিতেছেন, "আপনি মনে কোরতে পারেন

আমি বৈষ্ণব হয়ে গেছি।" মনে করার ত কথাই নাই, আমরা এই নামামৃত পান করিয়া বিভোর হইয়াছি, তার কীর্ত্তন-অঙ্গটুকুও কম মাদক নহে, ধূর্জ্জটির ধুতুরার গন্ধ সর্ব্বত্র। যথা—'আমার মতে প্রমথ বাবুর হাত থেকে দু'জন পাকা সাহিত্যিক তৈরী হয়েছেন। একজন অতুলবাবু, অন্যজন সুরেশ চক্রবর্ত্তী। তাঁর (অর্থাৎ অতুল বাবুর) একমাত্র দোষের জন্য দায়ী তাঁর ফরাসী ভাষা সম্বন্ধে অজ্ঞতা এবং ফরাসী লাল মদ পান কোরতে আপত্তি।" কীর্ত্তনের এই 'আখর'টি দশা পাইবার মত। সেদিন আর একটি মহাক্রিটিক এক বৈঠকখানায় বলিয়াছিলেন, "আজকাল ফরাসী ভাষা ক্রমশঃ হটিয়া যাইতেছে, বড় বড় লেখকেরা আর ফরাসী লিখিতেছেন না।" ইনি নাকি ঐ গোষ্ঠীরই অন্তর্গত! এখন আমরা করি কি? বাংলা লিখিতে হইলে ফরাসী ভাষার কসরৎ শিখিতে হইবে, আবার বড় বড় লেখকেরা ফরাসী ছাড়িয়া ইংরাজী ধরিতেছেন—মাতৃভাষা ত্যাগ করিয়া? এই দুই মন্তব্য একত্র করিয়া আমরা বড়ই মুস্কিলে পড়িয়াছি। এ-ত' গেল ভাষাতত্ত্ব। আবার লেখার জাতি-তত্ত্বও সহজ নয়। যথা—"ত্রিবেদী মশায়ের উত্তরাধিকারী আছেন ডাক্তার গিরীন্দ্রশেখর, চারু ভট্টাচার্য্য ও সতীশ ঘটক মশাই।" মশাইদের ভাগ্য ভাল, অতুল গুপ্ত মহাশয়ের তুলনায় বড় বাঁচিয়া গিয়াছেন। অধ্যাপকজীউ যে পরম বৈষ্ণব তাহার প্রমাণ —"আমি অন্ততঃ দিলীপের কথোপকথন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার আশায় বসে আছি।" 'আমি অন্ততঃ' এই কথাটিতে তাঁহার 'জীবে দয়া ও নামে রুচি'র পরিচয়ে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। অবশ্য এ গৌরব তিনি আর এক জনের সঙ্গে ভাগ করিয়া লইয়াছেন—"রাধাকমল বাবুর হৃদয়ভরা সহানুভূতি, নতুন ভাব, আদর্শ ও লিখনভঙ্গীকে আদর করবার ক্ষমতার" কাছে তিনিও হার মানিতে প্রস্তুত। সর্ব্বশেষে

অধ্যাপক মহাশয়ের সাহিত্যরসজ্ঞান কীর্ত্তন ছাড়িয়া ধ্রুপদে উঠিয়াছে, যথা—'বুদ্ধদেব বসু বোলে এক কবি—তাঁর কবিত্বশক্তি না মেনে যাবার উপায় নেই—সেই শক্তিতে প্ররোচিত না হয়ে অনেক সময় আর একজন খাঁটি কবির (অচিন্ত্য সেনগুপ্তের) আদর্শে কবিতা লেখেন, যেমন কাজী (নজরুল ইসলাম) সত্যেন দত্তকে আদর্শ করতে গিয়ে নিজেকেও অপমান করেছেন, আদর্শকেও করেছেন।" আমরা বলি, তা হোক, ভয় কি ? অধ্যাপক মহাশয়ের যে আদর্শ এই পত্রের ছত্রে ছত্রে ফুটিয়াছে, তাহার অপমান করিবার সাধ্য যে কাহারও নাই! ইতি ৭ই মাঘ, ১৩৩৪।

শ্রীভাবগ্রাহী পাঠক

'শনিবারের চিঠি' সম্পাদক মহাশয়
মাননীয়েষু।

মহাশয়,

আপনারা তরুণ-সাহিত্য লইয়া আলোচনা করিতেছেন দেখিয়া আমি তরুণ-সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে একটি কথা লিখিতেছি। তরুণ সাহিত্যিকেরা তরুণীদের সান্নিধ্য লাভ করিবার জন্য যে কতদূর কষ্ট স্বীকার করিতে প্রস্তুত এই কাহিনীটি তাহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

আমি যখন কলেজে পড়ি তখন একটি তরুণ 'চপল চুমোর চমকে' 'তুহিন মাঝে ফাল্গুনি ফুল' ইত্যাদি কবিতা রচনা করিয়া কবি-খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। নন-কো-অপারেশনের অছিলায় তরুণ কবি কলেজ ত্যাগ করেন।

সহরে একটি বাড়ী তরুণী-বাহুল্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। হঠাৎ একদিন ভোরে দেখিলাম তরুণ কবি সেই বাড়ীতে প্রবেশ করিতেছেন।

(কবির সেই বাড়ীর কাহারও সহিত কোন সম্পর্ক ছিল না।) হায় ভগবান! সৌম্যদর্শন কবির স্কন্ধদেশে সবুজ কি দেখা যাইতেছে?—সবুজ সাহিত্য নয়—সত্য সত্যই তাজা সবুজ ঘাস! আগের দিন—বাবুর গরুর চাকর পালাইয়াছে। বুঝিলাম এই সুযোগ হেলায় না হারাইয়া—তরুণ কবি তরুণীদের সান্নিধ্য লাভের জন্য এই কাজের ভার লইয়াছেন।

ঢাকা, ১৫ই জানুয়ারি, ১৯২৭।

—প্রত্যক্ষদর্শী।

শনিবারের চিঠি সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়, আপনারা যখন অতি-আধুনিক সাহিত্য লইয়া এত আলোচনা করিতেছেন তখন এই সাহিত্যের সামাজিক ফলাফল সম্বন্ধে নিশ্চয়ই উদাসীন নন, এই অনুমান করিয়াই এই পত্রখানি লিখিতেছি। আশা করি ইহা আপনার সুপরিচিত পত্রিকায় স্থান পাইবে। আমাদের গ্রামে একটী নব্য ধরণের যুবক ছিল। সে কলিকাতায় থাকিয়া পড়াশুনা করিত ও কেবলমাত্র গ্রীষ্ম ও পূজার ছুটিতে বাড়ীতে আসিত। তাহার স্প্রিংএর চশমা, চুলের ছাঁট, কাপড়, জুতা গ্রামের লোকদের মহা কৌতূহল ও আলোচনার বিষয় ছিল। যে সময়ের কথা বলিতে যাইতেছি তাহার কিছুদিন পূর্ব্বে তাহার বিবাহ হয়। বিবাহ সনাতন দেশীয় প্রথামত, বাপের উদ্যোগে হইলেও ছেলেটী সম্পূর্ণ নব্য ধরণে দাম্পত্য-জীবন যাপন করিতে বদ্ধপরিকর হয়। মেয়েটীর ডাক নাম 'চিনি' কি 'হাসি'। সর্ব্বসমক্ষে ক্রমাগত 'চিনি' 'চিনি' ডাক্, স্বামীস্ত্রীতে এক সঙ্গে বসিয়া খাওয়া, জুতা মোজা পরিয়া বেড়ান ইত্যাদি চলিতে লাগিল। অজ পাড়াগাঁয়ে একেবারে ঢি ঢি পড়িয়া গেল। কলঙ্কের অবধি রহিল না। সমাজে মাথা হেঁট হওয়ার দরুণ বাপ মাও নিদারুণ অভিমানে একেবারে

চুপ করিয়া রহিলেন। একদিন শয়নকক্ষে স্বামীস্ত্রীতে একসঙ্গে বসিয়া খাইতেছিল, এমন সময়ে বাপ সেই ঘরে কি কাজে আসিয়াই, পুত্র ও পুত্রবধূকে একত্র দেখিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিলেন! হিন্দুর মেয়ে স্বামীর জন্য চিরাভ্যস্ত সংস্কারও ত্যাগ করিতে পারে, স্বামীর অন্যায় দেখিলেও আপত্তি করিতে পারে না, তাই মেয়েটী অনেক সহিয়াছিল। কিন্তু বৃদ্ধ শ্বশুরকে ঊর্দ্ধশ্বাসে অপ্রতিভ হইয়া দৌড়িতে দেখিয়া তাহার ধৈর্য্য-চ্যুতি ঘটিল। লজ্জায় ক্ষোভে অধীর হইয়া সেদিন সে স্বামীর যতটুকু লাঞ্ছনা করা সম্ভব করিল (অবশ্য মুখের কথায় ও গোপনে)। অভিমানে আত্মহারা হইয়া পতি-দেবতা নিদারুণ প্রতিহিংসা লইতে সঙ্কল্প করিলেন। রাত্রে স্ত্রী ঘুমাইলে পর তিনি গলায় ফাঁস পরাইয়া কড়িকাঠে ঝুলিয়া পড়িলেন। সৌভাগ্যক্রমে দড়িটা ছিল পচা। ঝুলিয়া পড়িবামাত্রই ভারের চোটে ছিঁড়িয়া গেল। যুবক ও গলায় ফাঁস আটকাইয়া মেজের উপর পড়িয়া গেল। শব্দ শুনিয়া স্ত্রী জাগিয়া দেখে এই অবস্থা। তখনই সে চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। সেই চীৎকার শুনিয়া বাড়ীর লোক ছুটিয়া আসিল ও ভিতর হইতে কাহারও কোনো সাড়া পাওয়া যায় না দেখিয়া দরজা ভাঙ্গিয়া ঘরে ঢুকিল। ঢুকিয়া দেখে, স্বামী স্ত্রী উভয়েই অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে। গলার ফাঁস খুলিয়া, মাথায় জল ঢালিয়া অনেক কষ্টে দুজনকে বাঁচান হয়। গ্রামের দুষ্ট ছেলেদের ভয়ে, ভদ্রলোক পুত্র ও পুত্রবধূকে সেই রাত্রেই অন্যত্র পাঠাইয়া দেন।

—'গ্রামবাসী'—

STOP PRESS

আমাদের সাহিত্যে Problem আসিবে কোথা হইতে? অত্যন্ত গতানুগতিক দেশ। ঔপন্যাসিক ও গল্পলেখকের ত কোনো scope

নাই—সেদিন কে একজন তরুণ লেখক এই বলিয়া দুঃখ করিয়াছেন। তিনি সম্ভবত পৌষের **বঙ্গবাণীতে** "মৃত্যুরে কে মনে রাখে?" নামক গল্পটি পড়েন নাই। পড়িলে আর তাঁহাকে Problem-এর জন্য ভাবিতে বা দুঃখ করিতে হইত না। ঘরে ঘরেই Problem পাইতেন। উপরে উল্লিখিত গল্প হইতে নিম্নোদ্ধৃত স্থানটি পড়িলেই বুঝিতে পারিতেন—Problem অফুরন্ত, টানিয়া তুলিতে পারিলেই হইল।

[গোপাল ৭।৮ বছরের একটি অতি রুগ্ন পুরুষ-শিশু, সবে হাঁটিতে শিখিয়াছে ; অম্বা একটি ক্ষুধিতা বিধবা তরুণী]

"আস্‌বে আমার কোলে? অম্বা তাহাকে (গোপালকে) কোলে তুলিয়া লইল। পরে ছেলের মুখের উপর নিজের মুখ রাখিল, তারপর গাল দুইটি ধরিয়া কহিল, "বড় হ'য়ে আমায় কি বলে ডাক্‌বে?

ছেলে মুখের দিকে তাকায়। কিন্তু কথা বলে না।

নাম ধরে ডেকো, কেমন? ছেলেকে কোলের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া আবার বলিল, এম্‌নি করে আমাকেও খুব আদর করো, বুঝ্‌লে?

একবার ছেলেকে নামাইয়া দেয়, আবার কোলে তুলিয়া লয়। এমনি বার বার। সমস্ত হৃদয়, সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়া ছেলেটিকে জড়াইয়া ধরে। বুকের উপর যেন পিষিয়া মারে।

বার বার শুধুমাত্র অনুভব করিতে চায়—সে নারী,

আর যাহাকে চাপিয়া ধরিয়া আছে—সে পুরুষ।"

আমাদের একটি বন্ধু অত্যন্ত Jealous স্বামী। এই লেখা পড়িবার পর সে আমেরিকার Birth Control Leagueএর কাছে এক পত্র লিখিয়াছে, এরূপ খবর পাইয়াছি।

———

সংবাদ-সাহিত্য

You must not joke with fools and provincials. They are so apt to take offence.

—La Bruyere.

'তরুণ'-সাহিত্যিকদিগকে কেহ বলেন গোর্কী, কেহ বলেন হাম্‌সুন। আমরা জানি তাঁহাদের স্থান আরও অনেক উপরে। তাঁহারা সকলেই সেক্‌স্‌পীর (Sex-পীর, sex সম্বন্ধে পীর, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারয়)

———

কল্লোল-সম্পাদক তাঁহার দলীয় লেখকদের সম্বন্ধে বলিতেছেন—

"আমাদের অনেক লেখকই হয়ত নিজেরা জানেন না, তিনি কেন লিখিতেছেন, তাঁহার বলিবার কথা কি, এবং কি লিখিতেছেন। এই কারণে অধিকাংশ লেখার মধ্যেই কোনও বিশিষ্টতা থাকে না। পাঠক-দের কাছে তাই প্রায় লেখাগুলিই একঘেয়ে মনে হয়।"

ইহার উপর টীকা অনাবশ্যক।

———

আমরা বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল প্রভৃতি লেখকগণের শ্রদ্ধা প্রকাশ করি বলিয়া অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করেন। 'আত্মশক্তি'তে পড়িলাম—"দেশ যদি মৃতের কবরেই ভরে উঠ্‌ল তবে যারা বেঁচে আছে তাদের স্থান

কোথায় ?” আমাদের মনে হয় পীরকে নিউমার্কেটে কবরস্থ করিবার সময় এই কথাটা বলিলে আরও প্রাসঙ্গিক হইত।

একটি মাসিকে শ্রীযুক্ত ধূর্জ্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন “আমার এক দাদা আছেন, তিনি ফুলশয্যার রাত্রে আমার বৌদিকে Kantএর Critique of Pure Reason তর্জ্জমা কোরে শুনিয়েছিলেন ······আমিও দাদার ভাই।”

আমরা অনুমান করিতেছি, ধূর্জ্জটীবাবু ফুলশয্যার রাত্রিতে পত্নীকে নিজের লেখাগুলি পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন—তর্জ্জমা করিতে হয় নাই বটে, কিন্তু paraphrase নিশ্চয়ই করিতে হইয়াছিল।

এতদিনে ‘কল্লোল’ একটা ‘কাজের’ কথা বলিয়াছেন, (এতদিন কেবল ‘লেখার’ কথাই বলিতেছিলেন)—তরুণ লেখক ও তরুণী লেখিকাদের লইয়া একটি সঙ্ঘ স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন। উদ্দেশ্য মহৎ ও সাধু। “তরুণ-ধর্ম্ম” ত সহজিয়া-ধর্ম্ম, তাহার জন্য তপস্যা করিতে হয় নাই, আপসে মিলিয়াছে; ‘বুদ্ধ’ও হাজির, এক্ষণে একটি ‘সঙ্ঘ’ হইলেই ‘ত্রিরত্নে’র ত্র্যহস্পর্শ ঘটিবে। নির্ব্বাণের আর বাকি রহিল কি? অনেকেই ‘শরণ’ লইবেন।

টমাস হার্ডির মৃত্যু উপলক্ষে এক ‘তরুণ’ সমালোচক লিখিয়াছেন,—“তাঁহার মৃত্যুতে······একটি কোমল করুণ সুর থামিয়া গেল।” “শুভ্র কচি ব্যথা”তুরদের পাল্লায় পড়িয়া টমাস্ হার্ডিও কি কচি-সংসদের খাতায় নাম লিখাইয়াছিলেন নাকি ?

সুকবি শ্রীযুক্ত অজিতকুমার দত্ত “শ্রীযুক্ত অচিন্ত্য সেনগুপ্তের আমারে ভুলিও ভাই—পড়িয়া” একটি কবিতা লিখিয়াছেন। তিনি মহাজনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। Keats ও On First Reading Chapman's Homer বলিয়া একটি সনেট লিখিয়াছিলেন।

"ট্রেণের জান্‌লার গরাদে", "জঁাদরেল আপিস," "এরা (একটি মেয়ে) ঠোটেকলা", "তার দুই চোখ করুণায় ও কুশল-জিজ্ঞাসায় টইটুম্বুর," "পাঁচটে টাকা" (চারটে যদি হয়, পাঁচটে কেন নয়?) পূর্ব্ববঙ্গের লেখকের গঙ্গাতীরের ভাষা ব্যবহার করিবার এই সকল ব্যর্থ প্রয়াস লইয়া ঠাট্টা করা শ্রীযুক্ত বলাহক নন্দীর পক্ষে বাস্তবিকই অন্যায় হইয়াছিল। বিদেশী ভাষা জানা না থাকিলে, অথচ জানি বলিয়া অভিমান থাকিলে এই রকম দুই একটা howler হওয়া বিচিত্র নয়। এমন কি Victor Hugo'ও chest of drawers (দেরাজ) কে ফরাসীতে অনুবাদ করিতে গিয়া লিখিয়াছিলেন poitrine de calecon (অর্থাৎ ইজারের বুক, chest কিনা বুক, drawers কিনা ইজার)।

কাজি নজরুল ইস্‌লাম ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি।—তাই নিজের পরেই শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়কে স্থান দিয়াছেন। তিনি নিজে——

"গালির গালিচায় বাদশাহ—"

তিনি বলেন তাঁহার নীচেই "সুর-শা'জাদা" শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়। তার পরেই অবশ্য, নাচ-শা'জাদী—

পৌষসংখ্যা উত্তরায় 'ছেলে বয়সে'র কবি শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী (বাংলার অস্কার ওয়াইল্‌ড্‌) 'হে আকাশ নিশ্চল নিশ্চুপ' শীর্ষক একটি ৬ পৃষ্ঠাব্যাপী কবিতা লিখিয়াছেন। তাঁহার ধৈর্য্য প্রশংসনায়। রবীন্দ্রনাথের 'পূরবী' ও 'বলাকার' বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন পংক্তি লইয়া তিনি বহু পরিশ্রমে এই কবিতাটী খাড়া করিয়াছেন। এমন না হইলে স্বভাব-কবি! আমরা অবিচার করিব না—'নিশ্চুপ' কথাটি রবীন্দ্রনাথের নহে; সম্ভবত কবির নিজস্ব অথবা অন্য কাহারো।

গত সংখ্যা "শনিবারের চিঠি"র সমালোচনা প্রসঙ্গে 'সম্মিলনী' লিখিয়াছেন, "রামায়ণ মহাভারতের প্রসঙ্গ তুলে লেখক যেখানে উচ্ছৃঙ্খল সাহিত্যিকদের ব্যঙ্গ করেছেন, সেখানে তিনি প্রায়শ্চিত্ত বিধি দিতে গিয়ে নিজেই গুরুতর পাপ করেন নাই ত? যেমন তুলসী-গাছ খাওয়ার অপরাধে পোষা গোরুটিকে হত্যা করা।" মন্তব্যটি যেমন রসালো,

উপমাটিও তেমনি ধারালো। তুলসীগাছ বুঝিলাম, কিন্তু পোষা গরুটি এখানে কে? বেদব্যাস না বাল্মীকি? আমাদের ত মনে হয়, গাভী ততটা পবিত্র হইলেও বৃষকে দিয়া ধান-কলাই 'মাড়াইয়া' লইলে গো-হত্যার পাতক হয় না; যাই হোক, "সম্মিলনী"র এই রসবোধের পরিচয় পাইয়া আমরা এক বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইলাম,—'মানসী ও মর্ম্মবাণী'র আদর্শই রসচর্চ্চার খাঁটি আদর্শ, এ বিষয়ে 'সম্মিলনী'র সহিত তাঁহার বৈবাহিক-সম্বন্ধ হওয়াই স্বাভাবিক। এক ভস্ম আর ছার, দোষগুণ কব কার?

—

কল্লোল-সম্পাদক প্রায়ই বলেন, "যাহারা ক্লীব—ইত্যাদি"। স্ত্রীলোকের মনে পুরুষ সম্বন্ধে ও পুরুষের মনে স্ত্রীলোক সম্বন্ধে কম্‌প্লেক্সের কথা অগণিত জাল ফ্রয়েডের কৃপায় স্কুলের ছেলেরাও জানে। কিন্তু ক্লীব-কম্‌প্লেক্‌সের দৃষ্টান্ত এই প্রথম দেখিলাম।

—

'প্রগতি' শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের ভাষা সম্বন্ধে লিখিতেছেন,—"বাংলা গদ্য যে কত সুন্দর······একেবারে সহজ অনাড়ম্বর—না আছে শ্রুতিমধুর কথার মোহ, না আছে উপমার ছড়াছড়ি, না অপরূপ বাক্যবিন্যাসের মায়াজাল। যে ভাষায় সাধারণ লোকে সাধারণ কথা বলে, আগাগোড়া ঠিক সেই ভাষায় লেখা। অথচ কী-ই বা সে ভাষার জোর, **আর কী-ই বা শ্রী।**"

কিই-বা ছিরিই বটে! তবে গঙ্গার তীর হইতে বুড়ীগঙ্গার তীর পর্য্যন্ত পৌঁছিতে ভাষার এইটুকু রূপান্তর হওয়া বিচিত্র নয়।

'আত্মশক্তি'তে কাজি-বিলাপ পড়িলাম। নজরুল ইসলাম সাহেব একসময়ে রবীন্দ্রনাথের একান্ত স্নেহভাজন ছিলেন ও এখন সেই স্নেহ বিনাদোষে হারাইয়াছেন, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া কাজিসাহেব বলিয়াছেন,—বড়র পিরীতি বালির বাঁধ। ব্যাপার দেখিয়া আমাদেরও বলিতে ইচ্ছা হইতেছে, ছোটর পিরীতি গলার ফাঁস।

পৌষের বঙ্গবাণীতে একটি ধাঁধা দেওয়া হইয়াছে। ধাঁধাটি কবিতায় লিখিত, নাম দেওয়া হইয়াছে 'মাছ ধরি'। যে কেহ ইহার উত্তর দিতে পারিবেন তাঁহাকে এক বৎসরের 'শনিবারের চিঠি' বিনামূল্যে দেওয়া হইবে।

—"জলে ভিজি রোদে পুড়ি—,
মাছ বেচিগো ঝুড়ি ঝুড়ি ;
কিনে দিব পুতের মাকে

পুঁতির মালা পাঁচনরি,
সোনা জলে পানা জলে
নানান্ জলে মাছ ধরি।"

'কালি-কলমে'র মণিবজ্র ভারতী তাঁহার কোনো এক 'কল্যাণীয়াসু'কে এক পত্রে লিখিয়াছেন—

"এই কঠিন সমালোচনার ভয়ে অনেক নূতন লেখক রণে ভঙ্গ দিতেন। ...'ভারতী' আর 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনের সময় তিনি (রবীন্দ্রনাথ) লেখার উপর ও নীচে থেকে লেখকদের নাম তুলে নিয়ে—কাগজের প্রচ্ছদে লিখে দিতেন এই সংখ্যার লেখক অমুক-অমুক। বছরের শেষে কে কি লিখেছেন তা সূচিপত্র থেকে জানা যেতো।

এর ফল ভালই দাঁড়িয়েছিল। ছিদ্রান্বেষণ ক'রে তীব্র সমালোচনা বার করা মুস্কিল হ'তো।

...আমাদের এই অসংযত সমালোচনার দিনে সম্পাদকেরা এই পথ অবলম্বন করলে বোধ হয় ভাল হয়।"

কিন্তু ভারতী-মহাশয় তাঁহার কল্যানীয়াসুকে চিঠি লিখিবার সময় হয়ত জীববিশেষের মত ভাবিয়াছিলেন যে নিজে চোখ বুজিয়া থাকিলেই বিপদ এড়ান যায়।

এবারকার সম্মিলনীতে 'কর্ম্মব্রতী' ও 'মর্ম্মব্রতী' শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় মহাশয় শ্রীজীবনানন্দ দাস রচিত 'ঝরাপালক' নামক কবিতা-পুস্তকের সমালোচনায় লিখিয়াছেন—"তাঁর মর্ম্মকোষের ডিম্বে নিহিত মূক সঙ্গীত

যেন গগনময় মুখর হয়—রঙীন লঘু চঞ্চল 'ওড়া পালকে'র ভরে।" একে মর্ম্মকোষ, তাহার আবার ডিম্ব, তাহাতে নিহিত সঙ্গীত সেও মুক। সেই মুক সঙ্গীত মুখর হইবে রঙীন লঘুচঞ্চল 'ওড়া পালকের' ভরে। বপে্রে বাপ্! কবিতার সমালোচক ত পাওয়া গেল। কিন্তু এই সমালোচনার টীকা করিবার উপযুক্ত মল্লিনাথ কোথায়? ছেলেবেলায় একটা গান শুনিয়াছিলাম, তাহার অর্থ-বোধ আজিও হইল না। সম্ভবত কালিদাসবাবুর সমালোচনার অর্থের সহিত সেই গানের অর্থেরও সামঞ্জস্য আছে।

গানটি এইরূপ—

হামানদিস্তা মন—
কাম-পানেরে বিবাগী-খল ছেঁচ্ছে অনুক্ষণ!
হৃদয়-মর্ম্মকোষে—
রিপু-হংস ডিম পেড়েছে তা' দিচ্ছ তায় ব'সে—
হায় রে অকিঞ্চন!
ঝর্বে পালক, মন-বলাকা চল্বে বৃন্দাবন।

—

কল্লোল-সম্পাদক লিখিয়াছেন—

"যথার্থ জ্ঞানলাভ হইলে মানুষকে আর ধর্ম্মের বাণী বা কর্ম্মের বাণী কিছুই শিখাইতে হইবে না। শিক্ষার সঙ্গে রুচির যে উৎকর্ষতা লাভ হয় তাহাই মানুষকে কর্ম্মে প্রেরণা দেয়, ধর্ম্ম আচরণে প্রবৃত্ত রাখে।"

আমরাও বলি Amen। কিন্তু শিক্ষার সঙ্গে রুচির 'উৎকর্ষতা' লাভ না করিয়াই সম্পাদক সাজিয়া বসিলে যে পরের লেখা চুরী করিতে ইচ্ছা হয় এবং অধর্ম্ম চার-পোয়া হইয়া দেখা দেয়, সম্পাদক-মহাশয় তাহা জানেন কি?

—

মহাকবি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এই মাসের মানসী ও মর্ম্মবাণীতে "নারী" শীর্ষক কবিতায় নারীর দেহ ও মন লইয়া analysis করিয়া দেখিয়া মত দিয়াছেন—

বিশ্ব যদি নাহি দিত ভিক্ষা সেই দিন
তা হ'লে হয়ত মহী হ'ত নারীহীন।

তাঁহার analysis-এর ফল এইরূপ,

চন্দ্র দিল কান্তিকণা, ভুজঙ্গ ভঙ্গিমা
মৃগ দিল নেত্ররাগ, পুষ্প মধুরিমা,
নব তৃণদল দিল মরকত জ্যোতি,
লতা দিল রমণীয় নমনীয় মতি ;
মেঘ দিল অশ্রুরাশি, শশ দিল ডর
পালক লঘুতা দিল, বর্ণ সূর্য্যকর ;
শিখী দিল রূপগর্ব্ব, বায়ু চঞ্চলতা,
মধু দিল মধুবিন্দু, হীরা কঠোরতা ;
ব্যাঘ্র দিল জিঘাংসা ও হিংসার আগুন,
তুষার দানিল হিম চিত্তে নিদারুণ,
হৃৎপিণ্ড দিল বহ্নি, মিথ্যা অঙ্গরাগ,
নভ দিল নির্ল্লজ্জতা, প্রেম বিষভাগ।

মৃগ নেত্র-রাগ দিল,—নব তৃণদল মরকত-জ্যোতি দিল ; নভ নির্ল্লজ্জতা দিল ; সত্য বলিতে কি, কবির প্রতি এই অকবিদের হিংসা হইতেছে। মৃগের মত নেত্র-রাগ-সম্পন্ন অর্থাৎ পাটলচোখী নারী আর কচি-ঘাসের মতো মরকত-জ্যোতি সম্পন্ন নারীই চোখে দেখিতে পাইলাম না! আকাশের মত নির্ল্লজ্জা ত নহেই। সময় থাকিলে একবার বসন্ত বাবুর স্যাগ্‌রেদী করিতাম!

নিরভিমানী কবি আরো কয়েকটি কথা লিখিতে সঙ্কোচ করিয়াছেন, আমরা তাঁহার বাকী কথাগুলি লিখিতেছি—

আমারে হেরিয়া নারী পেল প্রেম-জ্বালা—
পড়িয়া আমার কাব্য বসিয়া নিরালা
দুর্ব্বোধ্য হইল নারী এ বিশ্বের কাছে—
কতেক বানরী হ'য়ে ফেলে গাছে গাছে।

—

ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্য যে কয়খানি মাসিক পত্রিকা আছে তাহাদের সকলগুলিতেই পত্রিকার শেষের দিকে ধাঁধা ও হেঁয়ালি দেওয়া হয় ও পরের মাসে সেগুলির উত্তর গ্রাহকেরাই পাঠাইয়া থাকে। কল্লোল

সম্পাদক মহাশয় তাঁহার পত্রিকার মাঘ সংখ্যা হইতে একটি করিয়া হেঁয়ালি দিবেন এইরূপ স্থির করিয়াছেন, দেখিতেছি। তবে তাঁহার গৌরবান্বিত বৈশিষ্ট্য তিনি রাখিয়াছেন। তাঁহার কাগজ ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য নহে। সুতরাং তিনি হেঁয়ালিটি গোড়ায় দিয়াছেন, (সম্ভবত ভবিষ্যতেও দিবেন)। আমরা কল্লোলের গ্রাহক না হইলেও নিয়মিত পাঠক। বহু চেষ্টাতেও সমস্যাটির সমাধান করিতে পারিলাম না।

কবি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত মহাশয়ের 'প্রিয়ার ঘরের অতিথি'টি কে? ইহার উত্তর দিতে হইবে। পাঠকদের সহায়তার জন্য কবি সেই অতিথিকে নিম্নলিখিত রূপ প্রশ্ন করিয়াছেন—তুমি কি আমার প্রিয়ার দুই চোখে বসন্ত-বাসনা দেখেছ? কোন্ নামে তাকে ডাক? তোমার আকাশে কি লাখো লাখো তেমনি ফুল ফুটেছে? তোমরা দুজনে কি মাঠের কিনারায় তেমনি ব'সে থাক! তোমাদের দেশে কি তেমনি 'চৈতের চৌদশী' আসে? শয়ন-শিয়রে রজনীগন্ধা কি নিশ্বাস ফেলে, আর তোমরা দুজনে নিরালা জেগে অবকাশ ভুঞ্জন কর? আমাকে কি বল্‌বে না—করতল দুটি কি তেমন কোমল, আঁখি কি তেমনি শীতল? তুমি না চাইতে অধর এনে কি আর অধরে রাখে? এবং বারেক আবেক 'ভালবাসি' ব'লে কি তেমনি থেমে থাকে? রঙীন বসন প'রে তোমাকে তুষ্ট কর্‌তে কি খোঁপায় ধান্যের মঞ্জরী গোঁজে? নব নবনীর মতো সুকোমল তার দুটি পয়োধরে কি তোমার শিশুর জন্যে সুধা সঞ্চিত ক'রে রেখেছে? আর কি বেহাগ গায়? তোমার চোখে কি আমার চোখের জলের আভাস পায়?

পাঠক বলুনত এই অতিথিটি কে? আমাদের মনে হয়. আমাদের দেশে বিবাহচ্ছেদ প্রথা প্রচলিত হওয়া উচিত। তাহা হইলে ব্যথিত কবি এরূপ কবিতা লিখিয়া দেশশুদ্ধ লোককে কাঁদাইবার পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিতেন।

আশাকরি আগামী সংখ্যা কল্লোলে এই হেঁয়ালির উত্তর পাইব।

Printed and Published by Yogananda Das at the
Prabasi Press. 91. Upper Circular Road. Calcutta.

৩য় সংখ্যা] অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮ [৪র্থ বর্ষ

অতি-আধুনিক প্রতিভা

আজকাল কেহ কেহ বাংলা সাহিত্যে নবযুগ অর্থাৎ নব-প্রতিভার উদয় দেখিতেছেন; শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ও তাঁহাদের দলে। কিছুদিন পূর্ব্বে অতি-আধুনিক সাহিত্য বলিয়া যে রচনা-রীতির নাম-করণ হইয়াছিল এবং যাহাকে লইয়া বাদ-বিতণ্ডায় শ্রীযুক্ত ঠাকুর-কবিও যোগ না দিয়া পারেন নাই, আজ নাকি সেই অপোগণ্ড, অকালপক্ক সাহিত্যে প্রতিভার বান ডাকিয়াছে, তাহার প্রচণ্ড বেগে ভগীরথও ভাসিয়া যাইতে বসিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ঠাকুর-কবি তাহার প্রশংসার জন্য নূতন ভাষার সৃষ্টি করিতে বাধ্য হইয়াছেন। শ্রীমান্ বুদ্ধদেব বসুর কবি-প্রতিভার বর্ণনা-প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন—'কবিতাগুলিতে সহজ স্বকীয়তার গাম্ভীর্য্য, ছন্দে, ভাষায় ও উপমায়

ঐশ্বর্য্যশালী।’ ভাষা দেখিয়াই মনে হয়, কবিকে এই কবিতাগুলি কিরূপ ‘মুগ্ধ’ করিয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে, বাংলা সাহিত্যের সেই অতি-আধুনিকতা ছন্দ, ভাষা ও উপমার ঐশ্বর্য্যে একটি সহজ স্বকীয়তার গাম্ভীর্য্য লাভ করিয়াছে—যাহা কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক বলিয়া এককালে নিরতিশয় নিন্দার্হ ছিল, তাহা ‘সহজিয়া’ হইয়া উঠিয়াছে। এই অতি-আধুনিক সাহিত্যের আর এক মহারথী ইতিপূর্ব্বেই ঠাকুর-কবির হাতে প্রতিভার ললাট-তিলক লাভ করিয়াছেন। কথাটা শ্রীযুক্ত ঠাকুর-কবির বলিয়াই নহে, দেশের আধুনিক ‘কালচার’-অভিমানী ঠাকুর-পূজারিগণও এই মতের সমর্থন করেন বলিয়া এই নবযুগের নূতন সাহিত্য ও তাহার প্রতিভা সম্বন্ধে আমাদের মত দুর্ব্বল-চরিত্র ‘কাল্‌চার’-অভিমানহীন বাঙ্গালীর যাহা বলিবার আছে এই প্রবন্ধে তাহাই বলিব।

* *

যাহাকে অতি-আধুনিক বলা হইয়া থাকে, বাংলা সাহিত্যে সেই বস্তুর আবির্ভাব আকস্মিক বোধ হইলেও বাঙ্গালীর জীবনে তাহা খুব আধুনিক নহে। বাঙ্গালার জীবনে, বিশেষ করিয়া তাহার নাগরিক জীবনে, যে, একটা পরিবর্ত্তন বিংশ শতাব্দীর প্রাক্‌কালেই আরম্ভ হইয়াছে, আধুনিক য়ুরোপীয় জীবনের সহিত নানা দিক দিয়া উত্তরোত্তর প্রবল সংঘাতেই তাহার জন্ম; ইহাতে উনবিংশ শতাব্দীর ভাব-জীবনে যে বিঘ্ন ঘটিয়াছে এবং তাহার ফলে আমাদের প্রাণে-মনে যে ‘আধুনিকতা’র প্রবৃত্তি প্রবেশ করিয়াছে, তাহা এক পুরুষেরও অধিক কালের কথা। বিগত পচিশ বৎসর ধরিয়াই আমরা আমাদের জীবন-যাত্রায় ক্রমশঃ নিরালম্ব, নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছি—আমাদের বাস্তুভিটায় ভাঙ্গন ধরিয়াছে। যে অচলায়তনের আশ্রয়ে

আমরা এতকাল—সেই বিদেশীয় কালচারের প্রথম আক্রমণের যুগেও—ভাব-জীবনের উচ্চ-উদার আদর্শকে জীবন-সংগ্রাম হইতে পৃথক রাখিয়া, পশ্চিমের সঙ্গে একটা রফা করিয়া, আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম, সেই বহুধিকৃত সমাজ-সৌধের ভিত্তিমূল, প্রথমে মহামারী ও পরে দুর্ব্বল দেহমন-সুলভ ক্ষুদ্র-সুখ-পিপাসার ফলে ক্ষয় হইয়া আসিতেছিল। পূর্ব্বতন সমাজে শাসন অযৌক্তিক ও দুর্নীতিমূলক বলিয়া তাহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য যে নূতনতর জীবন যাপনের আগ্রহে বাঙ্গালী স্বাতন্ত্র্য-সাধনের পক্ষপাতী হইল, তাহাতে সর্ব্ববিধ কর্ত্তব্যের গণ্ডী সংকীর্ণ হইয়া আসিল, কোনও রূপ আত্মিক শক্তিচর্চ্চার সামাজিক প্রয়োজন আর রহিল না। বহুবৎসর-ব্যাপী ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব বাঙ্গালার আধুনিক ইতিহাসে যে কি ভয়ানক ব্যাপার তাহা এখনও ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ ঘটে নাই. বাঙ্গালীর বাঙ্গালী-জীবনের প্রধান বিকাশ-ভূমি পল্লীগ্রাম ইহারই প্রকোপে শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। আমি পশ্চিম বঙ্গের সেই অঞ্চলের কথা বলিতেছি, অষ্টাবিংশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা কাল্‌চার ও সভ্যতা যেখানে পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। এই অচলায়তন ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইল, অথচ তাহার স্থানে আমরা কোনও নূতন আশ্রয় আজ পর্য্যন্ত গড়িয়া তুলিতে পারি নাই। জীবনে যেখানে যেটুকু স্বাবলম্বন পূর্ব্বে ছিল তাহা খোয়াইয়াছি; পুঁথিগত বিদ্যার বলে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেছি এবং সেই পুঁথিরই ভাব-স্বর্গে চক্ষু মুদিয়া বড় বড় কথার মোহে নিজেদের ক্ষুদ্রতা ও দুর্ব্বলতা ঢাকিতেছি।

* *

সমাজ ও বাস্তুভিটা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া 'সোতের শেহালা'র মত মূলহীন জীবন যাপন করাই যখন অধিকাংশ মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর

গত্যন্তর হইয়া দাঁড়াইল, তখন বাহিরে জাতি-সমূহের জীবন-সংগ্রামের প্রতিকূল প্রখরতা সেই স্রোতের মধ্যেই অনুভূত হইল। ১৯০৫ হইতে যে রাষ্ট্রীয় আন্দোলন সুরু হইয়াছে বাঙ্গালীর পক্ষে তাহার কারণ কিছু ভিন্ন। যে পরিমাণে আমরা জীবন-যুদ্ধে পরাজিত হইতেছি, সেই পরিমাণেই আমাদের মধ্যে একরূপ নৈরাশ্যের উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধি পাইতেছে—শক্তি নয়, অশক্তির অন্তিম আক্ষেপই আমাদের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের মূলে। স্বদেশী আন্দোলনের মূলে যে তাড়না ছিল তাহা বিজাতীয় আদর্শে বাঁচিবার আগ্রহ। বয়কট হইতে আরম্ভ করিয়া যত কিছু পন্থা আমরা অবলম্বন করিয়াছি তাহাতে বাঙ্গালীর প্রতিভা বিদেশীর অনুকরণ করিয়াছে; এবং স্বাদেশিকতার যে মন্ত্র আমরা তখন হইতে জপ করিতেছি তাহাতে আশানুরূপ সিদ্ধিলাভ করি নাই এই জন্য যে, সে মন্ত্র সাধন করিতে হইলে আমাদেব সমাজ ও সমগ্র জীবন বিদেশী আদর্শে ঢালিয়া সাজিতে হইবে—স্বধর্ম্মের সঙ্গে পরধর্ম্মের সমন্বয় সাধনের শক্তি আমাদের আর নাই, তাই পদে পদে আমরা বিড়ম্বিত হইতেছি। এই দীর্ঘকালব্যাপী রাষ্ট্রীয় সাধনার নিষ্ফলতার কারণ—আমরা আপনাকে হারাইয়াছি তাই পরস্বকে স্বকীয় করিতে পারি না; আমাদের সর্ব্ব প্রচেষ্টার মূলে একটা মূঢ় অনুকরণ-প্রবৃত্তি আছে।

* *

এই প্রবৃত্তি যখন আর চাপা দিবার উপায় রহিল না, অর্থাৎ যখন আর আত্ম-প্রবঞ্চনার সুযোগ রহিল না—তখন আমরা ক্রমশঃ স্বীকার করিতে বাধ্য হইলাম যে আমরা হারিয়াছি, আমাদের আর দাঁড়াইবার স্থান নাই, যে স্রোতে গা ঢালিয়াছিলাম, সে স্রোতের উজানে চলিবার বা তাহাকে রোধ করিবার শক্তি আর নাই—তখন

হইতে সকল নীতি ও আদর্শের কথা বন্ধ হইয়াছে স্রোতের গতি নির্ণয়েও আর প্রবৃত্তি নাই ;—জীবনে অতীতও নাই, ভবিষ্যৎও নাই, আছে কেবল বর্ত্তমানের নিকট আত্মসমর্পণ—জড়বুদ্ধির অসহায় উত্তেজনা। এ অবস্থায় আত্মিক শক্তি একেবারে নিষ্ক্রিয়—অসাড় দেহমন যে-কোনও স্ফুলিঙ্গের স্পর্শেই একটু চমক অনুভব করে। আমাদের জীবনে ইহারই নাম আধুনিকতা। কুসংস্কার-মুক্তির আস্ফালন, উচ্চতর আদর্শের জয়ঘোষণা, অতিরিক্ত জীবনোল্লাস বা বিশ্বসভ্যতার তালে তালে অগ্রগমন—যে স্পর্দ্ধাই আমরা করি না কেন, যে কেহ একটু ভাবিয়া দেখিবেন, তিনিই বুঝিবেন, আজ চারিদিকে বাঙ্গালীজীবনের সর্ব্বস্তরে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে, যে নির্জ্জীবতা ও অবসাদ, মস্তিষ্কবিকৃতি ও চরিত্রহীনতা, বিলাসিতা ও ও চালাকি প্রকট হইয়া উঠিতেছে—তাহা নব প্রভাতের অরুণিমা নয়, আসন্নসন্ধ্যার রক্তরাগ।

*　　　　　　*

সাহিত্যে এই আধুনিকতার সূত্রপাত হইয়াছে—উনবিংশ শতাব্দীর নব্য বাংলা সাহিত্যের প্রভাব ক্ষীণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। এ প্রভাব ক্ষীণ হওয়ার কারণ সহজেই অনুমেয়। যে ভাবকল্পনা ও রূপপিপাসা সে সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছিল তাহা রক্ষা করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িল—জীবনযাত্রায় জাতীয় আদর্শচ্যুতি, দেহমনের স্বাস্থ্যহানি এবং জীবন ধারণের পক্ষে নানা প্রতিকূল অবস্থা আমাদের প্রাণ-শক্তি অপহরণ করিল ; যে শক্তির বলে আদুলগায়ে ধুলামাটির উপরে বসিয়াও আমরা উচ্চ আদর্শ, উচ্চ চিন্তা এবং উৎকৃষ্ট কাব্যরসের নিশ্চিন্ত উপভোগ হইতে বঞ্চিত হই নাই, সেই শক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিল ; আমরা কতকটা

স্বখাত সলিলে ডুবিতে আরম্ভ করিলাম। আধুনিক য়ুরোপীয় সাহিত্যের উৎকট আদর্শও আমাদের রসবোধকে অনেক পরিমাণে বিপন্ন করিয়াছে। সে সাহিত্যের রসকল্পনাহীন মানস-ব্যায়াম, অথবা সূক্ষ্ম মনোবিলাস, আমাদের অলস অবসাদগ্রস্ত অসুস্থ চিত্তের পক্ষে উপাদেয় হইয়া উঠিল। য়ুরোপীয় জীবনে যাহা বাস্তব, যাহা সত্যকার মন্থনোদ্ভূত গরল—আমাদের দুর্ব্বল হৃদয়মনের, স্বল্পসুখকাতর সমাজের পক্ষে, তাহাই একপ্রকার ভাব-বিদ্রোহের পরিপোষক হইল। ইহার অন্তরালেও একটা গূঢ়তর কারণ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। যে সামাজিক মনোভাব বা জাতীয় সংঘবুদ্ধি আমাদের দেশে কখনও রাষ্ট্রীয়চেতনার দ্বারা পরিপুষ্ট হয় নাই, একটা ধর্ম্মনৈতিক আদর্শই যাহাকে এতকাল সংস্কারের মত পালন করিয়াছিল, সেই সংঘবুদ্ধি যখন আর টিঁকিল না, তখন তাহার পরিবর্ত্তে আমরা যে য়ুরোপীয় আদর্শের দোহাই দিতে লাগিলাম, তাহা আমাদের জীবনে কখনও সত্য হইয়া উঠে নাই। সমাজ গেল, একান্নবর্ত্তী পরিবারও গেল—ব্যক্তিগত সুখচর্য্যা ছাড়া জীবনে আর কোনও কর্ত্তব্য-নীতির শাসন রহিল না; রহিল কেবল আত্মসুখসাধনা ও প্রাণহীন ভাব-বিলাস।

* *

এ অবস্থা, আর যাহাই হোক, স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়;—সমষ্টিজীবনের মহত্তর অনুপ্রাণনায় ব্যষ্টিজীবনের যে সুস্থ স্বাভাবিক বিকাশ, তাহা যদি লোপ পায়, তবে সত্যকার সাহিত্য-রস-পিপাসা কেমন করিয়া সম্ভব হয়? সত্যকার রসিকতা বা রসবোধ জীবন-ধর্ম্মেরই অন্তর্গত—ভাব-বিলাস রসিকতা নহে। যাহা জীবনে অনুভব করি না,—জীবনেরই গূঢ়-গভীর গহনতলে, অন্ধকার আকাশে বিদ্যুদ্দীপ্তির মত, যাহাকে কখনও আভাসেও অনুমান করি নাই, সাহিত্যে তাহার রস-রূপ-উদ্ভাবন

করিব কিরূপে? জীবনের সহিত সম্বন্ধহীন হইলেই, রস, আস্বাদনের পরিবর্ত্তে, একটা মনোবিলাসের বস্তু হইয়া দাঁড়ায়। ঠিক এমনই অবস্থায় বাংলাসাহিত্যে এমন এক প্রতিভার আবির্ভাব হইল যাহার অলোক-সামান্য কাব্য-কল্পনায় বাঙ্গালীর রসবোধে অতি-সূক্ষ্ম ভাববিলাস ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা হইল। এ আদর্শের সাধনায় অতীত ও বর্ত্তমান সকল চিন্তাই তুচ্ছ হইয়া যায়, একটা সার্ব্বভৌমিক রসতত্ত্বের আশ্রয়ে ব্যক্তির ভাব-মুক্তি ও সমষ্টির মোক্ষলাভ হয়। সেই পরম তত্ত্বের সৌন্দর্য্যধ্যানে, যাহা নিকট ও প্রত্যক্ষ, তাহা একটি নিত্য-সুদূর মহা-মহিমার তুলনায় তুচ্ছ হইয়া যায়; বাস্তবজগতের কর্কশতা ও সমাজ-জীবনের মূঢ়তার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আদর্শের সাধনা বা আত্মরতির আনন্দই পরম আশ্বাসের কারণ হয়। নব্য বাংলাসাহিত্যের প্রথম যুগে আমরা জীবন ও জগৎকেই একটা মহত্তর আদর্শ-কল্পনায় মণ্ডিত করিয়া প্রাণের পিপাসা মিটাইয়াছিলাম; আধুনিক কালে, প্রাণের পিপাসা মিটাইবার প্রয়োজনই যেন আর নাই; জীবনকে ফাঁকি দিবার এবং সেই সঙ্গে রসকে মনোবিলাসের আড়ালে ঢাকা দিবার যে প্রবৃত্তি এ অবস্থায় অবশ্যম্ভাবী, তাহার পক্ষে রবীন্দ্র-সাহিত্যের এই প্ররোচনা বড়ই কাজে লাগিয়াছে; তাহার প্রভাবে বাংলার তথাকথিত শিক্ষিত সমাজে 'কাল্‌চার' নামক যে বস্তুটির আদর দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে, তাহার নাম 'কৃষ্টি', 'সংস্কৃতি' বা 'পরিশীলন'—যাহাই হউক, তাহা জীবনধর্ম্মবর্জ্জিত, আত্মপরায়ণ ভাবসর্ব্বস্বতা ভিন্ন আর কিছুই নহে, দোষে ও গুণে বাঙ্গালীজাতির যে বৈশিষ্ট্য ছিল, যাহা তাহার জীবন-ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত শক্তিরূপে সমাজে, ধর্ম্মে, উৎসবে, ব্যসনে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, এই 'কাল্‌চার' সেই শক্তির পরাভবের প্রমাণ।

* *

আধুনিক বাঙ্গালী-জীবনে রবীন্দ্র-প্রতিভা এই পরিমাণ কল্যাণ সাধন করিয়াছে। মাটি প্রস্তুত ছিল বলিয়াই এইরূপ আশাতীত ফললাভ হইয়াছে। এজন্য রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভাকে দায়ী করা যায় না—দুর্ভাগ্য দেশের, দুর্ভাগ্য কালের। দেশ ও কালকে অতিক্রম করিয়াই যে প্রতিভা সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, তাহাকে দেশ ও কালের শাসনে বদ্ধ করিবার কথাই উঠিতে পারে না। রবীন্দ্র-সাহিত্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যে নির্ভীক কল্পনা, যে গভীর ভাবুকতা অপূর্ব্ব সৃষ্টি-সুষমায় মণ্ডিত হইয়াছে তাহার মূল্যবিচার বর্ত্তমানে নিষ্প্রয়োজন। বাঙ্গালী সে দিক দিয়া আকৃষ্ট হয় নাই; সে মূল্য বুঝিতে চায় না; পারিবেও না। তাহার মধ্যে যে বস্তু-সমস্যাহীন ভাব-সঙ্গীত আছে—যাহার মোহে দেশ জাতি ও সমাজের দায়িত্ব বিস্মৃত হইয়া, স্বয়ম্ভু ও স্বয়ম্প্রধান হইয়া আত্মরতির রস উপভোগ করা যায়, তাহাই তাহার উপাস্য। ভাষা ও ছন্দের যে সুর-সুষমা তাহার গদ্যের অর্থকে এবং পদ্যের বস্তুকে অতিক্রম করিয়া অবশ স্নায়ুমণ্ডলকে সুখ-পীড়িত করে, রবীন্দ্র-কাব্য-প্রীতির মূলে অধিকাংশ স্থলে তাহার অধিক কোন উপলব্ধি নাই। কিন্তু এই সকলের মধ্য দিয়া যে একটি বাণী বা ভাবনা-নীতি অলক্ষ্যসঞ্চারে বহুরূপে ও বহুভঙ্গিতে বাঙ্গালীচিত্তে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে পূর্ব্বে বলিয়াছি। ১৯০৫ হইতে ১৯২৫ পর্য্যন্ত, মোটামুটি এই বিশ বৎসর বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্র-প্রভাবের যুগ; এই যুগই অতি-আধুনিকের পূর্ব্বযুগ, ও তাহার উদ্যোগপর্ব্বের কাল। অর্থাৎ, যাহাকে অতি-আধুনিক বলা যায়, সর্ব্বসাধারণের মধ্যে তাহার অনুকূল মনোভাব যেমন নানা কারণে পূর্ব্ব হইতেই গড়িয়া উঠিতেছিল, তেমনই সাহিত্য-ক্ষেত্রে, রবীন্দ্র-প্রতিভার গৌণ ও বিকৃত প্রভাবের ফলে সুস্থ রসবোধের

অভাব, এবং অলস ব্যক্তি-অভিমান তলে তলে বৃদ্ধি পাইয়া অবশেষে প্রকট হইয়া উঠিল।

*　　　　*

রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রভাবের কথা বলিয়াছি, তাঁহার ব্যক্তিপ্রভাবের কথা পরে বলিব। আমি জানি, আধুনিককালের 'কাল্‌চার' বিলাসীরা এবম্বিধ আলোচনার পক্ষপাতী নয়—এরূপ সিদ্ধান্তে আদৌ শ্রদ্ধাবান নয়। যাঁহারা অতি-আধুনিক সাহিত্যের অনুরাগী, অথবা নিজেরাও তাহার প্রতিষ্ঠাকল্পে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা যে যুক্তির আশ্রয় লইবেন তাহাও জানি। সর্ব্ববিধ ব্যভিচার, পাপাচার ও মিথ্যাভাষণের মূলে আছে ঐকান্তিক অক্ষমতা ও আত্মাভিমান—তাহার পক্ষে কৈফিয়ৎ সৃষ্টি করাই একমাত্র ক্ষমতার পরিচয়। আমি রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ প্রতিভাকে দায়ী করি নাই; আমার বক্তব্য এই যে, আমরা একালের বাঙ্গালী, সে প্রতিভার মুখ্যফলে লাভবান হই নাই; দেশ কালের দোষে তাহার গৌণ ফলটাই বড় হইয়া উঠিয়াছে। অতিশয় দুর্ব্বল, দিনদিন অধিকতর পরাজিত এই জাতি যদি নির্ব্বিশেষে ভূমার ব্যোম-পাথারে সন্তরণ করিবার পটুতা দাবী করে—কবি রবীন্দ্রনাথের যে জীবন, সেই জীবনের আদর্শকে আত্মসাৎ করিবার ভাণ করে, তবে তাহা কি সত্য? তবু যে সেই আদর্শে আকৃষ্ট হয় তাহার কারণ কি? সে আপনার জাতি-জন্ম বিস্মৃত হইয়া সর্ব্ব-দায়িত্ব-মুক্তির এক অভিনব রস-পন্থা অন্বেষণ করিতেছে। যে কাব্যে ভাব প্রায় বস্তুহীন, যাহাতে অর্থ অপেক্ষা সুরের প্ররোচনা অধিক, যাহাকে জীবনের দিক দিয়া বুঝিবার প্রয়োজন হয় না, অথবা যাহাকে বুঝিতে পারিলে একটি ভাব-স্বর্গে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করা যায়—সে তাহাকেই বরণ করিতে

উৎসুক। কোথায় রবীন্দ্রনাথের বিশ্বগ্রাসী আত্মভাবসাধনা—বহির্জগতের উপর দুর্দ্ধর্ষ দুর্ব্বার আত্ম-প্রতিষ্ঠা, আর কোথায় তাহারই অনুভাবনায় আত্মভ্রষ্ট আত্মভীত, দেহ-দুর্ব্বল মনোবিলাসীর আশ্রয় সন্ধান!

*　　　　*

এই দিশাহীন, আশাহীন চরিত্রহীন জীবনে যে সাহিত্য উপাদেয় হইয়া উঠিতেছে তাহার কয়েকটি প্রধান লক্ষণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। প্রথমতঃ, ইহাতে স্বর নাই, আছে গোঙানি ও চীৎকার; গোঙানির নাম Realism, এবং চীৎকারের নাম ব্যক্তিত্ব ঘোষণা। এই চীৎকারের বাক্য-অংশ য়ুরোপ হইতে ধার করা—ভাষা ও অর্থ দুই-ই! ইহার আস্বাদনীয় অংশ যদি কিছু থাকে, তাহা কটু ও ঝাল, মধুর না হওয়াই তাহার গৌরব; কারণ তাহা শুষ্ক জীবন-পল্বলের নীরস পঙ্ক; তাহা যে পরিমাণে কঠিন, সেই পরিমাণে সত্য; যে পাঠকের পক্ষে তাহা দুর্গন্ধ বা বমনোত্তেজক সে হতভাগ্যের জীবনী-শক্তি ক্ষীণ হইয়াছে বুঝিতে হইতে হইবে! বাঙ্গালীর জীবনে যাহা সম্পূর্ণ অপরিচিত, যাহা বিজাতীয় বলিয়াই অবাস্তব, তাহারই অপরিপাক-জনিত উদ্গার এ-সাহিত্যের মৌলিকতা। স্বজাতির জীবনোদ্ভূত রস-কল্পনার পরিবর্ত্তে, বিজাতির সমাজে আধুনিক কালে যে জীবন সংগ্রাম চলিতেছে তাহারই ঘর্ম্ম-ক্লেদ ও দুর্ভাবনার উত্তাপকে অতিসুলভ কল্পনায় আত্মসাৎ করিবার ভাণ এবং তাহারই আস্ফালন এ সাহিত্যের প্রধান কৃতিত্ব। অর্থাৎ নিজেদের জীবন-চেতনা যখন লোপ পাইতেছে তখন দেহে hot bottle-এর সাহায্যে উত্তাপরক্ষার চেষ্টা হইতেছে। জীবনের অগ্নিহোত্রে য়ুরোপ যে হবিঃ ও ইন্ধন তাহার সুগোপন

অগ্নিগৃহে সঞ্চয় করিতেছে, যে যজ্ঞে আমাদের অধিকার নাই, যে অগ্নি আমাদের দেহ-মনের অগোচর, তাহারই বহিরুৎক্ষিপ্ত স্ফুলিঙ্গ ও ধূমরাশি আহরণ করিয়া এখানকার প্রেতভূমিতে ভৌতিক উপদ্রব চলিতেছে। যাহাকে চিরদিন রসিকসমাজ রস বলিয়া উপভোগ করিয়াছে সে বস্তুর দাবী করাই মূঢ়তা,—তাহা বাস্তবধর্ম্মী সত্যপন্থী বীর-বিদ্রোহীর উপযুক্ত নয়। এ পর্য্যন্ত মানুষ যাহা কিছু তপস্যার বলে লাভ করিয়াছে, সত্য ও সৌন্দর্য্যের যে আদর্শ সমাজে ও ব্যক্তিজীবনে পূজার্হ বলিয়া মনে করিয়াছে, যাহার অনুপ্রাণনায় মানুষ আপনার ক্ষুদ্রতা ও অক্ষমতায় নিরতিশয় লজ্জা পাইয়াছে এবং যাহাকে সাধন-মন্ত্ররূপে আশ্রয় করিয়া নরজন্ম সার্থক করিবার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছে—এই অতি-আধুনিকেরা তাহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা ভয় করে, কারণ সে আদর্শ ধর্ম্ম বা আত্মিক শক্তির অপেক্ষা রাখে—পরাজয়ে লজ্জা এবং জয়লাভে আত্মপ্রসাদ দাবী করে। এজন্য এ সাহিত্যের যাহা ভাববস্তু, তাহা জীবনাবেগ-প্রসূত নয়। তাহা মুমূর্ষুর চিত্তবিকার জনিত প্রলাপ-উচ্ছ্বাস; তাহাতে রস নাই—আছে কতকগুলি উক্তির আস্ফালন; সে উক্তির বাক্যগত অভিপ্রায় পরস্ব, তাহার আবেগ দুর্ব্বলদেহে কম্পজ্বরের মত।

*   *

অতি-আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তের অকাট্য প্রমাণ ইহার ভাষা। অতি-আধুনিকেরা যে ভাষায় সাহিত্য রচনা করে তাহার কোনও জাতি নাই। সকল ভাষার মত বাংলা ভাষারও যে একটি নিজস্ব রীতি-প্রকৃতি আছে, যাহাকে আশ্রয় করিয়া ভাষার জীবন-রক্ষা হয়, তাহার প্রাণ-স্পন্দনের সেই গূঢ় ভঙ্গিটিকে ইহারা খুঁজিয়া

পায় না, ভাষাকে জড়যন্ত্রের মত ব্যবহার করে। ভাব ও অর্থ যেন শব্দের ঢেলা ভাঙ্গিয়া চলিয়াছে, কোনও একটা idiom-এর বালাই নাই। বিভিন্ন প্রাদেশিক রীতির অপূর্ব্ব মিশ্রণ, শব্দ ও বচনের অপপ্রয়োগ, সংস্কৃত সন্ধি-সমাসের অসংস্কৃত ভ্রূকুটি, এবং সর্ব্বোপরি ইংরেজী idiomএর অনুকরণে বাংলা শব্দযোজনা—ইহাদের ভাষাকে যে মূর্ত্তিদান করিয়াছে, তাহা যেমন কৃত্রিম তেমনই বিকট। এ ভাষা দেখিয়া মনে হয়, ইহারা কোনও ভাষার ধর্ম্মই মানে না—স্তিমিত প্রাণশক্তির ব্যভিচার-স্পৃহা ইহাদের ভাষাতেও পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ভাষার এই রীতি-ভ্রংশই জাতির মৃত্যু সূচনা করে। প্রতিভাশালী লেখকের ভাষার যে স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়—এ ভাষার স্বপক্ষে সে দৃষ্টান্ত হাস্যকর ও নিরর্থক। শক্তিমান লেখকের দ্বারা ভাষা ভগ্ন বিকল বা জখম হয় না বরং ভাষার প্রকৃতরূপ নানা ভঙ্গিতে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ভাষার যে স্বরূপ প্রথমে বীজ অবস্থায় অপ্রত্যক্ষ থাকে, তাহাকেই সুবিকশিত করা প্রতিভার কাজ। প্রতিভার স্পর্শেই ভাষার রূপ আরও বিশিষ্ট হইয়া উঠে ভ্রূণ অবস্থা হইতে ভাষা যেন সাহিত্যে ভূমিষ্ঠ হয় এবং প্রতিভাশালী লেখক পরম্পরার সাহায্যে তাহার যে আকৃতি সুনির্দ্দিষ্ট হইয়া উঠে, তাহা কখনও পরিবর্ত্তিত হয় না, পরিবর্দ্ধিত হয় মাত্র। ভাষার সেই বীজ-প্রকৃতিকে উপেক্ষা করিবার শক্তি কোনও লেখকের নাই—ইহাকে আবিষ্কার করিয়া এবং দৃঢ়ভাবে আত্মসাৎ করিয়াই ব্যক্তিগত রীতি-স্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। ভাষার প্রকৃতিগত এই নিয়মকে লঙ্ঘন করিয়া যে লেখক মৌলিকতা জাহির করিবার চেষ্টা করে সে শক্তিমান নয়, শক্তিহীন—তাহার নিজের জীবন ব্যাধিগ্রস্ত বলিয়া সে ভাষার জীবনে নিজ জীবন যুক্ত করিতে পারে নাই—বাগ্দেবতাকে সে বশ করিতে পারে নাই। ভাষার সে নবত্ব একটা রীতি কিম্বা Style

নয় ; কুব্জ খঞ্জ প্রভৃতি বিকলাঙ্গ মানুষের চেহারা যেমন, ইহাদের ভাষার সেই ভঙ্গি একটা style নয়—বিকৃতির লক্ষণ।

* *

সর্ব্বাপেক্ষা সংশয়ের বিষয় হইয়াছে এই যে, ঠিক যেকালে আমরা বাঁচিবার জন্য, জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছি, ঠিক সেই কালেই আমাদের সাহিত্যে ও ভাষায় এই আত্মিক শক্তি-লোপের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। আমরা যদি এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিই যে, নবসৃষ্টির জন্য যেমন পুরাতন সব কিছুকেই ভাঙ্গিয়া গড়িবার প্রয়োজন হয় তেমনি ভাষাকে নূতন করিয়া গড়িবার জন্য আমরা তাহার সকল বন্ধন শিথিল করিয়াছি, তবে তার মত আত্ম-প্রবঞ্চনা আর নাই। ভাষা সম্বন্ধে এ-কথা খাটে না ; কারণ সাহিত্যে ভাঙ্গনের আবেগ যথেষ্ট পরিমাণে প্রকাশ পাইলেও, সাহিত্য-কর্ম্মটাই একটা সৃষ্টি, ভগ্নস্তূপ নয় ; এবং ভাষা সেই সৃষ্টির মূলাধার—লেখকের শক্তি ও প্রতিভার, এক কথায় আত্মার ছাপ পড়ে, তাহার ভাষায়। ভাষাকে ভাঙ্গিয়া ফেলার অর্থ নিজেই ভাঙ্গিয়া যাওয়া। গত শতাব্দীতে রাশিয়া যে অবস্থার মধ্যে এবং তাহারই তাড়নায়, যে সাহিত্য জন্মলাভ করিয়াছে তাহাতে রুশ জাতির নব-জন্মের পরিচয় আছে ; ভাঙ্গনের আবেগ সাহিত্যে সৃষ্টি-প্রেরণা হইয়া উঠিয়াছে—সে জাতির প্রতিভা যেন নীলকণ্ঠ হইয়াই অমৃত বণ্টন করিয়াছে। সে জাতি যে ভাঙ্গিবার আবেগে আপনাকে ভাঙ্গে নাই—সে যে বাঁচিবার শক্তি হারায় নাই, সে যুগের সাহিত্য-সৃষ্টিতে তাহার প্রমাণ আছে। এই নবজন্মের লক্ষণ আমাদের বিগত শতাব্দীর সাহিত্যে কিছু আছে, যদিও এ দেশের তদানীন্তন অবস্থায় সে জীবন কল্পনা ও ভাবুকতাকে আশ্রয় করিয়াছিল। তথাপি সে

সাহিত্যের ভাষায় ও ভাব-কল্পনায় সুস্থ আত্মচেতনার পরিচয় আছে; আজিকার সাহিত্যের মত তাহাতে পঙ্গুতার আস্ফালন, দুর্ব্বল কাম-কল্পনার বিলাস বা বিজাতীয় ভঙ্গির ভাষায় বিজাতীয় ভাব-সাধনার গৌরব ঘোষণা ছিল না। এক্ষণে ভাষার যে অবস্থা হইয়াছে তাহাতে সুবিখ্যাত ইংরেজ মনীষী জন মল্টার নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলি স্মরণযোগ্য।

'Let the words of a country be in part unhandsome and offensive in themselves, in part debased by wear and wrongly uttered, and what do they declare, but by no light indication, that the inhabitants of that country are an indolent, idly-yawning race, with mind already—long prepared for any amount of servility? On the other hand, we have never heard that any empire, any state did not at least flourish in a middling degree as long as its own liking and care for its language lasted.'

* *

পূর্ব্বে বলিয়াছি, রবীন্দ্র-প্রতিভার অতিশয় সহজলভ্য ফলস্বরূপ আমরা কিরূপ কাল্‌চারের অধিকারী হইয়াছি, আমাদের সাহিত্যিক রসবোধও কেমন তুরীয়-মার্গে পৌছিয়াছে। কিন্তু, কেবল এই কবি-প্রভাবই নয়, রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি-প্রভাবও, অর্থাৎ সাহিত্যের নীতি-নির্ণয়ে ব্যক্তিগতভাবে এবং ব্যক্তিগত সাহিত্যিক সম্পর্কে, বিশেষতঃ শেষের দিকে, তিনি যে আদর্শ সমর্থন করিয়াছেন—তাহাও এই অতি-আধুনিক সাহিত্যের স্বৈরাচারকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রশ্রয় দিয়াছে। 'সবুজপত্র'-এর সবুজ অভিযান হইতে আজ পর্য্যন্ত তিনি ভাবে, চিন্তায়, উপদেশে ও আচরণে অবুঝের স্পর্দ্ধাকেই প্রাণের স্বাস্থ্য বলিয়া

অভিনন্দিত ও উৎসাহিত করিয়াছেন। অতিশয় চপল, অপরিণতবুদ্ধি যুবকসম্প্রদায়ের মধ্যে, মনের উপর কোনও নীতি, কোনও শাস্ত্র, কোনও সংস্কারের কর্তৃত্ব অস্বীকার করিয়া, প্রাণকে কেবল লতা-পুষ্পের মত প্রাকৃতিক প্রভাবের মধ্যে মেলিয়া ধরার একটা অতিশয় unmoral আদর্শের প্রতিষ্ঠায় তিনি বহুদিন যাবৎ ব্যাপৃত আছেন; কেবল যুবক-গণের সাহিত্য-সাধনায় নয়, বালক ও কিশোরদিগের শিক্ষাপদ্ধতিও তিনি এই আদর্শে সংস্কার করিবার পক্ষপাতী। নিজে প্রতিভার দৈবীশক্তিবলে যে শাসন তিনি কখনও মানিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই—বাহিরের সমাজকে জাতির বাস্তব জীবন-প্রয়োজনকে উপেক্ষা করিয়া যে আত্মরতির সাধনায় তিনি কাব্যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন—সেই বিপদজনক জীবন-নীতিকে ভাব-কল্পনার ক্ষেত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া তিনি আপামরসাধারণ বাঙ্গালী নর-নারীর আদর্শরূপে প্রবর্ত্তিত করিবার অভিলাষী। ইহার কারণ, জগৎময় তিনি আপনাকেই দেখেন, তাই পরের কল্যাণ-পন্থাকে পৃথক মনে করিতে পারেন না। এই জন্যই বোধ হয়, রবীন্দ্রনাথ জাতি-ভাব বা nationalism-এর বিরোধী, তিনি ব্যক্তি-ভাবের দ্বারা অন্ধ বলিয়াই, সমষ্টিগত সত্তার মূল্য বুঝেন না। তাই রবীন্দ্রনাথ, নীতির যে উচ্চ আদর্শ, প্রীতির যে সূক্ষ্ম বিভাবনা এবং শ্রুতি-স্মৃতির যে নূতন অর্থবাদ প্রচার করিতেছেন, তাহা সর্ব্বনীতি, সর্ব্বপ্রীতি ও সর্ব্বস্মৃতির negation; ভাবের জগতে তাহা যেমন মহা-সত্য, বস্তুর জগতে তাহা তেমনই মহা মিথ্যা। এই অতি উচ্চ ভাবের নাস্তিক্য-নীতির অনুসরণে তিনি আধুনিক সাহিত্যক্ষেত্রেও অরাজকতার বীজ বপন করিয়াছেন। 'ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ, ওরে আমার কাঁচা' বলিয়া একদা যাহাদিগকে তিনি 'পুচ্ছটি উচ্চে তুলিয়া নাচিবার' জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহারা সে আহ্বান অগ্রাহ্য করিতে পারে নাই,

কারণ, পুচ্ছছাড়া তাহাদের অন্য সম্বল ছিল না। আজ তাহাদেরই পুচ্ছতাড়নায় বঙ্গ-সরস্বতী অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন।

* *

এই স্বৈরাচার-নীতিকে উচ্চ আদর্শে শোধন করিয়া প্রচার করা ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ চিরদিন তাঁহার ব্যক্তিগত সাহিত্যিক জীবনে আর একটি নীতি পালন করিয়াছেন, তাহারও ফল সাহিত্যক্ষেত্রে কম বিষময় হয় নাই। তিনি চিরদিন নবীনতা ও তারুণ্যের পক্ষপাতী,—এ পক্ষপাত কেবল ভাববিশেষের প্রতি নয়, বস্তুগত পক্ষপাত; নবীন ও তরুণ যাহারা, তাহাদের সহিত মেলা-মেশা করিতে তাঁহার কোনও কুণ্ঠা নাই—নিজের অপরাজেয় চির-তারুণ্যের এই লক্ষণ তাঁহার গর্ব্বের বস্তু। ইহার আরও একটা কারণ বোধ হয় এই যে, বাংলা দেশে যে রসিকতার অভাবে তিনি তাঁহার প্রাপ্য কবিযশ কখনও পুরাপূরি পান নাই—প্রায় তিন পুরুষ ধরিয়া এক শ্রেণীর তরুণ তাঁহার কাব্য ও ব্যক্তিত্বের মোহিনী শক্তি স্বীকার করিয়া সেই রসিকতার অভাব পূরণ করিয়াছে। তাহাদের বয়স এমন যে তাহারা মুগ্ধ হইয়াই কৃতার্থ হয়, কোনও প্রশ্ন করে না, করিতে দেয় না। আলাপে পরিচয়ে, পত্র-ব্যবহারে তিনি যত অপরিণত বুদ্ধি, প্রতিভালেশহীন সাহিত্যাভিমানী ছোকরার দলকে তাহাদের এই মুগ্ধ হওয়ার বিনিময়ে যেরূপ প্রশ্রয় দিয়াছেন, তাহাতে বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্র নানা কীটপতঙ্গের আত্মশ্লাঘাগুঞ্জনে ভরিয়া উঠিয়াছে—রবীন্দ্রনাথের মত মহাকবির সঙ্গে সাহিত্যিক মৈত্রীর স্পর্দ্ধায়, তাঁহার শিষ্যত্ব-গৌরবে, অতিশয় অক্ষম ব্যক্তিও সাহিত্যস্রষ্টা বা সাহিত্যের সমজদার বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। অপেক্ষাকৃত অন্তরঙ্গ ভক্তগণকে, তাহাদের সুস্পষ্ট অক্ষমতা সত্ত্বেও, নানা প্রকারে সমসাময়িক

সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে তিনি দ্বিধা বোধ করেন নাই। রবীন্দ্রনাথের এ আচরণের মূলে যে মনোবৃত্তি আছে তাহা যতই নির্দোষ হউক—তিনি যে একটা নিতান্তই ব্যক্তিগত অভাব বা আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য, আত্মমর্য্যাদার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন, শস্যক্ষেত্রে ফসলের চর্চ্চাকে কাঁটাগাছের স্পর্দ্ধার দ্বারা অবমানিত' হইতে সাহায্য করিয়াছেন, তাহা আজ কেহ স্বীকার করিতেও সাহস পাইবে না জানি, কিন্তু আশা করি, বাংলা সাহিত্যের এ যুগের এই অরাজকতার কারণ-নির্ণয়ে ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক ইহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না। তিনি যে 'সবুজ-অবুঝ'দের পুচ্ছ নাচাইতেই উৎসাহিত করিয়াছেন তাহা নয়—সে পুচ্ছের স্ফীতি সম্পাদনেও যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন।

*

সাহিত্যের যে আদর্শ রবীন্দ্রনাথ এককালে ব্রতী তপস্বীর মত রক্ষা করিয়াছিলেন, বাংলা সাহিত্যে উৎকৃষ্ট সমালোচনা রীতিও প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, শেষে সে আদর্শের সংযম ত্যাগ করিয়া, প্রতিভাকে সৃষ্টিকার্য্য হইতে অবসর দিয়া, তিনি তাহাকে যে আত্ম-বিনোদনের লীলা-খেলায় নিয়োগ করিলেন, তাহার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার ভাষার নূতনতর প্রবৃত্তির মধ্যে। তিনি ক্রমশঃ ভাষার আর্য রীতি ত্যাগ করিয়া বৈঠকী-রীতি আশ্রয় করিলেন; এ রীতির সঙ্গে তাঁহার পরবর্ত্তী মনন-ভঙ্গীর যথেষ্ট সঙ্গতি আছে। শক্তিমানের লীলাখেলাও সুন্দর; কিন্তু বাংলা ভাষা তাঁহার অনুকরণে এই নূতন রীতির চর্চ্চায় যাহা হারাইল তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিবার অবকাশ আজও হয় নাই। কবি-যাদুকর নূতন নূতন ভেল্কি দেখাইতে লাগিলেন, ভাবের অবাস্তব মনোহারিত্বে ও শব্দবিন্যাসের কুহকে ভাষার কৌলীন্য-সংস্কার দূর হইল। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্য-কীর্ত্তির মূল্য বিচার করিলে দেখা যাইবে,

তাঁহার সৃষ্টিশক্তির পরাকাষ্ঠা হইয়াছে যে ভাষায়,—পদ্যের যে ছন্দে ও গদ্যের যে রীতিতে তাঁহার প্রতিভা মধ্যাহ্ন-দীপ্তি লাভ করিয়াছে, তাহাই বাংলাসাহিত্যকে মহিমময়ী সম্রাজ্ঞীর প্রৌঢ়-শ্রী দান করিয়াছে। সে সৃষ্টিশক্তি বুঝি আর তাঁহার নাই, তাই তাঁহার ভাষার এই অধুনাতন ভঙ্গী সে প্রতিভার জরতী-বেশ ঢাকিবার একটা কৌশল মাত্র। কিন্তু ভাষার এ রীতিতেও প্রতিভার যে শেষ প্রভা বিস্ফুরিত হইয়াছে অন্যের পক্ষে তাহা দুর্ল্লভ হইলেও, এ ভাষা 'চলতি' না হইয়া পারে না, এ ভাষায় শুইয়া গড়াইয়া হাই তুলিয়া কলম চালানো যায়—ভাব-অর্থহীন কলকাকলী, কল্পনাহীন মস্তিষ্ক-কণ্ডূয়ন ও বিদ্যাবিহীন বাচালতার পক্ষে এ ভাষা বড়ই উপযোগী। এই ভাষার খনিত্রযোগেই অতি-আধুনিকতার পয়ঃপ্রণালী প্রশস্ত হইয়া উঠিয়াছে।

* *

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ইহাতেই ক্ষান্ত হন নাই। অতি-আধুনিক সাহিত্যে লেখকদিগের ভাষার অক্ষম ব্যভিচার লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সাধ হইল. ভাষার জাতিনাশ করিতে হইলে কেমন করিয়া তাহা শক্তিসহকারে ভালো করিয়া করিতে হয়, তাহাই দেখাইবেন। শক্তির অভাবে তরুণেরা যাহাকে আঁচড়াইয়া খামচাইয়া নাক-কান ছিঁড়িয়া হতশ্রী করিতেছিল, তাহার দেহটাই মুচড়াইয়া মট্‌কাইয়া, একেবারে তাহার নাম ভুলাইবার জন্য রবীন্দ্রনাথ নিজের দারুণ তারুণ্য প্রমাণ করিলেন 'শেষের কবিতা' নামক অতিশয় চমকপ্রদ গল্পটিতে।! বাংলা ভাষার এ রূপও আমাদের দেখিতে হইল, তাহাও রবীন্দ্রনাথের হাতে! রীতিমত কুস্তিগীর পালোয়ানের মত, এই লেখায় রবীন্দ্রনাথ ভাষার সহিত মল্লক্রীড়া করিয়াছেন। যাহার সম্বন্ধে অপূর্ব্ব সংযম রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার বিশিষ্ট লক্ষণ, তাঁহার শক্তির অন্তর্লীন সুষমা যাহার মধ্যে

চির-প্রকাশ, অকাল-তারুণ্যের তাড়নায় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বৃদ্ধ বয়সে সেই ভাষার যে দুর্দ্দশা করিলেন তাহাতে আমরা শুধুই লজ্জা পাই নাই, ত্রাসযুক্ত হইয়াছিলাম। অতি-আধুনিকতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মত বাণী-সাধকের এই পাল্লা দেওয়ার চেষ্টায় আমরা বুঝিয়াছিলাম এ ভাষার আর নিস্তার নাই, যেটুকু বাকী ছিল রবীন্দ্রনাথই তাহা শেষ করিয়া যাইবেন। 'শেষের কবিতা' পড়িলে ইহাই মনে হয় যে, অতি-আধুনিকতার চরমসিদ্ধিকে আগাইয়া আনিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রতিভার শেষ শক্তিটুকু নিঃশেষে ব্যয় করিতে চাহিয়াছেন। ভাষা ও ভাবের যে বিজাতীয়তা তরুণেরা রসকল্পনার দ্বারা আয়ত্ত করিতে পারিতেছেন না, সেই বিজাতীয় মনোবৃত্তি ও অনুকরণমূলক কাল্‌চারকে একটা জীবিত-রূপ দিবার জন্য তিনি যে কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন তাহা তাঁহার মত কবিরই আয়ত্ত; এবং ভাষাকে অনুরূপ গতি দিবার জন্য তিনি যে বলপ্রয়োগ করিয়াছেন তাহাও আর কাহারও পক্ষে সম্ভব হইত না। শক্তির prostitution-এর কথা আমরা শুনিয়া থাকি, কিন্তু এত বড় শক্তির এতখানি আত্মবিস্মৃতি আমরা স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই। 'শেষের কবিতা' সর্ব্বপ্রকারেই অতি-আধুনিকতার জয়-ধ্বনি; এই একখানি পুস্তকের প্রভাব রসাতলযাত্রীদের পক্ষে যথেষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কারণ, ভাবের মদোন্মত্ত হাওয়ায় ভাষার তকমা-তাবিজ ছেঁড়ার এমন ভরসা ও আশ্বাস তাহারা আর কোথায়ও পায় নাই।

* *

বাংলাসাহিত্যে অতি-আধুনিকতার প্রসার ও প্রতিপত্তি বাড়িতেছে, এই কথা ধরিয়া বর্ত্তমান আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলাম: এই অতি-আধুনিকতার সূচনা কবে হইতে, ইহার উৎপত্তি হইয়াছে কোন্ অবস্থার

বশে, এবং ইহার পরিপুষ্টির মূলে, আধুনিক কালের একচ্ছত্র সাহিত্য-সম্রাট রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি-প্রভাব ও কবি-প্রভাব কতখানি, তাহার অতি-সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিলাম। অতি-আধুনিকতার মূলে প্রচ্ছন্ন ও প্রকটভাবে, অজ্ঞানে ও সজ্ঞানে, যে-প্রতিভার বিকৃত প্রেরণা রহিয়াছে, আমার জ্ঞানবিশ্বাস মত তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছি। এ আলোচনায় যে সকল সিদ্ধান্ত আছে তাহা অভ্রান্ত বলিয়া আমিও দাবী করি না; কেবল যে দিকের আলোচনা করিতে কেহ এ পর্য্যন্ত প্রবৃত্ত হন নাই, অথচ যাহা বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য, আমি তাহারি সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ সত্যভাষণের সাহস করিয়াছি। আমার মতে যাহা সত্য বলিয়া মনে হয় তাহা যদি কিয়দংশে, অথবা সর্ব্বাংশেও, অযথার্থ বলিয়া এ সাহিত্যের অপক্ষপাত সমালোচকের মনে হয়, তাহাতে আমার কোনও আপত্তির কারণ নাই। প্রত্যেকেই ব্যক্তিগতভাবে সত্যসন্ধানের অধিকারী। সে সত্য বহুমতসিদ্ধ না হইলেও, প্রত্যেকেরই সত্যসন্ধানে যদি জিজ্ঞাসায় আন্তরিকতা থাকে তবেই ক্রমে সত্যলাভের সম্ভাবনা ঘটে। বাংলা সাহিত্যের এই দুর্দ্দিন যাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, যাঁহারা দেশ জাতি ও সাহিত্যের কল্যাণ কামনা করেন, ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি অনুরাগ বা আনুগত্যের মোহে যাঁহারা বিবেকবুদ্ধির অবমাননা করিতে রাজী নহেন; যাঁহারা বাংলা সাহিত্যের, বাঙ্গালীর জীবন ও বাঙ্গালীর প্রতিভার স্বাস্থ্য কামনা করেন, এবং সে সাহিত্যে ব্যক্তি বা সম্প্রদায়বিশেষের খেয়ালের পরিবর্ত্তে শাশ্বত সারস্বত ধর্ম্মের বিকাশ দেখিতে চান—আমি তাঁহাদেরই দরবারে আমার এই আলোচনা উপস্থিত করিয়াছি। অতি-আধুনিক সাহিত্যের প্রতি সাহিত্যসম্রাট রবীন্দ্রনাথের মনোভাব আর অস্পষ্ট নহে; মধ্যে মধ্যে এ সাহিত্যের

প্রশংসার ফাঁকে ফাঁকে তিনি যে সাবধান-বাণী অথবা কূটবাক্য বসাইয়া দেন তাহাতে কাহারও ভুল বুঝিবার অবকাশ থাকে না। রবীন্দ্রেক-দেবতার উপাসক যাঁহারা, তাঁহারাও এই অতি-আধুনিকতার পক্ষপাতী। ইহার আরও একটা কারণ বোধ হয় এই যে, আজিকার অভিনব কালচারবিলাসী শিক্ষাভিমানী নব্য ইঙ্গ-বঙ্গ এ-সাহিত্যে বাংলা অক্ষরে অতি-আধুনিক বিলাতী ভাব ও ভাষার ভঙ্গী লক্ষ্য করিয়া আশ্বস্ত হইয়াছে। ইহাদের অধিকাংশ বাংলা ভাষা ও বাংলাসাহিত্য বলিতে রবীন্দ্রনাথের আধুনিক রচনাই বোঝে,—যাহার মধ্যে এমন একটি সর্ব্বসংস্কারমুক্তির দীক্ষা আছে যে, বাঙ্গালী বা বাংলা বলিয়া কোনও কিছু মানিবার প্রয়োজন হয় না। তথাপি এই অতি-আধুনিকতার প্রসার সম্বন্ধে সজাগ হইবার প্রয়োজন আছে কি? আমি এ প্রশ্নের উত্তরে কি বলিব, এতখানি আলোচনার পর সে বিষয়ে বোধ হয় কাহারও সন্দেহ নাই। সে উত্তর এই যে, বাঙ্গালী-জাতি যদি মরিতেই বসিয়া থাকে, তবে এই অতি-আধুনিকতার নামই অন্তিমতা; তজ্জন্য ভাবনা করিয়া লাভ নাই। যদি বাঁচে, তবে এই আবর্জ্জনার ভস্মস্তূপ হইতেই তাহার ভাষা ও সাহিত্য নবজন্ম লাভ করিবে—তখন ভাষার স্বপ্রকৃতি ও সাহিত্যের বিশুদ্ধ প্রাণ-প্রেরণা ফিরিয়া আসিবে; কারণ, এ দুইটি কথাও পরস্পর বিযুক্ত হইয়া থাকিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ এই অতি-আধুনিকতার সহিত যে সখ্য স্থাপন করিয়াছেন তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই কেন, সে আলোচনা যতদূর সম্ভব সবিস্তারে করিয়াছি; এজন্য আক্ষেপের কারণ নাই কেন তাহাই বলিয়া এ প্রসঙ্গ শেষ করিব।

* *

রবীন্দ্রনাথ সহসা এতকাল পরে তাঁহার সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে

প্রতিভার পর প্রতিভার আবিষ্কার করিতেছেন, ইহা মনে করিয়া আমাদের নিরতিশয় পুলকিত হইবারই কথা। এতদিন পরে তাঁহার দ্বারা অভিভূত বাংলাসাহিত্যে যে 'স্বকীয়তার' পরিচয় তিনি পাইতেছেন, তাহাতে আশা হয় এতদিনে বাংলাসাহিত্য বুঝি রবিগ্রাসমুক্ত হইল। রবীন্দ্রনাথ এই স্বকীয়তার প্রশংসা করিতে এতই অধীর যে 'খুসী হইয়াছি' এমন কথা বলিলে পাছে মুরুব্বিয়ানার মত শোনায় তাই জোড়হস্তে তাহার জন্য মাফ চাহিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, যাহারা এই অতি-আধুনিক সাহিত্যের বিরুদ্ধ সমালোচনা করে, তাহারা কাঁটা গাছের আবাদ করিয়া উপাদেয় ফসলের হানি করিতেছে বলিয়া ক্ষোভ দুঃখ ও ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রশংসা ও ক্ষোভ প্রকাশের কারণ বোধ হয় এই যে, বাঙ্গালাদেশের একশ্রেণী রসজ্ঞানহীন 'দুর্গত'-গণ ইহাকে আমল দিতে চাহিতেছে না; তাই তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। এ কর্ত্তব্যের প্রয়োজন পূর্ব্বে কখনও হয় নাই, তাঁহার জীবিতকালে বাংলাসাহিত্যে এমন কোনও ছোট, বড় বা মাঝারী প্রতিভার উদয় হয় নাই—যাহাদিগকে প্রকাশ্য অভিনন্দিত ও উৎসাহিত করার কোনও প্রয়োজন ছিল। কারণ তাহাদের প্রতিভার বিরুদ্ধবাদী কোনও প্রতিপক্ষ ছিল না। তাই তাহাদের সম্বন্ধে উদাসীন থাকাই সাহিত্য-রাজচক্রবর্ত্তীর উপযুক্ত হইয়াছিল। বাঙ্গালী জাতির চরিত্র দুর্ব্বল; এদেশ কবির লড়াই ও তর্জ্জার দেশ, তাই এমন উৎকৃষ্ট-বস্তুকেও তাহারা বিদ্বেষ করে। কিন্তু যে শিষ্টতা, শালীনতা ও চারিত্রনিষ্ঠার জন্যই রবীন্দ্রনাথ এহেন সদ্‌বস্তুর প্রশংসা করেন, অথবা কোনও অসদ্‌বস্তুর অপ্রশংসা করিতে কুণ্ঠিত তাহার প্রতি আমাদের কিছুমাত্র লোভ নাই—যেটুকু মোহ ছিল তাহাও অনেকদিন কাটিয়াছে। বাংলাসাহিত্যের যে অবস্থা চোখে

দেখিতেছি তাহার মূলে এই সকল গুণ আছে বলিয়াই আমরা আমাদের ক্ষুদ্রশক্তির প্রাণপণ প্রয়াসে এই নিষ্ঠুরতা ও অশিষ্টতার ধ্বজা তুলিয়াছি। ইহাই আমাদের গর্ব্ব। এদেশ তর্জ্জা ও কবির লড়াই-এর দেশ বলিয়াই অসভ্য ও চরিত্রহীন হইয়াও আমরা এখনও বাঁচিয়া থাকিবার আশা রাখি; সমগ্র বাঙ্গালীজাতি যদি এই ভূমার খেলায় যোগ দিত, তবে সেই তর্জ্জা-কবির লড়াই-রসিক পূর্ব্বপুরুষগণের জলপিণ্ড যে একেবারেই লোপ পাইত! তাই রবীন্দ্রনাথকে সম্বোধন করিয়া আমরা বলি,—হে নটরাজ, তুমি যে তাণ্ডবে মাতিয়াছ তাহাতে যোগ দিবার সামর্থ্য আমাদের নাই। বাঙালীর জাতীয়তা, বাংলাসাহিত্য ও বাংলা ভাষা তুমি ত শেষ করিয়া ছাড়িয়াছ, তোমার আর কোনও দায়িত্বই যে নাই! তুমি এখন খেলায় মাতিয়াছ। যাহা নিজ হাতে গড়িয়াছ তাহাও ভাঙ্গিয়া ফেলিতে তোমার কিছুমাত্র ক্ষোভ নাই। বাঙ্গালী তোমাকে তেমন করিয়া হৃদয় দিয়া বরণ করে নাই, তোমাকে বরণ করিয়াছে বিদেশ—বিশ্ব, তাই কি তুমি আক্রোশবশে বাংলাসাহিত্যের উপর এই ওস্তাদী প্রতিশোধ লইতেছ? না, অভিমানে এই আধুনিকতার কূপে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করিতেছ? আমাদের একমাত্র আশ্বাস এই যে, রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বাংলাসাহিত্য বড়—রবীন্দ্র প্রতিভাতেই তাহার শেষ নয়। ইহা যদি সত্য না হয়, তবে বাংলাসাহিত্য রসাতলে যাক—ক্ষতি কি?

মৃত্যু-মাধুরী

উঠ হিমাদ্রি-প্রায়,
দুঃখসিন্ধু হের গরজিছে
ব্যথাবেদনার লোনাজল উথলায়
ক্রূর নিপীড়নে কম্পিত আজি
ক্ষুব্ধ সাগর-তল,
ধাতব পৃথ্বী বাষ্প-বিকারে
মথিছে সিন্ধুজল।
ওরে লাঞ্ছিত, ভূকম্প-বেগে
উৎসার' আপনায়,
অদ্রি সমান লেহিয়া অভ্র
উঠ নিজ মহিমায়।
জাগ হিমাচল প্রায়।

জাগিয়াছে ভূতনাথ,
আগ্নেয় গিরি উন্মাদ যেন
দিকে দিগন্তে করে অগ্ন্যুৎপাৎ
বিষ্ণুচক্রে হের বরাভয়,
বিদরে অন্ধকার,
মৃত্যুর মাঝে অমৃত-মাধুরী
নেহার চমৎকার!

বক্ষে বক্ষে দেবী-পাদপীঠ
এ নহে অকস্মাৎ,
সতী-শব কাঁধে নটরাজ করে
উন্মাদ পদপাত!
ক্ষিপ্ত প্রমথনাথ।

জাগ্‌রে মানুষ জাগ্,
দেবী-মন্দিরে শিবা-সারমেয়
লেহন করিছে পুণ্য যজ্ঞভাগ!
শকুনি গৃধিনী মন্দিরদ্বারে
প্রহরী সেজেছে আজ,
ভক্ত বাহিরে ক্রন্দন করে,
ভুলিয়াছে ঘৃণা-লাজ;
দেবীর চরণে মন নাই তার,
আপনাতে অনুরাগ,
ভক্ত কি দেহে রক্ত থাকিতে
নাশিবারে দেয় যাগ্!
ওরে অমানুষ জাগ্!

কর্ কর্, সংগ্রাম,
মৃত্যু ক্ষণিক, শাশ্বত জানি'
মহাকাল ভালে অগ্নি-আখরে নাম!
কীটপতঙ্গ বাঁচে তারা, আছে
বাঁচিবার যত দিন,

মানুষই করিতে পারে জীবনেরে
মহৎ অথবা দীন।
জননীর ক্রোড়ে জনমে মানুষ,
ধরা তার বিশ্রাম,
সেই বীর তারে প্রণমি' যাহার
মৃত্যুও অভিরাম!
কর, কর, সংগ্রাম।

আলোড়িয়া তোল ঝড়,
যুগে যুগে যত সঞ্চিত মেঘ
নিবিড় করিয়া ঢেকেছে নীলাম্বর।
ঝঞ্ঝার বেগে পড় যদি, পড়
ধূলায় ভগ্ন পাখা,
বীরের ললাটে পঙ্ক-শোণিতে
তিলক রহিবে আঁকা।
মৃত্যু-আঁধাব আসিবে নামিয়া
হয় তো নয়ন 'পর,
তবুও পুলকে দেখিবে হাসিছে
নীলাকাশ সুন্দর—
কখন থেমেছে ঝড়!

চলচ্চিত্র

গদাই

অন্দরে ঘুরে গদা হাঁড়ি-মুড়ি-ভেদিনী,
গদাধারী হাঁক পাড়ে, 'হট যাও!' 'হুঁশিয়ার'
দেখে শুনে হতবাক্, নতজানু মেদিনী;
এতখানি দয়া পেটে,—এত মোটা ঘুষি যার

খসড়া

ছাব ?—ছবির জন্য ভাবনা কি ?
আগে detail গুলো হয়ে যাক ; ছবি সে হবে এখন।

গ্ল্যাডষ্টে.ন ব্যাগ

তবে এসো বাছা ! পৌছে চিঠি দিও।

বাহবা
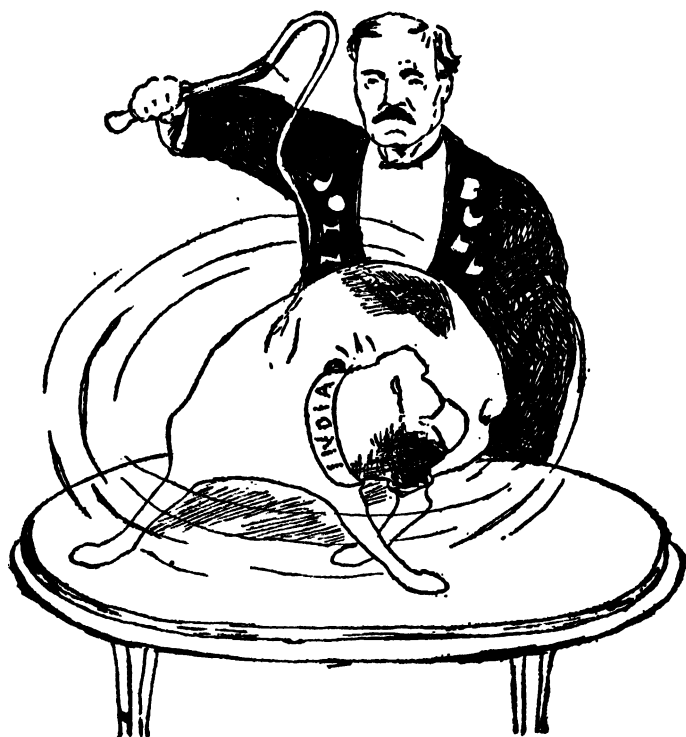
Showman : Try again ! Try again ! Try again !

একলা চলরে

Seeking protection from the tyranny of the Majority

LIQUID

League : "আমি যে আর সইতে পারি নে"

বঙ্কিম-জীবনী (২)

বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যরচনা—গদ্য

'সংবাদ প্রভাকর'-এর পৃষ্ঠায় বঙ্কিমচন্দ্রের যে-সকল গদ্য-রচনা মুদ্রিত হইয়াছিল, সেগুলি পরবর্ত্তীকালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। শচীশ বাবুর 'বঙ্কিম-জীবনী'তে (৩য় সংস্করণ, ১৩৩৮) মাত্র একটি স্থান পাইয়াছে; বাকী যে-কয়টির সন্ধান আমরা পাইয়াছি তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

১। সংবাদ প্রভাকর—১০ মার্চ্চ ১৮৫২। ২৮ ফাল্গুন ১২৫৮

শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন মেতৎ অত্র অকিঞ্চন মূঢ়তা প্রযুক্ত তল্লিখিত পত্রে প্রেরিত পত্রাদি অপ্রকাশ বিষয়ে কিঞ্চিৎ রূঢ়ভাষা প্রয়োগ হইয়াছিল, এইক্ষণে কৃতাপরাধী দয়াবীর সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে। পত্র প্রকাশেই সন্তুষ্ট থাকিবেক।

সংপ্রতি সমাচার দর্পণ সম্পাদক মহাশয় আমার বিস্তর হানি করিয়াছেন। মহাশয়ের আশ্রয়ে তদ্বিপক্ষে লেখনী ধারণ করিতেছি, অনুকম্পা সম্পাদনে আশ্রয় প্রদান করিবেন, অর্থাৎ নিম্নলিখিত বিষয় প্রভাকরে প্রকটনে পরম বাধিত করিবেন।

দর্পণ।

"দর্পণ পারা-হারা হইলে'

কোন বস্তুর প্রতিবিম্ব সুন্দররূপে দৃষ্ট হয় না।

"শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়" *

* My own name.

অম্নম ইত্যঙ্কিত মংকরণক অনুবাদিত বিষয় ৪৪ সংখ্যক দর্পণে প্রকটিত হইয়াছিল। সম্পাদক সাহেবের সংশোধনের গুণেই হউক বা মুদ্রাঙ্কণের দোষেই হউক, সেই অনুবাদের উল্টা শ্রী হইয়াছে, তাহা পাঠমাত্র দন্তে কপাট লাগিবেক, আর অন্য পাঠ থাকিবেক না।

দর্পণের ৩৫২ পৃষ্ঠায় চতুর্থ স্তম্ভে তাহার প্রথম চরণ নিম্ন প্রকার প্রকাশ হইয়াছে।

বিষয়ে রিক্ত হয়া, স্নিগ্ধ কুঞ্জবনে।

সম্পাদক মহাশয় আপনী ও পাঠকগণ সুপণ্ডিত বটেন, ইহার অর্থ কি বলিতে পারি না, আপনারা কহিবেন যে ইহা প্রকৃত nonsense আরো ত্রয়োদশ অক্ষরে পয়ার কখন শুনিয়াছেন? আমি প্রথম চরণে লিখিয়াছিলাম।

বিষয়ে বিরক্ত হয়ে, স্নিগ্ধ কুঞ্জবনে॥

কিসে কি হইয়াছে "দেব গঠিতে বানর হইয়াছে। অপিচ নবম পংক্তিতে।

অভিমানেতে জন্মে. যে প্রশংসা বায়।

ত্রয়োদশাক্ষরে পয়ার। আরো honour অর্থ কি অভিমান। এবং অভিমানে কি প্রশংসা জন্মায়? আমি লিখিয়াছিলাম।

তুচ্ছমান হতে জন্মে, যে প্রশংসা বায়।

ভাল ' ভাল।

অন্যান্য সামান্য দোষের তালিকা ৪ পংক্তিতে "মহাপ্রেম" পরিবর্ত্তে "নিত্যপ্রেম" হইবেক।

১০ পংক্তিতে "মলয়াতে" "মলয়জে" হইবেক। ১১ পংক্তিতে "পুষ্প" পরিবর্ত্তে "পুষ্পে" হইবেক।

অতএব দর্পণ সম্পাদককে অনুরোধ করি যে আগত সংখ্যায় ভ্রম সংশোধন করিবেন, এবং ভবিষ্যতে এই প্রকার না হয় এমত . . . . . বেন ইতি।

পুনশ্চ.........[ছিন্ন]

২। সংবাদ প্রভাকর—২৩ এপ্রিল ১৮৫২। ১২ বৈশাখ ১২৫৯ এই সংখ্যা 'সংবাদ প্রভাকরে' "শ্রীব, চ, চ।" এই স্বাক্ষরে বঙ্কিমচন্দ্রের যে গদ্য রচনাটি প্রকাশিত হয়, তাহা শচীশবাবুর 'বঙ্কিম-জীবনী'র ৬৫-৬৬ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে; কিন্তু কোন্ তারিখের কাগজ হইতে গৃহীত তাহার কোন উল্লেখ নাই।

৩। সংবাদ প্রভাকর—১০ জুলাই ১৮৫২। ২৮ আষাঢ় ১২৫৯।

(গুণাকর জনসহ সাক্ষাদভিলাষে নিরাশ জনস্য বিরচিত)

বর্ষাঋতু।

স্বনাথ শশধর বিরহিণী বিঘোর তমসাম্বরাবৃতা গভীরা নিশীথিনী শঙ্কাশ নিবিড় জলধরমাল গগনমণ্ডলে নিয়ত নিরীক্ষণ করিতেছি। মন্মথোন্মথিত জনরাজী হৃদয় বিদারক ঘোরঘন নির্ঘোষ নিনাদ শ্রবণে চমকিতচিত্ত চাপল্য প্রাপ্ত হইতেছে। নিবিড় নীলাঙ্গিণি যমুনাপুলিনে শ্রীরাধা চাতকী নীরদ কদম্ববিহারি শ্যাম শরীরোপরি তরলিত বিকচ বিমল বনমালা তুলিয়া নীলজলধরোপরি শম্পা কম্পায়মানা হইতেছে, কর্ণকুহরবিদারক ভীষণাশনি নিনাদে ভুবন চমকিত হইতেছে, কাদম্বিনী বর্ষিত বারি বিন্দু বিশালবেগে ধরাতলে পতিত হইতেছে। চিবাশাবলম্বিনী চাতকী ধরাধর বর্ষিত জলকণা পানে প্রাণ প্রাপ্ত হইতেছে, বিঘোর সজল জলদাবলী সন্দর্শনে শিখাবল শত২ নীল নিশাকর বিরাজিত

পুচ্ছবিস্তারিত পুরঃসর নৃত্য করিতেছে, নিদারুণ প্রখর কর ধর বিভাকর বিশালজীমূত জালাচ্ছন্ন রহিয়াছে, ললিত লপনা ললনা করাম্ভোজ স্বরূপা বিমলা কমলিনী ম্লানমুখে মুদিতা হইল মনোমোহিনী মহিলা মালা মুখচ্ছায়া কনক চক্রাকার চারুচন্দ্রমালা জলধর জালাচ্ছন্ন রহিয়াছে, নিশাম্বর শোভনতারকা মণ্ডলী অদৃশ হইল।

নিদাঘীয় প্রখর প্রভাকর প্রতাপে ম্লান স্বভাবাছন্না বিপুল লাবণ্যবতী হইল মহীরুহরাজী নবদলমালায় ঝলমলায়মান হইতেছে। বিদ্যুল্লতা তুলিতা নবীনা কুমারী মাতৃরঙ্কাবলম্বন সদৃশ নব লতিকামালা মহা-মহীরুহরাজীকে অবলম্বন করিতেছে বৃক্ষলতা সুশোভিতা বসুন্ধরা সুন্দরী, বহুল কনকালঙ্কারমণ্ডিতা চন্দ্রলপনাসঙ্কাশ প্রেক্ষণীয়া হইয়াছে, জলধর রস প্রাপনে পূর্ণ যৌবনা, বিশাল বেগবতী, ভীষণ কল্লোলোন্মত্তা, তরল তরঙ্গ রঙ্গিণী, স্রোতস্বতী, স্বনাথ সাগরে শরীর সমর্পণ করিতেছে, হে নয়ন যুগল! এতন্মনোরম পদার্থপুঞ্জে সন্দর্শন সার্থক হও।

হুগলী।
কালেজ। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরেজী প্রবন্ধ ও পত্রাবলী

বঙ্কিমচন্দ্রের অপ্রকাশিত বাল্যরচনা ছাড়া প্রাপ্ত বয়সের অনেক রচনা ও পত্রাবলী 'বঙ্কিম-জীবনী'তে স্থান পায় নাই। সেগুলির উল্লেখ করিতেছি।

(১) শ্রীযুত সজীবচন্দ্র সান্যাল BENGAL: PAST AND PRESENT (Apr.—June 1914, pp. 273-84) নামক ত্রৈমাসিক পত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের ১৩ খানি ইংরেজী চিঠি প্রকাশ করেন। পত্রগুলি

১৮৭২-৭৩ সালে বহরমপুর হইতে ডক্টর শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে লিখিত। আমারই অনুরোধে শ্রীযুত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা পত্রগুলির বঙ্গানুবাদ 'প্রবাসী'তে (১৩৩৬, কার্ত্তিক, পৃ. ২৩-৩০) প্রকাশ করিয়াছেন। তৎপূর্ব্বে শ্রীযুত মন্মথনাথ ঘোষও কয়েকখানি পত্রের বঙ্গানুবাদ 'সাহিত্যে' (১৩২৩ অগ্রহায়ণ, পৃ. ৫০৫-৫০৮) 'বঙ্কিম বাবুর প্রবন্ধ' নামক নিবন্ধে প্রকাশ করিয়াছিলেন। 'বঙ্কিম-জীবনী'তে এই সকল পত্র স্থান পাওয়া উচিত ছিল।

(২) বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ১০৬ সংখ্যক CALCUTTA REVIEW পত্রে "Buddhism and the Sankhya Philosophy" নামক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধটি এখনও বাংলায় অনূদিত হয় নাই!

(৩) ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের মে মাসের MOOKERJEE'S MAGAZINE-এ বঙ্কিমচন্দ্র "The Study of Hindu Philosophy" নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। শ্রীযুত মন্মথনাথ ঘোষ এই প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ 'হিন্দুদর্শনের আলোচনা' নামে ১৩২৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসের 'সাহিত্যে' প্রকাশ করিয়াছেন। শচীশবাবুর গ্রন্থে এই প্রবন্ধের কোন উল্লেখ দেখিতেছি না।

(৪) ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের MOOKERJEE'S MAGAZINE-এ বঙ্কিমচন্দ্রের 'Confessions of Young Bengal' প্রকাশিত হয়। ইহার বঙ্গানুবাদ শ্রীযুত মন্মথনাথ ঘোষ 'নব্যবাঙ্গালীর স্বীকারোক্তি' নামে ১৩২৩ সালের পৌষ মাসের 'সাহিত্যে' প্রকাশ করিয়াছেন। 'বঙ্কিম-জীবনী'তে ইহারও কোন উল্লেখ নাই!

(৫) বঙ্কিমচন্দ্রের 'On the Origin of Hindu Festivals' নামক প্রবন্ধ 'হিন্দু পূজোৎসবের উৎপত্তি কথা' নামে স্বর্গীয় পাঁচকড়ি

বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩১৯ সালের কার্তিক মাসের 'সাহিত্যে' (পৃ. ৪৯৯-৫১০) অনুবাদ করেন। মূল ইংরেজী প্রবন্ধটি বেঙ্গল সোশ্যল সায়ান্স য়্যাসোসিয়েশনে পঠিত হয়, কিন্তু 'সাহিত্যে' ভুলক্রমে বঙ্গীয়-সমাজ-বিজ্ঞান সভার পরিবর্ত্তে 'বেথুন সভায় পঠিত' মুদ্রিত হয়। শচীশবাবুও দেখিতেছি এই ভুলই বজায় রাখিয়াছেন; তিনি পাঁচকড়িবাবুর নিকট ঋণস্বীকার করাও প্রয়োজন মনে করেন নাই!

(৬) ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে বেঙ্গল সোশ্যল সায়ান্স য়্যাসোসিয়েশনে পঠিত বঙ্কিমচন্দ্রের অপর একটি ইংরেজী প্রবন্ধ 'বাঙ্গালার জনসাধারণের সাহিত্য' নামে পাঁচকড়িবাবু ১৩২০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের 'সাহিত্যে' অনুবাদ করেন। এই বঙ্গানুবাদ 'বঙ্কিম-জীবনী'র ৩৫১-৬১ পৃষ্ঠায় পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে বটে, কিন্তু পাঁচকড়িবাবুর নিকট কোনরূপ ঋণস্বীকার দেখিলাম না!

(৭) ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে CALCUTTA UNIVERSITY MAGAZINE-এ প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'Vedic Literature' নামক প্রবন্ধের কিয়দংশের সংক্ষিপ্ত মর্ম্মানুবাদমাত্র 'বঙ্কিম-জীবনী'র ৪৯৪-৯৯ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছে। সমগ্র প্রবন্ধটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(৮) ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ১০৪ সংখ্যক CALCUTTA REVIEW পত্রে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'Bengali Literature' প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ শ্রীযুত মন্মথনাথ ঘোষ 'সাহিত্যে' প্রকাশ করেন (১৩২৩ মাঘ-ফাল্গুন: ১৩২৪ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ)। ১৩২৪ সালের বৈশাখ মাসের 'সাহিত্যে' এই বঙ্গানুবাদের যতটুকু প্রকাশিত হইয়াছিল, কেবল ততটুকু (অনুবাদকের নিকট কোনপ্রকার ঋণস্বীকার না করিয়া) 'বঙ্কিম-জীবনী'র ২৩০-৩৮ পৃষ্ঠায় পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। মনে হয়, শচীশবাবু সাহিত্যের অন্যান্য

সংখ্যায় প্রকাশিত অংশগুলি দেখেন নাই। সমগ্র প্রবন্ধটি মন্মথবাবু 'বাঙ্গালা সাহিত্য' নাম দিয়া ১৩৩৫ সালে স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন।

কালেজীয় কবিতা-যুদ্ধ

'বঙ্কিম-জীবনী'র ৬৬ পৃষ্ঠায় আছে :—

"দীনবন্ধুবাবু, দ্বারকানাথ অধিকারী ও বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যেও এইরূপ কবির লড়াই চলিত।...বঙ্কিমচন্দ্র এ যুদ্ধে যোগদান করিতেন না। তবু দ্বারকানাথ তাঁহাকে চট্ট কবি বলিয়া গালি দিতে ছাড়েন নাই; দীনবন্ধুবাবুকে শহুরে কবি নাম দিয়া পাঁচালী সাজাইয়াছেন। দীনবন্ধুবাবু পাল্টা গাহিয়া দ্বারকানাথকে বুনো কবি নামে আখ্যাত করিয়াছেন।"

কিন্তু বঙ্কিমবাবুর 'কবির লড়াই'য়ের কোন নমুনা শচীশবাবুর গ্রন্থে পাইলাম না। কৌতূহলী পাঠকদের জন্য আমি পুরাতন 'সংবাদ-প্রভাকর' হইতে বঙ্কিমবাবুর দুইটি রচনা উদ্ধৃত করিতেছি।

(সংবাদ প্রভাকর, ২৭ মে ১৮৫৩। ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৬০)

বিচিত্র নাটক।

(তিন মিত্রের কথোপকথন।)

প্রথম মিত্র।

কি বিষাদে মুখ খানি, হাসি-ভরা নাই।
বেণা-বনে বোসে কেন, উঠ উঠ ভাই॥

দ্বিতীয় মিত্র।

দেখিয়া দেশের গতি, কেঁদে মরি মনে।
সে দুখে বসিয়া আছি, বিরস বদনে॥

তৃতীয় মিত্র।

সখা রে বচন ধর, মিছা দুখ পরিহর,
নিজ সুখে সুখী হও ভাই।

দ্বিতীয় মিত্র।

নিজ সুখ এ সংসারে, বন বন বল কারে,
আমিতো সে সুখ দেখি নাই॥

তৃতীয় মিত্র।

না জেনে কহিছ ভাই, সংসারে সে সুখ নাই,
জান নাতো কার কাছে পাবে।
রাখরে মানস পূরী, প্রমদার প্রেমে পূরি,
কত সুখে তোমারে মজাবে॥
পদে পদে প্রেম পথে, মজাইবে মনোরথে,
মহিলার মোহন বদনে।
মোহ মন্ত্রে রবে বাঁধা, মানিবে না কোন বাধা,
কত সুখে রবে মনে মনে॥

প্রথম মিত্র।

এ কথাটী ভাল বটে, রটে ধরাময়।
পরম পুলক প্রদ, প্রমদা প্রণয়॥
বিশেষতঃ কত তাহে, ধর্ম্মের সঞ্চার।
বিবাহ বিশেষ তাই, বিধি বিধাতার॥
নর নারী উভয়েতে, হইয়া মিলিত
আরাধনে করিবেক, পরমেশে প্রীত॥

দ্বিতীয় মিত্র।

ছিছি ছিছি কেন ছার, মুখাম্বুজে মহিলার,
মরিয়াছ মোহিত হইয়া।
জানি জানি যত জ্বালা, দেয় প্রণয়িনী বালা,
হারিয়াছি বারেক ঠেকিয়া॥
সবে তার এক দিন, হই আমি প্রেমাধীন,
নাকে কাণে খৎ দি হে তায়।
আদরে ভাঙ্গাতে মান, হইয়াছি অপমান,
না ভাঙ্গিল আমার কথায়॥

প্রথম মিত্র।

সব তার সহিলাম, কত কথা কহিলাম,
মধুর মিনতি কত করি।
রামায়ণ আদি নিয়া, সব কথা কাটাইয়া,
তবু মানে রহিলা সুন্দরী॥
সামান্য রতন নহে, রমণী রূপসী।
তার না ভাঙ্গিবে মান, বেণা-বনে বসি॥
তাই বলি উঠ ভাই, পরিহরি দুখ।
বল তুমি বল কারে, পৃথিবীর সুখ॥

দ্বিতীয় মিত্র।

অনিত্য সকল সুখ, নিত্য কারে বলি।
সকল সংসার সুখ, স্বপনে কেবলি॥
পৃথিবীতে আছে সুখ, কেবাল স্বপনে।
স্বপ্ন বিনে আর সুখ, নাহি জানি মনে॥

স্বপনে স্বকরে পাই, সংসার মণ্ডল।
স্বপনে নারীর দেখি, লপন কমল॥
ভারত জনম ভূমি, সতীত্ব অঙ্গনা।
শশিমুখী সরস্বতী, আর কত জনা॥

তৃতীয় মিত্র।

সে সব স্বপন ভাই, শ্রবণে তোমার।
শ্রবণে প্রবেশ করে, শত সুধাধার॥
কবি দেখ ছেলে দেখ, দেখ গিয়া মেয়ে।
স্বপনে জিনেছ ভাই, সকলের চেয়ে॥
মধুর সরল ভাষে, মুগ্ধ কর মন।
করুণায় ভেসে যায়, নীরেতে নয়ন॥
বিশেষ রসিক তুমি, জানি ইহাতেই।
স্বপ্ন দরশনে দেখ, সতীত্ব নিজেই॥

প্রথম মিত্র।

এখন হে জানিলাম, স্বপ্নে যত সুখ।
এসো মিত্র স্বপ্নে মোরা, ঘুচাইব দুখ॥

তৃতীয় মিত্র।

স্বপনে আমার ভাই, মন নাহি ভজে।
আসল পাইলে বল, নকলে কে মজে॥
বিশেষ একেতে আমি, ডরিহে কতক।
একেবারে তাড়াবোনা, দেশের রক্ষক॥

প্রথম মিত্র।

এই দোষে চিরকাল, মরিলিরে তুই।
ভাই কথা তোর মুখে, শুনিনে কভুই॥

তৃতীয় মিত্র।

তুমিওতো ওই রসে, মজিয়াছ ভাই।
সে কথা শুনেছি ভাল, কামিনীর ঠাঁই॥
চতুর জামাই হও, শ্বশুরের ঘরে।
ফুল খেলা কত জানো, বাগান ভিতরে॥
কিন্তু আহা মরি মরি, কামিনীর রূপ।
কি মোহন মন্ত্র দিয়ে, বর্ণেছ স্বরূপ॥
মধুর মোহন ভাষে, মোহিনী বর্ণন।
বুঝি হে কখনো আর, ভুলিবেনা মন॥

এই সময়ে শ্যামাচন্দ্র বিশ্বদাস ও গুপ্ত নামক কয়েকজন পুলিস সংক্রান্ত শস্ত্রধারি আসিয়া কহিল যে

চোর চোর ধর চোর, এই জন চোর।
পর ধন কর চুরি, এত সাধ্য তোর॥

তৃতীয় মিত্র।

বাহারে! এযে হে বড়, বাহারে চাতুরী।
বল দেখি কারে কিবা, করিয়াছি চুরি॥

গুপ্ত।

কার কি করেছো চুরি, এতো নাহি জানি।

বিশ্বদাস।

বলেছে তোমারে চোর, শুধু অনুমানি॥

তৃতীয় মিত্র।

ভাল ভাল এত বুদ্ধি, প্রশংসার বটে।
না জানিয়া চোর বলীবু, সুদ্ধিতে ঘটে।

শ্যামাচন্দ্র।

না জানিয়া তোরে কভু, চোর বলি নাই।
তাহার কারণ তবে, শুন মোর ঠাঁই॥
সে কালের কালী বাবু, বড় ধনবান।
পোরেছিল ছ পাড়ের, ধুতি একখান॥
তুমিওতো ছ পাড়ের ধুতি পরিয়াছ।
তাই বলি তার ধুতি, চুরি করিয়াছ॥

তৃতীয় মিত্র।

বটে বটে দিব্য আছে, এই পৃথিবীতে।
দু খানি ছপেড়ে ধুতি, নারিবে জন্মিতে॥

শ্যামাচন্দ্র।

চোপ্ চোপ্ চোপ্ রহ, মৎ কর সোর।
পুলিসের মাজিষ্ট্রেটি, পদ আছে মোর॥
আমি বলিতেছি তুই, চুরি কোরেছিস্।
আমার কথায় হয়, ডিক্রী বা ডিস্মিস্॥

তৃতীয় মিত্র।

যো হুকুম্ খোদা-বন্দ, হইল ইয়াদ্।
বল দেখি কত দিন, খাটিব মিয়াদ॥

গুপ্ত।

মানিলাম নাহি তুমি, করিয়াছ চুরি।
তবু দোষ দেখাইতে, পারি ভূরি ভূরি॥

প্রথম মিত্র।

কেবলি দেখায়ে দোষ, কি লাভ তোমার।

গুপ্ত।

দোষ দেখানো হে বাপু, ব্যাবসা আমার॥
তোমারো সহস্র দোষ, দেখাইতে পারি।
বিশ্বদাস তাহে মোর, আছে সহকারী॥

প্রথম মিত্র।

ভাল ভাল সাধু সাধু, কি নাম তোমার।
অসার সংসারে শুধু, তুমি প্রশংসার॥

গুপ্ত।

গুপ্ত রাখিলাম বাপু, নামটী আমার।
গু আছে প্রথমে তার মধ্যেতে পকার .

তিন জন পুলিস প্রহরি।

কথার গতিক বড়, উত্তম না ঘটে।
স্বস্থানে প্রস্থান করা, যুক্তি মত বটে॥

ইঁহারা প্রস্থান করুন।

তৃতীয় মিত্র।

সময় হোতেছে নাশ, যাই নিজ নিজ বাস,
কি করিব ভেবে দেখি মনে।
তুমি যাও এই বেলা, কর গিয়া ফুল খেলা,
কামিনীতে কামিনীর সনে॥
তুমি ত্যজিবেনা বনে, ভাবো গিয়ে নিজ মনে,
আজিকে দেখিবে কি স্বপন।
আমি বাড়ী গিয়ে ভাই, মনসুখে নিদ্রা যাই,
স্বপন কি, নাজানি কখন॥

তবে গো বিদায় হই, প্রণয়েতে যেন রই,
এই আশা করে মোর মন।
যদি কোন কথা মোর, হয়ে থাকে অতি জোর,
then beg you pardon.

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
হুগলি কালেজের ছাত্র।

(সংবাদ প্রভাকর, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৫৩। ১২ আশ্বিন ১২৬০)

ছাত্র হইতে প্রাপ্ত।

—০—

কালেজীয় কবিতার মারামারি *

বিষম "বিচিত্র নাটক"

অর্থাৎ

কবিদের মজ্‌লিশ এবং ঐ নাটক দর্শন।

দল মল ঝল মল, শত দীপ সচঞ্চল,
নিশাযোগে অট্টালিকা মাঝে।
সে আলোর কিবা নিভা, চন্দ্রিকার দিবা বিভা,
যেন তথা মিশিয়ে বিরাজে॥

* শুনিতে পাই প্রভাকরে নাকি দুটো বীর আসিয়া বড় যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে? একটি না কি আবার আশে পাশে কামড় মারিতে আরম্ভ করিয়াছে, বেশ আমিও একবার এই সময় সাহেবদের সেলাম ঠুকিয়া যাই, কিন্তু নিজে বীর নহি, যুদ্ধ করিব না, চড়টা চাপড়টা মারামারিই ভাল।

কোটী দীপ কাঁচ মাঝে, কোটী তারা সুবিরাজে,
জ্বলে যেন হীরাময় বাসে।
কতই কুসুম তায়, ঝল মল শোভা পায়,
প্রভাময় সকলি প্রকাশে।
ঝক্ মক্ ঝল মল, আলো মাঝে সচঞ্চল,
নৃত্যকীর বসন ভূষণ।
ঝকমোকে বেশ ধরি, বসেছে বিরাজ করি,
কবীশ্বর পাশে কবিগণ॥
ধীরে ধীরে বিনা বাজে, ধীরে ধীরে নিশী মাঝে,
মৃদু মৃদু গায় বামাস্বরে।
বিদ্যা আর অবিদ্যার, নৃত্য হবে দুজনার,
কে ছোট কে বড় জানিবারে॥

বিদ্যার নাচ।

নাচে শশি মুখী, গজেশ গতি।
ললনা ললিতা, লাবণ্য বতী॥
কোমল কুসুম, কলিকা প্রায়।
কনক ভূষণ, কনক কায়॥
নিবিড় নিতম্ব, যৌবন ভার।
হাব ভাব হেলা, কত প্রকার॥
হেলিয়ে দুলিয়ে, নাচিছে ঘুরে।
ভূষা ঝল মল, কুসুম ঝুরে॥
প্রেমময় নীল, কোমল আঁখি।
স্থির রাখিয়াছে, ধরায় রাখি॥

বঙ্কিম নয়নে, বারেক চায়।
বিদ্যুৎ সমান, তখনি যায়।
ঝাপ্টার মাঝে, বদন চাঁদ।
আশে পাশে ফেরে, বসন ফাঁদ॥
হাব ভাব কত লাবণ্যে মাখা।
কেমন নাচিছে, কেমন বাঁকা॥
ফিরিয়ে ফিরিয়ে, ফিরিয়ে ফেরে।
চলিয়ে চলিয়ে, চলিয়ে ধীরে॥
কখন কি রূপে, কোথায় আছে।
সমীরে সরোজী, যেমন নাচে॥
কিরূপ কি ভাব, কেমন ছবি।
দেখে গেল গলে, যতেক কবি॥
মন্ত্র মুগ্ধ সবে, অচল আঁখি।
বিদ্যা চলে গেল, তাদের রাখি॥

অবিদ্যার নাচ।

আইল অবিদ্যা তবে, দেখে কাঁপে বুক।
ঢেঙ্গা মাগী পেট্‌মোটা, হাঁড়ী পানা মুখ॥
বরণে হাঁড়ির তলা, ঝক্‌মেরে যায়॥
দীর্ঘ চুল দীর্ঘ দাঁত, সাঁচিপান খায়॥
বসন মলিন অতি, পচাগন্ধ গায়।
তিনি ফের নাচিবেন, নমস্কার পায়॥
ধপ্ ধাপ্ কোরে নাচে, মেঝে করে চুর।
পাকেতে লাফান যেন, ব্যাঙ্গ বাহাদুর॥

কবিগণ হেসে মরে, বলে একি পাপ।
পলাতে পারিলে বাঁচি, বাপ্ বাপ্ বাপ্॥

অবিদ্যার প্রতি কবিদের
রহস্যোক্তি।

অবিদ্যা এতেক বিদ্যা, শিখিলে কোথায়।
মোহিত হইয়ে মোরা, জিজ্ঞাসি তোমায়॥
পরিচয় দাও ধনি কেন এত বিদ্যা।
আমরি সুন্দরি তুমি, কাহার অবিদ্যা॥

অবিদ্যা

"প্রবল প্রতাপশালী, অসভ্য রাজন।
সসাগরা ধরা নিজে, করিল শাসন॥
তাঁহার সখের মোরা, দুই পাট রাণী।
প্রথমে অবিদ্যা আমি, দ্বিতীয় দুর্ব্বাণী॥
পুত্র এক পেয়ে মেনে, পরাণে বেঁচেছি।
কিন্তু আগে বল সবে, কেমন নেচেছি॥

কবিগণ।

এমন সুন্দর নাচ, কভু দেখি নাই।
তাই এক অভিলাষ, করেছি সবাই॥
সুখী হব পুত্র তব, দেখিবারে পেলে।
কে জানে সে কতগুলী, তোমারতো ছেলে।

কুবিদ্যা *

ছেলের গুণের কথা, কি কহিব আর।
রূপেতে আমারি মত, বাছা বাঁচা ভার॥
ভাল যাত্রা করে সে, যে, নিজে অধিকারি।
নাচিতে গাহিতে বাছা, স্বরূপ আমারি॥
কিন্তু আজ পারে কি না, নাহি যায় বলা।
কেবল ঝক্‌ড়া কোরে, ভাঙ্গিয়াছে গলা॥
সতিনী পালিত পুত্র, আছে এক ছোঁড়া।
সেই কালামুকো হলো, ঝক্‌ড়ার গোড়া॥
এক দিন তারে দেখে, আমার তনয়।
মাই ধোরে কোলে বোসে, মৃদু মৃদু কয়॥
"ওমা ওমা হেদে দেখ, দাদার এখন।
রাজ ভোগ খেয়ে দেহ, ফুলেছে কেমন॥
আমি কহিলাম উহা, বলোনারে আর।
ওপোড়া কপালে কাল, হয়েছে তোমার॥
সব কথা শুনিতেনা, পেয়ে কবি ভালো।
মনে২ কাল অর্থে করিলেন কালো॥"
হইল বিষম মনে, অভিমান বোধ।
বারে বারে কটু বোলে, দেয় প্রতিশোধ॥
তাই তারে গালি দিল, কুমার আমার।
সে দ্বন্দ্বে মেরেছে হুড়ো, বুঝি কাকে আর।

---

* কুবিদ্যা ও অবিদ্যা এক জনেরই নাম বিবেচনা করিতে হইবে, অবিদ্যা শব্দের অন্য অর্থ আছে এজন্য তাহা ব্যবহার করা উচিত বোধ হইতেছে না, তাহার হেতু পরে জানা যাইবে।

দুজনের সনে দ্বন্দ্ব, এ আর কেমন।
একা গাই দুই ষাঁড়, সে জ্বালা যেমন॥

কবি ঈশ্বর।

সে তোমার পুত্র নয়, ভাল জানি আমি।
তা হইলে হবে কেন, বিদ্যাপথ গামি॥
বিদ্যালয়ে থাকে ছেলে, বিদ্যা অনুরাগী।
তোর ছেলে হবে কেন, দুর বুড়ো মাগী॥

কুবিদ্যা।

তুই চুপ্ কর্ মেনে, সে ছেলে আমার।
তাই পরিচয় দেছে, আপনি কুমার॥
সে কথা শুনেছে সবে, জগৎ সংসারে।
প্রভাকর সাক্ষ্য আছে, জিজ্ঞাসহ তারে॥

কবিগণ।

যাহা হৌক ডাক তারে, শুনিব গো গান।
ছেলের মুখের গীত, অমৃত সমান॥

কুবিদ্যার ছেলে ডাকা।

আয় যাদু আয় যাদু, আয় রূপ কোরে।
মহা গুণি কবি যত, ডাকিতেছে তোরে।
শুনিতে ডাকিছে তোরে, পাবিরে খাবার।
আয় আয় আয় বাবা যাদুরে আমার॥
গাহিবে সন্তোষ মনে, খাবে যাহা দিবে।
এতেক বিমল মুখে, মিষ্টদে খাইবে॥*

* এতেক বিমল মুখে মিষ্ট দেখাইবে।

আয় আয় ধনমণি, মুখ্ রাখ মার।
আমার হোস্ গো তুই, সর্ব্ব ধন সার॥

ছেলে আসিতেং বলিতেছে

মাকো তোর চাবালেরে, ডাক্ দিলি ক্যান্।
যাতে নার্লাম মাগো, হাঁ—

মিত্র কবি।

—Walk up man.

কবীশ্বর।

কওরে কি নাম তোর, বাস কি নগর্।

ছেলে।

নাম বুনো অধিকারী, বেণাবনে গর্॥

মিত্র কবি

মাপ কর রাখ বাপু, ছুটো দিশি বোলে।
বল্ দেখি কিসে আলো, উপরেতে ঝোলে॥

বুনো

চাতালেতে ওডা বুঝি, ডোমেতে বা বেচে।
কাঁ্যাচের দোচনাওলা, জোলাইয়া দেচে॥

চট্ট

বল দেখি সাদা কেন, ঘরের দেয়াল।
মহা ব্যাধি হোয়েছে কি, তোলা গেছে ছাল॥

বুনো

বুজি বা এ ভারে, পারে দোষে চিতাইচে।
কি কাওয়ারে দৈবাৎ, কায়ে হাগাইচে॥ *

---

* অর্থাৎ [illegible] বা এটাকে পাড়িয়া ধরিয়া চিত্র করিয়াছে, কিম্বা কাক্‌কে দই [illegible] খাওয়াইয়া হাগাইয়াছে।

মিত্র

চট্ট এর ভাষা এ যে, বোঝা হোলো দায়।
অনুবাদ কোরে বল, তবে বোঝা যায়॥ +

কুবিদ্যা

ভেকো হোলে কেন বাছা, কথা কও দড়।
মিছে কেন খাটো হও, জোরে হও বড়॥
দাড়ায়ে কি কর, গালি, দেও যথোচিত।
না হয় গানেতে কর, সবারে মোহিত॥

বুনোর গীত।

রাগিণী ঝিঁঝিট্। তাল খেম্টা।

হব সন্ন্যাসী এবার। হব সন্ন্যাসী এবার॥
কোণের ভিতর শুক্‌নো নাড়ী, সইতে নারী
আর। তোর্ সনে লো পিরীত কোরে,
শিবের পূজা গেল ঘুরে, অধিকারী নাম্‌টী
ধোরে, ঘণ্টা নাড়া সার॥
কেমন গেয়েছি সবে, কওতো বিশেষ।

সব কবি

বেশ বেশ বেশ বুনো, বেশ বেশ বেশ॥

চট্ট

গাও ভাই ফিরে গাও, আর একবার।
শুনিয়া জুড়াই ফের, শ্রবণের দ্বার॥

+ ভাই কবি।

অথবা শুনেছি তুমি, কবি মহাগুণী।
একটী কবিতা ভাল, পড় দেখি শুনি॥
স্বপ্ন বা ধর্ম্মের ক্লেশ, ফেলে দেও জলে।
কহতো প্রেমের গুণ, কবিতা কৌশলে॥

বুনোর কবিতা পাঠ।

প্রেমে সবে কর সার, প্রেমময় এ সংসার,
আকাশ পাতাল মহীতলে।
সত্য ত্রেতা দ্বাপরাদি, প্রগাঢ় প্রণয়ে বাধি,
ভাসায়েছে সুখেতে সকলে॥
প্রেম তরে কত লোক, হয়ে গেল পরলোক,
শিবের হইল ধ্যান ভঙ্গ।
সমুদ্র মন্থন কালে, মোহিনীর প্রেমজালে,
গিরীশের ঘটিল কি রঙ্গ॥
শ্রীরাম প্রেমের তরে, কতই রোদন করে,
দেশে দেশে উদ্দেশিয়া নারী।
জ্বালা পায় কতবার, শেষেতে সে প্রেমে তার,
হইল বানর অধিকারী॥
দ্বারকানাথ গো আর, গোপাল মাঝেতে তার,
মন বাঁধা গরু রাধিকার।
দ্বারকায় লাজ খেয়ে, বরিল বানরী মেয়ে,
দাস জাম্বুবানের কথায়॥
যিনি নিজে রামেশ্বর, রসিকের মণি।
ছিল তাঁর কত আর, রসিকা রমণী॥

রুক্মিণী রূপসী রামা, সত্যভামা সতী।
দ্বারকা স্বর্গের সম, ছিল শোভাবতী॥
সে শোভা এখন কোথা, কোথা সেই হরি।
মোহিনী মণ্ডল কোথা, সব গেছে মরি॥
যত ছার পশু পক্ষী, বাসা করে তায়।
শৃগাল কুকুরে হাগে, দ্বারকার গায়॥
তাইতে হইল মোর, কবিতার শেষ।

সব কবি

বেশ বেশ বেশ বুনো, বেশ বেশ বেশ॥

কবীশ্বর।

ভাল বটে দেখি তব, কবিতার ছটা।
পরে গালি দিতে তবে, এত কেন ঘটা॥
কেহ হোলো অসভ্যের, বল সেনাপতি।
কেহ বা যুদ্ধের মন্ত্রী, নিজে সাধু অতি॥
পর দোষে দেও হাত, নিজ দোষ ঢাকি।
তুমিতো বোসেছ হোয়ে, নিজে জয়ঢাকী॥

বুনো কবি।

না প্রভু নহিক আমি, অসভ্যের কেহ।
পালিত হোয়েছে শুধু, তাঁর অন্নে দেহ॥
ভাল কোরে গালাগালি, দিতে যারে তারে
আশ্রয় লয়েছি এসে, অসভ্য আগারে॥
কত লোক দিছে কত, মুখে চুণ কালি।
তবু যারে তারে দিই, দোহাতিয়া গালি॥

কিন্তু অসভ্যের ছেলে, পাছে কেউ কয়।
পরকে বলেছি তাই, অসভ্য তনয়॥
চটুভাবে দিছে গালি, আমি নহি পটু।
তাকেও বলেছি তায়, গোটা-দুই কটু॥
গেলের বাজারে নাম, লিখেছি রাখিয়া।
চট্ট মিত্র মোর গাল, গিয়াছে খাইয়া॥
কোন মূঢ়ে বলে ওরে, গালে আমি কম্।
তারা জানে গাল্ মোর, শক্ত কি নরম্॥
কিন্তু ভয় করে, পাছে, ফিরে গালি খাই।
হাতে পায় ধোরে মানা, করিয়াছি তাই॥

চট্ট।

বুঝেছি চতুর বট, বুদ্ধি ঢের ঘটে।
গালি দিয়ে মুখ চাপা, যুক্তিমত বটে॥
আঙ্গুর হইল টক্, পেলে না নাগাল্।
ভয় খেয়ে সভ্য হলে, লিখিবেনা গাল্॥
যেমন নবোঢ়া হয়ে, রতিরসে বালা।
দুদিন ঠেকিয়ে শিখে, তার যত জ্বালা॥
দিন দুই ঘরে গিয়ে, স্বামি ঘর ছাড়ে।
যত আরো পতি সাধে, তত আরো বাড়ে
কোলেতে বসায় পতি, উঠে যায় কেঁদে।
সেই রঙ্গ দাদা ভাই, বসিয়াছে ফেঁদে॥
ছোঁড়াও তেমন নয়, ধোরে এনে জোরে।
বুক পুরে মনোরথ, লবে পূর্ণ কোরে॥

বুনোকবি।

তুমি যেহে বোলেছিল, কটু কহিবারে।
আমি নাকি পারিনেকো, দেখ এই বারে॥

চট্টো

বটে বটে খুব্ গালি, মিত্রে দেছ ভাই।
"মলমূত্র" আহারাদি, কিছু বাকি নাই॥
এক্ জোর ঘায়ে সব, করিয়াছ শেষ।
পাগল বুনোর ঘায়ে, যাব কোন দেশ॥
যেমন জনেক মূর্খ, রমণীর স্থান।
অরসিক বোলে কত, হৈল অপমান॥
পিরীতে রমণী দিল, কাণ্ মূলে তার।
মূর্খ বলে রসিকতা, শিখেছি এবার॥
কত রস শিখিয়াছি, এই দেখ রামা।
কসালো ছুঁড়ির ঘাড়ে, বারো ইঞ্চি ঝামা॥
সেই রঙ্গ হলো তব, শুন ভাই বুনো।
কবিত্বে বাড়ালে তুমি, গালি দিয়ে দুনো॥
কেবল তোমার মুখে, গালি না যুয়ায়।
কিন্তু হে একটি কথা, জিজ্ঞাসা তোমায়॥
কটুতে অপটু তুমি, বলিয়াছি বটে!
তুমিতো জানিলে বলো, কাহার নিকটে॥

বুনো কবি।

যে হোক না কেন তাতে, কি কায তোমার।
আগে বল দিছি গালি, কেমন এবার॥

তোমারে যা বলিয়াছি, বুঝেছত সব।
গোপনে বলেছি ঢের, কর অনুভব ॥

চট্টো।

গাল দেছ দড় দড়, হলো বাহাদুরি বড়,
বাড়িবেক যশ অবিরত।
আমরা শুনিয়া তায়, এসেছি কৃতজ্ঞতায়,
সেলাম বাজাতে গোটাকত ॥
"নীচ যদি উচ্চভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে"
সুবুদ্ধি মহৎ তুমিওত।
তাই সব নমস্কার, ফিরিয়ে দিবেনা আর,
সুবুদ্ধি মহৎজন মত ॥
কি সুবুদ্ধি সূক্ষ্ম তব, লোকে করে অনুভব,
যায় কি না যায় দেখা কিছু।
কেহ বলে কই কই, কেহ বলে, আছ ওই,
কেহ বলে দড়ি বাঁধো পিছু * ॥
হে উত্তরে মহল্লোক, একবার ভেজে শোক,
সম্বোধিও নীচে মুখফুটে।
মনসুখে সব সব, কিছু মাত্র নাহি কব,
অঙ্গীকার করি কর পুটে ॥

মিত্র কবি।

গালি দিলে প্রতিফল, অবশ্য পাইবে।
যেই মতি, সেই গতি, কেন না হইবে ॥

---

* অতি বুদ্ধি

বুনোকবি।

এ মতি আমার নাহি, ছিল এতকাল।
কুবিদ্যা কুমতি দিয়ে, ঘটালো জঞ্জাল॥
সুবিদ্যা সুমাতা ছেড়ে, এসে তার কাছে।
এই মতি এই গতি, শেষ ঘটিয়াছে॥

কুবিদ্যা।

আমি তোর মাতা নহি, সে তোমার মাতা।
সে তোমার প্রিয় হলো, খেলি মোর মাতা।
আমি চলে যাই দেখি, কে কি করে তোর।
এখন করিবি তুই, কোন্ মার্ জোর॥

কুবিদ্যা প্রস্থান ও বিদ্যা পুনরাগমন করিলেন।

বিদ্যা।

কেন বাছা তোরা সবে, কলহ করহ।
ভাই ভাই ভাবে সদা, ভাই ভাই রহ॥
সকলে একত্রে মোরে, আরাধন কর।
সকলেই উপদেশ, দেন কবীশ্বর॥
সদাই সদ্ভাবে তবে, কেন না চলহ।
কি কারণ কর সবে, কেবল কলহ॥

মিত্র।

তাই আমি কতবার, বুঝায়ে লিখেছি।
তার ফল গালাগালি, কেবল দেখেছি॥

অধিকারী।

আমিত দিইনে গালি, ওদের দুজনে।
শুধু কবি শ্রেষ্ঠ আমি, জেনে মনে মনে॥

করিলাম অপরূপ, স্বপন রচনা।
জগতেরে জানাবারে, নিজ গুণ পনা॥

বিদ্যা।

কিসে তুমি শ্রেষ্ঠ কবি. নিজ মনে লাগে।
কবিতা কাহাকে বলে, বল দেখি আগে॥

অধিকারী।

যে জন মিলায় শব্দ, সুকোমল ভাষে।
সেইত সুকবি বলি, আপনা প্রকাশে॥
তানয় কবিতা বাছা তানয় তানয়।
রামায়ণ পোড়ে তত সুকবি না হয়॥
মুগ্ধ যদি, প্রকৃতির, মোহন বদন।
যেই মনোমত ভাবে, করে দরশন।
সুখ দুখ রিপু রসে, হৃদয় মাঝার।
প্রকৃতির মোহসনে, জন্মে যে বিকার॥
যেই ভাষে সেই ভাব, স্বরূপ প্রকাশে।
যে ভাষে আপনা মনে, হৃদয় সম্ভাষে।
যথার্থ কবিতা সেই, সদা মোহ ময়।
শুধু রাম রাম বলা, কবিতা তো নয়॥
কিন্তু রামনাম তুমি, ছাড়িবেনা দেখি।
বক্তে প করিয়ে কবি, কয় যত ঢেঁকি॥
সত্য কবিতায় রাখ, যতন বিশেষ।
কবি ঈশ্বরের ঠাঁই, নহ উপদেশ॥

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
হুগলি কালেজের ছাত্র।

এই কালেজীয় কবিতা-যুদ্ধে শেষ পর্য্যন্ত দ্বারকানাথ অধিকারীকে হার মানিতে হইয়াছিল। তিনি ১৮৫৪, ৩১ জানুয়ারি (১৯ মাঘ ১২৬০) তারিখের সংবাদ প্রভাকরে লিখিলেন :—

"কালেজীয় কবিতাযুদ্ধের সন্ধিপত্র।—……আমি রাগান্ধ হইয়া প্রথমতঃ পবিত্র মিত্র দ্বয়ের সহিত বাক্ বিরোধে প্রবৃত্ত হইয়া অনুতাপে দগ্ধ হইতেছি, এই ঘৃণিত বিবাদের সূত্রপাত আমা হইতেই হয়, এজন্য আমি ইহাতে সংপূর্ণ দোষী তাহা স্বীকার করিয়া উক্ত কবি ভ্রাতা দ্বয়ের বিশেষতঃ মিত্র মিত্রের নিকট মার্জ্জনা প্রার্থনা করিতেছি।

……আমারদিগের হুগলি কালেজীয় নবীন সুকবি শ্রীযুত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট এ বিষয়ে আমি সংপূর্ণ অপরাধী নই, তিনি স্বীয় মনঃ কল্পিত দোষে আপনাকে কলঙ্কিত বোধ করিয়া একবার হানা দিয়া নানারূপ কটু কহিয়া গিয়াছেন। প্রথমে বোধ ছিল বঙ্কিম বাবু যুদ্ধ বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী নন, কিন্তু সে দিবসের বিক্রম দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে বিশারদ বলিয়াছেন।……আমরা কবিতা বিষয়ে তিন জনেই এক জনের শিষ্য, ইহাতে পরস্পর কলহ করা কোন ক্রমেই উচিত নহে,……।

শ্রীদ্বারকানাথ অধিকারী।

৮ মাঘ।

কৃষ্ণনগর কালেজের ছাত্র।

বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্রের একখানি পত্র।

১২৬৩ সালের সংবাদ-প্রভাকরের ফাইল ঘাঁটিতে গিয়া যাদবচন্দ্রের একখানি পত্রের সন্ধান পাইয়াছি। পত্রখানির বিষয়বস্তু বুঝিতে

কাহারও অসুবিধা হইবে না, সুতরাং কোনরূপ মন্তব্য না করিয়া, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদকীয় মন্তব্য সমেত, পত্রখানি উদ্ধৃত করিতেছি :—

(সংবাদ প্রভাকর, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭। ৭ ফাল্গুন ১২৬৩)

গত ২৮ মাঘ সোমবাসরীয় প্রভাকরে আমারদিগের কোন ছাত্র অনুবাদক বর্দ্ধমানের যে সংবাদ ইংলিসম্যান পত্র হইতে সংক্ষেপে অনুবাদ করিয়াছিলেন,* তাহাতে কিঞ্চিৎ ভ্রম হইয়াছিল, অর্থাৎ ডেপুটী কালেক্টরের পরিবর্ত্তে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট উল্লেখিত হইয়াছে, এবং ইংলিসম্যান সম্পাদক ব্যঙ্গোক্তিতে বাঙ্গালা দেশের লেপ্টেনাণ্ট গবরনর বাহাদুরকে সর্ব্বদা "নবাব অফ গ্রেট বেনিবোলেন্স" এই শব্দে সম্বোধন করেন, এজন্য, "লেপ্টেনাণ্ট গবরনর বাহাদুর ডেপুটী বাবুকে খাঁ বাহাদুর উপাধি দিবেন" লিখিত হইয়াছিল, তদ্দৃষ্টে ডেপুটী বাবু আমারদিগকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হইল।

"অশেষ গুণার্ণব শ্রীযুক্ত প্রভাকর মহাশয় বরাবরেষু।

মোং কলিকাতা সিমুল্যার অন্তঃপাতি হোগলকুড়ে
দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বরের বাটীতে।

শ্রীশ্রীদুর্গা।

সহায়।

বিনয় পূর্ব্বক নিবেদনমিদং।

মহাশয়ের ৫৭৪২ সংখ্যা প্রভাকর পত্র যাহা ১২৬৩ সাল ২৮ মাঘ সোমবারে মোতাবক ইংরাজী ১৮৫৭ সাল ৯ ফিব্রুআরি তারিখে প্রকাশ

* "বর্দ্ধমানের সংবাদ প্রদাতার পত্রে অবগতি হইল তথাকার মাজিষ্ট্রেট এবং কমিসানর সাহেব মফঃসল ভ্রমণে গিয়াছেন, নূতন কালেক্টর সাহেব অদ্যাপি কার্য্যভার লন নাই, ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবু যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পেনসন লইয়াছেন, লেপ্টেনাণ্ট গবরনর সাহেব তাঁহাকে খাঁ বাহাদুর উপাধি দিবেন।"...সংবাদ প্রভাকর, ৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭।

পাইয়াছে ঐ পত্রের ৪ নম্বরী পৃষ্ঠার মধ্য শ্রেণীতে বৰ্দ্ধমানের সম্বাদ প্রদাতার পত্রে অবগতি হইয়া যে সম্বাদ প্রচার করিয়াছেন ঐ পত্র প্রদাতা ও প্রেরক কোন্ ব্যক্তি তাহার নাম ধাম এবং আসল পত্রের নকল আপনকার দস্তখতযুক্তে প্রাপ্ত হইবার নিতান্ত অভিলাষী হইয়া জানাইতেছি যে কৃপা পূৰ্ব্বক অগৌণে অস্মদের অভিলাস পূর্ণ করিবেন, কদাচ বিলম্ব কিম্বা অন্যথা করিবেন না, বৰ্দ্ধমানের ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত রায় যাদবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় [চট্টোপাধ্যায় ?] বরাবর বিয়ারিং পোষ্টে পাঠাইবেন এখানে পত্রের মাস্থল জরিমানা সহিত দেওয়া যাইবেক, অন্যথাচরণ করিলে রীত্যানুসারে কৰ্ম্মানুবৰ্ত্তী হওয়া যাইবেক, ইহা জ্ঞাপন ইতি সন ১৮৫৭ সাল ১৩ ফিব্রুআরি ১২৬৩ সাল ৩ ফাল্গুন শুক্রবার।

শ্রীযাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
হাল স্থায়ী মোং বৰ্দ্ধমান।”

যে দিবসীয় ইংলিসম্যান পত্রের যে প্রবন্ধ হইতে ঐ সংবাদ গ্রহণ করা হইয়াছিল তাহার অবিকল ইংরাজী ডেপুটী বাবুর গোচরার্থে নিম্ন-ভাগে প্রকাশ করা গেল।

"It is reported that our Deputy Collector Baboo Jadub Chunder Chatterjee has been pensioned off. His departure will be a serious loss to the orthodox Hindoo community of Burdwan. It is a great satisfaction to us to learn that the Nabob of Great Benevolence in consideration of the long and meritorious services of the Baboo has been pleased to confer the hereditary title of Khan Bahadoor on him and his posterity, and a monthly gratuity of Co.'s Rs. 50 in addition to his pension

for that title. We are at a loss to know why such a rigid Hindoo of the old class like Baboo Jadub Chunder has been invested with a title which is essentially Mahomedan. Some assign it to the known partiality of His Honor for every thing Mahomedan."

ENGLISHMAN, 6 FEBRUARY, 1857.

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদকীয় মন্তব্য

এবারও বঙ্কিমচন্দ্রের সকল অপ্রকাশিত রচনা প্রকাশ করা সম্ভবপর হইল না। গতবারে ১৮৩ পৃষ্ঠায় বঙ্কিমচন্দ্রের যে-পুরস্কৃত রচনাটি সংগৃহীত হয় নাই বলিয়া ব্রজেন্দ্রবাবু আক্ষেপ করিয়াছিলেন তাহাও অতঃপর তাঁহার হস্তগত হইয়াছে। যথাসময়ে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য অপ্রকাশিত রচনার সহিত সেটিও প্রকাশ করিব। সঃ. শ. চি.

তাত-মৌ

(রবীন্দ্রনাথের 'নাত-বৌ' দেখিয়া)

শোন্, তোরে সার কহি কথা যত পুঞ্জিত
ধূম্রশাসিত বন্ধুর মোর মন-দেশে,
মগুসেবীর চিত্তের মীড় শুন্‌চি ত'
মগু-মধুপ মত্ত মধুর গন্ধে সে!
কালাচাঁদে ভালা বলি না পক্ষপাতিত্বে,
গাঁজা বড় শুধু প্রসাদে এবং আতিথ্যে
কে বড়, কে ছোট, ধরা পড়ে মুখবন্ধে সে।

ভাঙ-ভঙ্গিমা দেখিতে চাস্ তো ভর্ ঘটি,
টান্, নেশান্তে লাগিবে নেহাৎ মন্দ না,
চরসের রসে সুরুতে চতুর্ব্বর্গটি
পাবে হাতে হাতে, চরসের কর বন্দনা।
মুণ্ডু-ঘোরানো চণ্ডু রেখেছ কি ট্যাঁকে?
কোকেন সেবনে ঝোঁকেন কোথায় শিষ্ট সে?
মোদক-লোভীর লোভ যত কাঁচা-সন্দেশ।

প্রভাত বেলায় নিরালা নীরব অঙ্গনে,
কি নেশা মেশায় চায়ে ছোট-ডিম-সম্পাতে,
বর্ম্মী মেয়েরা তৈরী যা করে জঙ্ঘনে,
তৈরী যা হয় বালী, জাভা, শ্যাম, চম্পাতে।

যে তারি একটি টানে বীরবলী ভঙ্গীতে,
জেনো সেই জন পারিবে সাগর লঙ্ঘিতে,
মারিবে টেক্কা যত 'কুলচুরী' দ্বন্দ্বে সে।

বলো মন, কোন্ মৌতাতে করি পঙ্কিত,
কি মাল টানিয়া দেখাইব many ভঙ্গিমা,
লোকে মদ্যপ ক'বে তাতে নহি শঙ্কিত,
দেখেছি মদের রক্তধারার রঙ্গিমা!
আমার বিকারে আব্গারী পরিলজ্জিত,
মোর পরিচয় পরিচয়ে পরিসজ্জিত,
ক্বচিৎ কখনো লিখে থাকি আমি সন্দেশে॥

জগদ্ধাত্রীবিজয়া, ১৩৩৮
কারবালা

শ্রীপদামৃত মাধুরী*

(সমালোচনা)

মুখবন্ধে বইখানি প্রকাশের কারণ খগেন্দ্রবাবু যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা হইতেই তাঁহার ঔদার্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। আবাল্য বৈষ্ণবপদাবলীমুগ্ধ খগেন্দ্রবাবু একদা শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসীর

---

* শ্রীপদামৃত মাধুরী :—মাধুরী নাম্নী সরল ব্যাখ্যা সম্বলিত মহাজন পদাবলী, ১ম খণ্ড। মুখবন্ধ + ভূমিকা + কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন + শুদ্ধিপত্র + বিষয়সূচী + পদের সূচী—

কৃপালাভ করেন। সেই দিন হইতে সম্ভবতঃ তিনিই গুরুদক্ষিণা স্বরূপ ব্রজবাসী মহোদয়ের ভরণপোষণ পরিচালনা করিতেছিলেন নতুবা হঠাৎ আবার একদিন কেন মনে করিয়া বসিলেন যে, 'এই সময়ে আমার মনে হইল যে যদি একদিন আমার অভাব ঘটে ব্রজবাসীর চলিবে কিরূপে? সেই হইতে চিন্তা করিতে লাগিলাম।'

তিনি 'অনেক চিন্তার পর' যাহা স্থির করিয়াছিলেন তাহা হইতেই 'এই পদাবলী সংগ্রহের কল্পনা জন্মলাভ করে।' (মুখবন্ধ ৶.)

'এক্ষণে ব্রজবাসী মহাশয়কে বলিলাম পদসংগ্রহ করিতে। তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া হস্তলিখিত পুঁথি হইতে পর্য্যায়ানুরূপ পদ সংগ্রহ করিয়া অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়াছেন। আমি সেই পদগুলির টীকা টীপ্পনী ও আস্বাদন নিজের ক্ষুদ্র জ্ঞান-বুদ্ধি অনুসারে সংযোজিত করিয়াছি। তাহাই এই শ্রীপদামৃত মাধুরী।' (মুখবন্ধ ।০)।

চল্‌তি রকমের গাহিতে জানা এবং পদের রসবোধ দুইটি সম্পূর্ণ আলাহিদা বস্তু। যে কাজ জানি না এবং যে কাজের গুরুত্ব অনুযায়ী উপযুক্ত পরিশ্রম করিতে পারি না, সে কাজ করিতে গেলে যেমন হয়, 'শ্রীপদামৃত মাধুরী' ঠিক্ তাহাই হইয়াছে। পাঠ-বিভ্রাট এবং অপব্যাখ্যা দুইয়ে মিলিয়া 'শ্রীপদামৃত মাধুরী' এক অপূর্ব্ব খিচড়ীর সৃষ্টি করিয়াছে। পুস্তকখানি ভ্রম-প্রমাদে পরিপূর্ণ। এক একটি করিয়া তাহার সমস্ত দেখাইতে হইলে আর একখানি 'শ্রীপদামৃত মাধুরী' প্রস্তুত করিতে হয়।

৫।০ [৮৮ পৃঃ] এবং মূল গ্রন্থ ও সংকীর্ত্তনে বাদ্য. ৬০৮ পৃষ্ঠা। মূল্য তিন টাকা। শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী ও শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম. এ, সম্পাদিত। প্রকাশক শ্রীনগেন্দ্রকুমার লোধ, এম. এ, বি, এল, ১৭১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পুস্তকে সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গ, 'লালগোলাধিপতি', 'এমন মুরতি কেমনে করি লিখিলি বিশাখা', এবং 'যমুনা কূলে চাঁদনী রাতে' এই কয়খানি চিত্র আছে।

তাহা সম্ভব নহে। আমি মোটামুটি কতকগুলি ভুল দেখাইয়া দিলাম।

মুখবন্ধের নীচে খগেন্দ্রবাবু নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন, ভূমিকা ও কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনের নীচে কোনো নাম দেখিলাম না। ভূমিকায় গীতা, ভাগবত হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত অনেক কিছুরই আলোচনা আছে। ১৷৷৵ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, 'গৌরচন্দ্রিকার বহু পদ চৈতন্য-দেবের সম-সাময়িক বাসুদেব ঘোষ জগদানন্দ প্রভৃতির দ্বারা রচিত হইয়াছিল।' মহাপ্রভুর সম-সাময়িক পদকর্ত্তা জগদানন্দের পরিচয় আমরা জানি না। পণ্ডিত জগদানন্দের কোন পদ নাই। পদকর্ত্তা জগদানন্দ জোঁফলাইয়ের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহারই গৌর-চন্দ্রিকার পদ বিখ্যাত, তিনি মহাপ্রভুর বহুপরবর্ত্তী। আর একজন পদকর্ত্তা জগদানন্দ ঠাকুর, ইনি মঙ্গলডিহির অধিবাসী ছিলেন, ইঁহারও সময় দুইশত বৎসরের মধ্যে। মঙ্গলডিহি ও জোঁফলাই গ্রাম বীরভূম জেলায়। মহাপ্রভুর সময়ে কোন্ জগদানন্দ পদ রচনা করিয়াছিলেন, কোন্ কোন্ পদ তাঁহার রচিত, সম্পাদকদ্বয় জানাইলে অনুগৃহীত হইব।

ভূমিকার ৩৵ পৃষ্ঠায় 'ব্রজ-গোপীর প্রেমে গীতার আদর্শ' সম্বন্ধে আলোচনা আছে। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের কথা মনে রাখিতে পারিলে সম্পাদকদ্বয় এ সব লিখিতে সাহস করিতেন না। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে অষ্টম পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহাপ্রভু-রামানন্দ-সংবাদে সাধ্য-সাধননির্ণয়ে রায় স্বধর্ম্ম ত্যাগ সাধ্যসার বলিয়া গীতার 'সর্ব্ব-ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য' শ্লোক আবৃত্তি পূর্ব্বক নিজ মত সমর্থন করিলে, মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন, 'এহো বাহ্য আগে কহ আর।' সুতরাং গীতার ঐ শ্লোকের সঙ্গে ব্রজ-প্রেমের তুলনামূলক আলোচনায় তাঁহারা কি পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন বুঝিলাম না।

'কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে' অনেকের নাম দেখিলাম। মুখবন্ধে দেখিয়াছিলাম, শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র হাতের লেখা পুঁথি দেখিয়া পদ সংগ্রহ করিয়াছেন। এখানে দেখিলাম সম্পাদকদ্বয় বহু মুদ্রিত গ্রন্থেরও সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। তথাপি এত ভুলের কারণ বুঝিতেছি না।

'কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে' ৩৷৵ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন ও খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত বৈষ্ণব পদাবলী আমাদের অনেক উপকারে আসিয়াছে।' 'গাঁ বড় তার মাঝের পাড়া।' বইখানি কিরূপ উপকারী, তাহা ইতিপুর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক 'হিতবাদী' ও 'বঙ্গবাসী' পত্র সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। তাহাতেও অনেক বিষয় বাদ পড়িয়াছিল। সম্প্রতি 'শনিবারের চিঠি'তে সেই বাদ-পড়া অংশের খানিকটা দেখানো হইয়াছে। আশা করি শ্রীপদামৃত মাধুরীর দ্বিতীয় খণ্ডে শ্রীব্রজবাসী ও খগেন্দ্রবাবু সম্পাদিত এই প্রথম খণ্ডের উপকারে লাগার কথা লেখা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন থাকিবে।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে নামের তালিকা দেখিয়া মনে হইতেছে ইঁহারাই এই শ্রীপদামৃত মাধুরী প্রকাশে অর্থসাহায্য করিয়াছেন। খগেন্দ্রবাবু এই ব্যাপারে কত সাহায্য করিয়াছেন জানিতে পারিলে তাঁহার ব্রজবাসীর 'চলিবে কিরূপে' এই চিন্তার স্বরূপ বুঝিতে পারিতাম। পরের পয়সায় বই ছাপাইয়া সম্পাদক হইবার দুশ্চিন্তা আমরাও করিয়া থাকি। তবে খগেন্দ্রবাবুর বৈশিষ্ট্য—'ব্রজবাসীর চলিবে কিরূপে?' সুতরাং এ চিন্তায় মৌলিকতা আছে।

পুস্তকের ৩৬৯ পৃষ্ঠা হইতে ৩৮৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পত্রাঙ্কে গোলযোগ ঘটিয়াছে। এবং পুস্তকের ৩৭০—৩৭১—৩৭৪—৩৭৫—৩৭৮—৩৭৯—৩৮২ ও ৩৮৩ পৃষ্ঠা নাই। ইহা হইতেই বুঝা যায় পুস্তকখানি কিরূপ

অনবধানতার সহিত মুদ্রিত হইয়াছে! অনেক পদের অংশও বাদ পড়িয়াছে। উভয়েই কীর্ত্তনগায়ক, তথাপি মহাজন পদাবলীর উপর এই অত্যাচার দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম।

এইবার পদের কথা। পাঠ-নির্ণয়ে এবং ব্যাখ্যায় এত গোলযোগ ঘটিয়াছে যে, বইখানি পাতায় পাতায় ভুলে ভরা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রত্যেকটি তুলিয়া দেখানো সম্ভব নহে। তথাপি কতকগুলি মোটা মোটা ভুল দেখাইয়া দিলাম। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে ব্রজবাসী পদসংগ্রহে কিরূপ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, আর খগেন্দ্রবাবু 'বিশেষ শ্রমস্বীকার পূর্ব্বক' তাহার কি অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমাদের দেশে বিবাহের আসরে একটা প্রশ্ন উঠে বর বড়, না ক'নে বড়? এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন—কে বড়, কালিদাস না মল্লিনাথ? নবদ্বীপচন্দ্র, না খগেন্দ্র-বাবু?

পৃষ্ঠা ৭২, 'কদম্বের বন হইতে' পদে 'নিছিয়া' শব্দের অর্থ লেখা হইয়াছে 'মুছিয়া'! 'নিছনী'র তবে মানে কি হইবে?

পদের দ্বিতীয় গুচ্ছে পাঠ ধরা হইয়াছে—'তাহা কুলাঙ্গনামন গ্রহিবারে ধৈর্য্যগণ, যাতে হেন দশা কৈল মোরে॥' ব্যাখ্যা এইরূপ—'কুলাঙ্গনার মন ধৈর্য্যসমূহকে ধারণ করিবার জন্যই সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু তথাপি সেই মুরলী-গীত আমার এই অবস্থা করিয়াছে'। পদের ভণিতা দেওয়া হয় নাই।

যত্নন্দন দাসের এই পদটি 'বিদগ্ধ মাধব' নাটকের প্রথম অঙ্কের কয়েকটি শ্লোকের অনুবাদ। শ্লোকের একাংশ এইরূপ—

> 'হা হা কুলীন-গৃহিনী-গণ-গর্হণীয়াং
> যেনাদ্য কামপি দশাং সখি লম্ভিতাস্মি॥'

অনুবাদে আছে 'হাহা কুলরমণীর, গ্রহণ করিতে ধীর, যাতে হেন দশা

কৈল মোহে ॥' 'মোহে' স্থানে 'মোরে' পাঠও পাওয়া যায়। নাটকখানির সঙ্গে মিলাইয়া দেখিবার অবসর হয় নাই বোধ হয়। পাঠ এবং ব্যাখ্যা অসঙ্গত বলিয়াও কি সন্দেহ হয় নাই? এই পদের শেষে ভণিতা আছে—'দেখিয়া এসব রীত চমক লাগিল চিত দাস যদুনন্দনের মত।'

পৃষ্ঠা—৭৬, ৭৭, 'মনের মরমকথা' পদ। পাঠ ধরা হইয়াছে—'মরমে পৈঠল সেহ হৃদয়ে লাগল দেহ।' স্বপ্নে যদি মরমেই পশিলেন, তবে আর হৃদয়ে দেহ লাগিবে কিরূপে? পাঠ হইবে 'নয়নে পৈঠল সেহ মরমে লাগল নেহ।' পাঠ ধরা হইয়াছে—'বসি মোর পদতলে গায়ে হাত দেই ছলে আমা কিন' বিকাইনু বোলে॥' **পায়ে** হাত দেওয়ার জন্য ছলের দরকার হইবে কেন? 'আমায় কিনিয়া লও, বিকাইলাম' এই কথা কি গায়ে হাত দিয়া বলে? পাঠ হইবে—'**পায়ে** হাত দেই ছলে।'

পৃষ্ঠা ১০৭, 'তখনি বলিনু তোরে' পদে পাঠ ধরা হইয়াছে—'বাড়ীর বাহির নাহি নাছে।' ব্যাখ্যা আছে—'বাড়ীর বাহিরে যে পথ সেখানেও আমরা কখনো যাই না।' পাঠ হইবে—'বাড়ীর বাহির নহি নাছে।' অর্থ 'বাড়ীর বাহিরে নাছে যাই না।'

পৃষ্ঠা ১২২—১২৩, 'মরকত মঞ্জু' পদে 'বিটঙ্ক' শব্দের ব্যাখ্যা হইয়াছে 'মনরূপ পক্ষী ধরিবার ফাঁদ'। 'বিটঙ্ক' শব্দের অর্থ 'কপোতপালিকা', 'পায়রার খোপ'। বনমালার মাঝে পায়রার খোপের মত শিল্পকার্য্যই এখানে বিটঙ্ক শব্দের লক্ষ্য। 'মধুপ অনুসন্দিত' হইবে না, হইবে 'মধুপ অনুসন্ধিত', অর্থ (রায় সন্তোষ রূপ) 'মধুপের অন্বেষণীয়, প্রার্থিত, কাম্য।'

'ইন্দীবর-বর উদর-সহোদর মেদুর-মদহর দেহ' এই পদের উদ্ধৃত পংক্তির খগেন্দ্রবাবু নূতন অর্থ করিয়াছেন—'শ্রেষ্ঠ নীলপদ্ম যাহাতে প্রস্ফুটিত হয়, অর্থাৎ সমুদ্র (কবিপ্রসিদ্ধি); সমুদ্রের সহোদর অর্থাৎ তুল্য মেঘ; মেদুর অর্থাৎ স্নিগ্ধ যে মেঘ তাঁহার গর্ব্ব হরণ করে এমন

দেহ যাঁহার।' সমুদ্রে না হয় নীলপদ্ম ফুটিল, কিন্তু তাহার সহোদর 'মেঘ' না 'আকাশ'? না জানিয়াও নূতন কিছু করিবার সখ আছে! ইহার সহজ অর্থ এইরূপ—'শ্রেষ্ঠ ইন্দীবরের উদর অর্থাৎ কিঞ্জল্কের সাদৃশ্যযুক্ত স্নিগ্ধ মেঘের গর্ব্বহর দেহ।' পৃষ্ঠা ১৩২, 'শ্যামরূপ দেখিয়া আকুল হইয়া দুকুল **ঠেকিনু** হাতে' এই পদে হাতে দুকুল ঠেকিনু' ইহার অর্থ কি হইবে? প্রকৃত পাঠ—'দুকুল **ঠেলিনু** হাতে' অর্থাৎ—'হাতে দুই কুল ঠেলিয়া ফেলিলা লের বাহির হইলাম।

পৃষ্ঠা ১৩৩, 'কি হেরিলাম কদম্ব তলাতে' অনন্তদাসের এই পদটি একটু উল্টাপাল্টাভাবে ১৬৬ পৃষ্ঠায় গোবিন্দদাসের ভণিতায় দেওয়া হইয়াছে। একই পদ দুই জনের নামে দিবার সময় খেয়াল ছিল না?

পৃষ্ঠা ১৩৫, 'হেদেলো পরাণ সই' পদটির ছন্দ দীর্ঘ-ত্রিপদী। এই পদের সর্ব্বত্র ১ম ও ২য় ছত্রে এবং ৩য় ও ৬ষ্ঠ ছত্রে মিল আছে। কেবল দ্বিতীয় গুচ্ছে—'না চাহিলাম **তার পানে** ভরমে নামিলাম জলে' এই যে অমিল পাঠ ধরা হইয়াছে ইহার কারণ কি? পাঠ হইবে 'না চাহিলাম **তরুতলে**। তরুতলে কোনো পুঁথিতে হয় তো 'তার পানে' হইয়া আছে, কিম্বা ব্রজবাসী পাণ্ডিত্য সহকারে ঐরূপ পাঠোদ্ধার করিয়াছেন! 'তারপানে চাহিলাম না' এই পাঠ অপেক্ষা 'সে যে তরুমূলে ছিল সেই তরুতলের দিকেই চাহিলাম না' এই পাঠ কত সুন্দর।

পৃঃ—১৪৪, 'সাজহ শেজ কমল দল **পাঁতি**। কুলবতী যুবতী লেও নিজ শাতি॥' খগেন্দ্রবাবু ইহার অর্থ করিয়াছেন 'আমি আর সহিতে পারি না, আমার জন্য পদ্মপত্র বিছাইয়া শয্যা রচনা কর। কুলবতী যুবতীর পক্ষে শাস্তি হওয়াই উচিত।' এ তো আর শুধু ব্যাখ্যা নয়, এ যে আস্বাদন!' পাঁতি' পাঠ হইবে না, হইবে '**পাতি**'। 'কমলদল পাতিয়া শয্যা সাজাও। কুলবতী যুবতী নিজ শাস্তি গ্রহণ

করুক।' ইহাই অর্থ হইবে। অর্থাৎ (দখিণ পবন বাম বা বিষময় হইয়াছে, হিমকরের নাম পর্য্যন্ত সহিতে পারিতেছি না, এ ক্ষেত্রে) পদ্মপত্রের শয্যা আমার পক্ষে জীবন্ত চিতা শয্যার মতই হইবে। তথাপি সেই শয্যাই সাজাইয়া দাও, আমার কৃতকর্ম্মের (কুলবতী যুবতী হইয়া পরপুরুষে আত্মসমর্পণের) শাস্তি গ্রহণ করি। কথা আছে, 'চিতা সাজাও' তারই ধ্বনিতে এখানে 'সাজহ শেজ' কথা দেওয়া হইয়াছে।

পৃঃ—১৪৫, চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত 'করণ দেখিলুঁ শ্যাম' পদটি দীর্ঘ ত্রিপদী ও লঘু ত্রিপদীর খিচুড়ী। ব্রজবাসী যথা দেখিতং তথা লেখিতং করিয়াছেন, ছাপিতংও সেইরূপ হইয়াছে। খগেন্দ্রবাবুও ভাবিবার অবসর পান নাই যে চণ্ডীদাসের ছন্দজ্ঞান ছিল কি না?

পৃঃ—১৪৯, 'পীত **পতনি** বনি ভাল' পাঠ ধরিয়া অর্থনির্ণয়ে 'পট্টবস্ত্র' লিখিয়া জিজ্ঞাসা (?) চিহ্ন দিয়াছেন। 'পতনি কোনো শব্দ নাই, পাঠ হইবে '**পীত পটিমে** বনি ভাল।' 'পীতাম্বরে ভাল সাজিয়াছে।'

পৃঃ—১৫৪, 'নাহিতে যাইতে রঙ্গে জলদ শ্যামের **সঙ্গে** দিঠি পড়িয়া গেল মোর।' 'শ্যামের সঙ্গে দৃষ্টি পড়িয়া গেল?' না, 'শ্যামের **অঙ্গে** দৃষ্টি পড়িয়া গেল?

পৃঃ—১৬৩, 'মানস অবধি রহত কল্পতরু কে। অছু করুণা অপার।' এই পংক্তিগুলির অর্থ করিয়াছেন, 'কল্পতরু মানস অর্থাৎ অভীষ্ট ফল প্রদান করে, কিন্তু গৌরচন্দ্রের নিকট চাহিতে হয় না' ইত্যাদি। কল্পতরুর নিকটও চাহিতে হয় না: মনে মনে কামনা করিয়া গিয়া নিকটে দাঁড়াইলেই কল্পতরু ফলদান করেন। কিন্তু গৌরচন্দ্রের নিকট মনে মনে কামনা, অর্থাৎ সংকল্পেরও প্রয়োজন হয় না। আর কল্পতরু

সংকল্পের অধিক কিছু দেন না, কিন্তু গৌরচন্দ্র অযাচকেও কল্পনাতীত দান করেন। 'মানস অবধি' মানে 'যতটুকু কামনা।'

পৃঃ—১৬৪, 'হরি-অরি সন্নিধানে অবিরত পূরে বাণে রমণীজনার মনে বাজে ॥' এই পংক্তি কয়টির অর্থ লেখা আছে—'সিংহের শত্রু হরিণ, অর্থাৎ হরিণের ন্যায় চক্ষু, তাহা হইতে অবিরত বাণ বর্ষিত হইতেছে।' সিংহের শত্রু হরিণ, না হরিণের শত্রু সিংহ? হরিণ সিংহের সঙ্গে কিরূপ শত্রুতা করে? রমণীদের চক্ষুই হরিণের মত হয়, পুরুষের চক্ষু হরিণের মত হয়, এই নূতন শুনিলাম। হায়রে 'আস্বাদন'! 'সন্নিধানে' শব্দটার অর্থ কি? অর্থ হইবে 'হরি, অর্থাৎ কমল তাহার অরির, অর্থাৎ চাঁদের সন্নিধানে অবিরত বাণ পূরিতেছে।' চাঁদের মত মুখমণ্ডলে পদ্মের মত চক্ষুর যে কটাক্ষ, তাহা রমণীজনার বুকে লাগিতেছে। সন্নিধানে অর্থে নিকটেও হয়, অরিসন্নিধানে অর্থে এখানে শত্রুর প্রতি। কমল শত্রুর প্রতি বাণ মারিতেছে, কিন্তু তাহা লাগিতেছে গিয়া রমণীর হৃদয়ে।

পৃঃ—১৬৮, 'আদলি' শব্দের অর্থ করিয়াছেন, 'অদ্রি, জানুর উপরিভাগ পর্ব্বতসদৃশ।' জানুর উপরিভাগ বলিতে কি বুঝিব? জানুর উপরেই তো উরুদেশ! এখানে 'আদলি' নিতম্বের সঙ্গে তুলিত হইয়াছে, তাহাতে 'রোপিত কদলি' উরুদ্বয়। সুতরাং 'আদলি এখানে এমন কোন পাত্র যাহাতে লতা বা ক্ষুপ জাতীয় উদ্ভিদ রোপণ করা চলে, কিন্তু কদলী সচরাচর রোপিত হয় না।' এই পাত্রটি আজিও প্রায় এই নামেই রাঢ় দেশে প্রচলিত আছে। আকার—হাঁড়ির নিম্নাংশের ন্যায়। আমরা কিছুদিন আগে 'প্রবাসী' পত্রে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। হাঁড়ির সংস্কৃত নাম 'স্থালী।' 'পিঠরঃ স্থাল্যুখা কুণ্ডঃ (অমরকোষ, বৈশ্য বর্গ) হাঁড়ির অর্দ্ধাংশ বুঝাইতে সং 'অর্দ্ধ'+ 'স্থালিকা' > প্রাকৃত 'অদ্ধ'+'থালিআ',='অদ্ধহালিআ', > অপভ্রংশ

'অদ্ধহালিঅ' > প্রাচীন বাঙ্গলা * 'আধহালী', 'আধালি' * > মধ্যযুগের বাঙ্গলা 'আধালী', 'আধ্লি', 'আদলি'। > আধলা, আধালী নাম এখনো চলিতেছে। আদলির উপরে কদলি—এখানে 'উলট কদলি' বুঝিতে হইবে। যথা—কৃষ্ণকীর্ত্তন 'উরু শোভে বিপরীত রামকদলী' (পৃঃ ৪৮)। যথা—জ্ঞানদাস 'উলট কদলি তরু গুরুয়া নিতম্ব। জ্ঞানদাসের পঁহু জীয়ে ঐ অবলম্ব॥'

পৃঃ—১৭৮, 'হা হা প্রাণ প্রিয় সখি কি না হৈল মোরে' পদটি ব্রজবাসী কোন্ পুরানো পুঁথি হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন? গত ১৩৩৩ সালের ভাদ্র সংখ্যা 'ভারতবর্ষ'-এ আমরাই সর্ব্বপ্রথম এই পদ প্রকাশ করি। যে পুরানো পাতড়ায় এই পদ পাওয়া গিয়াছে, একখানি পুঁথি সহ সেই পাতড়া সাহিত্য পরিষদে দান করিয়াছি। যে কেহ গিয়া দেখিতে পারেন। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে তো কয়েক পৃষ্ঠাই গিয়াছে, আমাদের নাম করিয়া পদটি লইলে কি বইখানার গৌরব কমিত? না বলিয়া পরের আবিষ্কৃত পদ গ্রহণ করা কি বৈষ্ণবোচিত সাধুতা?

পৃঃ—২০১, 'সহজে ননীক পুতলি গোরী' এই সুন্দর পদটির ছয় পংক্তির পাঠ ধরা হইয়াছে—'শমতি না দেই দিন রজনী রোয়' পাঠে যে ছন্দোভঙ্গ হইয়াছে সে দিকে নজর নাই। আবার 'শমতি না দেই' পদের অর্থ করা হইয়াছে 'শান্তি দেয় না।' কিন্তু পাপ পাঠ দুই রকম পাওয়া যায়—'শমতি না দিন রজনী রোয়', কিম্বা 'নাবিরাম দিন রজনী রোয়।' অর্থ একই প্রকার—'বিরাম নাই।' ভণিতায় পাঠ আছে, 'জ্ঞানদাস কহে দুখ মদন দেল।' এখানেও ছন্দোভঙ্গ হইয়াছে। পাঠ হইবে—'জ্ঞান কহে দুখ মদন দেল।'

বারান্তরে আলোচনা সম্পূর্ণ করিবার ইচ্ছা রহিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

আলু ও পিঁয়াজ

আলু কহে— মিনতি করি, শোন, কাল্লু মিয়া,
ভিন্দালু রাঁধ যদি আমারে নিয়া,
শোন দোহাই তব
বেশী কি আর কব,
আহা ফুটি-ফাটা বেদনায় বিদরে হিয়া !
মোরে যা খুশী রাঁধ,
গাঢ় বাঁধনে বাঁধ—
শুধু জাতটি মেরো না পল-অণ্ডু দিয়া।

দেখ হদিসে যদি সে তব হদিস থাকে,
মোরে কল্‌মা পড়ায়ে দিও কল্‌মি-শাকে ;
দিও টম্যাটো-ওলে,
ফুল- কপির ঝোলে,
দিও কচুর সাথেতে মোর নেকাহ্-বিয়া।
ফেলে পিয়াজে মোরে
মেরো না ক' বেঘোরে,
ওগো যা হও তা হও তুমি সুন্নি-শিয়া !

খাসী- মাংসে ফেলিয়া মোরে বানিও কাবাব,
দিও চপ্-কাটলেটে তাতে ক্ষতি নাই, সাব্,
হীন বেসনে ফেলে,
তুলো ভাজিয়া তেলে,
র'ব ফাউলে বাউল হয়ে 'কারি' বনিয়া।

নীচ   পিঁয়াজের সাথ
মোরে   কোরো না বেজাত,
মোরে   প্রাণে মার' মেরো না ক' জাত মারিয়া।

পিঁয়াজ কহে—   হরি ঠাকুর শোনো, তেরা টিকির কিরে,
মোরে   অম্বলে দিও দিয়ে ফোড়ন-জিরে ;
লাগে   খোদার কসম,
যদি   রাঁধ আলু-দম,
মোরে   দিও না তাহাতে ফেলে দুভাগে চিরে।
মোর   করিও ভাজি,
তাতে   নহি নারাজী,
শুধু   ফেলো না কাফেরী-ফেরে কলিজা-ছিঁড়ে !

তব   শাস্ত্রে যদি বা কিছু আস্থা থাকে,
মোরে   শুদ্ধি করিয়া দিও মূলোর শাকে ;
শোনো   তোমায় বলি,
দিয়ে   কাঁচা-কদলী
রেঁধো   শুক্তো অথবা ফেলো ঘণ্ট ভিড়ে !
গোল   আলু ভাগাড়ে
ফেলে   মেরো না হা রে,
দিও   থেঁৎলে বরং মেরে মুগুর শিরে !

ফেলে   মাংসে পাঁঠার রেঁধো ঘুগ্নি-দানা,
দিও   কুমড়ো-ছোকায় আমি করি না মানা,

তব দোহাই ঠাকুর,
মোরে ভেজো চানাচুর,
শুধু মেরো না আমার জাতি-ধরমটিরে।
সব সহিতে পারি,
পারি ছাঁটিতে দাড়ি
শুধু আলু-চুঁৎ হলে ভাসি নয়ন-নীরে।

মন্তব্য— শ্রীহরি ঠাকুর আর কাল্লু মিয়া,
একই দেহ দুইরূপ দেখ বুঝিয়া।

অতীত ইতিহাসের যৎকিঞ্চিৎ

সে অনেক দিনের কথা।—বঙ্গভূমি সমুদ্র থেকে উঠেছেন, সবেমাত্র। তখনও তাঁর গায়ের জল শুকোয় নি। নবোদ্ভিন্ন বনস্থলী ভিজা কাপড়ের মত তখনো তাঁর গায়ে গায়ে লেগে রয়েছে।

এই সদ্যঃস্নাতার নগ্ন সৌন্দর্য্যের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সারা পৃথিবীর টনক নড়লো।

এরকম ক্ষেত্রে আমাদেরও টনক নড়ে। আমরা বসে যাই রঙ্ আর তুলি নিয়ে। তখনকার লোকের রুচি ছিল ভিন্নরূপ। তাঁরা ছুটলেন এঁকে দখল করতে।

ছুটলেন অনেকেই। কিন্তু পাল্লায় জিতলেন, এক দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ

জাতি, যাঁরা এলেন পশ্চিমের কোন এক দেশ থেকে,—লম্বা লম্বা পা ফেলে, সকলকে ছাড়িয়ে।

এঁরা নিজেদের আর্য্য নামে পরিচয় দিতেন। এই আর্য্যবংশে জন্মেছি বলে আমাদের জাতব্যবসার নাম আর্‌জি।

আর্য্যজাতির গৌরবের বস্তু ছিল প্রকাণ্ড দাড়ি আর প্রচণ্ড নাক। এঁদের নাকের বহর দেখে সেকালে বাংলাদেশের নাম রাখা হয়েছিল নাক। রঘুবংশে এই নাকের পরিচয় পাই,—আনাকরথবর্ত্মনাং। এবং সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারি রঘুকুলের বিজয়রথ কোন দিন বঙ্গদেশের চতুঃসীমা পার হতে পারে নি।

পার হবার কথাও নয়। কারণ, বাংলার সৌভাগ্যগগনে তখন একাদশ বৃহস্পতি।

দুঃখের বিষয়, বৃহস্পতির পর শুক্র আছে, শনি আছে। শনি যে আছে সেটা বোঝা গেল যেদিন নাকের দেশে জন্মাল এক খাঁদা। বিবর্ণ, বিশীর্ণকায়, বিচ্ছেয়কেশ, বিলুপ্তনাসা বালক ভূমিষ্ঠ হ'ল, আর নাকের কূলে ধস্ নামলো।

সকলে বললে, এমনটি হয়েছে পিতামাতার দোষে। পিতামাতা অনেক প্রায়শ্চিত্ত করলেন, বড় বড় কাঠের গুঁড়ি জ্বালিয়ে বড় বড় যজ্ঞ করলেন। তাতে ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় আকাশ অন্ধকার হ'ল, মেঘ জমলো, ধারা নামলো, নদীনালা ভরলো, কচুরীপানার প্রসার বাড়লো। খাঁদা কিন্তু বাড়লো না, আড়াই হাতের বেশী। আর তার নাক ত মোটেই বাড়লো না।

তখন দৈব ছেড়ে পুরুষকার ;—নাক ধ'রে টানাটানি। তাতে, ফল ত কিছু হ'লই না। উপরন্তু টানাটানির ভয়ে গোঁফ দাড়ি গজাতেই সাহস করলো না।

খাঁদার হল রাগ। শুঁয়াভরা ছ'কোণা, আটকোণা পাতা আর ডাটার মাঝখানে নধর কুমড়াটির মত, একান্তে সে রাগে ফুলতে লাগলো।

খাঁদাকে তুষ্ট করবার জন্যে চেষ্টা যথেষ্টই হ'ল। পুরুষেরা কাদা দিয়ে নিজেদের নাক ঢেকে ফেললেন। মেয়েরা নাকে গর্ত্ত ক'রে কতকগুলা আংটা পরিয়ে দিলেন। (এঁদের এই স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত এদেশে অমর হ'ল তিলক, ফোঁটা, নথ, নোলকের প্রচলনে)। খাঁদার কিন্তু মন উঠলো না।

দেশে তার মত খাঁদা যে আর ছিল না, তা নয়। তবে তারা থাকতো গ্রামের বাইরে, কুষ্ঠাশ্রমে।

একবার এই আশ্রমের একজনকে গ্রামের পথে দেখা গিছলো। সে দিন সে এক হৈ চৈ ব্যাপার! কুঠে দেখামাত্র দেশের সুস্থ লোক-গুলা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালাতে লাগলো,—খানাডোবা টপকে।

এ দৃশ্য দেখে আনন্দে খাঁদার বুক ভরে উঠলো। ঘন ঘন হাত-তালি দিয়ে সে চীৎকার করলো—'দ্যাখ, দ্যাখ খাঁদার বিক্রম দ্যাখ!'

খাঁদার এই উৎসাহবাক্যে কুঠেমহলে এমন উদ্দীপনা জাগলো যে, তারা দলে দলে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করলো এবং নেকোদের নাকানি চোবানি খাইয়ে দিল। তাদের আহার-নিদ্রা বন্ধ হবার উপক্রম হ'ল।

আহার্য্যের এই দুর্য্যোগের দিনে, উত্তরে চীন, আর পূর্ব্বে ব্রহ্ম, এই দু' দেশের দুই যুযুৎসু রাজশক্তি একযোগে নাক-রাজ্য আক্রমণ করতে অগ্রসর হ'ল। অগণিত চীনাচমূ ও ব্রহ্মবাহিনীর সম্মিলিত অক্ষৌহিণী একদিন বাংলার উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত ছাপিয়ে ছুটে এলো,—বাঁধভাঙা বন্যার জলের মত, দুর্ব্বার বিক্রমে। সুসমৃদ্ধ আর্য্যজাতি, তাঁদের মাঠ-ভরা গরু, আর ঘাটভরা জরু সামলাতে এমনি বিব্রত হয়ে পড়লেন যে,

হাতিয়ার হাতে করবেন, কি, একেবারে হাত-পা ছেড়ে দিলেন; এবং ভাগীরথীস্রোতের মুখে ঐরাবতের মতই ভেসে চল্লেন,—দীর্ঘ নাসায় দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে। নাক-রাজ্যে নাক ডাকাবার কেউ রইলো না।

খাঁদা কিন্তু পালায় নি। সে দেখলে বিজেতৃজনবাহিনীর প্রত্যেকেই তার মত খর্ব্ব আর খাঁদা। তখনি সে মনে মনে এই মহা-মানবজাতির সঙ্গে আপনার আত্মীয়তা স্থাপন করলে; এবং পলায়নপর আর্য্যদের ধ'রে ধ'রে বলতে লাগলো, 'দেখে যা আমার বংশ কত বড়!'

চীন ব্রহ্মের লোক কি ক'রে খাঁদার বংশ হ'ল সেটা তাঁরা বুঝতে পারলেন না। কিন্তু তখন দাঁড়িয়ে তর্ক করবার সময় ছিল না।

জনশূন্য লোকালয়ের ঘরদোর ভেঙে, ক্ষেত খামার জ্বালিয়ে, দীঘির জলে নবমীব অলাবু মিশিয়ে শত্রুসৈন্য নিষ্ফল আক্রোশে ফিরে এলো,—অনিবৃত্ত রক্তপিপাসা নিয়ে। এমন সময়ে খাঁদা পড়লো তাদের হাতে। দেখতে দেখতে বাইশ হাজার ধারাল ছোরা এক সঙ্গে এগিয়ে এলো খাঁদার পেট লক্ষ্য ক'রে। দেখতে দেখতে বাইশ হাজার ধারাল ছোরা এক সঙ্গে কোষবদ্ধ হ'ল,—তার নাকের দৌলতে। এ নাক দেখে আর তাদের হাত উঠলো না।

তখন চীনাসৈন্য ধরলো তার এক কান। বল্লে, চল্ উত্তরে,—আমাদের সেনাপতির কাছে। ব্রহ্ম-সৈন্য ধরলে আর এক কান। বল্লে, চল্ পূর্ব্বে—আমাদের সেনাপতির কাছে। দুদিকের টানে খাঁদার কান ক্রমেই লম্বা হ'তে লাগলো। কিন্তু সে কোন দিকেই এগুতে পারলো না।

ভাগ্যক্রমে, দু দলের দুই সেনাপতি এই সময়ে সেখানে এসে হাজির হ'লেন। তাঁদের দেখেই খাঁদা নাকে হাত ঠেকিয়ে কুর্ণিশ করলো।

এবং দুটো তেলাপোকা মুখে পূরে দিয়ে, কচ কচ ক'রে চিবিয়ে গিলে ফেললো।

সেনাপতিরা বল্লেন, 'উং তুম্! (উত্তম)

প্রশ্ন হ'ল, 'কোন্ তু?' 'তু কে?'

খাঁদা বল্লে—'আন্ তো ঙ্গো লে। (আমি তোর দলে)।

খাঁদা আরও বললে:

'নেকোরা লুকিয়ে থেকে আপনাদের এই অভিযান ব্যর্থ করতে বসেছে দেখে মর্ম্মাহত হয়েছি। তাদের এই বিশ্বাসঘাতকতার সমুচিত শাস্তি হওয়া উচিত। তাদের গতিবিধি আপনাদের জানা নেই, আমার আছে। আমি জানি, তারা যেখানেই থাক্, চন্দ্রগ্রহণের সময় বেরিয়ে আসবে, গঙ্গাস্নান করতে। সে সময়ে তাদের হাতে অস্ত্র থাকবে না, এবং দুটো হাতের একটাতে থাকবে পৈতে জড়ান। আপনারা যদি আগে থাকতে গঙ্গার দুই তীরে শিবির খাটিয়ে অপেক্ষা করেন এবং সময় বুঝে আক্রমণ করেন, ত সমস্ত নাকজাতি এক নিমেষে নিঃশেষ হয়ে যাবে।'

খাঁদার কথা মতই কাজ হ'ল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে বনবাদাড়ের আশ্রয় ছেড়ে আর্য্যেরা দলে দলে এসে গঙ্গায় ডুব দিলেন। আর তাঁদের উঠতে হ'ল না। ব্রহ্ম-চীনাদের অনম্য মুঠার তলায় তাঁরা চিরকালের মত তলিয়ে গেলেন। প্রতিবাদ মাত্র করবার সময় পেলেন না। মরবার আগে দু একবার হাত পা ছুঁড়লেন, দু এক ঝলক পতিতোদ্ধারিণী নাকে মুখে ঢুকিয়ে দিলেন। বাস! ঐ পর্য্যন্ত।

অসাড় দেহগুলাকে এক এক লাথিতে স্রোতের দিকে ঠেলে দিয়ে বিজয়ী বীরেরা শিবিরে ফিরে এলো। খাঁদা এতক্ষণ তীরে দাঁড়িয়ে নেকোদের ছটফটানি দেখছিলো, আর চীৎকার করছিল:

'বড় যে নাকের বড়াই করিস্! এখন নাক নিয়ে ধুয়ে খা।'

অযুত নিযুত আর্য্যদেহ স্রোতের সঙ্গে ভাসতে ভাসতে গিয়ে জমা হ'ল বঙ্গোপসাগরের মাঝামঝি এক জায়গায়। এই সকল পুঞ্জীভূত নাক-দেহের ওপর পলি প'ড়ে এক উর্ব্বর দ্বীপপুঞ্জের উদয় হ'ল। তার নাম হ'ল নাকোব্বর। এই নামেরই অপভ্রংশ দাঁড়িয়েছে নিকেবর।

সেদিনকার যুদ্ধে নাকজাতির একটি পুরুষও প্রাণ নিয়ে ফিরলো না। স্ত্রীদের মধ্যে যাঁরা বাঁচলেন তাঁদেরই নখবিষিত দেহগুলোকে পরের দিন পথে ঘাটে ছড়ান দেখা গেল।

সিদ্ধকাম ব্রহ্ম-রাজ আর চীন-রাজ একমত হ'য়ে এবার খাঁদার কর্ম্মশক্তি ও ধর্ম্মবুদ্ধির পুরস্কার দিলেন তাকে বাংলার সিংহাসনে বসিয়ে। তাকে রাজা করা হ'ল বটে, কিন্তু তার হাতে কোন ক্ষমতা দেওয়া হল না। কারণ, সেকালে চীন-ব্রহ্মদেশ-বাসী ছাড়া আর কারুর হাতে ক্ষমতা থাকলেই ক্ষমতার অপব্যবহার হত। খাঁদাকে সিংহাসনে বসান হ'ল হাত-পা বেঁধে। কেবল মুখে কোন ঢাকা দেওয়া হ'ল না। মুখে মুখে রাজা-উজীর মারবার অধিকার তার অক্ষুণ্ণ রইলো।

এক ভাবে, এক জায়গায়, অনেকক্ষণ ব'সে থেকে থেকে খাঁদা ঝিমুতে লাগলো। এমনি ক'রেই অনেক দিন হয়ত রাজত্ব করতে পারতো। কিন্তু পেটে সইল না। নানা মুনিবের মন জোগাতে তাকে নানা রকম অখাদ্য খেতে হ'ত। তাতে প্রকাশ পেলো তার উদারতা, এবং সঙ্গে সঙ্গে উদরাময়। কবিরাজ দণ্ডে দণ্ডে ওষুধ বদ্‌লাতে লাগলেন। তবু কোন ফল হ'ল না। পাচন আর বিরেচনে তিতিবিরক্ত হয়ে বেচারা অল্পদিনেই ইহলোক ত্যাগ করলো।

খাঁদা ম'লো। কিন্তু তার কীর্ত্তি ম'ল না। আজও পথে, ঘাটে,

বনে জঙ্গলে, পাহাড়ে পর্ব্বতে প্রস্তরে খোদিত খাঁদা মূর্ত্তির ছড়াছড়ি। কলিকাতা মিউজিয়মেও এই রকম কতকগুলি মূর্ত্তি রক্ষিত হয়েছে। মূর্ত্তিগুলির বিশেষত্ব—খাঁদা নাক, লম্বা কান, মুদিত চক্ষু, আর হাত-পা এক সঙ্গে বাঁধা। *

সবিতা

আমারই অহঙ্কারে,
তারকা খচিত অসীম শূন্য বিলীন নীলিমা 'পরে।
আমি কভু ভুলিব না,
আমারই প্রখর জ্যোতি-জৌলুষে হাসিছে দিগঙ্গনা।
আমি প্রদীপ্ত রয়েছি গগন ভালে,
কে জানিবে কারা রহিল অন্তরালে,
সুদূর তিমিরে কোন্ জ্যোতিষ্ক ঢালে
দীপ্ত কিরণ, কেহ তা জানিবে না রে।
সম্মুখে আমি জাগিয়া রয়েছি
বিপুল অহঙ্কারে।

---

* এই গবেষণায় কোন পাঁজি পুঁথির আশ্রয় লওয়া হয় নাই। শুনিয়াছি, আজকাল এইরূপ মৌলিক গবেষণারই কদর বেশী। —লেখক

আছে তারকার মালা,
নিঃসীম নীলে তারকা শুধুই—বিপুল বহ্নি-জ্বালা !
হয় তো বৃহত্তর,
নভো নীলিমার হয়তো ওপারে সুদূরে বেঁধেছে ঘর ।
তাহাদের জ্যোতি অতি ক্ষীণ চোখে লাগে,
প্রভাতে দুপরে আমার প্রখর রাগে,
আমি ভাবি তারা আমারই করুণা মাগে,
আমি কবে শেষ করিব দিনের পালা ।
গৃহ-প্রাঙ্গণে প্রদীপের মত
ফুটিবে তারার মালা !

আজিকে আগুন-শিখা,
মনে নাই কবে শৈশবে ছিনু ধূমায়িত নীহারিকা ।
ছিলাম ঘূর্ণ্যমান,
কোটী জীবনের সম্ভাবনায় বিহ্বল ছিল প্রাণ :
কোটী জীবনের প্রসব-ব্যথায় আমি ;
প্রচণ্ড বেগে ঘুরিতে ঘুরিতে নামি ;
আকাশে ফোটাই দুটি ফুল দিন-যামী,
জ্যোতি শতদল, তমিস্রা বিভীষিকা,
ধোঁয়ার পিণ্ড কবে ছিনু, আজ
দীপ্ত বহ্নি-শিখা ।

আমারই কিরণ লেগে,
পশ্চিমাকাশ রঙে রঙে রাঙা রঙধরা মেঘে-মেঘে !

দিন হয়ে আসে শেষ,
সাগরের বুকে ঠিকরে তবুও, আমারই জ্যোতির রেশ !
অস্ত-অচলে আমি চলি যাব যবে,
নিবিড় তিমির ঘনাইবে নীল নভে,
জানি অসংখ্য তারকার মেলা হবে,
তারকা-পিয়াসী কেহ না রহিবে জেগে,
স্বপন সায়রে ঢুলিবে ধরণী
আমারই আঘাত লেগে।

জানি একদিন মম,
শেষ হবে জ্যোতি রবির ভস্মে, ভস্ম হবে না তম।
হয় তো তারার দেশে,
নব সূর্য্যেরে আসন ছাড়িয়া তারা হয়ে রব শেষে।
নবরবি গেলে অস্ত অচলে চলি,
যত তারা মোরা দাড়াইব গলাগলি,
সে রবি-আলোকে স্বপনে পড়িব ঢালি—
হব অসহায় আজিকার তারা সম !
জানি একদিন সেদিন নিকটে—
শেষ হবে জ্যোতি মম।

থ্যাঙ্কস্ !

মেসের একই ঘর।

অমল আর রুদ্রাক্ষ।

অমল পড়ে থার্ড-ইয়ারে, রুদ্রাক্ষ চাকরী করে জেটীতে। অমল লেখে কবিতা, রুদ্রাক্ষ লেখে তিসির হিসাব। অমলের বালিশের নীচে থাকে Keats, Shelley, রুদ্রাক্ষের থাকে 'রাজকন্যার গুপ্তকথা'। অমলের সিটের সামনে টাঙানো 'মড্ এ্যালেনের কলানৃত্য', রুদ্রাক্ষের টাঙানো দশমহাবিদ্যা। অমল ফর্সা লম্বা, রুদ্রাক্ষ কালো বেঁটে।

তবুও দুজনায় বন্ধুত্ব।

হঠাৎ একদিন পাশের খালি বাড়ীটায় ভাড়াটে আসে। তরুণী হিন্দোলা এসে সামনের বারান্দায় দাঁড়ায়। ডাকে, বেয়ারা—

অমল দেখে Beatrice, রুদ্রাক্ষ দেখে উর্ব্বশী।

অমল শোনে Siren-song, রুদ্রাক্ষ শোনে—কানাড়া।

অমলের কলেজ কামাই। রুদ্রাক্ষের আপিস্ লেট্।

পনের দিন পরে।

অমল ভাবে রুদ্রাক্ষটা rogue

রুদ্রাক্ষ ভাবে অমলটা শয়তান।

হঠাৎ একদিন ঘুসি চলে। মেসের ছেলেরা ছুটে এসে অমলের পেটে লাগায় টীংচার আইডিন্,—রুদ্রাক্ষের মাথায় বাঁধে ব্যাণ্ডেজ।

একমাস পরে।

বৈঠকখানায় চা খেতে খেতে হিন্দোলা বলে—রুদ্রাক্ষবাবু, আপনি অমলবাবুর মত কবিতা লেখেন না কেন ?

রুদ্রাক্ষ শুকনো মুখে বলে,—লিখতাম আগে।

হিন্দোলা বলে,—অমলবাবু বেশ কবিতা লেখেন কিন্তু। আমার খু—ব ভালো লাগে।

রুদ্রাক্ষ বলে,—হুঁ।

হিন্দোলা বলে,—প্রাণ-ঢালা লেখা।

রুদ্রাক্ষ বলে,—হু।

হিন্দোলা বলে,—ছন্দের উপর আশ্চর্য্য ক্ষমতা।

রুদ্রাক্ষ বলে,—হুঁ।

হিন্দোলা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বলে,—অমলবাবুর সেই কবিতা—'চাঁদের কলঙ্কের প্রতি' আমার ত মুখস্থই হয়ে আছে।

রুদ্রাক্ষ বলে,—হুঁ।

অমল বিনীত হাসি হেসে বলে,—কলঙ্ক এতদিন ভয়ের জিনিষ ছিল,—আপনিই আজ ভরসা দিলেন।

হিন্দোলাও হাসে। দুটি গাল টোল খায়। কানের সোনার ময়ূর দুলে ওঠে। বলে,—কলঙ্কেই চাঁদের শোভা বাড়ে।

অমল ও রুদ্রাক্ষ একসঙ্গেই বলে,—ঠিক কথা।

হঠাৎ অমল হেসে উঠে বলে,—মনে পড়েছে,—মনে পড়েছে,—রুদ্রাক্ষের একটা কবিতা—'বন্ধ্যা বালা'—বল না হে—

অমল নিজেই আওড়ায়—

আনাচে কানাচে লুকিয়ে লুকিয়ে
চুপি চুপি কত তোমা দেখি প্রিয়ে,
আঁস্তাকুড়েতে কত কি মাড়িয়ে
ছোঁয়াচ পড়ি যে সন্ধ্যাবেলা,—
ও আমার বন্ধ্যা-বালা!

হঠাৎ হিন্দোলা হেসে ফেলে।

রুদ্রাক্ষ চটে' ওঠে, বলে,—হাস্‌লেন যে!

হিন্দোলা বলে,—সত্যিই আপনার কবিতাটির আরম্ভ বেশ impressive.

উল্লসিত হয়ে রুদ্রাক্ষ বলে,—কবিতাটি কিন্তু আমার জেটীতে তিসির গুদামে বসে' লেখা,—

হিন্দোলা রুদ্রাক্ষের বাহুতে অল্প চপেটাঘাত করে' বলে,—হোক্ জেটী,—তার সৌন্দর্য্য,—তার মাদকতা,—আপনার কবিতার প্রতি ছত্রে ফুটে ওঠে,—তার—

রুদ্রাক্ষ বাধা দিয়ে বলে,—এ আপনার ঠাট্টা।

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে, চশমাটা আঁচল দিয়ে মুছে নিয়ে হিন্দোলা বলে,—ঠাট্টা কি রকম? তিসি উচ্চশ্রেণীর আর্টের জননী তা কি জানেন না? কেমন চেপ্টা চেপ্টা লালচে দানাগুলি,—যেন এক একটি চুনি। হাত দিয়ে টিপে দেখুন,—তেল বেরুবে। তিসির তেলে রং মিশিয়ে কি না হয়? অয়েল পেন্টিং থেকে আরম্ভ ক'রে মায় কপাট জানালা বরগা কড়িকাঠ পর্য্যন্ত—

অমল হেসে বলে, আপনার যুক্তির সারবত্তা আছে।

রুদ্রাক্ষ চটে' ওঠে। বলে,—সাবধান অমল—Don't be jealous—please don't—don't—

তিনমাস পরে।

অমল হিন্দোলার বাজার করে। রুদ্রাক্ষ ঘর ঝাড়ে। হিন্দোলা অমলকে বলে—Nice fellow, রুদ্রাক্ষকে বলে perfect gentleman.

অমলের কলেজে proxy,—রুদ্রাক্ষের জেটীতে কামাই।

মেসে কিন্তু আগেকার মতই খাওয়া-শোওয়া চলে।

অমলের বালিশের তলায় থাকে হিন্দোলার নিজের হাতের লেখা বাজার ফর্দ্দ,—আলু, কপি, পটোল,—মাছ,—

রুদ্রাক্ষের বালিশের তলায় থাকে কাগজে মোড়া হিন্দোলার মাথার ক'গাছি ছেঁড়া চুল ও হিন্দোলার শোবার ঘরের মেঝের ধূলা।

অমল খাতায় লেখে,—If winter comes can summer be far behind—

রুদ্রাক্ষ লেখে,—'তারা মা পরমেশ্বরী'—

এক বছর পরে।

অমল পরীক্ষা দেয় না। রুদ্রাক্ষ চাকরী ছাড়ে।

মেসের দেনা মিটেও মেটে না,—বেড়েই চলে।

হঠাৎ হিন্দোলার কাছে কে এসে দাঁড়ায়।

বাঙ্গালী সাহেব।

হিন্দোলা পরিচয় করিয়ে দেয়, My husband Mr. Sen, এক বৎসর Madrasএ ছিলেন।

সেন-সাহেব হিন্দোলার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চায়,—

হিন্দোলা হেসে বলে,—My helping neighbours.

সেন সাহেব সিগার-কেস বের ক'রে,—Have one—

না থাক্—রুদ্রাক্ষ বলে।

You?

খাই না—অমল বলে।

হিন্দোলা হাসে। গাল দুটিতে বেশ মিষ্টি টোল খায় বলে,—কালই Madras যাচ্ছি। গুড্ বাই,—

সেন-সাহেব হঠাৎ অমল ও রুদ্রাক্ষের হাত দুটো ধ'রে নাড়া দেয়,—Thanks!

মেসে ফিরে এসে অমল ডাকে,—রুদ্রাক্ষ দাদা!

রুদ্রাক্ষ ডাকে,—অমল, ভাই!

সংবাদ-সাহিত্য

দ্বিতীয় সংখ্যা পরিচয়ের 'অকৃতজ্ঞ' গল্পটি পড়িয়া আমরা লেখকের প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছি। পনেরো বৎসরের পুরাতন গল্পকে তিনি যে 'ধ্বংসস্তূপ' হইতে টানিয়া বাহির করিয়াছেন, এ জন্য তো বটেই—মেজবৌদির মুখে ঠাকুরপোর 'বাপ হওয়ার ক্ষমতা নেই' একথা প্রচার করিয়াও সর্ব্বসংস্কারমুক্তির পরিচয় দিয়াছেন। ফলে ঠাকুরপোর স্ত্রী বিনীতা স্বামীকে বলে—

'দেখ, ভূতের মুখে রামনাম শোভা পায় না। যে চেষ্টা কোরেও অসংযমী হতে পারে না, তার আবার সংযমের দাম কি? তোমার মত পুরুষত্ববর্জ্জিত লোকের ওসব কথা মুখে আনাই পাপ। . . . তোমায় এখন জিজ্ঞাসা করি আমি, কেন তুমি জেনে শুনে আমায় বিয়ে কোরে এমন ঠকালে? . . . . আমায় তুমি বিয়ে করেছিলে কি আমায় উদ্ধার করার জন্যে, না আমার বন্ধ্যাত্ব (!c) প্রচার কোরে তোমার পুরুষত্বহীনতাকে চাপা দিয়ে লোক-সমাজে তোমার মান বজায় রাখার জন্যে?'

—

কিন্তু অদ্ভুত লেখকের ক্ষমতা! ডাক্তারী ঔষধ যাহা পারে নাই, হকিমী দাওয়াই যেখানে হার মানিয়াছে, স্ত্রীর এই কথাগুলিই সেখানে আশ্চর্য্য কাজ করিল। তৎক্ষণাৎ পুরুষত্ববর্জ্জিত স্বামীর—

'নিষ্পেষিত প্রবৃত্তির চাপা-আগুন চোখের লেলিহান দৃষ্টিতে জ্বলিয়া বাহির হইল। দুই হাত বাড়াইয়া সে বিনীতার পানে অগ্রসর হইল।—'

কিন্তু কথায় বলে, শয়তানী thy name is woman. স্বামীর পুরুষত্ব পুনঃপ্রাপ্তিতে সুখী না হইয়া

'বিনীতা . . . . ছুটিয়া বাথরুমে গিয়া দরজায় খিল লাগাইয়া দিল।'

—

এখানেই গল্পের শেষ নয়। বিনীতা

'এই নীচপ্রাণ ভণ্ড লম্পটের সহবাসিনী'—মেজবৌদি ইহার পর কি বলিয়াছিলেন লেখক তাহা প্রকাশ করেন নাই—ইহাতে রাজী না হইয়া বিনীতা সটান্ বাপের বাড়ীতে একেবারে মামা সুজয়ের ঘরে।

'সুজয় চেয়ারে বসিয়াছিল।' বিনীতা বলিল—

'আমি তোমায় বলতে এসেছি যে তোমায় আমি খুব ভালবাসতুম। . . . . তোমাকে ভালবাসতুম স্বামীর মত। . . . . আমি শুধু তোমায় এই কথাটা জিজ্ঞাসা কোরতে চাই, তোমায় যদি আমায় ওই রকম কোরেই ভালো লেগে থাকে, সে দোষটা কি কেবল আমারই একলার? কেন তুমি ছেলেবেলা থেকে আমার কাছে পরিচিত ছিলে না? . . . . কেন তুমি হঠাৎ এলে আমার যৌবনোদ্‌গমের সেই অনন্ত-সম্ভাবনা-পূর্ণ সন্ধিক্ষণে যখন আমি প্রথম পুরুষের সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছি।'

কি ভীষণ নগ্ন সমস্যা! আমাদের মনেও গল্পের এই অংশ পাঠ করিয়া একটি সমস্যা জাগিয়াছে। ধরা যাউক, পিতা কন্যার জন্মের বছরখানেকের মধ্যেই স্বদেশী মামলায় ধরা পড়িয়া আন্দামানে গিয়াছেন। পনর বৎসর পরে তিনি ফিরিয়া আসিলেন। ঘরে মা ও মেয়ে থাকে, অন্য পুরুষ নাই। কন্যার বয়স ষোল। 'যৌবনোদ্‌গমের সেই অনন্ত-সম্ভাবনাপূর্ণ সন্ধিক্ষণে' যে 'প্রথম পুরুষের সম্বন্ধে' সে 'সচেতন' সে তাহার ওই পিতা। মামার ক্ষেত্রে যাহা ঘটিয়াছে পিতার ক্ষেত্রে তাহা ঘটিবে কি? সাহিত্যের অধ্যাপক মনস্তত্ত্ববিদ নীরেন্দ্রনাথ রায় ইহার জবাব দিবেন কি? দেখিতেছি, তিনিও পরিচয়ের লেখক-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

—

যাহা হউক, গল্পের শেষ এখনও হয় নাই। মামা সুজয় ভাগিনেয়ীর এতাদৃশ বিশ্রম্ভালাপ শ্রবণ করিয়া

'জামাটা কাঁধে ফেলিয়া বাহির হইতে যাইতেছিল, বিনীতা দরজায় পিঠ দিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—যাচ্ছ কোথায় তুমি? আরো অনেক কথা তোমায় শুনতে হবে। তুমি জান, এসব কথাগুলো তোমার কাণে কত খারাপ লাগছে, তোমার দিদির (বিনীতার মাতার) কাণে তা লাগবে না তোমার মত জামাই তিনি কামনা কোরতেন (উপ-জামাই নয় কেন ?) ।

সুজয় আর সহ্য করিতে পারিল না। দাঁত চাপিয়া রুদ্ধস্বরে কহিল—তুই এত নীচ, তোর মনে এত ময়লা যে তার কাদা দিয়ে তুই আমাদের সমস্ত সম্বন্ধকে ঘোলাটে করে দিচ্ছিস্ . . . . পথ ছাড়্।'

পাঠক ভাবিতেছেন বুঝি গল্পের শেষ হইল। আরো আছে—আরো সমস্যা আছে! এতো অন্য কাগজ নয়। এ যে পরিচয়! ইহাতে 'যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্মবাদ' ছাপা হয়। রবীন্দ্রনাথ মাসিক পত্রিকার ইভোলিউশন দেখাইয়া প্রবাসী হইতে ক্রমিক বিবর্ত্তনের ফলে ভারতী, সবুজপত্র এবং শেষ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ পত্রিকা হিসাবে 'পরিচয়'কে সার্টিফিকেট দিয়াছেন, ইহার সম্বন্ধে আশা এত সহজেই মিটিলে চলিবে কেন ?

'সেই রাত্রে একটা অস্পষ্ট গুমরাণির শব্দে জাগিয়া উঠিয়া সুজয় দেখিল, বিনীতা তাহার পায়ের কাছে মাথা রাখিয়া অঝোরে কাঁদিতেছে। তাহাকে জাগিতে দেখিয়া বিনীতা সুজয়ের পা দুখানি নিজের বুক দিয়া চাপিয়া ধরিয়া মুখ গুঁজড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কেবলই বলিতে লাগিল—জ্বলে গেলাম, আমি জ্বলে গেলাম।

ঘর অন্ধকার . . . . চারিদিক নিস্তব্ধ নিঃঝুম। তারি মাঝে বিনীতার এই অসঙ্কোচ আত্মনিবেদন—সুজয় সংযম হারাইল। বিনীতাকে সাদরে নিজের বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—এই যদি তোর মনে ছিল, রাক্ষুসী, আগে বলিস নি কেন ?'

একটি কথা এখানে মনে রাখিতে হইবে—বিনীতার স্বামীর নাম অপ্রকাশ; লেখকও অপ্রকাশ। তিনি স্বয়ম্ভূও বটেন। স্বয়ম্ভু

না হইলে অর্থাৎ পিতা মাতা মাসী পিসী ভাই বোন ইত্যাদি থাকিলে এ গল্প লেখা কঠিন হইত।

—

এই গল্প হইতে মানবমনের আর দুইটি দুজ্ঞের্য় রহস্যের সন্ধান দিয়া আমরা বিদায় লইব। উপরোক্ত ঘটনার কয়েক দিন পরে বিনীতার মাতা এবং সুজয়ের দিদি বিমলা সুজয়কে বলিলেন—

'আজ থেকে তোকে আর একলা শুতে দেওয়া হবে না, তুই আমার কাছে শুবি।'

বিমলার স্বামী মহেন্দ্র ইহাতে আপত্তি করিয়াছিলেন কি না প্রকাশ নাই।

দ্বিতীয় রহস্য 'নগ্নমূর্ত্তি' বিষয়ক। প্রশ্ন ও উত্তরগুলি হুবহু উদ্ধৃত করিতেছি—

প্রশ্ন। শিল্পীরা নগ্নমূর্ত্তি আঁকতে এত ভালবাসেন কেন?

উত্তর। মানুষের দেহটা তাঁদের চোখে এমনই সুন্দর যে কাপড় দিয়ে ঢেকে তার সর্ব্বাঙ্গীন পরিপূর্ণতাকে ক্ষুণ্ণ কোরতে তাঁদের সৌন্দর্য্যবোধে ঘা লাগে।

প্রশ্ন। তোমার এই কথাটা যদি সত্যি হয় তবে নগ্নমূর্ত্তির মধ্যে বেশীর ভাগই নারীদেহ হবার মানে কি?

উত্তর। মানে অনেক। প্রথমতঃ এই কথাটা আগে বলে নিই, আর্টে পুরুষ নগ্ন মূর্ত্তিও বড় কেল্‌না নয়।.... তবে নারীদেহ যে বেশী আঁকা হয়েছে, তার কারণ এক দল বলেন, ওরা নাকি বিবর্ত্তন ধারায় একধাপ এগিয়ে গেছে; কোন কোন বিশেষ অবস্থায় নারী পুরুষের চেয়ে সুন্দর। আমার কিন্তু মনে হয় চিত্রকরেরা পুরুষ এইটাই হচ্ছে আসল কারণ। নারীদেহের প্রতি একটা আকর্ষণ থাকা তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক।

প্রশ্ন। তাহলে যাঁরা নারীশিল্পী আছেন, তাঁদেরও ত পুরুষের প্রতি ওই রকম

একটা আকর্ষণ থাকা স্বাভাবিক। অথচ তাঁদের আঁকা একটাও নগ্নপুরুষ মূর্ত্তি আমার চোখে পড়ে নি।

উত্তর। তার কারণ নারী এখনও কোনখানেই সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে ওঠে নি। পুরুষের সম্বন্ধে তার মনোভাব এখনও অসংকোচ সরলতা ও শিল্পীর নিরপেক্ষ দৃষ্টি লাভ করে নি। সেই দিনই নারীর অন্তরের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে যেদিন পুরুষের সম্বন্ধে তার মনোভাব লজ্জা-ভয়-দ্বিধা-লেশ শূন্য হতে পারবে; যেদিন সে প্রাণ খুলে বলতে পারবে, পুরুষের শক্তি, পুরুষের সৌন্দর্য্য তার ভাল লাগে।

হায়রে দুর্ভাগা দেশ, এদেশে এমন একজনও 'লজ্জা-ভয়-দ্বিধা-লেশ শূন্য' নারী কি জন্মগ্রহণ করেন নাই যিনি শ্রীস্বয়ম্ভূ চক্রবর্ত্তীর একটি নগ্ন মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া 'যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্মবাদে'র লেখককে উপহার দিতে পারেন? তাহা হইলেই পরিচয়ের চরম হইত।

'কোন কোন বিশেষ অবস্থায় নারী পুরুষের চেয়ে সুন্দর।'—কোন্ কোন্ বিশেষ অবস্থায়?

—

ভাগিনেয়া যখন মামাবাবুকে অতিরিক্ত আদর করে তখন সে মামাবাবুকে 'মাম্ বু' বলিয়া ডাকে।

—

এই সংখ্যায় 'পরিচয়ে'ই সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা 'বর্ষপঞ্চক'—কবিতাটি এখনও ভাল মত আয়ত্ত করিতে পারি নাই, কারণ হাতের কাছে তেমন ভাল কোনও অভিধান নাই। তবে একটা বড় ভাবনায় পড়িয়াছি। কবিতাটির তিন ভাগ, পাঁচ নয়, সুতরাং আইনানুসারে ইহার নাম হওয়া উচিত ছিল, বর্ষত্রয়ক।

—

'চাল কড়াই ভাজা' রীতিমত চিবাইয়া খাওয়ার অভ্যাস যাঁহাদের নাই তাঁহারা এই কবিতা পড়িবার চেষ্টা করিলে ব্যথা পাইবেন, পরিচয়ের প্রারম্ভে এ কথার উল্লেখ করিয়া দিলে সম্পাদক মহাশয় সহৃদয়তার পরিচয় দিতেন। পূজ্যপাদ দত্ত মহাশয়ের পুত্রকে উচ্চ শিক্ষা দিবার প্রচেষ্টা যে বিফল হয় নাই এই কবিতাতেই তাহার পরিচয় আছে। সব কিছু মিলাইয়া দেখিতেছি—'পরিচয়ে'র 'পরিচয়' নাম সার্থক হইয়াছে।

—

আর একটি দৃষ্টান্ত দিলেই পাঠক পরিচয়ের 'পরিচয়তা' বুঝিতে পারিবেন। শুধু লেখা লইয়াই ইঁহাদের পরিচয় সমাপ্ত নয়, বংশ ও গোষ্ঠী-পরিচয় পর্য্যন্ত টানিতে ইঁহারা ইতস্ততঃ করেন না। পথের পাঁচালী ও অপরাজিত নামক উপন্যাসদ্বয়ের লেখক শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'মেঘ-মল্লার'-এর সমালোচনা প্রসঙ্গে পরিচয়ের কোনও ধুরন্ধর লিখিয়াছেন—

'উঁচুদরের গল্প লেখার যে প্রতিভা—যা আমাদের দেশে দুল ভ- -এই বইখানির মধ্যে তারই সন্ধান পাওয়া গেল। উৎসর্গ থেকে জানা যায়,—শরৎবাবু লেখকের মামা। তাঁর ভাষাসম্পদ উত্তরাধিকার সূত্রে হয়তো ইনি পেয়ে থাকবেন——'

দৈবদুর্ব্বিপাকে বিভূতিবাবুর এক মাতুলের নাম শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং এই মাতুলকেই তিনি গ্রন্থখানি উৎসর্গ করিয়াছেন। আর যায় কোথা, সঙ্গে সঙ্গে সমালোচকের সকল দ্বন্দ্ব ঘুচিয়া গেল, তিনি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। তিনি কিছুতেই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছিলেন না যে, বিভূতিবাবু এই অপরূপ ভাষা ও লিখনভঙ্গী কাহারও ভাগিনেয় বা পুত্র না হইয়া কেমন করিয়া পাইতে পারেন। যেমন উৎসর্গ-পত্র

দেখা, অমনিই সকল সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। পরিচয়েরও চূড়ান্ত হইল। একটা কথা—পশুপতি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কোনও মাতুলের নাম কি ম্যাথু আর্ণল্ড? নহিল এই অপরূপ সমালোচনা-শক্তি তিনি পাইলেন কোথা হইতে!

—

দ্বিতীয় সংখ্যার পরিচয় প্রসঙ্গে প্রথম সংখ্যার একটি কথা মনে পড়িল। বুদ্ধদেববাবুর গল্প-সমালোচনা করিতে গিয়া অন্য একজন ভট্টাচার্য্য (মেঘ-মল্লার ভট্টাচার্য্যের কেহ নহেন তো?) লিখিয়াছেন—

'বুদ্ধদেবের লেখায় এসে জুটেছে অতি অপ্রত্যাশিত একগাছা ছিপ—ভদ্রতাবিরুদ্ধ বিনানুমতিতে নায়িকারই পিতার পুকুরে মাছ ধরবার জন্য; সে মাছ আবার নিজের খাবার জন্য নয়!'

অনুপ্রাসের যুগে জিজ্ঞাসা করিলে ভাল হইত, তবে কি বাবার জন্য? কিন্তু বুদ্ধদেববাবু 'সাড়া' লিখিয়াছেন, এমন কথা তাঁহাকে বলিলে পাপ হইবে।

এ ভট্টাচার্য্য মহাশয় মাতুলের খবর দেন নাই বটে, কিন্তু ছিপ ও বঁড়শির সন্ধান রাখেন। বুদ্ধদেববাবু যে নিজের খাবার জন্য মাছ ধরেন না, ইনি তাহাও জানেন দেখিতেছি! কিন্তু এ যে বংশ-পরিচয় নয়, একেবারে আঁতের পরিচয়!

—

'পরিচয়'রূপ সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া আমরা কয়েকটি উপলখণ্ড মাত্র সংগ্রহ করিয়াছি—বিশাল সমুদ্র এখনও সম্মুখে পড়িয়া। রবীন্দ্রনাথের 'পত্রিকা', প্রমথ চৌধুরীর 'নীল-লোহিতে স্বয়ম্বর', কবিচূড়ামণিদের 'কবিতাগুচ্ছ' ও 'অনুবাদ', সমালোচক ধুরন্ধরদের 'পুস্তক-পরিচয়'—

কত নাম করিব ! বিধাতা মানুষকে এত দিয়াছেন—শুধু অমরতা দিলেন না কেন ?

ত্রৈলোক্যবাবুর 'কঙ্কাবতী'তে পড়িয়াছিলাম—মানুষ মরিয়া ভূত হয় এবং ভূত মরিয়া মার্ব্বেল হয়। 'ভারতী' মরিয়া 'সবুজ পত্র' এবং সবুজ পত্র মরিয়া 'পরিচয়' হইয়াছে কিন্তু ত্রেতাযুগের তাঁহার মত অজর অমর হইয়া বিরাজ করিতেছেন তিনি—যিনি শ্রদ্ধেয় অতুল গুপ্ত মহাশয়ের মতে রবীন্দ্রনাথকে বাংলা শিখাইয়াছেন। এ যুগে কদলীবন May Fair হইয়াছে।

—

সম্প্রতি অবনীনাথ রায় নামে এক ধুরন্ধর সমালোচকের উদয় হইয়াছে—তরুণদের 'পরস্পর পিঠ-চুলকানো সভা'র ইনি একজন মাতব্বর সভ্য হইয়া উঠিয়াছেন—তাহারা সকলে ইঁহার সমঝদারীর তারিফ করিতেছে। আমরাও করি, পাঠকেরা যাহাতে করিতে পারেন তজ্জন্য ইঁহার লেখার একটু নমুনা দিতেছি। শরৎচন্দ্রের 'শেষপ্রশ্নে'র বিরুদ্ধ সমালোচনার সমালোচনা করিয়া অবনীনাথ রায় বলিতেছেন—

'চাপা নিন্দার বিষাক্ত নিঃশ্বাসে আকাশ নীল হয়ে গেল (আগে বেশ গৌরবর্ণ ছিল)। পরিবাদের ব্যগ্র জিহ্বা হঠাৎ যেন একটা অবলম্বন পেয়ে একেবারে মুখর হয়ে পড়ল (যদিও জিহ্বা কোন অবলম্বন পেলে তাহা লেহন অথবা চোষণ করে, বৃথা বাক্যব্যয় করে না)।'

—

'দুঃখের বিষয় উপরের চার্জ্জগুলির সবিস্তার উত্তর দেওয়ার সময় আপাততঃ আমার হাতে নাই (কি দুঃখের বিষয়! কেবল সময় বলিয়াই ত!) যদি for the moment স্বীকার করে নিই যে, শরৎচন্দ্রের দ্বারা উপরের সবগুলি ত্রুটিই ঘটেচে, তা' হ'লেও একটা কথা বাকী থেকে যায়: . . . . তিনি অনেকগুলি অমূল্য রত্ন আমাদের উপহার

দিয়েছেন। এতে করেও কি তিনি আমাদের এতটুকু শ্রদ্ধা অর্জ্জন করেন নি? . . . . এ personal note-এর মধ্যে সমালোচনার যতটুকুই থাক, ব্যথা দেওয়ার চেষ্টা আছে তার চেয়ে বেশি। . . . . যাঁরা দেশের খণ্ড খণ্ড দুঃখ বুকের মধ্যে পুরে নীলকণ্ঠ হয়েছেন (বিষ রহিল বুকে, তবু নীলকণ্ঠ!), এবং তার অদ্ভুত interpretation দিলেন তাঁদের সম্বন্ধে সসম্ভ্রমে কথা বলার প্রয়োজন আছে বলেই মনে করি।'

সাহিত্য-সমালোচকের এই অবশ্য কর্ত্তব্যটি স্মরণ করাইয়া দিয়া তিনি 'শেষপ্রশ্নে'র স্বপক্ষে যে ব্রহ্মাস্ত্রটি ঝাড়িয়াছেন, তার ঠেলা সামলাইবে কে?—

'বিশ্বসাহিত্যের পরিধির ভিতর থেকে যদি কেউ কমলের মত দ্বিতীয় চরিত্র খুঁজে বার করতে পারেন, আমাকে তার সন্ধান দেবেন (অর্থাৎ বিশ্বসাহিত্যের মধ্যে এত foolish কীর্ত্তি যদি আরও থাকে)। নয় ত কমল অদ্বিতীয়ই থেকে যাবে।' আমরাও বলি, কেন বাপু, লেখাপড়া শিখিলেই কি দিঙ্গী হইতে হয়? চরিত্র মৌলিক হয় কিসে তাহা বুঝিবার জন্য ভক্তিযোগ অভ্যাস কর। নহিলে লেখাপড়া শিখিলেই কি সমালোচক হয় নাকি? 'বিশ্বসাহিত্যের পরিধি' দেখিয়াছ?—এ ঘুমন্ত বাঘকে খুঁচাইয়া তুলিবার কি দরকার ছিল? Sufficient unto the day is the evil thereof.

—

শ্রদ্ধাস্পাদ প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয় প্রবীণ এবং রবীন্দ্রনাথও নবীন নহেন। অগ্রহায়ণের প্রবাসীতে 'মাটির স্বর্গ' সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলিয়াছেন 'আমি গত শতাব্দীর মানুষ, আধুনিক নই সে কথা বলা বাহুল্য।' বলা বাহুল্য যে, সকল সময় নয়, তাহা তিনি এই কেতাব-সমালোচনাতেই প্রমাণ করিয়াছেন। গত শতাব্দীর প্রবীণদের সহিত তুলনায় আধুনিক কালের তরুণদের অশিষ্টতা লইয়া

দেখিয়া কোনও কবির সম্বন্ধে ভাল-মন্দ অভিমত প্রকাশ করিলেন ইহা ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু ইহা ঘটিতে পারে এরূপ কল্পনা করাও আমাদের পক্ষে কঠিন ছিল। রবীন্দ্রনাথের জবাবদিহি উদ্ধৃত করিতেছি—

সম্প্রতি দিলীপকুমার কয়েকটি কাঁচিছাঁটা পাতায় তাঁর আপন মন্তব্যের দ্বারা পরিকীর্ণ ক'রে বুদ্ধদেব বসুর ছয়টি কবিতা আমাকে পড়তে পাঠিয়েছেন। তার মধ্যে কয়েকটি কবিতা সবটা দেন নি। . . . . যে কয়টি কবিতা আমার সামনে এসে পড়েচে তার বাইরে নিশ্চয় আরো অনেক লেখা আছে। হয়তো কেবলমাত্র এই লেখাগুলি নিয়ে সমগ্রভাবে কবির বিচার করা সঙ্গত হবে না।

অদ্ভুত ভানুমতীর খেল্! রবীন্দ্রনাথ কি অপেক্ষা করিতে পারিতেন না? দিলীপকুমারকে কি লিখিয়া পাঠাইতে পারিতেন না, বাপু হে, তোমার 'মণি-মুক্তা' ও তদুপরি টীকা-টিপ্পনির সাহায্য ছাড়াও আমি কবিতা বুঝিতে পারি, ভগবান ততটুকু কাব্য-বুদ্ধি আমাকে দিয়াছেন। তুমি গোটা গন্ধমাদনটি আমার নিকট হাজির কর, বিশল্যকরণী ইত্যাদি আমিই বাছিয়া লইব। বুদ্ধদেববাবু সম্বন্ধে কিছু বলিবারই যদি ছিল, তাঁহার সমগ্র রচনা সংগ্রহ করা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে দুরূহ হইত না। কবিতা তো 'রেডিয়মণ্ডো' নয়, যে, আমি ব্যবহার করি নাই, অমুকে ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়াই প্রশংসাপত্র দিয়া রবীন্দ্রনাথ নিষ্কৃতি পাইতে পারেন। যাহা তাঁদের জীবনের একমাত্র সাধনার বস্তু তাহার বেলায়ই এই ফাঁকি রবীন্দ্র-ভক্তেরা কি করিয়া সমর্থন করিবেন? শুধু অপমান হইয়াছে অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের। শিখারও যে কচিৎ অধোগতি হয় এই প্রথম দেখিলাম।

—

[illegible] সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথের আর একটি কথা প্রণিধানযোগ্য। 'আমার ক্ষণিক অবকাশ পাট বিক্রের টাকার মত।' বর্তমানে

দেখিতেছি, রবীন্দ্রনাথের ক্ষণিক অবকাশই নয়, সমগ্র জীবনটাই পাট বিক্রির টাকায় এবং পাটোয়ারী বুদ্ধিতে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। মাল যাচাই করিয়া বাজারে ছাড়িবার সময় তাঁহার নাই।

—

রবীন্দ্রনাথের 'বনবাণী' বাহির হইয়াছে। যে দেশে পঞ্চাশোর্দ্ধে বনে যাওয়াই রীতি এবং যেখানে রবীন্দ্রনাথ 'ক্ষণিকা'য় যৌবনেই বানপ্রস্থ অবলম্বনের পক্ষে ওকালতী করিয়াছেন, সেখানে ৭০-এর কোঠায় 'বনবাণী' বহুবিলম্বিতই বলিতে হইবে। এই পুস্তকে গাছ-গাছড়ার বন্দনা দেখিয়া ভরসা হইতেছে ইহাই বুঝি কবি-রাজ মহাশয়ের শেষ বাণী!

—

কোনও মানুষ যখন সুস্থ ও সবল থাকিতে থাকিতে দেহত্যাগ করে, আমরা দুঃখ করিয়া বলি লোকটার অকাল-মৃত্যু হইল। পূর্ণ আয়ুষ্কাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকিলে স্বভাব-ধর্ম্মবশে তাহাকে বিগলিতদন্ত পলিতকেশ ও লোলচর্ম্ম হইয়াই মরিতে হইবে, তাহাতে দুঃখ করিবার কিছু নাই। এবং একথাও কোন দিনই সত্য হইবে না যে, বিগলিত-দন্ত, পলিতকেশ লোলচর্ম্ম পূর্ণপরিণত মানুষ সৌন্দর্য্যের মাপকাঠিতেও সুন্দরতর। যেমন দেহের ক্ষেত্রে. কবিতার ক্ষেত্রেও তেমনই, আয়ুর পরিমাপে পূর্ণতর মানুষের কবিতাও তাহার দেহের মত বিগলিতদন্ত, পলিতকেশ ও লোলচর্ম্ম হইবে। তাহার যৌবনকালের সৌন্দর্য্যের মতই যৌবনকালের কবিতাও হইবে পূর্ণাঙ্গ। অতিপরিণত বয়সে নকল দাঁত ও কলপের মত শুধু ছন্দমিল ও তথ্যের প্রলেপ দিয়া কবিতাকে বড় করিতে যাওয়ার ন্যায় হাস্যকর প্রয়াস আর কি হইতে পারে?

দৃষ্টান্তস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের দুটি কবিতার উল্লেখ করিতেছি। একটি অগ্রহায়ণের 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত প্রথম কবিতা 'নাতবৌ', দ্বিতীয়টি অগ্রহায়ণের 'মৌচাকে' প্রকাশিত প্রথম কবিতা 'উদ্বোধন'।

'নাতবৌ'কে কিঞ্চিৎ বে-আব্রু করিয়া দেখাইতেছি—

আরো সে করুণ তরুণ তনুর সঙ্গীতে
দেখেছি তাহারে পরিবেষণের ভঙ্গীতে
স্মিত মুখীমোর লুচি ও লোভের দ্বন্দ্বে সে।

বলো কোন্ ছবি রাখিব স্মরণে অঙ্কিত,
মালতী-জড়িত বঙ্কিম বেণী-ভঙ্গিমা?
দ্রুত অঙ্গুলে সুরশৃঙ্গার ঝঙ্কৃত?
শুভ্র সাড়ির প্রান্তধারার রঙ্গিমা?
পরিহাসে মোর মৃদু হাসি তার লজ্জিত,
অথবা ডালিটি দাড়িমে আঙুরে সজ্জিত,
কিম্বা থালিটি থরে থরে ভরা সন্দেশে?

মিল ও অনুপ্রাসের ব্যর্থ কসরৎ ইহাতে আছে—বাঁধানো দাঁত ও কাবুলী কলপের মত। কিন্তু কাব্য? রবীন্দ্রনাথ যৌবনে এই ধরণের নারী-বন্দনা লিখিয়াছেন—'উর্বশী' 'নাতবৌ' না হইলেও নারী—

* * *

মুক্তবেণী বিবসনে বিকসিত বিশ্ববাসনার,
অরবিন্দ মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার
অতিলঘুভার।

—

তব স্তনহার হতে নভস্তলে খসি পড়ে তারা
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষমাঝে চিত্ত আত্মহারা
নাচে রক্তধারা।
দিগন্তে মেখলা তব টুটে আচম্বিতে
অয়ি অসম্বৃতে!

পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের চিত্তে নারীর যে চিত্র ফুটিয়া উঠে তাহা শুধু ছন্দ ও মিলের কারসাজি নয়—এই কবিতার প্রাণবস্তুর ছোঁয়াচ লাগিয়াই পাঠকের চিত্ত মুগ্ধ হয়। কিন্তু 'নাতবৌ' কবিতায় সে প্রাণ কোথায়? শুধু ফাঁকা কথার আওয়াজে কাব্যসৃষ্টি হয় না। হইলে, শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় কাব্যমার্গে বংশ-পরিচয় জীবন্ত করিয়া যাইতে পারিতেন।

—

এতকাল পরে বৃদ্ধ বয়সে নাতবৌয়ের কল্যাণে নয়া তরুণ রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যে 'শৃঙ্গার' শব্দ ব্যবহার করিলেন। উত্তম। কিন্তু 'অঙ্গুলে শৃঙ্গার' কি বস্তু?

—

দ্বিতীয় কবিতা, উদ্বোধন। এই কবিতাটি সম্পূর্ণ পাঠ করিয়াও যে আমার মৃত্যু হয় নাই, এইটাই সবচাইতে আশ্চর্য্য ঠেকিতেছে। এই কবিতা সম্বন্ধে অধিক আর কিছু বলিবার নাই, কবিতাটি হুবহু উদ্ধৃত করিতেছি—

উদ্বোধন

তিনকড়ি। তোলপাড়িয়ে উঠল পাড়া
তবু কর্ত্তা দেন না সাড়া।
জাগুন শিগ্‌গির জাগুন।

কর্ত্তা। এলারমের ঘড়িটা যে
চুপ রয়েছে, কই সে বাজে,
তিনকড়ি। ঘড়ি পরে বাজবে এখন ঘরে লাগল আগুন।
কর্ত্তা। অসময়ে জাগলে পরে
ভীষণ আমার মাথা ধরে,
তিনকড়ি। জান্‌লাটা ঐ উঠ্‌ল জ্বলে উর্দ্ধশ্বাসে ভাগুন।
কর্ত্তা। বড্ড জ্বালায় তিনকড়িটা,
তিনকড়ি। জ্বলে যে ছাই হোলো ভিটা
ফুটপাথে ঐ বাকী ঘুমটা শেষ করতে লাগুন।

গোপালদা শুনিয়া বলিলেন, মোদের মুয়ে আগুন। গোপালদা স্বভাব-কবি। সঙ্গে সঙ্গে এই আদর্শে যে কবিতাটি লিখিয়াছেন, তাহাও না ছাপিয়া পারিলাম না। গোপালদা কবিতাটির নাম দিয়াছেন,—

ছেলে ঘুমলো পাড়া জুড়লো বর্গি এল দেশে

তিনকড়ি। বন্ধ রাখুন কলম-নাড়া
হলেন দেখি খোকার বাড়া,
দোহাই শুয়ে পড়ুন।
কর্ত্তা। ভাব রয়েছে খিলুর মাঝে,
বন্ধ হয় না কলমটা যে
তিনকড়ি। হয় কি না হয় দেখিই আমি, পালঙ্কেতেই চড়ুন।
কর্ত্তা। কেন জ্বালাস্‌ এমন করে,
ভাবের চাপে মারবি ওরে—
তিনকড়ি। কর্ত্তা তোমার হল কি আজ হচ্ছ ক্রমেই তরুণ!

কর্ত্তা। মিলগুলো সব জুটছে মিঠা,

তিনকড়ি। থামাও দেখি বকুনিটা,

লিখ্‌ছ যত দশা তোমার ততই হচ্ছে করুণ।

শুধু 'করুণ' নয়, করুণতম!

—

'রমেশদার আত্মকথা'র পরেই বোমারু বারীনদার 'আত্মকাহিনীর কয়েকটি পাতা'—বিজলীতে ঝিলিক মারিতেছে! শুনিয়াছিলাম, বারীনদা গভর্ণমেণ্টের লোক, বিশ্বাস হয় নাই। এখন দেখিতেছি, তাহাই সত্য। তবে এরও আবার রকমফের আছে—সরস কেচ্ছা লিখিয়া দেশের আশা-ভরসা তরুণদের চরিত্র নষ্ট করিবার ভার গভর্ণমেণ্ট বারীনদার হাতে দিয়াছেন। বারীনদা ভাল কাজ করিতেছেন!

—

বোমার-কাহিনীও কি অপরূপ ও সরস হইতে পারে বারীনদার 'আত্মকাহিনীর কয়েকটি পাতা' পড়িবার পূর্ব্বে কে তাহা কল্পনা করিতে পারিত? এ যেন পল্‌কা নাচিতে নাচিতে মৃত্যু-অভিসার! যে বন্ধুর বাড়ীতেই যান, যে গুরুর কাছেই দীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশে গমন করেন, চিকের অন্তরালে বলয়িত একখানি হাত প্রতীক্ষা করিতেছে, টান মারিলেই হাতের মালিক একেবারে বুকের উপর আসিয়া পড়িবে। ভাতের থালা হাতে পরিবেষণের উদ্দেশে যাঁহারা আসিতেছেন, তাঁহাদেরও মুখে হাসির ইঙ্গিত! বারীনদা যাহাকে বলে একেবারে প্রেম-কপালে! যে যুগে বোমার ইতিহাস এমন সরস ছিল সে যুগে যে দেশশুদ্ধ বাঙ্গালী বোমারু হইয়া যায় নাই এইটাই বিচিত্র!

বারীনদার বোমা-প্রেমের অনেকগুলির মধ্যে একটি বিবৃত করিতেছি—বারীনদার ভাষাতেই—

ঢাকায় এসে আমার জীবনের অন্তঃপুরে ঢুকলেন তাঁর অনবদ্য লাবণ্যে যৌবন-কান্তিতে চারিদিক আলো করে আর একটি মেয়ে। তারও নাম ধাম বলার উপায় নেই।

কি অদ্ভুত chivalry ! সেই মেয়েটির স্বামী ও আত্মীয়েরা যদি জীবিত থাকেন, তাঁহারাও কিছুতেই বুঝিতে পারিবেন না, কাহাকে কেন্দ্র করিয়া বারীনদার এই কাহিনী ! উঁচু দুটি দাঁতেও নয় !

—

মেয়েটি ছিল তন্বী, কিশোরী, নাতি দীর্ঘ, বিপুলকুন্তলা, সত্য সত্যই হরিণ নেত্রা যাকে বলে। রং ছিল তার গায়ের ঠিক দুধে আলতার, দুটিতে (?) কি যে অতল আলো গভীরতার ডাক ছিল তা বলে শেষ করা যায় না—সেই গভীর আলো চোখের উপর সুখের (?) চোখের পাতা দুটি উঠলে সারা প্রাণখানা আঁটু পাঁটু (?) করে তার দিকে ছুটে যেতে চাইতো।

নিজে এসে আমার কাঁধের ওপর ঝুকে পড়ে সুগন্ধি চুলের পরশ দিয়ে সে আমার সর্ব্বনাশটা করলো, মাথাটা ঘুরে যাবার যেটুকু বাকি ছিল তা শেষ করে দিল তার ঐ ভুবনবিজয়ী চোখের আড়ে আড়ে সলাজ সত্রাশ (?) চাহনী। ব্যস ! সেই থেকে আমাদের দুজনার সর্ব্বনাশ হয়ে গেল। তার পর থেকে ছয় মাস ধরে চললো দু'টি তৃষিত প্রেমার্দ্র দেহ প্রাণ দুজনের পরস্পরের ওপর ব্যাকুল হয়ে আছাড়ি পিছাড়ি। অবাধ প্রচুর অবসর, ভোগ করলেই হয়, তবু আমাদের কিসে যেন আটকাতে লাগল—দেহ সম্ভোগ হ'লো না হ'লো শুধু দেহের খেলাভূমি ঘিরে দুজনকে ছুয়ে বুকে নিয়ে প্রেমের পাগল ঢেউ তোলা।

—

দেহ-সম্ভোগ যদি সেই দিন হইয়া যাইত তাহা হইলে এত বৎসর পরে আমাদিগকে এই দুর্ভোগ ভুগিতে হইত না ! তখন কি

হকিমী দাওয়াইয়ের প্রচলন অথবা চরক-সুশ্রুতের পুনর্জাগরণ এদেশে হয় নাই?

—

আমার ঢাকায় আসার দু একমাস পরেই বোধ হয় একদিন হঠাৎ তার ঘন ঘন বমি হতে লাগল, মাথা ঘুরে শরীর কেমন করতে আরম্ভ করলো। সে বাড়ীতে একজন মুসলমানী রাঁধুনী ছিল, সে মিটি মিটি হাসছে দেখে আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, 'হাসছিসস্ যে? বেচারীর অসুখ করেছে আর তুই কিনা হাসছিস্।' রাঁধুনী চোখ টিপে আমাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বললো, 'অসুখ কোথা? তুমি যেমন হাবা মনিষ্যি, দিদিমণির খোকা হবে গো, খোকা হবে।' শুনে হঠাৎ আমার ভিতরটা কি যেন আঘাত পেয়ে গুটিয়ে কুঁকড়ে গেল, ব্যথায় মনটা মূক হয়ে রইল। যে এমন ভাবে সর্ব্বস্ব ঢেলে নিবিড় প্রেমে আমার হয়েচে তার গর্ভে আর একজনের সন্তান!

এ যে হুবহু 'পঙ্কতিলক'! ঢাকার চারুবাবুর প্লট কি তাহা হইলে বারীনদাই জোগাইয়াছেন? 'ভিতরটা গুটিয়ে কুঁকড়ে গেল'—বারীনদা লিখিতে ভুলিয়াছেন, ভিতর ছাড়িয়া সেই 'কুঁকড়ে' যাওয়া ভাব এখন তাঁহার মগজে পৌঁছিয়াছে। অতর্কিতে বোমা ফাটিয়া সে-যুগে ত অনেকে মরিয়াছেন শুনিয়াছি, কিন্তু—

—

তারপর আমাদের প্রেম সকল বাঁধ ভেঙ্গে চললো অনিবার্য্য গতিতে সব ক্ষইয়ে ফেলবার—সব কেড়ে নিবার দিকে; একদিন গভীর রাত্রে কামনার বশে অসহায় হয়ে আমরা দেহ ভোগের খুব কাছাকাছি গিয়ে কোন গতিকে আত্মরক্ষা করলুম।

এইখানে বারীনদা একটি কথা একটু ঘুরাইয়া লিখিয়াছেন, পুরুষসুলভ লজ্জায়। এজন্য তাঁহাকে দোষ দিই না। 'কোন

গতিকে আত্মরক্ষা করলুম' স্থলে হইবে 'কোন গতিকে আত্মরক্ষা হইয়া গেল!'

—

ধোমা ফাটিয়াই বীমা! শুনিয়াছি বারীনদা কোনও বীমা-কোম্পানীকে বুড়া বয়সে মাল্যদান করিয়াছেন তাই আজ তাঁহাকে বীমার ভাষাতেই জিজ্ঞাসা করি—একটি পলিসি তিনি কয়জনকে assign করিবেন?—যে পলিসি আবার paid up!

—

১লা অগ্রহায়ণের 'সম্মিলনীতে' রসচক্রের এক চক্রীর একটি প্রেরিত পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, চিঠিটি রসে ও চক্রান্তে সমান মধুর। হয়তো শনিবারের চিঠির প্রসঙ্গ-কথা লেখক ভুল করিয়াছেন, হয়তো বিশ্বপতি-বাবুর দিকে অকারণে তিনি আকৃষ্ট হইয়াছেন, তাই বলিয়া রসচক্রের দোষ ক্ষালন হইতেছে কিরূপে! দিন আট নয় পূর্ব্বে উপাসনার সম্পাদক সাবিত্রীবাবুর সহিত নাট্যনিকেতনের হল্-ঘরে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। তিনি বলেন, সমালোচনা প্রেসে দিবার পূর্ব্বে রসচক্রের রসিকদের সম্মুখে (কালিদাস বাবু ও বিশ্বপতিবাবু সেইদলে ছিলেন) পড়া হয়। তাঁহারা সকলেই এই সমালোচনার সমর্থন করেন। এই কথা আমরা পূর্ব্বেও জানিতাম। তাছাড়া সমালোচনার নীচে 'সে' থাকিলেই কি বুঝিতে হইবে তাহা কালিদাস রায় অথবা বিশ্বপতি চৌধুরীর লেখা নয়—নন্দগোপাল সেনেরই লেখা? এক কালিদাস বাবুই তো সহস্র নামে লিখিয়া থাকেন! নন্দগোপাল সেন কি ফিরিঙ্গি? 'ন' না লিখিয়া 'সে' লেখেন কোন্ রীতিতে?

যাহাই হউক অপরাধ স্বীকার করিতেছি যে, 'সে' দেখিয়া আমাদের

প্রোপ্রাইটার ও কুক স্বয়ং 'সেই চিরপরিচিত গিরীশ চক্রবর্ত্তী'কেই মনে পড়িয়াছিল।

রসচক্রের পত্রলেখক মহাশয় তাঁহার চিঠির চক্রান্তে কিঞ্চিৎ রস-সংযোগও করিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন, 'শনিবারের চিঠির ডাকহরকরা ব্যঙ্গরসিকতার ঘুঙুর বাজিয়ে বাঁই বাঁই করে ছুটেছেন—।' আমাদের পাড়ায় ডাকহরকারারা এখন পর্য্যন্ত পায়ে খাকি পটি বাঁধিয়াই আসে, হয়ত বা রসচক্রে ঘুঙুর পরিয়াই 'চিঠি' ডেলিভারি দেয়, কিন্তু বাঁই বাঁই শুনিয়া কিঞ্চিৎ গোলোযোগ ঘটিতেছে। ঘুঙুরের সঙ্গে 'ঘুরে ফিরে'র চাটনি পরিচিত বটে, কিন্তু 'বাঁই বাঁই' চিত্রটি অভিনব। তবে রসাধিক্যে আসর ছাড়িয়া ঘুঙুরের পশ্চাদ্ধাবন করিলে পলায়নপর 'ঘুঙর বাজিয়ে বাঁই বাঁই করে' ছোটাটা সম্ভব বটে।

পরিচয়-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা বা বর্ষপঞ্চক সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, দৃষ্টান্ত না দিলে তাহা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। কবিতাটির অন্যান্য সকল গুণ ছাড়িয়া দিলেও অনঙ্গরঙ্গ, প্রচ্ছন্ন যৌনতত্ত্ব, বাজীকরণ ও ধাত্রীবিদ্যার পাচন হিসাবে ইহার কবিরাজী মলা অসাধারণ।

১। ধ্বংসের কালিমাক্লিষ্ট নগ্ন নিঃস্ব বৈধব্য গোপন

২। অচুম্বিতা কুমারী গালে

যন্ত্রস্থ লজ্জার রাগ প্রথম প্রগল্‌ভ নিমন্ত্রণে,

তোরাও বিলীন হবি সম্ভোগের সার্থকলগ্নে

পাণ্ডু শ্লথ তপনের নিরুপায় নিস্তীর্ণ হিক্কারে

অকস্মাৎ।

৩। ঊর্দ্ধশ্বাস মিলন-উল্লাল।

৪। উলঙ্গ বল্লরী

আস্বচ্ছ কপিশবস্ত্র রিক্তবক্ষে টানিছে শিহরি

৫। অঙ্কুরিছে আচম্বিতে হর্ষোত্থিত নব রোমরাজি

৬। প্রাচীন দৌর্ব্বল্য মোর … … …

… … থাক ঝরকে ঝরকে টুটেলুটে

সর্ব্বভুক্ রমনীর ব্যয়কুণ্ঠ রহস্য সম্পুটে

বিস্মৃতির গুহাগর্ভে।

৭। সৃজন বেদনাস্ফীত পীত তার উর্ব্বর জরায়ু

৮। কুহকী কুলটা

… … … …

তনিমার সলীল ভঙ্গীতে

আত্মদান্ বিনিময়ে করিবে কি স্মিত অঙ্গীকার

সে তপ্ত কাঞ্চনদেহে … … …

৯। কৃতীর পবিত্রাসনে করিবো ক্লীবের অভিষেক

১০। ভাবিবো মহৎ বুঝি নিরিন্দ্রিয় বন্ধ্যার সংযম

১১। হবে না নির্ব্বাণ কভু নপুংশের (?) নির্ব্বিঘ্ন ভুবনে

এতদ্ব্যতীত, 'অমিতির নিশ্চিহ্ন অয়ন' 'ব্যূহবদ্ধ শরীরের ঘনঘোর ছায়াপাত' 'লগ্ননিষ্ঠ গড্ডলিকা' 'উদ্বাস্ত বলাকা' 'শূন্য প্রপঞ্চক' 'জীষ্ণু সেনা' 'ত্রস্নু বিভীষিকা' 'নৈর্ব্যক্তিক হাহাকার' 'ভাবালুসঙ্গীত' 'পরাস্তের দুর্জ্জেয় বিজয়' 'পদের ভৃগুরেখা' ইত্যাদি বহুৎ মজা আছে। এই ধরণের কঠিন কাব্যকে অতি দুঃসাহসের সহিত নাড়াচাড়া করিতে হয়। আমরা সে দুঃসাহস দেখাইব না। শুধু কয়েকটি প্রশ্ন আমাদের মনে জাগিয়াছে, সেইগুলিই নিবেদন করিব।

১। 'অচুম্বিতা কুমারীগাল'—কুমারী স্ত্রীলিঙ্গ কিন্তু তাহার গাল স্ত্রীলিঙ্গ কেন?

২। 'সৃজনবেদনা স্ফীত পীত তার উর্ব্বর জরায়ু'—

যে ভদ্রমহিলার 'ফোলা' স্তনের কথা প্রথম সংখ্যা পরিচয়ে বুদ্ধদেব-বাবু লিখিয়াছিলেন, ইনি কি তিনিই?

৩। 'করিবো ক্লীবের অভিষেক'—

তিনি যে ক্লীবেদেরই অভিষেক করিয়াছেন প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা পরিচয়ের পাতায় পাতায় তাহার পরিচয় আছে। তাঁহার এ অভিলাষ কোন্ complex-এর অন্তর্গত?

৪। 'নিরিন্দ্রিয় বন্ধ্যার সংযম—'

বন্ধ্যার ইন্দ্রিয় থাকে কি না তাহা অভিধানে লেখা থাকে না জানি, কিন্তু সুধীন্দ্রবাবু এতবড় ভুলটা করিবার পূর্ব্বে একটু অনুসন্ধান করিলেন না কেন?

৫। 'পদের ভৃগুরেখা'—

সুধীন্দ্রবাবুর পদের ভৃগুরেখা কোন্ জ্যোতিষী দেখিয়াছেন?

কবিতার অভিনন্দন কবিতা দিয়াই করিতে হয়, আমরাও চার লাইন কবিতা লিখিয়া সুধীন্দ্রবাবুকে অভিনন্দনকরতঃ জানাইতেছি—ভগবান শব্দকোষ তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন!

কুমুদ্বব কুন্দেন্দীব খ্যাতিহারা ব্রহ্মনিভ
কিংকর্ত্তব্যমূঢ় ধুন্ধুমার,
উষবুধ উষরীব উচ্চৈঃস্তম হয়গ্রীব
কটিঙ্কর কর্ব্বর হুঙ্কার!

দিলীপকুমার ভক্ত মাতৃসাধক ও কবি। তিনি 'মা'কে নানা মূর্ত্তিতে নানা ভঙ্গীতে দেখিতেছেন ও সকলকে দেখাইয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতেছেন। সম্প্রতি তিনি জননীর 'সঙ্গীতমুখরা' 'মূর্ত্তি' দেখিয়া কণ্টকিত হইয়াছেন। আমরাও হইলাম। বাল্যকালে একবার 'কটাক্ষময় কুক্ষি' দেখিয়াছিলাম,

যৌবনে 'কণ্ঠলীনা বীণা' দেখিয়াছি, আজ দিলীপবাবুর কল্যাণে 'সঙ্গীতমুখরা মূর্ত্তি'ও দেখিলাম। এইবার তাঁহার 'নৃত্যচঞ্চল কর্ণ' দেখিবার আশায় উদ্বাহু হইয়া রহিলাম। ভগবান্ কবে আশা পুরাইবেন ?

—

কবি দিলীপকুমার অন্যত্র আক্ষেপ করিয়াছেন 'খুব কম কবিই বিধাতার কাছ থেকে 'নাল্পে'-র অভীপ্সা নিয়ে জন্মায়। দিলীপ-কোষে আর একটি শব্দ যোজনা হইল—'নাল্প'। অনেক ভাবিয়াও যখন নাল্পের কূল-কিনারা না পাইয়া হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া বসিয়াছিলাম সেই সময়ে গোপালদা হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, 'ওটা হল 'যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি'-র 'নাল্পে'। বাপ্! ভূমা, কি, না 'নাল্প'! কিন্তু ওটা ত 'ন অল্প' নয়, ও যে 'ন অস্তি'। বেচারা সংস্কৃতভাষা! তা হোক্, এ যে স্বয়ং দিলীপকুকার! এবার আমাদের নকবি দিলীপ নবিলম্বে নমুখর হইলে যে আমরা নাল্প আনন্দ লাভ করিয়া বাঁচি!

—

অগ্রহায়ণের স্বদেশে বাউণ্ডুলে কবি শ্রীসুকুমার সরকার প্রেমের মুসাফির হইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,

কামনার কাপালিক ঘুরি আমি যৌবন-চঞ্চল
নিখিল নারীর দ্বারে নিত্য চলি প্রেম-মুসাফির!

ছন্দরক্ষার জন্য 'ফির' কথাটা 'চৈবতুহি'র মত কবিকে অকারণে ব্যবহার করিতে হইয়াছে, আসলে তিনি প্রেম-মুসা! স্বভাববশে অনেক কিছুই কুন্দদন্তে ছিন্নভিন্ন করিয়াছেন। প্রেম-বিল্লি না আসা পর্য্যন্ত এইরূপই থাকিবেন।

—

ঐ সংখ্যাতেই নারী-জগৎ-মিত্র শ্রীজগৎ মিত্রের আকাশ ও সমুদ্র।

প্রতিমা কে অতিক্রম করেই নারীর একটি মানসী-মূর্ত্তি আমার মধ্যে জেগে উঠলো।

অতিক্রম সম্ভবতঃ ইংজেরী—cross শব্দের প্রতিশব্দ!

অগ্রহায়ণের বিচিত্রায় সম্পাদকীয় 'নানা কথা' আমরা দেখিয়াছি। বিচিত্রা-সম্পাদক মহাশয় আমাদের পৌষ সংখ্যার 'প্রসঙ্গ কথা'ও আশা করি দেখিবেন!

জয়ন্তী

মোরগ-লড়াই ভালই তো নয় বল্‌ছে যত বোষ্টমে,
বুনিয়াদের জমিদারী ঘুচ্‌বে এবার অষ্টমে ;
প্রভু এবার প্রবুদ্ধ,
গণ্ডূষে খাও সমুদ্র—
সুখ করেছ অষ্টপোয়া পড়্‌বে এবার কষ্টমে।

ওগো প্রভু, আজো সমান চল্‌ছে তোমার স্বজন তো,
ভুলেছ তদ্ধিত প্রত্যয়, ভুল্‌চ কেন নিজন্ত !
সকল ভাতি প্রতিভার
ভস্ম হ'ল চমৎকার,
ছাই ফুঁড়ে কি জল্‌ছে আগুন করছ এত বীজন তো !

নিজেই পড়লে নিজের কলে এমনই ললাট-লিখন যে,
খোস্-খেয়ালে বল্‌ছ, 'পাহাড় ডিঙাও'—পঙ্গু ও খঞ্জে।
সাম্‌নে এল বাহাত্তর,
দেখ্‌ছি শুধু তাহার তোড়্‌,
ঘুচ্‌বে না কো মনের কালি অহমিকার ও-[illegible]ঞ্জে।

ধোঁয়া-জমাট মেঘ ঢেকেছে নিত্যকালের সূর্য্যকে,
ঢাক পেটানোর বহর দেখে চিত্তবীণার সুর ধোঁকে !
শূদ্র ক'রে মন্ত্র পাঠ
তুল্‌ল বুঝি [illegible]-পাট !
অনেক কাণ্ড করলে প্রভু, একটি কেবল 'হুঁ'র ঝোঁকে।

খাল কাটিয়া বান ঢোকালে সরস্বতীর অন্দরে,
এখন কেন নাক ঢাকিয়া হাঁক্‌ছ, 'লাগে গন্ধ রে!'
বয়স-ভুলে করলে কি,
টান্‌লে কোলে সব মেকি!
ভিড়্‌ল তোমার সোনার তরী হায়, বেনামী-বন্দরে!

আসল যাহা রবেই তাহা, হচ্ছ কেন ভয়ার্ত্ত,
নাই রহিল ছন্দ-দোদুল, রইল তোমার পয়ার তো!
পাহাড়-প্রমাণ পাষাণ-ভার,
সব কি ধরে হীরার ধার?
চৌদ্দ আনা তাহার প্রভু জন্ম নিলই ক্ষয়ার্থ।

বুঝ্‌লে না কো তফাৎ আছে এ বিশ্বে আর ও বিশ্বে,
গণৎকারও বল্‌তে নারে কি আছে ছাই ভবিষ্যে!
যশের নেশা কম ক'রে
থেকেই দেখ দম ধ'রে—
কোপ্তা-পোলাও অনেক খেলে সার কর আজ হবিষ্যে।

মৃত্যু তোমায় জয় করিছে তাই হতেছে জয়ন্তী,
শকুনি চিল হুক্কাহুয়া জুট্‌ল এসে অগণ্‌তি!
হট্টগোলের মাঝখানে,
মন যে তোমার লাজ মানে,
এতই জানো, জানো না 'ঘর পায় না অতি-ঘরন্তী।'

রক্তজবা

সমস্ত দ্বিপ্রহর অফিসের খোলা দরজার পথে উর্দ্ধে ধূম্রকলঙ্কিত লঘু খণ্ডমেঘাচ্ছাদিত আকাশ এবং নিম্নে ইটকাঠরাবিশ ও পুরাতন লোহে ভরাট অতীতের কারবালা পুষ্করিণীর বর্ত্তমান অসমতল বীভৎস রূপ ও তাহারই আশেপাশের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অট্টালিকা এবং নোংরা বস্তির ছাদ দেখিতে দেখিতে মন অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই বন্ধুর ভূমিখণ্ডের মাঝখানটায় পূর্ব্বসমৃদ্ধ জলাশয়ের ভারাক্রান্ত জলাবশেষ যেখানে পঙ্কশয্যায় বাষ্পবুদ্বুদের দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছিল—রৌদ্রক্লান্ত মোটবাহী গাড়ীর মহিষগুলি দ্বিপ্রহরে আজিও বপ্রক্রীড়ায় যে পঙ্কিল জলভাগকে আলোড়িত করিতে দ্বিধা করে নাই—তাহাও এখন আর দেখা যায় না, জমীর মালিক সম্মুখে ঘর তুলিয়া সে আরাম-টুকুকেও অন্তরাল করিয়া দিয়াছে। সম্মুখের বস্তির মেথরদের অপোগণ্ড শিশুরা বহুকষ্টে সংগৃহীত অর্থে ক্রীত বিয়ারের বোতল লইয়া ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে এখন আর প্রত্যেকে এক একটি ছোট্ট মাটির খুরি ও ঘুগ্‌নির চাট লইয়া মৌতাত করিতে বসে না, চারিদিকে প্রাচীর উঠিয়াছে, তাহারা হয় তো দেয়ালের ওপারেই রোজকার মত মৌজ সারিয়া লইয়াছে। বিশ্বকর্ম্মাপূজা কবে শেষ হইয়া গিয়াছে, আজ ঘুড়ি উড়াইয়াও কেহ চোখের অবকাশ সৃষ্টি করে নাই। একটা এরোপ্লেন ও একটা দিক্‌ভ্রষ্ট মাতাল ফানুষ ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে কিছুক্ষণের জন্য মনকে বিভ্রান্ত করিয়াছিল। আজিকার খোরাক সেইটুকুই।

পাশের কামরার দপ্তরীরা আমার অফিসঘরের সম্মুখের খোলা মেটে বারান্দায় তাহাদের উদ্বৃত্ত দুইখানা চৌকি ফেলিয়া রাখিয়াছিল

তাহারই একটাতে বসিয়া বসিয়া দেখিতেছিলাম ধোঁয়াটে নীল আকাশে কেমন করিয়া আসন্ন শীতের কুয়াশায় ম্লান কালো অন্ধকার নামিয়া আসে। মাথাটা একটু ধরিয়াছিল। পূর্ব্ব দিগন্তের পটভূমিতে টালিছাদওয়ালা তেতালা বাড়ী এবং আমার অতি প্রিয় নিষ্পত্র অষ্টাবক্র বৃক্ষপঞ্জরটিও যখন ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইয়া গেল, তখন পশ্চিম দিগন্তে মুখ ফিরাইলাম। ধোঁয়া আর অন্ধকারের পীড়নে পশ্চিমাকাশের রঙের শেষ আমেজটুকুও মিলাইয়া আসিতেছিল; ভূতপূর্ব্ব ডাফ হোষ্টেলের বিপুলায়তন কোণাটা খাড়া পাহাড়ের মত চোখের সামনে ধীরে ধীরে কালো হইয়া রেখামাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া গেল। বসিয়া বসিয়া দেশের বর্ত্তমান দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিতে লাগিলাম। দুশ্চিন্তার পর দুশ্চিন্তা মাথায় ভিড় করিয়া চোখের পাতাকেও ভারী করিয়া তুলিতে লাগিল—ভাগ্যে বিদেশী তখন তোলা উনুনটায় কয়লা দিয়া আগুন ধরাইয়াছে—ধোঁয়ার বন্যাস্রোত আমার মাথার উপর দিয়া চলিয়া যাওয়াতে আমার মাথাটা একটু হালকা হইল। ভাবনার তবু বিরাম নাই। ভাবিতে লাগিলাম—রাউণ্ডটেবল কনফারেন্স তো ফাঁসিয়া গেল, মহাত্মা গান্ধী দেশে ফিরিতেছেন। আবার আইন-অমান্য স্থরু হইবে; খবরের কাগজগুলা পড়িয়া মনে হয়—নেতারা জনসাধারণকে উপদেশ দিবার জন্য কেহই বাহিরে থাকিবেন না। যিনি দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে বিদ্রোহী অপদার্থগুকে শাসন করিয়াছেন বাঙলাদেশের ভাগ্যে তিনিই আসিলেন গবর্ণর হইয়া! এমনিতেই তো বেকার বাঙালী যুবকের ভাবনার অন্ত নাই—অর্ডিন্যান্স-প্রপীড়িত দেশে তাহারা কি নিশ্চিন্তে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে? ভাবিতে ভাবিতে ব্যবসাবাণিজ্যের দুর্গতির কথা, সাহিত্য বেচিয়া এই দুর্দ্দিনে অন্নসংস্থানের কথাও মনে হইল। হাসিয়া, দাঁত দেখাইয়া, মুখ ভ্যাংচাইয়া, সমালোচকের চাবুক হাতে

রসসৃষ্টি ও রসভঙ্গ করিবার সময় আর থাকিবে না—'শনিবারের চিঠি'কে হয় তো ভিন্ন মূর্ত্তি ধরিতে হইবে—তা'ছাড়া, কাগজ কিনিয়া পড়িবে কে? ভাবিয়া ভাবিয়া ভাবনা-সমুদ্রে কোনই কূলকিনারা দেখিলাম না। হঠাৎ ছেলেটার কথা মনে হইল, কাল পা পিছলাইয়া ফুটন্ত ভাতের ফ্যানে পড়িয়া তাহার বাঁ হাতখানা পুড়িয়া গিয়াছে—বড় কষ্ট পাইতেছে। হয় তো কাঁদিতেছে, এখানে এইভাবে বসিয়া আবোল-তাবোল চিন্তা করার চাইতে তাহাকে কোলে লইয়া বসিলে হয় তো সে কিছু আরাম পাইবে—চুরুটের শেষটুকু যতদূরে পারি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া উঠিতে যাইব হঠাৎ একটা প্রচণ্ড থাবা কাঁধের উপর পড়িল, ভারী গলায় কে যেন বলিল—এই যে কেবলরাম ভায়া, ঠিক ধরেছি কিন্তু—

চমকাইয়া উঠিলাম, রামদাদার গলা। ঘাড় ফিরাইয়া দেখি রামদাদাই বটেন। অপরূপ মূর্ত্তি। সযত্নবিন্যস্ত চুল, সুন্দর ফর্সা মুখ, টিকলো নাক এবং পরিপাটি করিয়া ছাঁটা ছুঁচলো চাপদাড়ি—রূপকথার রাজপুত্র বলিয়া ভ্রম হইল। খালি পা, গরদের ধুতি এবং সমস্ত দেহ বেড়িয়া একটি গরদের চাদর। সসম্ভ্রমে প্রণাম করিয়া রামদাদাকে জড়াইয়া ধরিলাম। মনে হইল দাদার মস্তিষ্কবিকৃতি কে যেন মায়ামন্ত্রে দূর করিয়াছে; আনন্দের আবেগ ধরিয়া রাখিতে পারিলাম না। চাদরের ভিতরে দাদার বাঁ হাতটা সজোরে চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, রামদা, তুমি? দিদি কোথায়?—দাদা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া বাঁ হাতটি সন্তর্পণে চাদর হইতে বাহির করিয়া দেখাইলেন। কব্জি হইতে আঙুল অবধি ব্যাণ্ডেজবাঁধা। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে দাদার দিকে চাহিলাম, শান্ত ম্লান হাসি হাসিয়া তিনি বলিলেন, পরে শুনবি, সে অনেক কথা।

আমি বলিলাম, দিদি?

রামদাদা কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, দিদি নেই। আমৃত্যু

তিনি আমার কল্যাণ কামনা করে গেছেন, মৃত্যুর পরপারে থেকেও—ওই দ্যাখ্—

ধোঁয়াটে কালো আকাশের বক্ষ ভেদ করিয়া একটা খসিয়া পড়া তারা প্রচণ্ডগতিতে জ্বলিতে জ্বলিতে নীচে নামিতেছিল। দাদা বলিলেন, আমি রোজই দিদিকে দেখতে পাই।

বুঝিলাম মাথার গোলযোগ এখনও আছে, তবু ভাল লাগিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি হঠাৎ আমার কাছে এলে যে! আমি যে এখানে আছি তোমায় কে বললে?

রামদাদা দপ্তরীদের সেই জীর্ণ চৌকিতেই আসনপিঁড়ি হইয়া বসিলেন ও ঢুলিতে ঢুলিতে বলিতে লাগিলেন, মা বলেছেন। তিনিই আমাকে তোর কাছে পাঠিয়েছেন। তোকে তাঁর প্রয়োজন আছে।

—মা?

—হ্যাঁ, মা, মহাকালী, কালভৈরবী! দ্যাখ্, তোদের কাগজের ওপর থেকে মুরগীর ছবিটা সরাতে হবে, মা বলেছেন মুরগীর বদলে রক্তজবা।

হেমন্তের ধোঁয়াটে সন্ধ্যায় খোলা আকাশের নীচে বসিয়া আমার মনে যে চিন্তা অস্পষ্ট ভাবে উদিত হইয়াছিল, রামদাদার কথা যেন তাহাকেই স্পষ্ট রূপ দিল—মুরগীর বদলে রক্তজবা!

আমি কথা কহিলাম না। বিহ্বলভাবে দাদার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। দাদা বলিলেন, অবাক হচ্ছিস্?

সম্মুখের খোলা মাঠটায় ব্যগ্র দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া দাদা কি যেন খুঁজিতে লাগিলেন। আমাদেরই দরজার পাশে প্রাচীর তুলিবার জন্য ভিৎ খুঁড়িয়া একদিকে অনেকখানি মাটি ঢিপি করিয়া রাখা হইয়াছিল, সেই দিকে দক্ষিণ করাঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া দাদা বলিলেন—সামনের জায়গাটাও কি তোর এলাকায়?

বিস্মিত হইয়া বলিলাম, না, কেন বল তো ?

দাদা বলিলেন, ওখানে সারি সারি রক্তজবার গাছ লাগাতে হবে। রক্তজবা না হলে মায়ের পূজো হবে না। সারা বাঙলাদেশে রক্তজবার গাছ বেশী নেই, মায়ের পূজো হবে কিসে ?

হায়রে! সেই রামদাদাই আছেন। উট্‌রামের টুপির বদলে রক্তজবা! আমাকে নীরব দেখিয়া রামদাদা যেন একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন, বলিলেন, এ জায়গার মালিক কে ?

আমার হাসি পাইল, বলিলাম, মহেন্দ্র শ্রীমানি। কেন বল তো ?

দাদা বলিলেন, জায়গাটা লীজ নিতে হবে। জবা ফুলের চাষ করব।

শুধু ধোঁয়া আর টকাঠ দেখিয়া আজ ডুপুর বেলায় যে ভাবে পীড়িত হইয়াছিলাম তাহাতে মনে হইল, আমার ঘরের সম্মুখে থরে থরে রক্তজবা ফুটিয়া থাকিলে সময় মন্দ কাটিবে না। কথাটা ঘুরাইয়া দিবার জন্য বলিলাম, দাদা, তোমার হাতে কি হয়েছে তা তো বললে না ? হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা কেন ?

দাদা যেন হঠাৎ ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিলেন, বলিলেন, হঃ, ভুলেই গেছলাম, বাইরে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে, তোকে এখনই যেতে হবে।

—কোথায় যেতে হবে ?

—মায়ের কাছে। তোকে দীক্ষা নিতে হবে। তোর ভাগ্য ভাল, মা স্বয়ং তোকে স্মরণ করেছেন। ওঠ, আলোয়ানটা নে, অনেক দূরে যেতে হবে।

থতমত খাইয়া বলিলাম, কোথায় ?

দাদা আমার কথার জবাব না দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, গাড়ীতে যেতে যেতে বলব, কই ঘরে চাবী করলিনে ?

গত্যন্তর না দেখিয়াও বটে, আবার কতকটা কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়াও বটে দরজায় চাবী লাগাইয়া আলোয়ান কাঁধে দাদার অনুগমন করিয়া ট্যাক্সিতে গিয়া উঠিলাম। দাদা হুকুম দিলেন, চালাও, সোজা ঝিনিদহ। তেল আছে তো পায়জী?

পায়জী পাগ্‌ড়ী খুলিয়া আবার বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল, জী হুজুর!

ঝিনিদহ? বনগাঁ ছাড়িয়া যশোর, যশোর ছাড়াইয়া ঝিনিদহ। আজ পাগলের পাল্লায় পড়িয়া বেঘোরে মৃত্যু নিশ্চয়। খোকার এই অবস্থা, বাড়ীতে একটা খবরও দিতে পারিলাম না।

রাত্রি তখন সাড়ে সাতটা। শীতের রাত্রে সামান্য আলোয়ান ছাড়া গরম কাপড় ছিল না। গাড়ী হু হু করিয়া ছুটিয়াছে—হঠাৎ আক্রান্ত বাতাস ঝড়ের বেগে কানে ও গায়ে লাগিয়া কাঁপুনী ধরাইয়া দিল. কোনও রকমে নিজেকে ঢাকিয়া ঢুকিয়া বসিলাম। চুরুট ধরাইবার প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও চুপ করিয়া থাকিতে হইল—রামদাদা পাগল হইলেও তাঁহার সম্মুখে অতটা বেয়াদপি করিতে পারিলাম না।

বেলগাছিয়া, দমদম—রাস্তার আলো ঝাপ্‌সা—পথ জনবিরল হইয়া আসিতে লাগিল, গাড়ীর হেড্‌ লাইটে সম্মুখবর্ত্তী পথের সন্ত্রস্ত ব্যাঙ্‌ প্রভৃতি নিরীহ জানোয়ারদের চাঞ্চল্য, মন্থরগতি গাড়ীর গরু ও মহিষদলের চোখের বিহ্বল দৃষ্টি দেখিতে দেখিতে চলিলাম, পিছনে ধূলির ঝড়।

বারাসত। শৃগালের আর্ত্ত চীৎকার, পথের দুইধারে দুটি ইটের মিনার মাথা খাড়া করিয়া আছে—ডাহিনে বিস্তীর্ণ ধানের ক্ষেত দূরে রেল লাইন পর্য্যন্ত বিস্তৃত—বৃহৎ সরীসৃপের মত আলোকিত বক্ষপঞ্জর লইয়া একটা ট্রেন ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে কলিকাতার দিকে চলিয়া গেল।

রামদাদা এতক্ষণ কথা কহেন নাই, আমার বাম হাতখানি তাঁহার ডান হাতের মুঠির মধ্যে ধরিয়া তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পড়িয়াছিলেন—হঠাৎ স্বপ্নোত্থিতের মতো চোখ মেলিয়া সোজা হইয়া বসিলেন, আমার দিকে চাহিয়া গম্ভীর গলায় কহিলেন—সেই হিপ্‌নটিজমের ভাষা, চক্ষে সেই স্বপ্নাভাস—আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনিতে লাগিলাম।

দত্তপুকুর, গোবরডাঙ্গা—কৃষ্ণা চতুর্থীর চাঁদ তিমির-স্নান সারিয়া কুয়াশাক্লিষ্ট আকাশ ভেদ করিয়া একটা খণ্ডিত সুবৃহৎ অগ্নিগোলকের মত নিরালম্বভাবে অন্ধকারে কাঁপিতেছে—হঠাৎ দেখিলে বোধ হয় যেন অন্ধকার আকাশের পূর্ব্ব-উত্তর সীমান্তে বনভূমির ঠিক শীর্ষদেশে আগুন ধরিয়া গিয়াছে।

রামদাদা বলিতে লাগিলেন,—তিন ঘণ্টা পূর্ব্বে আমি যখন এই পথ দিয়া এই গাড়ীতেই কলিকাতা যাইতেছিলাম তখন দিনের আলোক ছিল, লোকালয়ের উপরিভাগে দোদুল্যমান ধূম্রপুঞ্জ ও পথের ধূলি তখন দৃষ্টিগোচর ছিল, গাড়ীটার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখিতে পাইতেছিলাম, অসীম অনন্ত পথে যাত্রা করিয়াছি এই ভাব কিছুতেই মনে আনিতে পারি নাই কিন্তু এখন আমি মনে করিতেই পারিতেছি না যে, পৃথিবীর ধূলিকঙ্করাস্তীর্ণ বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া আমরা ছুটিয়াছি, মনে হইতেছে, সীমাহীন শূন্যে ওই সন্তরণশীল নিঃসঙ্গ চন্দ্রের মত চলিয়াছি, প্রচণ্ড আমার গতি, কিন্তু লক্ষ্য সুনির্দ্দিষ্ট। কোথায় চলিয়াছি জানিস্?—মহাকালীর মন্দিরে। এই অবস্থায় তোর মনে করিতে কষ্ট হইবে না যে, সে মন্দির এই ধরার ধূলির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, এই হতভাগ্য বাঙলায় নহে—অসীম শূন্যে ওই নিবিড় তমিস্রার রাজ্যে মায়ের পূজাবেদী, উলঙ্গিনী মা আমার শাণিত খড়্গে অন্ধকার মহিষাসুরকে খণ্ড বিখণ্ডিত করিতেছেন, কবন্ধ অন্ধকারের রক্তধারায় কালো আকাশ লাল হইয়া

গেল—সেই ধারা গলিয়া গলিয়া পড়িতেছে ধরার ধূলায়—রক্তজবার গাছে রক্তজবা থরে থরে ফুটিয়া উঠিল। মায়ের খড়্গাঘাতে ছিন্নবিছিন্ন তিমির-রাক্ষসের রক্তধারায় মায়ের পূজা করিতে হইবে, মায়ের পূজার একমাত্র উপচার—রক্তজবা।

কাল ভোরে যখন ঘুম ভাঙিল, বিছানায় উঠিয়া বসিয়া চোখ রগড়াইয়া মাকে আমার ঠিক সম্মুখে প্রত্যক্ষ করিলাম—দিনের আলোকে মা আমার তিমিরবরণী। ম্লান করুণ তাঁর দৃষ্টি, হাতে খড়্গ নাই, বরাভয়ও নাই, ভিক্ষাপাত্রও ছিল না, কিন্তু ভিক্ষার আকৃতি ছিল। অত্যন্ত ক্ষীণকণ্ঠে মা বলিলেন, বৎস, আমি আসিয়াছি, তোর ঘুম এখনও ভাঙিল না। অন্ধকার অরণ্যগর্ভে অসহায় অবস্থায় পড়িয়া পড়িয়া আমি যুগযুগান্ত ধরিয়া কাঁদিতেছি, আমার শিরে মন্দিরের আবরণ নাই, আমার পূজাবেদী ধূলায় মিশিয়াছে। আমি ক্ষুধিত, বহুকাল পূজা পাই নাই। ভক্ত সন্তানেরা আমায় বিস্মৃত হইয়াছে। আমার পূজোপচার সংগ্রহ করিতে গিয়া কবে যে সেই তাহারা অরণ্যে পথ হারাইল, আজিও পথ খুঁজিয়া পাইল না। সন্তানের জন্য পথ চাহিয়া চাহিয়া আমার নয়নের অশ্রু শুকাইল, চক্ষু অন্ধ হইল, আমার স্তনদুগ্ধ ক্ষরিয়া ক্ষরিয়া অরণ্যের ধূলি-কঙ্করে নদী বহিল, অরণ্যের শৃগাল সারমেয় আমার বক্ষের সেই পূত দুগ্ধধারা লেহন করিয়া গেল, আমার সম্মুখের প্রশস্ত পথ—দুর্ভাগ্য সন্তানদল যেপথ আজিও খুঁজিয়া পাইল না—আমারই চোখের সম্মুখে ধীরে ধীরে কণ্টক-গুল্মে অপরিসর হইতে হইতে দুর্ভেদ্য বনভূমিতে বিলীন হইয়া গেল—আমি প্রতীক্ষা করিতে করিতে পাষাণ হইয়া গেলাম।

বৎস, কেমন করিয়া জানি না, আজ আমার মোহ নিদ্রা ভাঙিল, জাগিয়া দেখিলাম হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য-প্রদেশে আমি একা পাষাণ

দেহ লইয়া পড়িয়া অছি—সমস্ত বনভূমি ব্যাপিয়া যেন একটা আর্ত্ত হাহাকার ধ্বনি উঠিয়াছে, আমার মনে হইল, আমার কোলের সন্তান কোথায় যেন ধূলায় পড়িয়া কাঁদিতেছে। মা হইয়া স্থির থাকিতে পারিলাম না। বহুকষ্টে সেই দুর্গম বনভূমি ভেদ করিয়া পথ করিতে করিতে ক্ষতবিক্ষত চরণে আমি আসিয়াছি, তুই রামচন্দ্র—পাদস্পর্শে নয়, পূজা-নিবেদন করিয়া পাষাণী জননীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা কর.। রক্তজবায় মায়ের পূজা করিতে পারিবি কি?

—পারিব, বলিয়া মায়ের চরণ জড়াইয়া ধরিতে গেলাম, পাষাণ মেঝেতে আঘাত পাইলাম। কোথায় মা? কিন্তু মা যে সত্যই আসিয়াছিলেন, তাঁহার চরণের রক্তরেখা আমার মেঝেতে পড়িয়াছে। আমি উন্মাদের মত মাকে খুঁজিতে বাহির হইলাম। কে সন্ধান দিবে?—

বনগ্রাম পার হইয়া গেল, কপোতাক্ষীর শীর্ণ জলধারা চকিতে চন্দ্রকিরণে ঝলসিয়া উঠিল। রামদাদার চক্ষু দুইটি আগুন শিখার মত জলিতে লাগিল, সেই চোখের দৃষ্টি আমাকে বাহিরের সকল অনুভূতি হইতে দূরে লইয়া গিয়াছিল। পাঁয়জী শীতে কাঁপিতেছিল কিন্তু আমার কিছুমাত্র শীত লাগিতছিল না।

রামদাদা বলিতে লাগিলেন, রাত্রে বিভূতি মাষ্টারের সঙ্গে দেখা! তাহাকে মায়ের আগমন সংবাদ দিলাম। সে বলিল, মা কোথায় আছেন, সে বলিতে পারে। ব্যাকুল আগ্রহে বিভূতিকে জড়াইয়া ধরিলাম, বলিলাম শীঘ্র বল, আমাকে এখনই যাইতে হইবে। আজ সমস্ত দিন আমি মায়ের সন্ধানে পথে পথে বৃথাই ঘুরিয়াছি। বিভূতি বলিল, সে শুনিয়াছে, মা ঝিনিদহের কাছে এক গভীর জঙ্গলে পড়িয়া আছেন।

আমি আর অপেক্ষা করিলাম না, গাড়ী করিয়া সমস্ত কলিকাতা শহর তোলপাড় করিয়া খুঁজিয়াও সেইরাত্রে কোথায়ও রক্তজবা সংগ্রহ করিতে পারিলাম না—মা আমাকে রামচন্দ্র বলিয়াছেন, বাড়ী হইতে একটা খড়্গ সঙ্গে লইলাম—তারপর—

যশোর, ঘুমন্ত শ্মশানপুরী, ঝিনিদহ।—দুই পাশে গভীর অরণ্য—আব্ছা অন্ধকারে বিরাট প্রাচীরের মতো দেখাইতেছিল। অন্ধকার তখন ফিকা হইয়া আসিয়াছে, গাছে গাছে পাখীদের পক্ষবিধূনন শব্দ—বনভূমিতে ঈষৎ চাঞ্চল্য সুরু হইয়াছে।

গাড়ীর বেগ মন্দীভূত হইয়া আসিল। শেষে এক সঙ্কীর্ণ মেটে পথের উপর আসিয়া গাড়ী থামিল। রামদাদা বলিলেন, নাম্।

গাড়ী হইতে নামিতেই অত্যন্ত শীত বোধ হইতে লাগিল। তখন প্রায় ভোর হইয়াছে। পূর্ব্বাকাশে আবীরের ছোপ। রামদাদার অনুসরণ করিয়া ভিজা ধূলার উপর পদচিহ্ন অঙ্কিত করিতে করিতে কষ্টে পথ চলিতে লাগিলাম। পথ সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর হইতে লাগিল, শেষে অরণ্যভূমি যেন দুই কণ্টকবাহু বিস্তার করিয়া একেবারেই পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। রামদাদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারিদিকে লক্ষ্য করিয়া চলিতে চলিতে এক জায়গায় আসিয়া থামিয়া গেলেন। বলিলেন, মা এই পথে আসিয়াছিলেন। দেখিতেছিস্?

কোথায় পথ; নিরেট বনভূমি!

রামদাদা হঠাৎ গুঁড়ি মারিয়া সেই নিবিড় কণ্টক-বন ভেদ করিয়া চলিতে সুরু করিলেন, আমি বহু কষ্টে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলাম। জুতার আবরণ সত্ত্বেও পা ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল। এক স্থানে পিছন ফিরিয়া রামদাদা বলিলেন, দেখিতেছিস্, এই কাঁটা-বনে মায়ের পায়ের রক্তচিহ্ন? মা আমার এই পথে কত কষ্টে যে হতভাগা

সন্তানের খোঁজে বাহির হইয়াছিলেন বুঝিতে পারিতেছিস্! দুই এক স্থলে কণ্টকাগ্র সত্যই লাল। রক্ত হইতেও পারে।

কিয়দ্দূর চলিয়া একস্থানে আসিয়া সম্মুখে একটি ভগ্ন ইষ্টকস্তূপ চোখে পড়িল। সেই ইষ্টকস্তূপের সন্নিকটে পৌঁছিয়া রামদাদা থামিলেন। সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, কেবলরাম, এই মায়ের মন্দির, পায়ের জুতা খুলিয়া ফেল্।

জুতা খুলিয়া অতি সন্তর্পণে সেই ইষ্টকস্তূপের উপরে উঠিলাম। উঠিয়াই যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিদ্যুৎ স্পন্দিত হইল। ভয়-ভক্তি মিশ্রিত এক অদ্ভুত ভাব আমার মনে সঞ্চারিত হইল। আমি সেইখানে দাঁড়াইয়া ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিলাম। দেখিলাম—কে যেন সদ্য সদ্য সেই স্থানের কণ্টকলতা অপসারিত করিয়াছে। পরিষ্কৃত স্থানে ধূলার উপরে এক সুবৃহৎ কালো পাথরের কালীমূর্ত্তি—স্থানে স্থানে ভগ্ন, কর্ত্তিতনাসা এবং তাহারই চতুর্দ্দিকে যুগান্তসঞ্চিত শুষ্ক ধূলির উপরে চাপ চাপ রক্ত জমাট বাঁধিয়া রক্তজবার মত পড়িয়া আছে। এক পাশে রক্তমাখা একটি খড়্গ। রামদাদা ততক্ষণে বামহস্তের ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া ফেলিয়া হাতটি আমার সম্মুখে প্রসারিত করিলেন। আতঙ্কিত বিস্ময়ে দেখিলাম বামহস্তের পাঁচটি অঙ্গুলি কর্ত্তিত, এবং সঙ্গে সঙ্গে নজরে পড়িল, একটি অঙ্গুলি তখনও দেবীর পাদমূলে পড়িয়া আছে, বাকী চারিটি সম্ভবত শৃগাল-কুকুরে লইয়া গিয়া থাকিবে। আমার ভয়চকিত মূঢ় ভাব দেখিয়া রামদাদার মুখে অদ্ভুত হাসি ফুটিয়া উঠিল—অকস্মাৎ আমাদের দুই জনের মধ্যে যেন যুগান্তের ব্যবধান ঘটিল। সেই যুগান্তের ওপার হইতে রামদাদা বলিতে লাগিলেন—রক্তজবা যখন পাইলাম না, তখন আপনার দেহরক্ত নিবেদন করিয়া মায়ের পূজা করিলাম, কিন্তু হায়,

পাষাণী মা আমার এখনও জাগিলেন না। রক্তজবা চাই কেবলরাম, তুমি রক্তজবা আন, আমি মায়ের পাষাণ দেহে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিব— বলিতে বলিতে উন্মাদ রামদাদা অকস্মাৎ ধূলি হইতে রক্তমাখা খড়্গটি তুলিয়া লইয়া আপনার কণ্ঠে আঘাত করিতে উদ্যত হইলেন, আমি সবলে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলাম। রামদাদার হাত হইতে খড়্গখানি কাড়িয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিলাম। উন্মাদ রামদাদার আয়ত চক্ষু দিয়া দরদরধারে জল ঝরিয়া পাষাণদেবীর পাদমূল সিক্ত করিয়া দিল।

দীনবন্ধু-সংখ্যা

গত ১৭ই কার্ত্তিক রায় বাহাদুর দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের মৃত্যু-বার্ষিকী দিবস গিয়াছে। তিনি ১২৮০ সালে ঐ তারিখে পরলোক গমন করেন। এই উপলক্ষ্যে আমরা শনিবারের চিঠির একটি বিশেষ 'দীনবন্ধুসংখ্যা' বাহির করিব স্থির করিয়াছিলাম। ঈশ্বর গুপ্তের যোগ্য শিষ্য, বঙ্কিম-চন্দ্রের প্রিয় সুহৃদ নীলদর্পণ ও সধবার একাদশী প্রণেতা দীনবন্ধুর নাম বাঙালী পাঠক ভুলিতে বসিয়াছেন। আমরা যে একটি বিশেষ সংখ্যা বাহির করিয়াই এই চোরাবালির দেশে দীনবন্ধুকে প্রতিষ্ঠা দিতে পারিব তাহা আশা করি না। তবু আমাদের তরফ হইতে আমাদের কর্ত্তব্য আমরা করিব। নামাকরণে একটু বিলম্ব হইয়া গেল। পৌষ সংখ্যায় দীনবন্ধুর নাটক ও কাব্যের সমালোচনা ও বহু অপ্রকাশিত রচনা প্রকাশিত হইবে। দীনবন্ধু সম্বন্ধে যদি কাহারও বিশেষ কিছু বলিবার থাকে আগামী ১০ই পৌষের পূর্ব্বে তিনি তাহা প্রবন্ধ বা পত্রাকারে শনিবারের চিঠির সম্পাদকের নামে পাঠাইলে বাধিত হইব। আগামী ১৬ই পৌষ দীনবন্ধুসংখ্যা শনিবারের চিঠি বাহির হইবে। শনিবারের চিঠির অন্যান্য লেখাও যথারীতি ইহাতে থাকিবে। এই কারণে এই সংখ্যা পত্রিকা আকারে কিছু বড় হইবে—নগদমূল্য কিছু বাড়িতেও পারে।

শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ৩২।৫।১ বীডন ষ্ট্রীট, শনি-রঞ্জন প্রেস হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পৌষ ১৩৩৮

Deeno Bundhoo Mitter

দীনবন্ধু মিত্র

জন্ম— ... চৈত্র, ১২৩৬

মৃত্যু— ... কার্ত্তিক, ১২৮০

৪র্থ সংখ্যা] পৌষ, ১৩৩৮ [৪র্থ বর্ষ

দীনবন্ধু

গত শতাব্দীর বাংলা-সাহিত্যে বঙ্কিম মাইকেলের যে যুগ বাঙ্গালীর কবি-প্রতিভার অভিনব উন্মেষের পরিচয় বহন করিয়া এ সাহিত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে—যে যুগে বাঙ্গালী বিজাতীয় শিক্ষার প্রভাবকে আত্মসাৎ করিয়া নিজের জাতীয়তা ও জীবনীশক্তির জয় ঘোষণা করিয়াছিল—স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র সেই যুগের সেই সাহিত্যের অন্যতম যুগন্ধর। তাঁহার প্রতিভায় এমন একটি মৌলিক শক্তি ও সৃষ্টি-নৈপুণ্যের পরিচয় আছে, যাহার আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব, কোনও সাহিত্যের উৎকৃষ্ট প্রেরণা কোথা হইতে রস সঞ্চয় করে—এবং জাতির জীবনের সঙ্গে জাতীয় সাহিত্যেব যোগ বিচ্ছিন্ন না হইলে

সাহিত্য-সৃষ্টি কোন্ পথে কি পরিমাণ সত্যকার এবং সহজ সাফল্য লাভ করিতে পারে। গত যুগের সাহিত্য সম্বন্ধে যতই আলোচনা করি ততই একটা সত্য আমরা কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারি না যে, এই সাহিত্যের সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ এবং গৌরবের কারণ, এ যুগে বাঙ্গালী বাহিরের আক্রমণে অভিভূত হইয়াও স্বকীয় প্রতিষ্ঠাভূমিকে দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করিবার শক্তি হারায় নাই—এ সাহিত্যে বাঙ্গালীর বাঙ্গালিয়ানা নানাছন্দে নানারূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। তাই, আজিকার উন্নত আর্ট-সর্ব্বস্ব সাহিত্য-চর্চ্চার দিনে যখন আমরা আত্মভ্রষ্ট হইয়া, কায়ার পরিবর্ত্তে ছায়া ও ভাবের পরিবর্ত্তে অভাবকে সাহিত্যের উপাদানরূপে বরণ করিয়া, সত্যকার রসিকতার পরিবর্ত্তে কাল্চারের অভিনয় করিতেছি, তখন এই বিগত যুগের সাহিত্যে কোনও শক্তি, কোনও প্রতিভার পরিচয় আর পাই না; তাই কালচারে মর্কট-লীলার অভিমানে যে বাঙ্গালী আজ লাঙ্গুল-দৈর্ঘ্যে দেহ-দৈর্ঘ্যের আস্ফালন করে, তাহার মতে এ-যুগের সাহিত্য সাহিত্যপদবাচ্যই নয়। ইহার কারণ, বাঙ্গালী সাহিত্যকে স্ব-জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছে; জাতির জীবন হইতে ব্যক্তির জীবনকে পৃথক করিয়াছে; দেশকাল পাত্রের দাবীকে অস্বীকার করিয়া রস-পিপাসাকে ভূমি হইতে ভূমায় তুলিয়াছে। দীনবন্ধুর সাহিত্যিক-প্রতিভা এই ভাবের এমনই প্রতিকূল যে, আজিকার দিনে তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে হইবে। খুব সংক্ষেপে বলিতে গেলে ইহার একমাত্র কারণ, আজিকার সাহিত্য-বিলাসীরা এ-কালের বাঙ্গালীও নহেন; এবং দীনবন্ধু সেকালের হইলেও চিরকালের বাঙ্গালী। ইংরেজি সাহিত্যের আধুনিকতার অভিমানে আজ যাহারা সাহিত্য-ক্ষেত্র মুখর করিয়া তুলিয়াছে তাঁহাদের তুলনায়,—দীনবন্ধু সে-কালের যে সমাজে বিচরণ করিতেন, তাঁহারা

ছিলেন যথার্থ রসিক ও বিদ্বান,—ইংরেজি সাহিত্যের যে সুধা একাল আধুনিকতার ট্রেড্‌মার্কেও সস্তা হইয়া উঠে নাই এবং কখনও হইবে না—সেই সুধা তাঁহারা কণ্ঠ ভরিয়া পান করিয়াছিলেন, এবং প্রাণশক্তি সুস্থ ছিল বলিয়াই তাহাতে তাঁহারা অধিকতর প্রাণবন্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের স্বাস্থ্য অটুট ছিল বলিয়াই পদব্রজে খানা-ডোবা পার হইয়া তাঁহারা জীবনের গ্রাম্যতা আবিষ্কারেও ভয় পাইতেন না। যে কৃত্রিম নাগরিক মনোবৃত্তি, এ-যুগের বাংলা-সাহিত্যকে বাঙ্গালী সাধারণের জীবন হইতে দূরে লইয়া গিয়াছে, সেই অস্বাভাবিক জীবন, সেই বিজাতীয় কালচার-মোহের কথা স্মরণ করিয়া যে ভাবুক চিন্তাশীল রসিক বাঙ্গালী সন্তপ্ত না হন, দীনবন্ধু-প্রসঙ্গ তাঁহার জন্য নহে। গত পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ বাঙ্গালীর জীবনে ও সাহিত্যে যে মূলহীন শৈবালস্তর জমিয়া স্বাভাবিক ভাব-স্রোত রুদ্ধ করিয়াছে, রুচিকে কৃত্রিম ও সূক্ষ্ম, রসকে তুরীয় এবং ভাষাকে কুলত্যাগিনী বেশ-বধূ করিয়া তুলিয়াছে, তাহার মোহ দমন করিতে না পারিলে দীনবন্ধুর মত খাঁটি বাঙ্গালীর সাহিত্য-সৃষ্টি ও তাহার সাফল্য-সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব। কারণ, দীনবন্ধুকে বুঝিতে হইলে বাঙ্গালী হইয়া বাঙ্গালীকে বুঝিতে হইবে; এবং সাহিত্যের আদর্শ সম্বন্ধে নিছক্ মনোবিলাসের abstraction পরিহার করিয়া, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মহিমা খর্ব্ব করিয়া, সাহিত্যের যে প্রেরণা দেশের আলো-বায়ু-জল ও জাতির জীবিত-চেতনা হইতে রস সংগ্রহ করে, তাহাকেই বরণ করিতে হইবে।

* * *

দীনবন্ধুর নিজ প্রতিভার পরিচয়ের সঙ্গে আর একটি বাহিরের পরিচয় যুক্ত হইয়া আছে—তিনি যুগনায়ক বঙ্কিমের প্রিয় সুহৃদ ছিলেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এমন সৌহার্দ্দের কাহিনী বড়

নাই—সে একটা জীবনঘটিত কাব্য বলিলেও চলে। কিন্তু সৌহার্দ্দের মূলে যে গভীর ব্যক্তিগত প্রীতির বন্ধন ছিল তাহা সাহিত্যরস-রসিকতার সূত্রেও দৃঢ়তর হইয়াছিল, এ অনুমান অসঙ্গত নহে। এত বড় প্রীতির সম্বন্ধ যেখানে এবং উভয়েই যখন সাহিত্যসেবী, মূলে যে এই দুই ব্যক্তির মধ্যে সাহিত্যিক সমপ্রাণতাই তাঁহাদের সখ্যকে দৃঢ়তর করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু উভয়ের প্রতিভা ও সাহিত্যিক প্রকৃতিতে পার্থক্য অল্প নহে। এই দুইজন সে যুগের দুই বিভিন্ন রীতিতে দুই দিক দিয়া সাহিত্যের পুষ্টি-সাধনে ব্রতী হইয়াছিলেন। একজনের প্রতিভা যত বড় আর একজনের বড় নয়—কিন্তু একই সাহিত্য-রসরসিকতায় উভয়ে উভয়কে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র যে মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সাহিত্যের যে আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন দীনবন্ধুও সেই মন্ত্রে সেই আদর্শের পূজারী ছিলেন। উভয়ের দৃষ্টি ছিল সাহিত্যের সত্যের দিকে—উভয়ে দেখিতে চাহিয়াছিলেন মানুষকে—মনুষ্য-চরিত্র ও মনুষ্য জীবনের অপার রহস্য উভয়েই পরম বিস্ময়ে রসরূপে উপভোগ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমের প্রতিভা ও মনীষা ছিল বড়—তাঁহার কবি-দৃষ্টি ছিল গভীরতর, তিনি বাস্তব জীবন ও জগতের মধ্যে গূঢ়তর কার্য্য-কারণ নীতি, জটিলতর সুষমা, ও বৃহত্তর পরিকল্পনার আভাস পাইয়াছিলেন; তিনি মানুষের নিয়তিকে,—তাহার মর-জীবনের দুঃখসুখকে—ট্রাজেডির উচ্চতর ক্ষেত্রে তুলিয়া ধরিয়া সে জীবনের আদি-অন্তকে যুগপৎ উপলব্ধি করার যে চরম কাব্যরস তাহারই সাধনা করিয়াছিলেন; কল্পনার সে শক্তি কেবল তাঁহারই ছিল—তিনি ছিলেন জীবন-মহাকাব্যের কবি। দীনবন্ধু সেই জীবনকেই আর একদিক দিয়া দেখিবার ও তাহার রসরূপ সৃষ্টি করিবার সাধনা

করিয়াছিলেন। তাঁহার দৃষ্টি, প্রত্যক্ষের অন্তরালে যে পরোক্ষ আছে তাহা ভেদ করিতে চাহে নাই; যাহা নিকট, যাহার সঙ্গে প্রাণমনের সম্পর্ক অব্যবহিত, যাহা বাহিরের বিকাশভঙ্গিমাতেই, অতি ভাবুকতা ও কল্পনা ব্যতিরেকেই, রস-সম্পৃক্ত হইয়া উঠে—তিনি ছিলেন সেই জীবনের মুগ্ধ উপাসক। সাহিত্য-সৃষ্টিতেও যেন উভয়ে উভয়ের পার্শ্বচর—একের অভাব অপরে পূরণ করিয়াছিলেন। বঙ্কিম আঁকিয়াছিলেন নগেন্দ্র, গোবিন্দলাল, দীনবন্ধুর সৃষ্টি তোরাপ, হেমচাঁদ; বঙ্কিমের কুন্দনন্দিনী, দীনবন্ধুর ক্ষেত্রমণি; বঙ্কিমের দেবেন্দ্র ও দীনবন্ধুর নিমচাঁদ। আবার বঙ্কিমের প্রতাপ ও দীনবন্ধুর নবীনমাধবে যে প্রভেদ, দীনবন্ধুর রাজীবলোচন ও বঙ্কিমের বিদ্যাদিগ্‌গজে সেই প্রভেদ।

* * *

সে যুগের বাংলা সাহিত্যে যে প্রেরণা বঙ্কিমের গদ্যকাব্যগুলিতে সার্থক হইয়াছে, দীনবন্ধুর নাটকগুলিতেও সেই প্রেরণা অপর পথে রস-সৃষ্টি করিয়াছে। য়ুরোপে রেণেসাঁসের যুগে এই জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে যে বিস্ময়-বিহ্বলতা; যে শ্রদ্ধাবোধ ও রহস্য-সন্ধান তথাকার সাহিত্যে অভিনব প্রাণ-সঞ্চার করিয়াছিল, সাহিত্যকে একরূপ মানবজীবন সংহিতার রূপেই রূপান্তরিত করিয়া মানুষেরই মহিমা ঘোষণা করিয়াছিল, আমাদের সাহিত্যেও তাহারই একটু প্রেরণা-স্পর্শ ঘটিয়াছিল। তাহারই বলে, মাইকেল কবি-কল্পনাকে জড়তা-মুক্ত করিলেন; বঙ্কিমচন্দ্র সেই কল্পনাকে কাব্যসৃষ্টিতে নিয়োগ করিলেন; দীনবন্ধু সেই কল্পনার তীব্র আলোক প্রশমিত করিয়া, অতি উচ্চ ভাবুকতাকে সহজ হৃদয়ধর্ম্মের অধীন করিয়া, যথাপ্রাপ্ত দেশ ও সমাজের মধ্যেই, মানুষের চিরন্তন দুর্ব্বলতা ভ্রান্তি ও মোহকে

রসমুগ্ধ করিয়া তুলিলেন। বঙ্কিম যে-রসকে জীবনের নিম্নতর স্থানে উপভোগ করিতে পরাঙ্মুখ ছিলেন, দীনবন্ধু সেই রসকেই প্রত্যেক প্রবহমান জীবনধারার উর্ম্মিনৃত্য, হাস্য-অশ্রুর অগভীর স্রোতেই প্রাণ ভরিয়া পান করিতে চাহিয়াছিলেন। গীতিপ্রাণ কল্পনা-বিলাসী বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা যে সম্ভব হইয়াছিল তাহার কারণ, এই রসিকতাও বাঙ্গালীর জাতিগত ধর্ম্ম। ট্রাজিডি বা মহাকাব্য বাঙ্গালীর স্বভাবগত না হইলেও প্রাচীনকাল হইতে বাংলা কাব্যে লিরিকের সোনার তারের সঙ্গে এই উৎকৃষ্ট মানস-ধর্ম্মের পরিচয়টি রূপার তারের মত জড়াইয়া আছে। ব্যঞ্জনে লবণের মত, এই রস সকল শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-প্রেরণায় প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে। ইহা যদি বাঙ্গালীর মানস-চরিত্রের একটি বিশেষ লক্ষণ না হইত তাহা হইলে বাঙ্গালীর সাহিত্য এত সমৃদ্ধিলাভ করিত না। কবিকঙ্কণ ও ভারতচন্দ্রে আমরা প্রতিভার যে লক্ষণে বিশেষ করিয়া মুগ্ধ হই, বাঙ্গালীর গ্রাম্য সাহিত্যে এককালের সৌখীন নাগরিক কাব্যকলাতেও, আমরা যে রসের উৎসার-প্রাবল্য লক্ষ্য করি; বাংলার অসংখ্য প্রবচনের মধ্যে বাঙ্গালীর যে তীক্ষ্ণ রসবুদ্ধির পরিচয় আজও প্রোজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে—সেই রস-রসিকতা এ-পর্য্যন্ত উৎকৃষ্ট সাহিত্যসৃষ্টি না করিলেও, তাহার সে সম্ভাবনা চিরদিনই ছিল। বাংলাসাহিত্যের নবযুগের প্রাক্কালে যাহা কবির গান, পাঁচালী প্রভৃতির অধঃপথে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল—ঈশ্বর গুপ্তের বালকভক্ত দীনবন্ধু যৌবনে সেই রসকেই সাহিত্যসৃষ্টির সুগভীর প্রেরণায় সার্থক করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইহারই আলোচনায় অতঃপর আমরা তাঁহার হাস্য-রস-কল্পনা ও নাটকীয় প্রতিভার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব।

* * *

বাংলা-সাহিত্যে এ-পর্য্যন্ত উৎকৃষ্ট নাটকের উৎপত্তি হয় নাই। তাহার কারণ অনুমান করা দুরূহ নয়। প্রথমতঃ, বাঙ্গালী অতিমাত্রায় ভাব-প্রবণ;—নাটক রচনায় মানুষের জীবন ও মানুষকে যে চক্ষে দেখিবার শক্তি আবশ্যক হয়, বাঙ্গালীর সে দৃষ্টি স্থির নহে, অতিশয় চঞ্চল। যে ঘটনা-স্রোতে আপামর মানব-সমাজের বিভিন্ন চরিত্র বিভিন্ন গতি-মুখে নিরন্তর ভাসিয়া চলিয়াছে—সেই স্রোতের একটা অংশকে সমগ্রতায় উপলব্ধি করিয়া, অবিন্যস্ত ঘটনারাশির মধ্যে একটা অর্থের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া, ঘটনার দৈবরূপ ও মানবচরিত্রের অন্তর্নিহিত নিয়তিরূপকে কার্য্যকারণ সূত্রে বিবৃত করিয়া যে নাটক রচনা সম্ভব হয়, বাঙ্গালীর চরিত্রে ও মনে তাহার প্রতিকূল প্রবৃত্তিই নিহিত আছে; এবং শুধু বাঙ্গালী বলিয়াই নহে, ভারতীয় হিন্দু বলিয়াও বটে—জীবনকে তেমন করিয়া দেখিবার শিক্ষা বা সংস্কার এ-জাতির নাই। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের সমাজে জীবনের সে অভিজ্ঞতা —সে অন্তরঙ্গ মূর্ত্তির পরিচয় সুলভ নহে। আমি শ্রেষ্ঠ নাটকীয় কল্পনার কথাই বলিতেছি। তেমন কল্পনা না হইলেও সকল সমাজে সকল যুগে জীবনের একটা না একটা রূপ আছেই; কারণ মানুষ থাকিলেই তাহার জীবন-লীলাও আছে। সে লীলা শ্রেষ্ঠ কবি-কল্পনার বিষয় না হইলেও তাহারও রস আছে, এবং সহৃদয় রসিকচিত্তে যথাযথ প্রতিফলিত হইলে তাহা হইতেও কাব্যসৃষ্টি হয়। আমরা নাটক রচনার সেই আদর্শের অনুকরণ করিয়াছি—জীবনে যাহার সত্যকার অবকাশ নাই; কতকগুলি বড় বড় sentiment-এর উচ্ছ্বাসে রঙ্গমঞ্চকে বক্তৃতামঞ্চে পরিণত করিয়াছি—না হয়, নিকৃষ্ট রঙ্গরসের লোভে কৃত্রিম কথাবস্তুর সাহায্যে আমরা নাটক রচনা করিয়া থাকি। আমাদের সাহিত্যে নাটকীয় প্রেরণার এই দৈন্য

আধুনিক ভাবপ্রধান ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগে আমরা যেন আর অনুভব করিতেও পারি না। সাহিত্যের খাঁটি রসাস্বাদ এখনকার দিনে একমাত্র গল্পে ও উপন্যাসেই সন্ধান করিতে হয়—উৎকৃষ্ট চরিত্রসৃষ্টির বা জীবন অনুভূতির যাহা কিছু রস তাহা আমরা কথা-সাহিত্যেই পাইয়া থাকি।

* * *

কিন্তু নাটক ও কথা-সাহিত্যে উপাদান-সাদৃশ্য থাকিলেও দুইটির গঠন বা সৃষ্টিনৈপুণ্যে যে পার্থক্য আছে, কবির অনুভূতির ভঙ্গিই সে পার্থক্যের কারণ; অতএব সে পার্থক্য এই দুইএর তুলনামূলক বিচারে একটা বড় কথা। নাটকের নির্ম্মাণ-কৌশলই স্বতন্ত্র; তাহা দৃশ্য, পাঠ্য নহে; পাঠ করিবার কালেও আমরা একটুকু কল্পনার সাহায্যে সে কাব্যকে চাক্ষুষ করিয়া থাকি—তাহাতে পাত্রপাত্রী সম্মুখে উপস্থিত, কাল বর্ত্তমান। উপন্যাস বা কাহিনীতে যে কথাবস্তুকে সাজাইয়া গুছাইয়া বলিবার বা বর্ণনা করিবার ভঙ্গিতে লেখকের কলা-নৈপুণ্য প্রকাশ পায়, এখানে সেই কথাবস্তু বিবৃতি নয়, কাহিনী নয়—একটি প্রবহমান ঘটনা-স্রোতরূপে তাহা প্রদর্শিত হয়; সেই ঘটনাগত অবস্থায় চরিত্রগুলি স্ব স্ব প্রবৃত্তিমূলক কার্য্য ও বাক্য ভিন্ন লেখকের স্বতন্ত্র কোন প্রকাশ-রীতির অবকাশ নাই। এই ঘটনা ও চরিত্রের অন্তরালে লেখককে এমন করিয়া আত্ম-গোপন বা আত্মনিমজ্জন করিতে হয় যে, নাটকে যাহা ঘটিতেছে তাহা যে কেহ ঘটাইতেছে এমন ত নহেই তাহা যে কাহারও ব্যক্তিগত বিচার-বিশ্লেষণ—কাহারও স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গি অথবা আদর্শ বা রুচির দ্বারা মার্জ্জিত, পরিশুদ্ধ বা সুবিন্যস্ত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে, এমন সংশয়ও মনে জাগিতে পারিবে না। উপন্যাস বা গল্পে বা কাহিনী-কাব্যে যে

চরিত্রচিত্রণ ও কথাবস্তুর রচনানৈপুণ্য আমাদিগকে মুগ্ধ করে, তাহার মধ্যে সর্ব্বক্ষণ লেখকও আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকেন—আকারে ইঙ্গিতে, ভাবে ভঙ্গিতে, ব্যাখ্যায় বিশ্লেষণে, বর্ণনা ও বিবৃতির ব্যপদেশে, তিনি তাঁহার কল্পনা, তাঁহার অভিজ্ঞতা, তাঁহার ভাব ও ভাবনা—জীবন ও জগতের কোন একটা দিক তিনি কেমন রূপে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাই আমাদিগকে জানাইয়া থাকেন। কিন্তু নাটককারের সে আকাঙ্ক্ষা নাই, থাকিলে তিনি নাটক লিখিতেন না। যাঁর যাহাতে নিগূঢ় আনন্দ বা রসোল্লাস হয়, তিনি তাহারই আবেগে কাব্যসৃষ্টি করেন। জীবনকে বর্ণনীয় না করিয়া তাহাকে দর্শনীয় করিবার আবেগেই নাটকের সৃষ্টি হয়। এ আবেগের মূল—কল্পনার objectivi y, বাহিরের নিকট আত্মসমর্পণ; আত্মগত রসকল্পনায় বস্তুসকলকে মণ্ডিত না করিয়া বস্তুসকলের রসসত্তায় আপনাকে বিলাইয়া দেওয়া। যাঁহার মধ্যে বিষয়-রসানুভূতি এতই প্রবল যে আপনার চিত্ত তাহাতেই ভরপূর হইয়া উঠে, বিষয়াতিরিক্ত কোন ভাবের দ্বারা, আত্মগত অভাব পূরণের প্রয়োজন হয় না—তিনি নাটকীয় প্রতিভার অধিকারী। জীবনের যাহা-কিছু প্রত্যক্ষ অনুভূতি-গোচর, তাহাই যখন আপনারই ভঙ্গিতে, আপনারই নিয়মে, একটি সুসমঞ্জস রসমূর্ত্তি পরিগ্রহ করে—যাহা আছে তাহাকে তদ্বৎ উপভোগ করিবার শক্তিই যখন পরমানন্দের কারণ হয়—এই জীবন ও জগৎ যখন স্বাতন্ত্র্যাভিমান-বর্জ্জিত মনকে হাত ধরিয়া নিজের পথে পথ দেখাইয়া বস্তু সকলের সুগভীর রহস্যনিকেতনে লইয়া যায়, তখন এই যথাপ্রাপ্ত জগৎই অপূর্ব্ব সুষমায় মণ্ডিত হইয়া যে রসের আস্বাদন করায়—নাট্যকবি সেই রসের রসিক। তাই তাঁহার সৃষ্টিকল্পনায়, প্রকৃতি ও মানব-সমাজ লেখকের অহং-ভাবমুক্ত হইয়া যে রসরূপ ধারণ করে, তাহার মধ্যে লেখককে

খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—যাহা যেমন আছে তাহাই, লেখকের সকল অভিমান ও ব্যক্তিসংস্কারের অবিরোধে, এমনি একটি স্বাভাবিক সত্য-সুন্দরের স্ফূর্তি লাভ করে যে, তাহাতেই রস উছলিয়া উঠে—মানুষের সকল সংস্কারের মূল যে সংস্কার, সেই গভীরতম প্রাণচেতনার প্রীতি-সাধন করে।

*　　　*　　　*

কল্পনার এই objectivity, উৎকৃষ্ট নাটকীয় প্রতিভার এই লক্ষণ, আমাদের সাহিত্যে অতি অল্পই প্রকাশ পাইয়াছে—সেই অল্পের মধ্যে দীনবন্ধুর প্রতিভাই আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আজিকার দিনে এই কথাটি বুঝিবার ও বুঝাইবার বিঘ্ন অনেক। আমাদের দেশে সাহিত্য-বিচারে রসের একমাত্র উৎকর্ষ তাহার কাব্যগুণে ভাবপ্রধান উর্দ্ধগ কল্পনায় অতি উচ্চ আদর্শে; এবং শব্দ ও ছন্দঝঙ্কারে যাহা শ্রবণ-মনোহর তাহা ভিন্ন আর কিছুই উৎকৃষ্ট সাহিত্য নয়। এ-পর্য্যন্ত উৎকৃষ্ট সাহিত্য যাহা কিছু রচিত হইয়াছে, সমালোচন-পদ্ধতির দোষে এবং কাব্যের আদর্শ-নির্ণয়ের অভাবে তাহার প্রকৃত কাব্যগুণ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এমনই যে, সাহিত্যের রূপভেদে রসভেদ সম্বন্ধে আমরা সজ্ঞান নহি। নাটক বলিতে সাধারণতঃ আমরা অঙ্ক ও দৃশ্যে বিভক্ত রোমান্সই বুঝি—চমকপ্রদ কল্পনার বিলাস এবং ভাবাতিরেকের অনুকূল ঘটনা-বিন্যাসকেই আমরা সকল রচনায় একমাত্র কৃতিত্ব বলিয়া বিশ্বাস করি। আমাদের দেশে নাটকের অভিনয়-সাফল্য নির্ভর করে দর্শকের প্রাণমনের সরল স্বাভাবিক সমর্থনের উপরে নয়;—নিজের সহিত নিজের নিবিড় আত্মপরিচয়ের আহ্লাদেই সে রসের উপলব্ধি হয় না। যাহা যেমন আছে তাহারই রসমাধুর্য্যে মুগ্ধ হইবার সামর্থ্য আমাদের নাই বলিয়া, স্বতঃ উৎসারিত জীবন-ধর্ম্মের মধ্যেই যে অবাঙ্মনসগোচর

পরম সত্তার ইঙ্গিত রহিয়াছে তাহাতে আকৃষ্ট হই না বলিয়া, আমরা দুরূহ আদর্শ, দুরূহ ধর্ম্ম ও দুরূহ নীতির আবেগ অনুভব করাকেই নাটকের মুখ্য ফল বলিয়া গণনা করি। আমাদের দেশে উচ্চ নাট্যকলা-সম্মত রচনার প্রবৃত্তি এই কারণেই চিরদিন বাধা পাইয়াছে। বর্ত্তমানে আরও গুরুতর বাধা হইয়াছে এই যে, আমাদের সাহিত্যের একমাত্র আদর্শ দাঁড়াইয়াছে—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ঘোষণা; এই individualism ও তদানুসঙ্গিক লিরিক-আদর্শ—নাটকীয় কল্পনার objectivity-কেই আদৌ স্বীকার করিতে চায় না। আর একটি বাধা রুচির বাধা। সাহিত্যের যে যুগে আমরা বাস করিতেছি, এ-যুগের যথার্থ নামকরণ করিতে হইলে, ইহাকে বাংলা সাহিত্যের ব্রাহ্মযুগ বলাই সঙ্গত। এ-যুগে বাঙ্গালীর জীবন, বাংলা সাহিত্যে প্রকাশ পাইতে হইলে, তাহার বন্যতা ও বর্ব্বরতা, তাহার অর্দ্ধনগ্নতা ও অশ্লীলতা বর্জ্জন করিয়া, খুব ধব্‌ধবে ইস্ত্রি-করা পোষাক পরিয়া একমাত্র বৈঠকখানায় ছাড়া আর কোথাও দেখা দিতে পারিবে না। সে জীবন যত সত্য, যত স্বাভাবিক এবং যতই আন্তরিক হউক—কথাবার্ত্তায় বেশভূষায়, আদবকায়দায়, সম্পূর্ণ অবাঙ্গালী অর্থাৎ ইংরেজিশিক্ষাভিমানী রুচিবিলাসী নাগরিক না হইলে, সাহিত্যে তাহার স্থান নাই। দীনবন্ধুর নাটকীয় প্রতিভার আলোচনা প্রসঙ্গে এইরূপ বিস্তারিত ভূমিকার প্রয়োজন আছে।

* * *

দীনবন্ধুর প্রথম নাটক 'নীলদর্পণ।' এই নাটক হইতেই তাঁহার প্রতিভার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এই নাটকখানি অবলম্বন করিয়াই আমি তাঁহার সাহিত্যিক প্রবৃত্তি ও প্রেরণা, তাঁহার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনা করিব। 'নীলদর্পণ' রচনায় যে সাময়িক উদ্দেশ্য স্পষ্ট হইয়া আছে, তাহার উল্লেখের প্রয়োজন নাই—এই নাটকে, তাহার সকল

ত্রুটি সত্ত্বেও, আমরা বাংলা সাহিত্যে যে নূতন প্রতিভার পরিচয় পাই এবং যাহা এ-পর্য্যন্ত আর কোন নাট্যকারের কল্পনায় তেমন করিয়া স্ফূর্তিলাভ করে নাই, তাহারই কিঞ্চিৎ বিস্তারিত উল্লেখ করিব। 'নীলদর্পণে'র ঘটনাবস্তু (action) melodramaয় অবসিত হইয়াছে, মাত্রাতিরিক্ত emotion এর উপর বিশেষ জোর দেওয়ার প্রয়োজনে লেখকের কল্পনা সংযম হারাইয়াছে ;—তা ছাড়া লেখক এখানে স্বল্পবস্তু-সম্বল লইয়া, সাধারণ চরিত্র অবলম্বনে নাটকখানিকে ট্রাজেডির ছাঁচে ঢালিতে গিয়া বিফলমনোরথ হইয়াছেন। এই সকল কথা ছাড়িয়া দিয়াও 'নীলদর্পণ' নাটকে এক শ্রেণীর চরিত্র চিত্রণে লেখকের যে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়—তাহা সত্যই বিস্ময়কর। বাংলায় একটা প্রবাদ আছে, 'পরচিত্ত অন্ধকার'—কিন্তু যে উৎকৃষ্ট নাটকীয় কল্পনায় এই পরচিত্ত আর অন্ধকার থাকে না, এই নাটকে দীনবন্ধু বাংলার কৃষক ও কৃষক-কন্যাদের চিত্ত সেইভাবে আলোকিত করিয়াছেন, দেশকাল পাত্র বা পরিচ্ছিন্ন মানব-হৃদয়ের অতি নিগূঢ় সংবেদনায় আশ্চর্য্য লিপি-কৌশলে সাহিত্যে প্রতিফলিত করিয়াছেন। ট্রাজেডি-রচনার অবকাশ এখানে ছিল না; পূর্ব্বেই বলিয়াছি দীনবন্ধুর রস-প্রেরণা ট্রাজেডির অনুকূল নহে, এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব। প্রতিকূল ঘটনার বজ্রবিদ্যুতালোকে কোনও একটি চরিত্রকেও গভীরভাবে উদ্ভাসিত করার যে কাব্যকল্পনা, তাহা হইতেই ট্রাজেডির সৃষ্টি হয়—সে নাটকরচনায় নাটকীয় প্রতিভার সঙ্গে অত্যুৎকৃষ্ট কবি-প্রতিভাও যুক্ত থাকে। কিন্তু নাটকীয় প্রতিভার যথার্থ বৈশিষ্ট্য ইহাই নহে; যে বিশিষ্ট শক্তির জন্য সেক্স্পীয়ারের এত বড় কবিগুণকেও অতিক্রম করিয়া তাঁহার নাটকীয় প্রতিভাই বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে তাহা—সর্ব্বসমাজের ও

সর্ব্বশ্রেণীর ব্যক্তি-চরিত্রে, পরকায়-প্রবেশের মত প্রবেশ করিবার শক্তি। দীনবন্ধু এই নাটকে সেই শক্তির যে পরিচয় দিয়াছেন তাহা সত্যই অনন্যসুলভ। তিনি একশ্রেণীর বাঙ্গালীজীবনে যেভাবে প্রবেশ করিয়াছেন, সে জীবনের সাধারণ অনুভূতির ভাষা ও ব্যক্তিগত অনুভূতি-প্রকাশের স্বরভঙ্গী পর্য্যন্ত যেভাবে আত্মসাৎ করিয়াছেন তাহাতেও যদি বিস্মিত হইবার কারণ না থাকে, তাহা হইলে, তিনি এই নাটকের সেই চরিত্রগুলিকে যে স্ব-ভাবের সূক্ষ্ম সমগ্রতায় চিত্রিত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নাটকীয় কল্পনার অসামান্যতাই সূচিত হইয়াছে। আজিকার এই তথাকথিত realism-এর দিনে, এই চরিত্র-গুলির পর্য্যালোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি, সকল 'ism'-এর মত এই realism ও একটা তত্ত্ব—একটা মানস-প্রসূত অভিমান মাত্র; যে কল্পনাশক্তি সকল সাহিত্যসৃষ্টির প্রথম ও শেষ উপজীব্য তাহার ফলে real যে সত্যকার real-রূপ পরিগ্রহ করে তাহার প্রমাণ ইহাতে আছে। রস যে কি বস্তু তাহা বাক্যের দ্বারা, সংজ্ঞার দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয় না বটে, কিন্তু দীনবন্ধুর এই সকল real চরিত্র-সৃষ্টির মধ্যেই সর্ব্ববিধ তুচ্ছতা ও মলিনতা ভেদ করিয়া সেই রস উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপ রস-সৃষ্টির দুই একটি দৃষ্টান্ত দিব। আধুনিক 'কাঁচি-ছাঁটা'-পন্থী রুচিবাগীশ পাঠক শিহরিয়া উঠিবেন জানি; কিন্তু আমরা এখানে লিরিক-কল্পনার বেল-জুঁইএর কথা বলিতেছি না—নাটকীয় কল্পনায় ঝিঙাফুল ও মটরফুলের পরিচয় করিতেছি; আবশ্যক হয়, রুচি-বাগীশেরা চক্ষু আবৃত করুন।

* * *

বেগুনবেড়ের কুঠির গুদামঘরে কয়েকজন রাইয়ত বসিয়া আছে; ইহাদিগকে জোর করিয়া নীলের দাদন লওয়াইবার জন্য এবং মিথ্যা

সাক্ষ্য দিবার জন্য, নীলকর সাহেবের কর্ম্মচারী ধরিয়া আনিয়াছে। তাহাদের তিনজনের কথোপকথনের আরম্ভটি মাত্র উদ্ধৃত করিলাম; পাঠক দেখিবেন, ইহার মধ্যেই, চাষার বুদ্ধি ও চাষার প্রাণ, চাষার ভাষায় কি সহজ ও সুস্পষ্ট ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে—তাহাদের মুখভঙ্গি পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে; একই অবস্থায় একই শ্রেণীর চরিত্র কেমন ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যে সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছে!—

প্রথম রাইয়ত। কঁদির মুখি বাঁক থাকবে না, শ্যামচাঁদেয় ঠ্যালা বড় ঠ্যালা। মোদের চকি কি আর চামড়া নেই, না মোরা বড় বাবুর মুন খাইনি;—করবো কি, সাক্ষী না দিলি যে আস্ত রাখে না। উট সাহেব মোর বুকি দেঁড়িয়ে উটেলো, দ্যাখ্‌দিনি, অ্যাকন তবাদি অক্ত ঝোঁজানি দিয়ে পড়্‌চে; গোডার পা য্যান বল্‌দে গোরুর খুর।

দ্বিতীয়। প্যারেকের খোঁচা;—সাহেবেরা যে প্যারেকমারা জুতো পরে, জানিস নে?

তোরাপ। (দন্ত কিড়মিড় করিয়া) হুত্তোর প্যারেকের মার প্যাট করে, লৌ দেখে গাড়া মোর ঝাঁকি মেরে ওট্‌চে। উঃ! কি বল্‌বো, সুমিন্দিরি অ্যাকবার ভাতারমারির মাঠে পাই, এম্‌নি থাপ্পোড় ঝাঁকি, সুমিন্দির চাবালিডে আসমানে উড়িয়ে দেই, ওর গ্যাড্‌ম্যাড্‌ করা হের ভেতর দে বার করি।

—নীলদর্পণ, দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক।

তোরাপের প্রকৃতি প্রথম রাইয়তের ঠিক উল্টা; যে মূক পশুবৎ সহিষ্ণুতাই এ অবস্থায় বুদ্ধির নিদর্শন প্রথম রাইয়তের তাহা আছে; সে বুদ্ধিমান,—ইতরভদ্রনির্ব্বিশেষে এ চরিত্র আমাদের দেশে অতিশয় সুলভ। কিন্তু দেহের উপর এতখানি অত্যাচারের কথা সে কেমন স্থির নির্ব্বিকারভাবে উল্লেখ করিল! কেবল এইটুকুমাত্র গালি দিয়াই নিরস্ত হইল যে—গোডার (গুওটার) পা য্যান বলদে গরুর খুর। এই

গালির মধ্যেও যে unconscious humour আছে তাহাই যেন এতখানি ব্যথার উপরে প্রলেপের কাজ করিতেছে। যাহারা মনে শিশুর মত দুর্ব্বল ও অসহায়, তাহাদের দেহের এই অপরিমিত শক্তি হইতেই তাহারা কতখানি ধৈর্য্য সংগ্রহ করে, এইটুকুর মধ্যে তাহার আভাস আছে।

তোরাপের কথাগুলিতে যে চরিত্র পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহা সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালের কবিকল্পনাকে আকৃষ্ট করিয়াছে। তাহার বিশাল পেশীপুষ্ট দেহ—একটা বন্য পৌরুষের ছবি—একথাগুলিতে যেমন সুস্পষ্ট হইয়া উঠে, তেমনই এই ভাষার ভঙ্গিতেই তার অন্তরের বালকমূর্ত্তি এবং অকপট কুটিলতাহীন ক্রোধ যে রসের সৃষ্টি করে, তাহাতে একাধারে হাসি ও শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। 'লৌ দেখে গাডা মোর ঝাঁকি মেরে ওট্‌চে'—এই একটি কথায় সে কোন্ জাতের মানুষ তাহা আমরা নিমেষে বুঝিয়া লই; চরিত্রচিত্রণে এমন অব্যর্থ নাটকীয় কল্পনাই শেক্‌স্‌পীয়ারেরও গৌরব। কিন্তু তোরাপের চরিত্রে এই যে এখানে আদিম পশুটার মূর্ত্তি উঁকি মারিতেছে—তাহার ক্রোধ প্রকাশের ভঙ্গিতে সেই পশুরই শিশুরূপ দেখিয়া আমরা কৌতুক অনুভব করি; সেই পশুই একটি অকপট মনুষ্যত্বের মাধুর্য্যে মনোহর হইয়া উঠিয়াছে। তোরাপের ভাষাও লক্ষ্য করিবার বস্তু,—এখানে ভাষার অসংযমই প্রাণের প্রাবল্য সূচনা করিতেছে। এ ভাষায় যে অশ্লীলতা আছে তাহা 'আর্টে'র অশ্লীলতা নয়, চরিত্রগত দুর্নীতি নয়; এ অশ্লীলতায় ন্যায্য অধিকার কেবল এই চরিত্রেরই আছে, সে অধিকার হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিতে চাহিবে, এত বড় রুচিবাগীশ ভগবানও নহেন—তোরাপ তাহাই প্রমাণ করিয়াছে। এ ভাষার জন্ম হইয়াছে—আত্মাভিমানহীন নাটকীয় কল্পনার অব্যর্থপ্রেরণায়; তোরাপ

কাঁচিছাঁটা করিয়া নিজের রুচি অনুসারে গড়েন নাই, কারণ, তিনি নাটক লিখিতেছেন, কাব্য করিতেছেন না।

কিন্তু দ্বিতীয় রাইয়তের ওই অতি-সংক্ষিপ্ত মন্তব্যটির দ্বারা আমরা এই নিরতিশয় সরল বোকা মানুষটিকে চিনিয়া লই; উহার মধ্যে অতিসূক্ষ্ম হাস্যরস রহিয়াছে তাহাও অল্প উপভোগ্য নহে। মুখটা বিজ্ঞের মত গম্ভীর করিয়া সে একটা খুব খবর দিয়া নিজেও খুসী হইতে পারিয়াছে, তাহার সঙ্গীকেও যেন কতকটা আশ্বস্ত করিতে পারিয়াছে। আসলে, সেই সকলের চেয়ে হতভম্ভ হইয়া আছে; সংসারের এই সকল অনর্থের কূলকিনারা পায় না বলিয়াই সে বেচারী যখন কোন-কিছুর একটা কারণ খুঁজিয়া পায়, তখনই যেন কতকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারে। এই চরিত্রের এই উক্তিটিতে একদিকে যেমন হাসির উত্তেজনা আছে, তেমনই এইরূপ অত্যাচারিত অসহায় কৃষকজীবনের করুণতম বেদনা এই কথাগুলির মধ্যে স্তম্ভিত হইয়া আছে।

দীনবন্ধুর নাটকীয় প্রতিভার সম্যক আলোচনা এ প্রবন্ধের অভিপ্রায় নয়, এখানে সে আলোচনার স্থানও নাই। অধুনা-উপেক্ষিত, বিস্মৃত-প্রায় এই অসাধারণ শক্তিশালী লেখকের নূতন করিয়া কিছু পরিচয় দিবার স্পর্দ্ধা আমরা করিয়াছি। তথাপি নীলদর্পণ নাটক হইতে আর একটি চিত্র উদ্ধৃত না করিয়া পারিলাম না। এই নাটকে দীনবন্ধু একটি চাষার-মেয়ে আঁকিয়াছেন; আমার মনে হয়, সমগ্র বাংলাসাহিত্যে এমন স্বভাবাঙ্কন কুত্রাপি নাই। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীর মেয়ে আঁকিয়াছেন, তিনি তাহার নারী-চরিত্রের মহিমার দিকটিই কবি-উপাসকের মত মুগ্ধদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়াছেন—যে চরিত্রের গভীরতা তাহার অনির্ব্বচনীয় রহস্য-শোভা তিনি পৌরুষ-সহকারে

উদ্ধার করিয়াছেন। দীনবন্ধুর 'ক্ষেত্রমণি' নিতান্তই গ্রাম্য,—গ্রাম্য বলিয়াই, তাহার নারীত্ব-মহিমা নয়,—নারী-প্রকৃতির আদি-স্বভাব, মাত্র বাংলাদেশের গ্রাম্য গার্হস্থ্য-সংস্কারে মার্জ্জিত হইয়া যেভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার সেই সারল্য, কোমলতা ও দৃঢ়তায় চাষার মেয়েও খাঁটি বাঙ্গালীর মেয়ে হইয়াই দেখা দিয়াছে। যে অবস্থায় ক্ষেত্রমণির এই চরিত্র নাটকীয় কল্পনায় ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে, সে অবস্থায় আজিকার ক্ষেত্রমণিরা কি করে জানি না, তথাপি দীনবন্ধুর এ চিত্রাঙ্কণে কাব্যকল্পনার লেশমাত্র নাই বলিয়াই মনে হয়। সে অবস্থায় সে চরিত্রের যে বিকাশ আমরা লক্ষ্য করি, তাহা একটা বিশিষ্ট সংস্কারের ফল বলিয়াও যেমন বুঝিতে পারি, তেমনিই, নারী-চরিত্রের একটি অতি স্বাভাবিক—এমন কি, অতিশয় আদিম প্রাকৃতিক প্রেরণার লক্ষণ ইহাতে রহিয়াছে বলিয়া প্রতীতি জন্মে। আমি নীলদর্পণ নাটকের একটি অতি দুরূহ ও নিদারুণ দৃশ্যের কথা বলিতেছি —এ দৃশ্যে দীনবন্ধুর নাটকীয় প্রতিভার একটি অগ্নি-পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। নীলকর সাহেব পদী-ময়রাণীর সাহায্যে ক্ষেত্রমণিকে কৌশলে হরণ করিয়া তাহার শয়ন-কক্ষে বন্দী করিয়াছে: মিষ্ট কথায় ও পরে ভয় দেখাইয়া জোর করিয়া তাহার ধর্ম্মনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে। দৃশ্যের সে অংশটি এইরূপ—

ক্ষেত্র। ময়রা পিসি, যাস্‌নে ; ময়রা পিসি যাস্‌নে।

[পদীময়রাণীর প্রস্থান

মোরে কালসাপের গত্তের মধ্যে একা রেখে গেলি? লোর যে ভয় করে, মুই যে কাঁপতে নেগিচি; মোর যে ভয়তে গা ঘুরতি নেগেছে, মোর মুখ যে তেষ্টায় ধূলো বেটে গেল।

রোগ। ডিয়ার,—(দুইহস্তে ক্ষেত্রমণির দুই হস্ত টানন) আইস, আইস—

ক্ষেত্র। ও সাহেব! তুমি মোর বাবা, ও সাহেব! তুমি মোর বাবা; মোরে ছেড়ে দাও, পদীপিসির সঙ্গে দিয়ে মোরে বাড়ী পেটিয়ে দাও; আঁদার রাত, মুই একা যাতি পারবো না—(হস্ত ধরিয়া টানন) ও সাহেব, তুমি মোর বাবা, হাত ধল্লি জাত যায়, ছেড়ে দাও, তুমি মোর বাবা।

রোগ। তোর ছেলিয়ার বাবা হইতে ইচ্ছা হইয়াছে; আমি কোন কথায় ভুলিতে পারি না। বিছানায় আইস, নচেৎ পদাঘাতে পেট ভাঙ্গিয়া দিব।

ক্ষেত্র। মোর ছেলে মরে যাবে—দই সাহেব,—মোর ছেলে মরে যাবে,—মুই পোয়াতী।

রোগ। তোমাকে উলঙ্গ না করিলে তোমার লজ্জা যাইবে না। (বস্ত্র ধরিয়া টানন)

ক্ষেত্র। ও সাহেব! মুই তোমার মা, ন্যাংটো করো না; তুমি মোর ছেলে, মোর কাপড় ছেড়ে দাও। (রোগের হস্তে নখ বিদারণ)

রোগ। ইন্‌ফরন্তাল্ বিচ! (বেত্র গ্রহণ করিয়া) এইবার ছেনালি ভঙ্গ হইবে।

ক্ষেত্র। মোরে অ্যাকবারে মেরে ফ্যাল, মুই কিছু বল্‌বো না; মোর বুকি একটা তেরোনালের খোঁচা মার, স্বগ গে চলে যাই,—ও গুখেগোর বেটা, আঁটকুড়ীর ছেলে, তোর বাড়ী যোড়া মড়া মরে না? মোর গায়ে যদি হাত দিবি তোর হাত মুই এঁচ্‌ড়ে কেম্‌ড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করবো. তোর মা বুন নেই, তাদের কাপড় কেড়ে নিগে যা; দেঁড়িয়ে বলি কেন? ও ভাইভাতারীর ভাই; মার্‌না, মোর পরান বার করে ফ্যাল্ না, আর যে মুই সইতি পারি নে।

রোগ। চোপরাও হারামজাদী,—ক্ষুদ্র মুখে বড় কথা! (পেটে ঘুসি মারিয়া চুল ধরিয়া টানন)

ক্ষেত্র। কোথায় বাবা! কোথায় মা! দেখ গো, তোমাদের ক্ষেত্র মলো গো!! (কম্পন)

—ইহার নামই ভাষা! এ যেমন সাধুভাষা নয়, কথ্য কাব্য-ভাষাও নয়—তেমনিই এ কেবল চাষার ভাষাই নয়; এ ভাষার শব্দ-গ্রন্থনে মনুষ্যহৃদয়ের আদিম ভাষাকে বাংলারীতির মধ্যে বাঁধিয়া দিতে হইয়াছে —এ ভাষার উপাদানে, মৃত্তিকার প্রতিমার মত, একটা নাটকীয়

অবস্থার চরিত্র গড়িতে হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যের দুর্ভাগ্য যে, এ ভাষার এ প্রয়োজন এখন আর নাই; নাই বলিয়াই বাংলা ভাষা এখন কুলত্যাগিনী হইয়া 'রোগ্'এর ভাষায় পরিণত হইয়াছে।

* * *

এই দৃশ্যের এই টুকুর মধ্যেই অসহায়া নারীর যে অবস্থা-সঙ্কট চিত্রিত হইয়াছে তাহার তীব্রতা ও নিদারুণতার কারণ এই যে, নৃশংস হিংস্রজন্তুর আক্রমণে যেন শশকশিশু তাহার সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু তাহার নখ-দন্ত তাহার প্রাণের মতই কোমল, ফুল বজ্র হইয়া উঠিতে পারিল না। জীবনের এত বড় নির্ম্মম কঠোর দিকটা যে কখনও দেখে নাই—নিশ্চিন্ত বিশ্বাসের সারল্যে যে আজন্ম লালিত, চাষার ঘরের নির্ব্বোধ স্নেহে যাহার হৃদয় মন গঠিত, সে যখন সহসা জগতের এই নিষ্করুণ লোলুপতার মূর্ত্তি দেখিল, তখন তাহার আত্মরক্ষার যে প্রয়াস আমরা দেখি, তাহাতে ট্রাজেডির নায়িকা-সুলভ আচরণ বা বাক্য-বিন্যাস নাই; অজগর সর্পের আক্রমণে ক্ষীণপ্রাণা পক্ষীমাতার যে নিতান্ত নিষ্ফল আর্ত্তচীৎকার ও নখরাঘাত—এখানে তাহাই স্বাভাবিক; প্রাণের প্রবল আকুলতা দুর্ব্বল দেহের বাধা অতিক্রম করিতে পারিতেছে না। এই অতি অশ্লীল দৃশ্যে, গ্রাম্য নারীচরিত্রের গ্রাম্যভাষায়, দীনবন্ধু এই একটা জীবনের সত্য—criticism of life এখানে কাব্যরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। ক্ষেত্রমণি যখন মরিয়া গেল, তখন তাহার মায়ের মুখ দিয়া লেখক যে চরম খেদোক্তি প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতেও তাঁহার উৎকৃষ্ট নাটকীয় কল্পনা ও সুগভীর চরিত্রানুভূতির অব্যর্থ পরিচয় রহিয়াছে। ক্ষেত্রমণির শবদেহবাহকের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া রেবতী বলিতেছে—

মুই সোণার নক্সি ভেসিয়ে দিতে পারবো না। মা রে, মুই কনে যাব রে?
সাহেবের সঙ্গি থাকা যে মোর ছিল ভাল মা রে!

পাঠককে বোধ করি বলিয়া দিতে হইবে না, ইহার কোন্ কথাটি দীনবন্ধুর স্থান-কাল-পাত্র-কল্পনা ও সহানুভব-শক্তির সাক্ষ্য দিতেছে।

* * *

এই সকল চিত্র ও চরিত্রসৃষ্টিতে দীনবন্ধুর নাটকীয় কল্পনার মূলে যে কবিদৃষ্টি রহিয়াছে তাহার বৈশিষ্ট্য বুঝিতে বিলম্ব হয় না। দীনবন্ধুর স্বভাব-প্রেরণা, ট্র্যাজেডি বা অতি উচ্চ ভাব-কল্পনার বিরোধী, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তিনি বাঙ্গালী-জীবন হইতে রসের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন; সে রস অতি গভীর ভাবকল্পনার রস নয় এই জন্য যে, তিনি যাহা দেখিয়াছেন, তাহারই তদ্ভাবে মুগ্ধ হইয়াছেন, আর কিছুর দ্বারা পূরণ করিয়া লই নাই। করুণরস বাঙ্গালীর জীবন-কাহিনীতে যথেষ্ট আছে; এবং বাঙ্গালী চরিত্রে, তাহার অতিসঙ্কীর্ণ জীবন-পরিধির মধ্যেই, অতি ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখও ভাব-গভীর অন্তর্বিপ্লবের সৃষ্টি করিতে পারে। কিন্তু নাটকের ঘটনা-চিত্রে, জীবনের পরিদৃশ্যমান কর্ম্মরঙ্গভূমিতে সে চরিত্রের এমন মূর্ত্তি প্রকাশ পায় না যাহাতে নাটকীয় ট্র্যাজেডি-রচনা সম্ভব হয়। বঙ্কিমচন্দ্র অতীতের কাল্পনিক ইতিহাস আশ্রয় করিয়া যাহা রচনা করিয়াছিলেন তাহা নাটকীয় কল্পনা অপেক্ষা কবি-কল্পনারই উপযোগী, তাই বঙ্কিমের প্রতিভায় নাটকীয় গুণ থাকিলেও তাঁহার কল্পনা গদ্য-রোমান্সেই সার্থক হইয়াছে। এককালে কল্পনার এই কাব্য-প্রবৃত্তি বাঙ্গালী লেখককে অভিভূত করিয়াছিল; বাঙ্গালীর জীবনে যাহা নাই, কল্পনায় তাহা পূরণ করিয়া সাহিত্যে নিছক কাব্যরসসৃষ্টির উদ্যোগ চলিয়াছিল। একটা দৃষ্টান্ত দিব। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের 'ফুলজানি' উপন্যাস এককালে

বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল; রবীন্দ্রনাথও এই উপন্যাসের একটি উপাদেয় সমালোচনা লিখিয়াছিলেন। এই উপন্যাসে সেকালের বাঙ্গালী সমাজ; বাঙ্গালী জীবন ও বাংলার পল্লী-প্রকৃতি লেখকের সহজ সহানুভূতি-কল্পনায় চিত্রিত হইয়াছে। দীনবন্ধুর ক্ষেত্রমণি-চরিত্রের যে অংশ 'নীলদর্পণ' নাটকের দৃশ্যগুলির অন্তরালে রহিয়া গিয়াছে, তাহাই উচ্চতর সমাজের মার্জ্জিত পরিচ্ছন্ন রূপে এই উপন্যাসের 'ফুলকুমারী'র চরিত্র-চিত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ইহার শেষের দিকে, ঠিক ক্ষেত্রমণির মতই 'ফুলে'র যে অবস্থা-সঙ্কট কল্পিত হইয়াছে এবং সেই অবস্থায় তাহার চরিত্রে যে ট্র্যাজেডি-সুলভ নায়িকা-বৃত্তি আরোপ করা হইয়াছে, তাহাতে কাহিনীর পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষা হয় নাই; 'ফুল'কে আর ফুল বলিয়া চিনিতেই পারা যায় না। ঘটনা অসম্ভব না হইলেও, এ উপন্যাসের রস বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়; পাঠকের চিত্ত বিস্ময়-বিহ্বল হয় সত্য, কিন্তু সেখানে ট্র্যাজেডির যে বেদনা আমরা অনুভব করি, তাহার কারণ—আমাদের এই অতি-পরিচিত বাঙ্গালী মেয়েটির সেই অভাবনীয় রূপান্তর। যে জীবনের যে রস-কল্পনায় এই উপন্যাসের উৎপত্তি, এবং কতকপরিমাণে পরিণতিও বটে,—শেষাংশের ট্র্যাজেডি যতই সুকল্পিত হউক—সে জীবনের পক্ষে তাহা যেন নিতান্তই আগন্তুক, অভ্যন্তরীণ নহে।

* * *

বাঙ্গালী জীবন ও বাঙ্গালী চরিত্রের এই সংকীর্ণ গণ্ডীকে আশ্রয় করিয়াই দীনবন্ধুর নাটকীয় কল্পনা স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল; এ জীবনে যে উপকরণ সুলভ দীনবন্ধুর প্রতিভা তাহার সম্পূর্ণ উপযোগী। এই লোকায়ত অতি-সাধারণ সুখ-দুঃখকে নাটকাকারে প্রকাশ করিতে হইলে যে রস-প্রেরণা নাটকরচনার পক্ষে সঙ্গত, দীনবন্ধুর তাহাই ছিল

সহজাত শক্তি। এই রস হাস্য-রসই বটে, কিন্তু ইহা সাধারণ ভাঁড়ামী বা রঙ্গরস নহে; ইহা বৃহত্তর অনুভূতি কল্পনার হাস্য-রস। এক হিসাবে যাবতীয় রসের মধ্যে এই রস শ্রেষ্ঠ। দীনবন্ধুর রচনায় যে অতিরিক্ত কৌতুক-হাস্যের প্রাচুর্য্য আমাদিগকে সহজেই আকৃষ্ট করে, তাহাই যদি তাঁহার একমাত্র কৃতিত্ব হইত, তাহা হইলে তাঁহার প্রহসনগুলির মধ্যেও উৎকৃষ্ট নাটকীয় গুণের সমাবেশ আমরা দেখিতে পাইতাম না। সেই প্রবল কৌতুক-হাস্য-প্রিয়তার মধ্যেও দীনবন্ধুর নাটকীয় কল্পনা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই। উৎকৃষ্ট হাস্যরস উৎকৃষ্ট কাব্য-কল্পনার মতই দুর্ল্লভ; কারণ, উভয়ের মধ্যেই জগৎ ও জীবনকে গভীর-ভাবে দেখিবার শক্তি আছে। উৎকৃষ্ট হাস্যরসের মূলে যে কল্পনা-দৃষ্টি আছে তাহা অনেকটা এইরূপ। জীবনের যতকিছু দ্বন্দ্ব, দুঃখ, দুর্গতি ও দুর্ব্বুদ্ধি—সকলের মধ্যেই একটা সমান নিরর্থকতার লীলা আছে; উত্তম-অধম, শ্রেষ্ঠ-নীচ, পাপ-পুণ্য, শক্তি-অশক্তি প্রভৃতি যাবতীয় ভেদ-বুদ্ধি ও তর-তম-সংস্কারের মূলে আছে মানুষের বেরসিক-সুলভ আত্মাভিমান। এই জগৎব্যাপী নিরর্থকতাকে সার্থক করিয়া তুলিবার একমাত্র উপায় সকল ব্যক্তি সকল ঘটনাকে একটা বিরাট হাস্যরসাত্মক অভিনয়ের অঙ্গরূপে উপভোগ করা। তখন দেখিতে পাইবে, যে দুষ্ট তাহারও আত্মাভিমান যেমন বৃথা, যে শিষ্ট তাহারও আত্মপ্রসাদ তেমনই কৌতুককর। এই অভিনয়-রস-বোধ লাভ করিতে হইলে, নিজকে দর্শকের স্থানে বসাইতে হয়, অভিনয়গত ব্যাপারের প্রতি ব্যক্তিগত লৌকিক সংস্কার ত্যাগ করিতে হয়। অতএব উৎকৃষ্ট হাস্য-রসের মূলে একটা অতি উচ্চ রস-কল্পনা আছে। এইরূপ রস-কল্পনায় মানুষের প্রতি বা সৃষ্টির প্রতি নির্ম্মম ব্যঙ্গের ভাব নাই, কারণ অতি ব্যাপক সহানুভূতিই এই হাস্যরসের নিদান। এই ভাব-দৃষ্টির দ্বারা

মানুষকে দেখিতে পারিলে তাহার সর্ব্ব অভিমান নিরর্থক বলিয়াই যেমন হাস্যকর হইয়া ওঠে, তেমনই সেই হাসির অন্তরালে একটি সুগভীর সহানুভূতি প্রচ্ছন্ন থাকে—ঐ সহানুভূতি আছে বলিয়াই পরিহাসও 'রস' হইয়া উঠে, হাস্যরস কবিকল্পনায় অভিষিক্ত হয়।

* * *

দীনবন্ধুর কল্পনা যেখানে যে চরিত্রাঙ্কণে সর্ব্বাপেক্ষা সফল হইয়াছে, সেখানেই উৎকৃষ্ট হাস্যরসের সাহায্য লইয়াছে। তাঁহার 'নীল-দর্পণ' নাটকের অতি করুণ ও বীভৎস ঘটনা সমাবেশের মধ্যেও এই হাস্যরসের যে প্রাচুর্য্য আমরা দেখিতে পাই, তাহা সম্ভব হইত না, যদি জীবনের দুঃখ-দুর্দ্দশা ও পাপ-দম্ভের উপরে তাঁহার উদার রস-কল্পনা জয়ী না হইত ; অত্যাচারী ও অত্যাচারিত উভয়ের মধ্যেই তিনি যে হাসি প্রসারিত করিয়াছেন তাহা যে কোথাও রসভঙ্গ করে নাই, তার কারণ, তাঁহার সেই ব্যক্তি-নিরপেক্ষ উদার রস-কল্পনা। করুণকেও উজ্জ্বলতর করিবার জন্য তিনি হাস্যরসের অবতারণা করেন ; কারণ, এই জাতীয় রসসৃষ্টিতে করুণ ও হাস্য তুল্যমূল্য। এই হাস্যরসই যে দীনবন্ধুর প্রতিভার মূল প্রেরণা তাঁহার কল্পনা যে আর কোনও পথে রসসৃষ্টি করিতে পারে না, তার দৃষ্টান্তও এই নীলদর্পণ নাটক ; এই নাটকেই তিনি পৃথকভাবে করুণরসের সৃষ্টি করিতে গিয়া একেবারে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। প্রশ্ন উঠিতে পারে, তাঁহার হাস্যরস উৎকৃষ্ট হইলেও তাহার পরিসর-ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ, অর্থাৎ তিনি এই হাস্যরসের প্রেরণায় যে চরিত্রগুলি সৃষ্টি করিযাছেন, সেগুলি চরিত্রহিসাবেও নিতান্তই সাধারণ। ইহার একমাত্র উত্তর, তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে তিনি যাহা ভালো করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, তাহাই নাটকাকারে গ্রথিত করিয়াছেন। কিন্তু, একথা ভুলিলে চলিবে না, নাটকের বিষয়ীভূত

কোনও চরিত্রই সামান্য হইতে পারে না—যাহা আপাতঃদৃষ্টিতে সামান্য তাহাই নাটকের সুলিখিত চিত্রে যে রস-রূপ ধারণ করে, তাহাতেই অসামান্য হইয়া উঠে। নাটকীয় কল্পনায় কোনও চরিত্রই সামান্য থাকে না—সকল চরিত্রই সমান মূল্যবান। তাই, দীনবন্ধুর 'নদেরচাঁদ'ও তাঁহার সৃষ্ট আর কোনও চরিত্র হইতে নিকৃষ্ট নহে; এখানে আদর্শের কথা নাই, রুচির কথা নাই, কাব্য-সৌন্দর্য্যের কথা নাই—আছে কেবল ব্যক্তি-চরিত্রের কথা। এই 'নদেরচাঁদ'ও আমাদিগকে আকৃষ্ট করে কোন্ গুণে? এতবড় একটা দুশ্চরিত্র মূর্খও আমাদের রসবোধ তৃপ্ত করে কেমন করিয়া? সে কি কেবল নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের পাত্র হইয়া? না, লেখকের উদার হাস্যরসে অভিষিক্ত হইয়া, সেও তাহার মনুষ্যসুলভ দুর্ব্বলতার প্রতি আমাদের—সজ্ঞানে না হউক, অজ্ঞানে—আত্মীয়তা আকর্ষণ করে। ইহাই দীনবন্ধুর হাস্যরসের বৈশিষ্ট্য—বাংলাসাহিত্যে এ বৈশিষ্ট্য আর কাহারও নাই।

* * *

দীনবন্ধু প্রহসন লিখিয়াছেন, সে প্রহসনে ভাষাগত আমোদ-কৌতুকের অন্ত নাই; তথাপি সেই ব্যঙ্গাত্মক বিকৃতি ও অতিশয়োক্তির মধ্যেও দীনবন্ধুর হাস্যে উৎকৃষ্ট কল্পনা-গুণের পরিচয় আছে। দীনবন্ধুর ভাষায়, আমরা, কৌতুক-প্রবণতার যে আতিশয্য আছে বলিয়া মনে করি, তার একটা কারণ এই যে, এককালে আমাদের সমাজে যে প্রাণ-খোলা উচ্চহাস্যের ভাষা অতিশয় সহজ ছিল, তাহা আমরা ভুলিয়াছি; সে প্রাণও যেমন নাই, তেমনই তাহার ভাষাও আজ আমাদের নিকট নিছক প্রহসনের ভাষা বলিয়া মনে হয়। দীনবন্ধুর 'বিয়েপাগ্‌লা বুড়ো' প্রহসন হিসাবে আজিও অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া আছে। কিন্তু প্রহসনের প্রয়োজনে এই গ্রন্থে তিনি যে 'পেঁচোর মা' চরিত্রটি সৃষ্টি

করিয়াছেন—মনে হয়, প্রহসনের বাহিরেও তাহার একটা বাস্তব অস্তিত্ব আছে; সে চরিত্রের প্রত্যেক রেখাটি এমনই সযত্নে অঙ্কিত যে, তার কতখানি স্বাভাবিক ও কতখানি আতিশয্যঘটিত, তাহা বলা কঠিন। এই প্রহসন হইতেই দীনবন্ধুর হাস্যরসে উচ্চাঙ্গের নাটকীয় কল্পনার একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া এ প্রসঙ্গ শেষ করিব। বিয়ে পাগলা বুড়ো যখন আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে বিবাদ করিয়া, যুবা সাজিয়া, নকল বাসরঘরে নকল শালী-শালাজের কাণমলা সহ্য করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও শেষে কাঁদিয়া ফেলে, এবং 'মলাম, গিচি, মেরে ফেল্লে,—ও রামমণি!' বলিয়া তাহার বৃদ্ধবয়সের একমাত্র পালয়িত্রী ও রক্ষয়িত্রী বর্ষীয়সী বিধবা কন্যার নাম ধরিয়া চীৎকার করিয়া উঠে, তখন এই কৌতুকাভিনয়ের মধ্যেই মুহূর্ত্তের জন্য মানুষের করুণতম অদৃষ্টই হাসিয়া উঠে। নিজ বার্দ্ধক্য অস্বীকার করিয়া যে-বৃদ্ধ বিগত-যৌবনের অভিনয় করিতেছে, সে যে কিছুতেই জরাকে ফাঁকি দিতে পারিতেছে না, নিমেষের মোহও টিঁকিতেছে না—সে যে সত্যই শিশুর মত অসহায়, এবং একটুতেই আকুল হইয়া মাতৃস্থানীয় রামমণিকে তাহার স্মরণ করিতে হয়,—নিয়তির সহিত কঠিন সংগ্রামে, বিমূঢ় মানবের এই অবস্থা যেমন হাস্যোদ্দীপক, তেমনই শোকাবহ। কিন্তু এই রীতিমত প্রহসনের দৃশ্যেও যে-কল্পনা রাজীবলোচনের মুখে ওই 'ও রামমণি!' বলাইয়াছে, তাহাকে কি নাম দিব? প্রহসনের মধ্যেও এ হাস্যরসের দৃষ্টান্ত কি আর কোথাও মিলিবে? দীনবন্ধুর প্রতিভার এই অনন্যসাধারণতা যে উপলব্ধি না করিল, বাংলাসাহিত্যের একটি বিশিষ্ট রসাস্বাদ হইতে সে বঞ্চিত হইয়া আছে।

'ঝড়ের রাতে' দীনবন্ধু

১২৮০ সালের ১৭ই কার্ত্তিক ইহধাম ত্যাগ করিবার পর মাত্র একবার আমাদের প্রিয় নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, প্ল্যানচেটে নয়, নাট্যনিকেতনে 'ঝড়ের রাতে' অভিনয় দেখিতে। সেদিনের কথা, সুতরাং সাক্ষীসাবুদের অভাব হইবে না; আমাদের প্রেত-তাত্ত্বিক ঔপন্যাসিক কবি ভূগোল চট্টোপাধ্যার মহাশয়ও সেদিন উপস্থিত ছিলেন এবং তৎপ্রণীত 'ভিস্তির প্রেম' নামক উপন্যাসের নাটকীয় সম্ভাবনা সম্বন্ধে দীনবন্ধুর সহিত তাঁহার কিঞ্চিৎ আলোচনাও হইয়াছিল। আমার স্পষ্ট স্মরণ আছে সেদিন দীনবন্ধু ভূগোল বাবুকে বলিয়াছিলেন যে তিনি স্বর্গলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ক্ষীরোদপ্রসাদের সহিত আলোচনা করতঃ 'ভিস্তির প্রেম' সম্বন্ধে ভূগোল বাবুকে খবর পাঠাইবেন, 'ছি ছি এত্তা জঞ্জাল' নামক সুবিখ্যাত গানটি 'ভিস্তির প্রেমে' সন্নিবেশিত করিতে পারা যাইবে কি না ওই সঙ্গে তাহাও জানাইবেন। ভূগোল বাবু, বেশী দূরে নয়, পটলডাঙ্গায় থাকেন, আপনারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিতে পারেন।

তবে একথাও পাঠককে সোজাসুজি জানাইয়া দেওয়া ভাল, যে দীনবন্ধু সেদিন অত্যন্ত আহত হইয়া ফিরিয়াছিলেন এবং সেই অপমানের পর তাঁহার মত আত্মাভিমানী ব্যক্তি (বঙ্কিমচন্দ্রেরই লোক বন্ধু!) কখনই আর ইহলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন না, ইহাও নিশ্চয়। 'সধবার একাদশী' ও 'নীলদর্পণ' লিখিয়া তাঁহার যে বাড় বাড়িয়াছিল, তাহাতে এই ধরণের আঘাত যে একটা পাইবেন তাহা তো জানাই ছিল—তিনি অতিরিক্ত অহঙ্কারে আসিয়াছিলেন

অতি আধুনিক 'ঝড়ের রাতে' নাটক লইয়া একটু রসিকতা করিতে। প্রগতিহীন স্বর্গলোকে বাহবা পাইয়া পাইয়া তাঁহার মাথা বিগড়াইয়াছিল, ভাবিয়াছিলেন, স্বর্গের ন্যায় আমাদের নিত্য-পরিবর্ত্তনশীল অথচ চির-নবীন এই পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে তিনি যেখানে দাঁড়ি টানিয়া গিয়াছিলেন সেখানেই বুঝি বাঙলা নাটকের সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেছে। নীল আকাশে সূর্য্য চন্দ্রের মত 'নীলদর্পণ' ও 'সধবার একাদশী'ই রশ্মি বিকীর্ণ করিতেছে! সেই 'নট্ নড়ন চড়ন ঠকাস্ মার্ব্বেল' * মণ্ডিত অমরলোক জানিবেই বা কি করিয়া মরলোকের রঙ্গমঞ্চ কি ভীষণ গতিতে উন্নতির পথে উঠিতে উঠিতে ১৪ই নবেম্বর তারিখে † অভ্রংলিহ গিরি-চূড়ায় আরোহণ করিয়া গণ্ডের উপর বিস্ফোটকের হাসি হাসিতেছে! কেমন করিয়াই বা জানিবে তাহারা যে প্রগতির পথে ঢেলার মত গড়াইতে গড়াইতে স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী মহোদয়ই সম্প্রতি ভিন্ন নামে বঙ্গ-রঙ্গালয়ের মদমত্ত মোশন মাষ্টার স্বরূপ দেখা দিয়াছেন; এ খবরই বা তাহারা পাইবে কোথায় যে দীনবন্ধুর সমসাময়িক নাট্যাকাশের ঘূর্ণ্যমান নীহারিকারাই বর্ত্তমানে প্রবোধ বাবুর সহায়তায় প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড রূপে গগনবক্ষে জ্বলিতেছে এবং নিভিতেছে, উদিত হইতেছে এবং অস্ত যাইতেছে আবার কখনও বা আলেয়ার মত অগ্নিনৃত্যে অন্ধকারকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া ছাড়িতেছে! হায় হতভাগ্য অমরলোক! সেখানে আজিও সেই পাকা দাড়ি গোঁফ সমাচ্ছন্ন কোন্দল-কলহপ্রিয় ঢেঁকিবাহন নারদ ঋষিই পুরাতন প্রথায় সংবাদ-বাহকের কাজ করিতেছে; Publicity নাই, রয়টার নাই; দুন্দুভি নাই, নবশক্তি

* প্রথম সংখ্যা "পরিচয়ে" শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রেমপত্র' দ্রষ্টব্য।

† ৩য় বর্ষ ৩০শ সংখ্যা 'নবশক্তি'তে শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী লিখিত '১৪ই নবেম্বর' প্রবন্ধ দেখুন।

নাই—নিদেন পক্ষে একটা শিবরাম চক্রবর্ত্তী কি অখিল নিয়োগীও নাই যে মাঝে মাঝে এক একটা interview কি প্রবন্ধ ছাড়িয়া স্বর্গবাসী তরুণগণকে কিঞ্চিৎ ওয়াকিবহাল করিয়া রাখিবে! ছাই স্বর্গ!

যাক্, দীনবন্ধুর কথা হইতেছিল। হ্যাঁ, দীনবন্ধু সত্যই আসিয়াছিলেন, নতুবা সধবার একাদশীর নিমে দত্তের কাঞ্চন-বন্দনা স্তোত্রে শ্রদ্ধেয় হেমেন্দ্রকুমার রায় মহাশয় সুর দিলে ভাল হয়, একথা বলিলেন কেমন করিয়া? 'নীলদর্পণ' নাটকে 'আলেয়া'র নটরাজের নৃত্যটি যেখানে হউক এক জায়গায় বসাইয়া দিবার কথাই বা তাঁহার মনে হইল কেন! দীনবন্ধু আসিয়াছিলেন এবং আসিয়া নাট্যনিকেতনের প্রেক্ষাগৃহের 'c' পংক্তির বাম দিক হইতে তৃতীয় আসনের হাতলে পাকানো চাদরটি বাঁধিয়া বসিয়াছিলেন, মাথায় ছিল সেই জামবাটি-উপুড়-করা ফ্যাশনের টুপি। আমার বেশ মনে আছে—ঠিক পিছনের পংক্তিতেই দুইজন তরুনের মাঝখানে স্যাণ্ডউইচ্‌ড্ হইয়া উপবিষ্ট নন্দভাজ সম্পর্কিতা দুইটি তরুণী দীনবন্ধুর অদ্ভুত টুপি দেখিয়া কিঞ্চিৎ হাস্যপরিহাস করিয়াছিলেন।

সেদিন বড় দিনের ছুটি ছিল। অনেক বাঙ্গালই হাইকোর্ট, রবীন্দ্রজয়ন্তী, ঘোড়দৌড় ও থিয়েটার দেখিতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, প্রেক্ষাগৃহে তিল ধারণের স্থান ছিল না। সেদিন অভিনয় ছিল দুই কিস্তি—৪টা হইতে ৮টা 'ঝড়ের রাতে' এবং ৯টা হইতে ১২টা 'আলেয়া'—একা রামে রক্ষা নাই সুগ্রীব দোসর! হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার। আলোর পিছনে ছায়ার মত মহারাজ শ্রীশনন্দী মহাশয়ের পিছনে আমাদের উপাসনা-ব্রাণ্ড সাবিত্রীবাবুও আসিয়াছিলেন কিন্তু মহারাজের পিছনে বসেন নাই, 'পাসে' বসিয়াছিলেন!

আমিও কি ছাই দীনবন্ধুকে চিনিয়াছিলাম? 'গৈরিকপতাকা'

যশের শচীন সেনের অতিআধুনিক নাটক 'ঝড়ের রাতে' দেখিতে গিয়াছি—শিবরাম চক্রবর্ত্তীর '১৪ই নবেম্বর' পড়িয়া পড়িয়া প্রায় মুখস্থ হইয়া গেছে।—এমনই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি যে নাটক শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে যবনিকা-পতন হইলে আমার জীবনের যবনিকাও পড়িবে কি না মাথায় এই ভাবনা ঢুকিয়াছে। আশে পাশের কিছু দেখিবার অবকাশ আমার ছিল না। থিয়েটারে ঢুকিবার মুখেই ইজিচেয়ারে শায়িত প্রবোধবাবুর অপরূপ প্রসন্ন হাসি ও শ্রীযুক্ত সতু সেনের কালো টাইটাই মাথার ভিতর ঢুকিয়াছিল—নাটক সুরু হইয়া খানিকটা অগ্রসর হওয়া পর্য্যন্ত প্রবোধ বাবুর হাসি ও সতুবাবুর টাইয়ে মগজের ভিতর জট পাকাইয়া যাইতেছিল—হঠাৎ উষা ও সন্ধ্যার উদয় হইতেই প্রবোধবাবুর হাসিও মিলাইল, সতু সেনের টাইটাও আর দেখিতে পাইলাম না, সন্ধ্যা ও উষার মধ্যে দোল খাইতে খাইতে দীনবন্ধুতে আসিয়া চমকাইয়া উঠিলাম। কিন্তু সে অল্পক্ষণের জন্য। চেনা চেনা মত মনে হইলেও চিনিবার অবকাশ ছিল না। দূর ছাই! কোনও মার্চ্চেণ্ট অফিসের হেড্ কেরাণী হয় ত!

মন তখন ফুলিয়া ফুলিয়া বুককে কেন্দ্র করিয়া চারিদিকে তরঙ্গ তুলিতে সুরু করিয়াছে। অদ্ভুত! অদ্ভুত! এক্সপেরিমেণ্টাল শাইকলজীর ছাত্রী দুইটি ভদ্রঘরের মেয়ে দুই সহপাঠী পুংবন্ধুর সহিত এক গাড়ীতে হারমোনিয়াম সহযোগে গান গাহিতে গাহিতে আসিতেছে, as free as air! মোটর গাড়ীর চাকার বদ্ধ বাতাস নহে, একেবারে ফাঁকা গঙ্গার হাওয়া। যে বাড়ীতে তাহারা আসিতেছে সেই বাড়ীর মালিক মেয়েদের একজনের দাদা এবং অভিভাবক সস্ত্রীক দাঁড়াইয়া শুনিতেছেন, ভগিনী পুংবন্ধুদের (দাদার অপরিচিত) সহিত গলা মিলাইয়া গাহিতেছে—

ঘর পালালো মন নিয়ে তাই বেড়িয়ে বেড়াই
ফাঁকায় ফাঁকায়।

আমার মন তখন দুনে চৌদুনে ভদ্রমেয়েদের সহিত গলা মিশাইয়া গান ধরিয়াছে—পাশে কে বসিয়া আছে দেখিবে কে? তারপর সেই thrill, সেই experience! ইচ্ছা হইতেছিল উষা ও সন্ধ্যার (মেয়ে দুটির নাম) 'কিডে' * তাহাদের নাচের সরঞ্জামের সঙ্গে আমিও ঢুকিয়া যাই—ঢুকিয়া যাই, আর বাহির হই না!

কিন্তু নাচের সরঞ্জাম্ বাহির না হইলে নাচ হয় না। নাচ-গান না হইলে সব মাটি—অডিটোরিয়াম ফাঁক! অতি আধুনিক নাটকের ইহাই বিশেষত্ব। আর বিশেষত্ব, কথা—এ পক্ষ এবং ও পক্ষ যেন ধারালো তলোয়ার খেলিতেছে। এর কথাও কাটিল কচ্ করিয়া, ওর কথা এ কাটিল কুচ করিয়া। কথাগুলা শ্রোতাদের চোখের সাম্‌নে যেন সরিষা ফুলের মত ফুটিয়া ওঠে—বসিয়া পড়িয়া দোয়ানি খুঁজিলেই হয়! চোখ বুজি। নাটক শোন, মনে হইবে—যেন নাট্যকার স্বয়ং হরবোলা সাজিয়া নিজের বুকের কথা আর প্রাণের ব্যথাই মিহি মোটা করুণ ও রুদ্রসুরে বলিয়া চলিয়াছেন—তিনি একাই নাটকের যাবতীয় কুশীলবগণ। চেহারা এবং sexএর পার্থক্য শুধু বৈচিত্র্যের জন্য পুরুষের throw এবং মেয়ের delivery যুৎমত হইলেই অতি আধুনিক নাটক একেবারে ১৪ই নবেম্বর মার্কা হইয়া যায়। অতি নাচ গানের সময় স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টির মত গায়কের

* আমরা জানিতাম কিট্ ব্যাগ—কিন্তু অতি আধুনিক নাট্যকার, মডার্ণ শিক্ষিত পরিবারগুলি যিনি তন্ন তন্ন করিয়া ষ্টাডি করিয়াছেন তিনি একাধিকবার লিখিয়াছেন কিড—সুতরাং কিড্।

গায়িকার ও নর্ত্তকীর মুখের ভাঁজে ও কাপড়ের ভাঁজে নানারঙের আলোক-বৃষ্টি হইলেই—ব্যস! ধন্য প্রযোজক আর ধন্য পরিচালক!

যাক্, কিডে ঢোকা হইল না—দীনবন্ধুকে চেনা ত নয়ই। হঠাৎ চমকাইয়া উঠিলাম—নায়িকা বিজলী বলিতেছে—

"আমি ত' বলি স্থাবরের স্থিতি-শীলতা নিয়ে পচবার গলবার চেয়ে, গতির আনন্দ উপভোগ করতে করতে মরব, ঢের—ঢের ভালো।"

ইচ্ছা হইল চেয়ারের উপর লাফাইয়া উঠিয়া নাচিতে নাচিতে থিয়েটার দেখি, কিন্তু, পিছনেই ননদভাজ সম্পর্কিতা তরুণী দুইজন! উদ্বেলিত আবেগ বুকে চাপিতে চাপিতে ঘামিয়া উঠিলাম, শীতের রাত্রি তবুও। কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে সকল উত্তাপ জল হইয়া গেল। শুনিলাম 'আগামী কালের নারী' সন্ধ্যা ও উষা already-come পুরুষদের সম্পর্কে মন্তব্য করিতেছে—

সন্ধ্যা। আমি জানি আমার ভিতরে যদি আগুন থাকে তাহলে পুরুষ পাকার মতোই তাতে আত্মাহুতি দেবে। আমি তাই ইন্ধন জুগিয়ে জুগিয়ে সেই আগুন রাখবার চেষ্টা করছি। * *

উষা। তোর দেখছি বিয়ে আর হবে না!

সন্ধ্যা। তোর যেন হবে!

উষা। * * একা একা পথ চলা আমায় দিয়ে হবে না।

সন্ধ্যা। দুটির কোনটিকে চাই! সমরকে না প্রণবকে?

উষা। ধোৎ। ওরা ত' খেলার সাথী। ...ওদের সাথে বড় জোর প্রেমের খেলা করা চলে, সত্যিকারের প্রণয় চলে না।

আমার মন সম্মুখে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া ভাবিতে বসিল, দুটির কোনটিকে চাই—

কতক্ষণ ভাবিয়াছিলাম জানি না, ননদের সঙ্গে মাসীমা আসিলেন।

যামিনী মাসীমার কাপড়ে একটি 'বোকে' আঁটিয়া দিল। অতি-আধুনিক নাটকে 'বোকে'ও কাপড়ে আঁটিতে হয়। মনকে বলিলাম, শেখ, হতভাগা, শেখ্। শচীন বাবু অতি আধুনিক নাটক লিখিয়াছেন— মডার্ণ শিক্ষিত সমাজের ছবি আঁকিয়াছেন অথচ এইজন্য তাঁহার শিক্ষিত হইবার প্রয়োজন হয় নাই।

তারপর 'ডাইনিং হলে খাওয়া', 'অর্গানে আঘাত', 'পেছনে লাগা', হইতে 'মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ আজকের নারীর পক্ষে লজ্জার নয়। গৌরবের কথা' অবধি শুনিলাম। মনে হইল, আজকের দিনে কেন আগেও এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে—যযাতির নিকট শর্ম্মিষ্ঠা এই আবেদনই করিয়াছিল। তবে এই নাটকের অতিআধুনিকত্ব কোথায়?

ভাবিতে ভাবিতে ভাবনা-সমুদ্রে ডুবিয়া গেলাম। যখন ভুরভুরি কাটিয়া উঠিলাম তখন চারিদিকে ঝড় উঠিয়াছে—রঙ্গমঞ্চের ভিতরেই। বৃষ্টির ঝাপটার আওয়াজ হইতেছে। সিঁড়ির ঠিক নীচেই, বিজলীরূপ খর্জ্জুরবৃক্ষে কইমাছরূপ প্রভঞ্জন কান্‌কোর সাহায্যে বাল্‌তেগ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে—হঠাৎ দোতালা হইতে নায়ক প্রশান্ত সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতে নামিতে চীৎকার করিয়া উঠিল—'ভৈরবদা, আমার বন্দুক, বন্দুক ভৈরবদা'—এবং হলে নামিয়া লাফাইতে লাগিল।

আমার মনের অবস্থা পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন, বুঝিতে পারিতেছেন যে এই অবস্থায় যদি আয়েষাকে লইয়া জগৎসিংহ দুর্গ-প্রাকার হইতে শুকনো ড্যাঙায় ঝাঁপ দেয় তাহা হইলেও আমি বিচলিত হইব না। কিন্তু তবু বিচলিত হইতে হইল। সেই জামবাটি টুপি-পরণে ধেড়ে মিস্সেটি তখন ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে সুরু করিয়াছিলেন— অন্ধকারে তাঁহার চাপাকান্না 'ঝড়ের রাতে'র নকল ঝড়ের দীর্ঘশ্বাস

হইতেও ভয়াবহ বোধ হইল। অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া ভদ্রলোককে ধরিয়া একটা নাড়া দিলাম—একটু অনুকম্পাও যে না হইতেছিল তা নয়, ভাবে মনে হইতেছিল হয় ত বা তাঁহার জীবনেও 'প্রভঞ্জন' আসিয়া একটা লণ্ডভণ্ড কিছু করিয়া গিয়া থাকিবে—কিন্তু ওই ধেড়ের কান্নার জন্য অমন নাটকটি তো নষ্ট হইতে দিতে পারি না। আশে পাশে চাহিয়া দেখিলাম, বৃদ্ধের কান্না অন্য কাহাকেও বিচলিত করে নাই—তাহারা বিমূঢ়ভাবে প্রশান্তের বন্দুক কার্য্যকরী হইয়া উঠে কি না তাহাই দেখিতেছে—মায়, উষা ও সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দোতালা হইতে নামিয়া আসিয়াছে।

বৃদ্ধকে আরও জোরে নাড়া দিয়া কহিলাম, কান্‌চেন কেন মশায়? বেশী ভাব লেগে থাকে তো বাইরে গিয়ে কাঁদুন।

ভদ্রলোক বাঁ হাতের তালুর উল্টা পিঠ দিয়া চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে বলিলেন, মাপ করবেন, মনের দুঃখে একটু আত্মবিস্মৃত হয়েছিলাম। নিজের দুখেই কাঁদছি মশাই, পরে—

—তাইতো বল্‌ছি, পরকে না শুনিয়ে—

—আপনি বুঝছেন না; আমি প্রশান্তের জন্যে কাঁদিনি—

'ঝড়ের রাতে' তখন ঝড়ের বেগে action হইতে actionান্তরে ছুটিয়া চলিয়াছিল। প্রশান্ত মাথার চুল ছিঁড়িতেছিল—তবু জবাব দিলাম,

—জানি। বিজলীর জন্যে তো!

—না।

—বুঝেছি, সন্ধ্যা, উষা। সুবিধা হবে না, মশায়—সব বাঁ—

—তাও নয়। আমার নিজের নাটকগুলোর জন্যে কান্না পাচ্ছে—হায়, হায়, এ-সব সুবিধা যদি পেতাম!

আমার হাসি পাইল, বাংলাদেশে খাঁটি নাটককার বলিতে আড়াই জন—নাটুকে মন্মথ রায় এক, নট শচীন সেন দুই এবং notorious শিবরাম চক্রবর্তী হাফ—মোট আড়াই। এই আড়াই জনকেই চিনি। এ আবার কে, বলে, নাটক লিখি! হাসি গোপন রাখিয়া গম্ভীরভাবে বলিলাম—গণেশ অপেরা পার্টির জন্য লেখেন বুঝি—তা—

—আপনি ঠাট্টা করতে পারেন, বারণ নেই, কিন্তু সেকালে এমন দিন গ্যাচে, যখন আমার নাটক ছাড়া আর কিছু অভিনয়ই হত না—

—বটে! মশায়ের বয়স কত?

শাম্‌লা মাথায় ভদ্রলোক হাসিলেন, বলিলেন, ১২৮০ সালের কার্ত্তিক মাসে আমার বয়স ছিল ৪৪।

দীনবন্ধুসংখ্যা শনিবারের চিঠির বিজ্ঞাপন দিতে গিয়া ব্রজেনদার মারফত সদ্যসদ্য অবগত হইয়াছি, ১২৮০ সালের কার্ত্তিকেই দীনবন্ধুর জীবননাট্যের যবনিকা পতন হইয়াছিল। আর বলিতে হইল না। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বলিলাম, মাফ করবেন, অন্ধকারে ঠিক ঠাহর করতে পারি নি। এবং সঙ্গে সঙ্গে 'সধবার একাদশী'-প্রণেতার সঙ্গে একটু রসিকতা করিবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম, অবিশ্যি, কান্না শুনে আমার বোঝা উচিত ছিল—আপনাদের ওযুগে করুণ রস অত্যন্ত সুলভ ছিল কি না।

দীনবন্ধু অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন। ভাগ্যিস আমাদের কথোপকথন আশেপাশের আর কেহ শুনিতে পাইতেছিল না, নতুবা সেদিন একটা কুরুক্ষেত্র হইত নিশ্চয়; বলিলেন, তার চাইতে সুলভ ছিল প্রাণখোলা হাসি, স্পষ্ট কথা। আমি যখন মারা যাই দেবেনবাবুর ছোট ছেলে তখন শিশু। বঙ্কিমের মুখে শুনেছি সেই ছোকরাই এমনিতরো প্যাচানো কথার আমদানি করেছে। আমি তো সব বুঝতেই পারলাম

না। আর, তোমরা ফুঁপিয়ে কাঁদ না বটে—কথার কমা সেমিকোলোন ড্যাশ ফুলিষ্টপে কান্না তোমরা চমৎকার আয়ত্ত করেছ!

—অর্থাৎ—

—তোমাদের নাটকের চাকরের কথাবার্ত্তা শুনলে মনে হয়, যেন যোড়াসাঁকোর জামাই, আর ঝি যেন কলুটোলার পুত্রবধূ; নাটক দেখছি, না, সমাজ-মন্দিরে উপাসনা শুনছি বোঝা শক্ত।

নাট্যনিকেতন রঙ্গমঞ্চ তখন গমগম করিতেছে। বিজলীর দিদি যামিনী বিজলীর স্বামী প্রশান্তকে বলিতেছে—

যামিনী। যাও কাপুরুষ নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত কর।

প্রশান্ত। অধিকার? অধিকার, মেজদি। যার ভালবাসা হারিয়েছি, তার ওপর কিসের অধিকার আছে?

যামিনী। সত্যই কি তুমি গ্রন্থকীট? এতটুকু পৌরুষও কি তোমার অবশিষ্ট নেই। তোমায় যেতে হবে, তোমার বিবাহিতা পত্নীকে ওর কাছ থেকে ছিনিয়ে আনতে হবে।

[যামিনী প্রশান্তকে টানাটানি করিতে লাগিল

প্রভঞ্জন। ও কেন আসে না, এসে কেন তোমায় আমার কাছ থেকে কেড়ে নেয় না?

আধুনিক নাটকের কী অপূর্ব্ব পরিণতি! এ শুধু এ-যুগেই সম্ভব! আনন্দোজ্জ্বল মুখে দীনবন্ধুর দিকে চাহিলাম। গতিক খারাপ; ভদ্রলোক আবার ফুঁপাইতে সুরু করিয়াছেন। নিজের নাটকের কথা শুনিয়া কাঁদিতেছেন—বলিলেও, বুঝিলাম তিনি আসলে শচীনবাবুর নাটক দেখিয়াই অভিভূত হইয়াছেন। ভদ্রলোকের পিঠে কনুয়ের একটা ঠ্যালা মারিয়া কহিলাম—ঐ রে, আপনি আবার—

—কান্না নয় ভাই—তোমরা আমায় বড়ই ভাবিয়ে তুললে। বড্ড ভুল হয়ে গেছে, শোধরানোর উপায় নেই আর। নইলে 'সধবার একাদশী'তে বয়াটে অটলের পাশে তার মাগ কুমুদিনীকেও যদি একটু আউট করিয়ে দিতে পারতাম, নাটকটা জমত ভাল। এখন দেখছি, আমার একটা নাটকও এযুগে চলবে না।

—সেজন্যে আর ভাবছেন কেন, বলুন। আপনার সুহৃৎ বঙ্কিমকেও তো আমাদের যুগের শরৎ বাবু মেরেছেন—যুগপরিবর্ত্তন বড় সাংঘাতিক ব্যাপার মশায়!

বঙ্কিমের নাম হইতেই দীনবন্ধুর চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বলিলেন, বঙ্কিম ঠিকই বলেছিল—যাক্, প্রবোধ বাবু আর সতু সেনের সঙ্গে একবার আলাপ করিয়া দিতে পার?

একটু কৌতুক অনুভব করিলাম, বাহিরে দেখিতে ভদ্রলোককে নিরীহ গোছ বোধ হইতেছিল, বুঝিলাম, ভিতরে প্যাঁচ আছে। প্রবোধ বাবু ও সতু সেনকে উস্কাইয়া দাঁও মারিবার চেষ্টা।

আমাকে ভাবিত দেখিয়া দীনবন্ধু বলিলেন, ছ্যাখ ওতে কিছু ফল হবে না! আমাদের সময় এক একটা চরিত্র, কথায় বার্ত্তায় ধরণ ধারণে নিখুঁত করবার জন্যে কম বেগটা পেতে হয়েছে! যেখানকার যা ভাষা, যার যেমন হাবভাব দরকার, যেখানে যেমনটি মুখভঙ্গী ঠিকমত আয়ত্ত করার জন্যে কি কম হেফাজত! যতগুলি চরিত্র ততগুলি আলাদা লোক! এখন দেখছি, সে বালাই নাই, নাটকে পাঁচ হোক, দশ হোক, বিশ হোক যত গুলোই চরিত্রই হোক না কেন, নাটককার নিজেকে তত ভাগে ভাগ করে সমস্ত বইখানায় দিলেন চারিয়ে—তাঁর কর্ত্তব্য শেষ! তার পর, ঠ্যালা সামলান পরিচালক আর প্রযোজক! প্রবোধ বাবু আর সতু সেনের বড় কষ্ট, না?

আমি দেখিলাম বাড়াবাড়ি হইতেছে, ভদ্রলোক বক্তৃতা সুরু করিয়াছেন, বলিলাম, চলুন না, তাঁদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, খুসী হবেন তাঁরা, তা ছাড়া প্রতি মাসে একটা করে নতুন নাটক তাঁদের তৈরী করতে হবে। এত নতুন বইই বা পাওয়া যায় কোথায়? আপনাদের বইগুলোই তো গড়ে পিটে নিতে হবে। দেখা হলে সুবিধে হবে আপনার।

—তা বেশ চল, কিন্তু, বিজলীর কি হ'ল দেখে যাব না ?

বৃদ্ধের রস লাগিয়াছিল মনে হইল। প্রেমাস্পদ প্রভঞ্জনের হাত ধরিয়া বিজলী তখন স্বামীগৃহ ত্যাগ করিয়া যাইতেছে, ঝড়ের হাওয়ার দীর্ঘ শ্বাস ও মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ-গর্জ্জন শোনা যাইতেছে। ননদ-ভাজ সম্পর্কিতা তরুণী দুইজন কখন উঠিয়া গিয়াছেন। উপরের একটা বাক্সে নারীকণ্ঠে কে ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে।

প্রশান্ত বলিতেছে, 'একটু অপেক্ষা কর; প্রভঞ্জন, একটু অপেক্ষা কর। মেজদি! ওর অলঙ্কার, ওর রেনকোট, ওর জন্য কিছু টাকা। নইলে ওর বড় কষ্ট হবে।'

দীনবন্ধু উঠিয়া দাঁড়াইয়া আবার বসিয়া পড়িলেন বলিলেন, আমার লীলাবতীর জন্য বড় কষ্ট হচ্ছে। আহা বেচারা!

প্রবোধবাবুর মফঃস্বল-ঘরে সতু সেন ও তিনি বসিয়াছিলেন, দীনবন্ধুর সহিত তাঁহাদের আলাপ করিয়া দিলাম। প্রবোধ বাবু সেই অপরূপ হাসি হাসিয়া বলিলেন, আপনার সঙ্গে আমি একটু আত্মীয়তা claim করি—চাকুরী ব্যাপারে আপনি আমার পূর্ব্বপুরুষ, আবার দুজনেরই কারবার নাটক নিয়ে।

দীনবন্ধু হাসিলেন, বলিলেন, ঠিক। আত্মীয়তা আরও ঘনিষ্ঠ হতে পারে যদি সতুবাবু কৃপা করেন—কিছু বলতে ভরসা পাচ্ছি না মশাই। দেখে শুনে হকচকিয়ে গেছি।

সতুবাবু কালো টাইটা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে বলিলেন, এই প্লেটার লাইট এফেক্ট দেখলেন ?

দীনবন্ধু সসম্ভ্রমে বলিলেন, দেখলাম বৈ কি। অপূর্ব্ব! আমাদের সময় এসব জিনিষের কল্পনা করতে পারলে—

সতু সেন দীনবন্ধুকে কথা শেষ করতে দিলেন না, বলিলেন,

সে আমি ঠিক করে নেব। কিন্তু শুনেছি আপনার ডায়ালগ মাঝে মাঝে বড্ড ভাল্‌গার। এযুগে অচল। একটু আধটু বদলাতে হবে। আপনার ভয় নেই, সাহিত্য আমার জুরিসডিক্‌শন নয়, সে আমি শচীন বাবুকে দিয়ে করিয়ে নেব। দেখলেন তো 'ঝড়ের রাতে'? কি chaste!

দীনবন্ধু চটিলেন। পাশ কাটাইবার জন্যই আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, চলহে, নাটকের শেষটা দেখে আসি। ফিরে এসে জমিয়ে বসা যাবে।

প্রবোধ বাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, আজ বড্ড ব্যস্ত থাকব। 'ঝড়ের রাতে'র পরেই 'আলেয়া' কিনা, সিন চেঞ্জ মহা হাঙ্গামের কাজ, আর একদিন দুপুরের দিকে আসবেন—আসবেন কিন্তু। এঁদের সঙ্গেও আলাপ হবে'খন—

সতু সেন বাঁকা হাসি ও করকম্পনে দীনবন্ধুকে বিদায় দিলেন। তিনি ঘোঁৎ ঘোঁৎ করিতে করিতে আমাকে উপেক্ষা করিয়াই সোজা আসিয়া নিজের আসনে উপবিষ্ট হইলেন। আমিও সসঙ্কোচে তাঁহার পাশে বসিলাম।

নাটক শেষ হইয়া আসিয়াছে। বিজলী যামিনী প্রশান্তের গৃহত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিতেছে। বিজলী বলিতেছে—

মেজদি, চল।

যামিনী। আমাকে ভুল বুঝ' না প্রশান্ত।

প্রশান্ত। মেজদি, তুমি যে দেবী, সেই কথাই ভালো করে বুঝিয়ে দিয়ে গেলে। দুঃখ এই মেজদি, তোমাদের আমি কাছে রাখতে পারলুম না। সর্ব্বস্বের বিনিময়েও না।

চাকর ভৈরব। পারবি কেমন করে? মায়ের দুধ খেয়ে তো মানুষ হ'সনি।

[সকলে ভৈরবের দিকে চাহিল]

পুরুষ যদি হতিস্ তাহলে কি আর ইস্ত্রিকে অমন করে ছেড়ে দিতিস? চুলের মুঠো ধরে টেনে রেখে দিতেস।...বাপ ঠাকুরদার নাম যদি না ডোবাতে চাস্, তাহলে এই মুখ্যুর কথা শোন। বুঝিয়ে দে যে, তুই পুরুষ।......

যামিনী। তাই কর প্রশান্ত, তাই কর।......

প্রশান্ত। তাই করব, মেজদি?

বিজলী। [সুটকেশ ফেলিয়া দিয়া ছুটিয়া প্রশান্তর কাছে গেল] ওগো তাই কর। তাতে আমার ভালই হবে।

প্রশান্ত। হাঁ তোমায় বেঁধেই রাখব। পীড়নই করব।

উপরের বক্সের সেই নারীকণ্ঠের কান্না আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিল। কালো অন্ধকারে সাদা রুমালগুলি আশে পাশে সর্ব্বত্রই এই ঝকঝক করিতে লাগিল। নাক-ঝাড়ার শব্দ।

প্রশান্ত বিজলীর উপর পীড়নের নমুনা দেখাইবার পূর্ব্বেই দীনবন্ধু খাড়া হইয়া দাঁড়াইলেন। মুখে ক্রোধ ও বিরক্তির চিহ্ন! বলিলেন, ছি! ছি! ছি! আর সতু সেন বলে কিনা আমার ডায়ালগ ভাল্‌গার। ভাল্‌গারের নিকুচি করেছে। আমার কথা ভাল্‌গার! তোমাদের 'ঝড়ের রাতে' কি বাপু? chaste? মুণ্ডু! ছি ছি! আজকালকার মেয়েরাই বা কি? উঠে গেল না! বসে দেখতে পারলে! আমার অটলও এমন জিনিষ বাইরে দেখাতে লজ্জা পেত, অন্যে পরে কা কথা।

বলিতে বলিতে দীনবন্ধু লাফে লাফে অডিটোরিয়ামের চেয়ার পার হইতে হইতে শূন্য পথেই দ্বিতলে উঠিলেন এবং অনতিবিলম্বে নাট্যনিকেতনের ছাদ ভেদ করিয়া শূন্যমার্গে বিলীন হইলেন। আমি হতভম্ব হইয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম।

যখন জ্ঞান হইল তখন দেখি—'আলেয়া' সুরু হইয়া গিয়াছে, অগ্নিশিখা রঙের বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া যোগিনীদল রঙ্গমঞ্চে অগ্নিনৃত্য করিতেছে—গান চলিতেছে—

জাগো নারী—
দিকেদিকে মেলি তব লেলিহান রসনা

নেচে চল উন্মাদিনী দিগ্‌বসনা—
জাগো হতভাগিনী ধর্ষিতা নাগিনী—

চমক ভাঙিতেই হঠাৎ মনে হইল—ধর্ষিতা যদি তাহা হইলে পীনাল কোডের আশ্রয় না লইয়া ইহারা নাচিতেছে কেন ?

দীনবন্ধু ও বঙ্কিম

দীনবন্ধু—তোমাকে 'নবীন তপস্বিনী' দিয়েছিলুম—কই সব কথা ত বল্লে না। অরুচি হল কিসে ? নবীনে, না তপস্বিনীতে ?

বঙ্কিম—তপস্যায় অরুচি তোমারও যেমন আমারও তেমন। তাই, বলে 'নবীন তপস্বিনী' ত মন্দ ঠেকে নি।

দীনবন্ধু—সবটা ত আর তোমার নতুন রুচিতে ওৎরাবে না—তাই জিজ্ঞেস করছিলুম, কি ভালো লাগল ? কি ভালো লাগল না, তাও বলতে পার।

বঙ্কিম—এককথায় কোন কথাই বলা যায় না।

দীনবন্ধু—এক কথা তোমায় কে বলতে বলেছে ? এক শ' কথাই না হয় বলো।

বঙ্কিম—এতদিনে খাঁটি লেখক হয়েছ। যে নিজের লেখা পড়তে ও পড়াতে, তার আলোচনা করতে ও আলোচনা শুনতে সর্ব্বদাই ব্যস্ত সে-ই হ'ল লেখক।

দীনবন্ধু—বেশ, বেশ, তোমাকেও ও বিষয়ে হতাশ হতে হবে না। তোমার লেখা অলেখা বইগুলোর কথা যত খুশী বকতে চাও,

আমি শুনব।—এখন বলো, 'নবীন তপস্বিনী' পড়ে তোমার কি মনে হল।

বঙ্কিম—মনে হল, তোমার কথা। যেখানে তুমি উপস্থিত সেখানেই বই জমে উঠেছে।

দীন—আমি উপস্থিত?

বঙ্কিম—ঠিক তাই। তুমি মজ্‌লিসে বস্‌লে, মজলিসের ছিলিম ঘন-ঘন বদলাতে হয়।

দীন—সে না হয় মজলিসে হয়।

বঙ্কিম—মজ্‌লিসে বৈঠকে চৈব—লেখায়ও তাই। হাসি যেখানে তুমুল হয়ে উঠ্‌ল, সেখানেই বুঝ্‌ব দীনবন্ধু আছে। 'নবীন তপস্বিনী'তেও তোমার তাপস-তপস্বিনীরা থাকুন, যায় আসে না। কিন্তু তোমার জলধর জগদম্বা না থাকলে যে দমবন্ধ হত।

দীনবন্ধু—ওদের তোমার ভালো লেগেছে?

বঙ্কিম—কারুর তা না লেগে পারে না কি? যদি তেমন কেউ থাকে তাদেরকে তোমার ত্রিসীমানা মাড়াতে মানা করে দিও।

দীন—একালের রুচি। অত হাসি, অত মস্করা, অত রঙ্গব্যঙ্গ—এজুকেশন-দম্ভে বড্ড বেমানান ঠেক্‌ছে না? হাল্কা মনে হবে না?

বঙ্কিম—দেখ, তুমি আমাকে তোমার ঘটীরাম পেয়েছ?—

দীনবন্ধু—হাজার হোক্, তোমাদের সমাজেরই লোক ত।

বঙ্কিম—তা হলে, ভুল করে আমাকে না জিগ্যেস্ করে—সমাজের লোকদের জিগ্যেস করো।

দীনবন্ধু—চুলোয় যাক্, তুমিই বলো। রঙ্গের দিকটি তোমার ভালো লেগেছে; অন্যদিকটি,—রমণীমোহন, মালতী, তাদের কেমন লাগল?

বঙ্কিম—আলুভাতে, আলুভাতে। যেন ঘী দিয়ে না মাখালেই চলে না—ওদের দিয়ে না হয় ঝাল, না হয় চচ্চড়ি। ভালো রাঁধুনী আলুভাতে রেঁধে খুশী হতে পারে কি? না খাঁটি রসিকই তা খেয়ে খুশী হতে পারে?

দীন—পোলাও কালিয়াতেই ত রাধুনীর হাতযশ।

বঙ্কিম—তা হবে, তোমার হাত যশটা ঝালে আর চচ্চড়িতে। ওটাও সহজ কথা নয়।—মনে যার রঙ্ নেই, রঙ্গ তার লেখায় নেই। সে যদি সং সাজাতে যায়, নিজেই সং সেজে বস্‌বে। সে কঠিন পরীক্ষায় তোমার জুড়ি মেলে না। তুমি এক্কেবারে ডবল ফার্স্ট ক্লাশ। যেমন তোমার চোখ, তেমন তোমার কথা।

দীন—সোজা কথায় বলো না যে, শকুনির দৃষ্টি ভাগাড়ে।

বঙ্কিম—কিম্বা বৈদ্যের দৃষ্টি ফোড়ায়।—যা খুশী বলো। কথাটা ওই। চোখে তুমি যেমন ক'রে অসঙ্গতি আর ব্যঙ্গাত্মক দিকটি দেখতে পার, তেমন সহজে আর কেউ তা দেখতে পায় না। কাছারিতে মজ্‌লিসে অনেক বাঁদরই ত দেখছি কিন্তু আঁকতে গেলে দেখি ন্যাজের কথাই ভুলে যাই। তোমার হাতে ন্যাজটি সুন্দর, সুপুষ্ট, বড় হয়ে দেখা দেয়। তোমার চোখকে কিছুতেই ফাঁকি দেবার উপায় নেই। ওটাই তোমার সব চেয়ে বড় শক্তির কথা।

দীন—কিন্তু এই নূতন যুগের সুনীতি দুর্নীতির বৃহল্লাঙ্গুলরা যে আমার উপর লাফিয়ে পড়বার জন্য ওৎ পেতে বসে আছেন।

বঙ্কিম—উপায় নেই। তাঁরা অনুমোদন করলেন বার-ইঞ্চি ন্যাজ-বিশেষ স্থলে চলতে পারে। তুমি জুড়ে দিলে বার-গজী এক ন্যাজ। কাজটা যে ভালো করলে তা নয়—তবে ন্যাজটা ন্যাজই

হল, অর্কফলা হয়ে গেল না, সভ্য ভব্য হয়ে রইলা না। তা'তেই তাঁদের ক্ষোভ।

দীন—কিন্তু, শুধু ত এ কথা নয়—আমার অনেকগুলো চরিত্রের কথাবার্ত্তা, কাজকারবার ত খুব শিষ্টজনোচিত নয়। সে সম্বন্ধে তুমি কি বলো?

বঙ্কিম—এ সত্য কথা।—তোমার আদুরী-তোরাপ যে ভাষায় কথা কয় তা আমাদের কালেজেও চলে না, চতুষ্পাঠীতেও চলে না, গোলকবাবুর আত্মীয় কুটুম্বদের মধ্যেও চলে না। কিন্তু, তারা ত টোলে-কলেজে পড়া লোক নয়, গোলক বসুর আত্মীয়ও নয়। তারা আদুরী তোরাপ—তা না হয়ে, অন্য কিছু হলে কি লাভ হত? যে চরিত্র যা, তাকে ঠিক তা-ই দেখা, তা-ই রাখা, এই হল নাট্যকারের কলার সুসঙ্গতি। সেখানেই তোমার কৃতিত্ব। যে নাট্যকার আঁকছেন বাড়ীর দাসীর চরিত্র, কিন্তু তাঁর দাসীর কথা, ভাবে ও ভাষায় কালেজ-গন্ধী বা ব্রাহ্মসমাজ-গন্ধী, সে নাট্যকার কালেজীবাবুর বাহবা পেতে পারেন, কিন্তু নাট্যকার হিসাবে তার কোনও মূল্য নাই। দেখবার ক্ষমতা ও যা-দেখা তাকে তেমনিরূপ দেওয়া—ভাবে, ভাষায়, মনে-প্রাণে তার স্বরূপ রক্ষা—এটিই হল তোমার নাট্যকলার বড় গুণ।

দীন—আমি একটা নূতন প্রহসন আঁচ করেছি—এ যুগে মদ-মেয়েমানুষ নিয়ে যে পাপ বেড়ে উঠেছে—তাই হবে তার বিষয়, এক দিকে বড়লোকের এঁড়ে বাছুর আর এক দিকে মদ খাওয়া যারা কালেজের শিক্ষার লক্ষণ বলে মনে করে—তারা। এই দুই দলে মিলে আমাদের সমাজে যে সর্ব্বনাশ সৃষ্টি করছে—তাই একবার দেখাতে চাই।

বঙ্কিম—সাবধান! কালেজী শিক্ষা বড় সহজ জিনিষ নয় আর আলালের ঘরের ওসব দুলালরাও সহজে তোমায় ছাড়বে না।

দীন—কালেজী শিক্ষার প্রতি আমার টান্‌টা সত্যিকারের—আমি তাই সেখানকার লেখাপড়া শেখা সোনার চাঁদদের মদের স্রোতে ভেসে যেতে দেখলে হতাশ হয়ে পড়ি। এরা ত বড় লোকের ছেলেদের মত আকাট মূর্খ, ষণ্ডামার্ক, অকালকুষ্মাণ্ড নয়—এরা ইতর নয়, শুধু একটা ফ্যাশানের মোহে পড়ে নেশা ধরে—শেষটা নেশাই এদের ধরে বসে, খেয়ে শেষ করে। এদেরকে যদি রঙ্গব্যঙ্গে হাস্যাস্পদ করে তুলতে পারি তা হলে এদের চমক্‌ ভাঙতে পারে। আর তা নইলে দেশের বা সমাজের কোনও ভরসা দেখছি না।

বঙ্কিম—তা ঠিকই বলছ। আর তোমার যেরূপ দৃষ্টিশক্তি তাতে তুমি কালেজে-পড়া মাতালের ও বড়লোকের বখাটেদের ঠিক মত আঁকতে পারবে। কিন্তু, বিষয়বস্তুটি বড় বিদ্‌ঘুটে—তোমার মত লোকের পক্ষে একটু ভয়ের কারণ। তুমি তাদের কথাবার্ত্তা কাজ-কাববার একচুলও বদলাবে না, সে তোমার ধাতও নয়। বদলালে আবার এসব চরিত্র বড্ড ফাঁকা ফাঁকা, জলো জলো হয়ে উঠবে। তাই মনে হয়, লোকে ঠিক ওর মানে ধরতে পারবে না—ভাব্‌বে তুমি কুরুচিকর ও দুর্নীতিজনক কথাবার্ত্তা চালাচ্ছ। সে নালিশ তোমার বিরুদ্ধে বরাবর থাক্‌বে।

দীন—এ ত বড় মুস্কিল! তুমিই বললে যে, যে যেমন তাকে তেমন দেখানোই উচিত। কালেজে-পড়া মাতালকে কি আমি ভণ্ড, কপটচারী মাতাল বা শুদ্ধভাষী পণ্ডিত মশায় করে চিত্রিত করব? বখাটে ইতরকে বা বাজারের মেয়েমানুষকেই কি আমি সংযত, ভদ্র, কথাবার্ত্তা বলতে দেব? তা হলে ত, ও নাটকের অর্থই

থাকবে না। আর তা ছাড়া আমি যে কি চাই, তা কি পাঠক বা দর্শকরা বুঝতে পারবে না? তারা কি দেখছে না যে, এ সমাজের গলদ্ আমি দূর করতে চাই,—আমি আমার দেশকে ভালোবাসি বলেই ত তার কলঙ্ক আমাকে পীড়া দেয়। একে সহ্য করতে পারি না। যদি শিক্ষার প্রভাবেও মানুষ মানুষ না হয়ে এমন বাঁদর হয়ে থাকে, শিক্ষাহীনদের ইতরতাতেই ইন্ধন জোগায়, তা হলে সে দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার—কোনও আশাই তার নাই।—তুমি কি এ সম্পর্কে কিছু ভেবেছ, বঙ্কিম?

বঙ্কিম—ভেবেছি কি-না জানি না। কিন্তু আমি একটা স্বপ্ন দেখেছিলুম, কোনও দিন তার রূপ দিতে পারলে জন্ম সার্থক হবে।

দীনবন্ধু—কি স্বপ্ন বঙ্কিম?

বঙ্কিম—সে যেদিন ব'লে উঠ্‌তে পারব তোমাকেই বলব। তুমি ছাড়া তা আর কেউ বুঝবে না—আমি ছাড়াও তোমাকে যেমন বেশী লোকে বুঝবে না। লোকে মনে করে দীনবন্ধু মিত্র হাস্য-রসিক, মজলিসী লোক, হাল্কা আড্ডায় বন্ধুমহলে জমিয়ে বসে, শ্লীলের চেয়ে অশ্লীলের উপরই তাঁর ঝোঁক কেউ বুঝছে না যে। দীনবন্ধু মিত্র যখন গল্প করতে বসে শ্লীল-অশ্লীলের ঘোমটা টেনে বসে না, সে মুখ খুলে, প্রাণ খুলে বন্ধুদের সঙ্গে প্রাণের বিনিময় করতে বসে। প্রাণ আছে ব'লেই তার হাসি বেপরোয়া, তার রঙ্গ বেপরোয়া, তার লেখা বেপরোয়া। কালির দাগ লাগে না বলেই তার মনে কুণ্ঠা নেই—সে সীমা ছাড়িয়ে যায়। কেউ বোঝে না যে, এ হাসির ফোয়ারা কোথায়। আবার কেউ ভেবে দেখে না যে, হাসির ফোয়ারা যাঁর এত অশেষ সে কেন করুণ বা গম্ভীর রসের পরিবেশনে অক্ষম হয়।

দীন—সত্যি, কেন গম্ভীর বা করুণ কথা আমি বলে উঠ্‌তে পারি না? দেখেছ ত, আমি কম চেষ্টা করি নি। সত্যি-সত্যি আমি এত অপদার্থ নই যে, কোনও ভাব গম্ভীর ভাবে নিতে পারি না। তুমি জানো আমার মনের অতটুকু গভীরতা আছে। তবে কেন আমি অন্য রসের জোগান দিতে পারি না?

বঙ্কিম—ব্যঙ্গে বা রঙ্গ-রসে তোমার শক্তির মূল যা, অন্য রসে তোমার অক্ষমতার মূলও তাই।—তোমার চোখ আছে।

দীন—এই অপরাধ?

বঙ্কিম—অপরাধ নয়—এই তোমার প্রকৃতি। চোখ দিয়েই তুমি দেখতে শিখেছ; চোখ বুজে তুমি দেখতে জানো না। তোমার চোখ দিয়ে তুমি খুব স্পষ্ট দেখ—যতটা চোখের দৃষ্টি যায় ততটাতে কিছু ঝাপ্‌সা থাকে না—পরিষ্কার। চোখ বুজলে তোমার কাছে সব অস্পষ্ট। রঙ্গে, ব্যঙ্গে, বাস্তবচিত্রে—তোমার তুলনা নেই। কিন্তু তোমার ভাবুক মন যখন দূরের দিকে তাকাতে চায় তখন সব ঘোলাটে দেখে—তাতেই গম্ভীর বা করুণ রস তেমন স্পষ্ট হয় না। ওতে দুঃখের কিছু নেই,—তবে লোকে তোমার মন সম্বন্ধেও অবিচার করে বসে এই যা। তোমার চোখে দৃষ্টি আছে, স্বপ্ন নেই। লোকের চোখে না আছে দৃষ্টি, না আছে স্বপ্ন।

দীন—তোমার দৃষ্টিও আছে, স্বপ্নও আছে—তার চেয়েও বেশী আছে তোমার বিরাট্ রূপ—তোমার প্রতিভা।—কিন্তু তোমার স্বপ্নের কথা ত বললে না।

বঙ্কিম—তা বলছি—তোমার যা আছে তাকেও কম মূল্য দিয়ো না।

দীন—কি আছে—তাত শুনেছিই—নিজের মূল্য নিজে কম দেব, অমন মূর্খও আমি নই।

বঙ্কিম—তোমার কি আছে তুমি জানো না—বাঙালীত্ব। দোষভরা, গুণভরা, হাসিভরা, কান্নাভরা সেই বাঙালীত্ব নিয়ে তুমি একালের সমস্ত জাতির প্রতিভূ হয়ে এসেছ—এ মহাভাগ্য একমাত্র তুমিই করেছ—

দীন—হায়! এ যুগের বাঙ্গালী! বড় ক্ষীণ, বড় আশা-নিরাশার খেলার বস্তু!—বঙ্কিম, তুমি আমাদের ভাবী বাঙালীত্বের পথদ্রষ্টা, পথস্রষ্টা, পথকৃৎ হও—এই আমার প্রার্থনা! তোমার সহজ রসিকতা, তোমার বজ্রশক্তি, তোমার সৌম্য গাম্ভীর্য্য, অতলস্পর্শী গভীরতা, তোমার আত্মার প্রশান্ত উদারতা :—এ যেন আমাদের ভারতবর্ষের যুগযুগান্তের মূর্ত্ত সাধনা। তুমি বুঝি চিরদিনকার ভারতবর্ষ—ভাবীদিনের গরিমাময় বাঙালীত্ব, আজকের গ্লানিময় বাঙালীত্ব নয়।

বঙ্কিম—দীনবন্ধু, ভাবীদিনের বাঙলার একটি মূর্ত্তি আমার স্বপ্নে আমি পেয়েছি—সে ত তোমার এই যুগের শতদুঃখময় সাধনার মধ্য দিয়েই সার্থক হবে।

দীন—তোমার সে স্বপ্ন একবার শুনি, বঙ্কিম, বলো।

বঙ্কিম—আমি সন্ন্যাসীবিদ্রোহের কথা পড়ছিলুম—জাতির জন্য, দেশের জন্য, কি কেউ আজ সন্ন্যাস নিয়ে তেমনি নিজেকে নিঃশেষে দিতে পারে না? তেমন সন্তান কি নেই যে সত্যকারের সন্তান? তা নইলে ত মাও বাঁচবেন না।—ভাবতে, ভাবতে চোখে কেমন স্বপ্ন নেমে এল—আমি দেখলুম…

দীন—কি?

বঙ্কিম—মা যা ছিলেন—'ইনিই কুঞ্জর, কেশরী প্রভৃতি বন্য পশু সকল পদতলে দলিত করিয়া বন্য পশুর আবাসস্থানে আপনার পদ্মাসন

স্থাপিত করিয়াছিলেন। ইনি সর্ব্বালঙ্কার-পরিভূষিতা হাস্যময়ী সুন্দরী ছিলেন। ইনি বালার্কবর্ণাভা, সকল ঐশ্বর্য্যশালিনী।'

দীন—তারপর ?

বঙ্কিম—মা যা হইয়াছেন—'কালী—অন্ধকারসমাচ্ছন্না কালিমাময়ী। হৃতসর্ব্বস্ব, এই জন্য নগ্নিকা। আজ দেশে সর্ব্বত্রই শ্মশান—তাই মা কঙ্কালমালিনী। আপনার শিব আপনার পদতলে দলিতেছেন—'

দীন—তারপর ? তারপর ?

বঙ্কিম—মা যা হইবেন—দশভুজ দশদিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত ; পদাশ্রিত বীরকেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত। দিগ্‌ভুজা—নানা-প্রহরণধারিণী শত্রুবিমর্দ্দিনী—বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী—বামে বাণী বিদ্যা-বিজ্ঞান-দায়িনী—সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ।'

দীন—তারপর—তারপর ?

বঙ্কিম—আমার চোখে জল এল—আমি মনেপ্রাণে বল্লুম, 'বন্দেমাতরং'।

রসিকতায় রুচি

'বিয়ে পাগলা বুড়ো,' 'জামাই বারিক', ও বিশেষ করিয়া 'সধবার একাদশী' সম্বন্ধে, আজকাল একটা আপত্তি উঠিয়াছে যে, দীনবন্ধুর হাস্যরসের রুচি নাকি তত মার্জ্জিত ও সভ্যসমাজের উপযোগী নহে। এই সকল নাটক নাকি অশ্লীল ও অসৎভাবের উদ্দীপক; এবং তরজা-খেউড়ে অভ্যস্ত জাতির পক্ষে ইহা স্বাভাবিক হইলেও নিতান্ত শোচনীয়। রুচি সম্বন্ধে এই আপত্তি নূতন ভাবে উত্থাপিত হইলেও একেবারে নূতন নহে। 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রের পুরাতন সংখ্যায়, পাদরী লালবিহারী দে যে অসহিষ্ণু ভাষায় দীনবন্ধুর ও তাঁহার পাঠকবর্গের নিন্দা করিয়াছেন, তাহা অতি-আধুনিক তথাকথিত রুচিবাগীশদিগের মন্দ লাগিবে না। পাশ্চাত্যবিদ্যাভিমানী পাদরী সাহেব যাহা বলিয়াছেন তাহাতে কিছু যায় আসে না, এবং লোকে তাহা অনেকদিন হইল ভুলিয়া গিয়াছে; কিন্তু কালচক্র পূর্ণ হইয়া আবার বিশ্বসাহিত্য-'পরিশীলন'কামী এক শ্রেণীর স্বয়ংসিদ্ধ সমালোচক-দিগের মুখে সেই কথা ফিরিয়া আসিয়াছে।

অন্যদিকে, সমাজ-রক্ষক স্থিতিশীল সম্প্রদায়ের তরফ হইতে রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন, "সধবার একাদশী কেবল মদের কথায় আরব্ধ এবং মাতালের কথাতেই পর্য্যবসিত। ইহাতে হাস্যরসো-দ্দীপক অনেক কথা বর্ণিত আছে সত্য, কিন্তু আদ্যোপান্ত অশ্লীল বকামি ও মাতলামির কথাতেই পরিপূর্ণ। শুধু কতকগুলি বকামির গল্প লিখিলেই যদি প্রহসন হইত, তাহা হইলে কলিকাতার মেছোবাজার

সোনাগাছী প্রভৃতি স্থানে দৈনন্দিন যে সকল ব্যাপার সংঘটিত হয়, সেইগুলি অবিকল লিখিয়া লইলেও অনেক প্রসহন হইতে পারিত। উল্লেখ্যমান প্রহসনে অটল ও নিমেদত্ত বরাবর সমান মাতলামি ও বেশ্যা প্রভৃতি লইয়া সমান ঢলাঢলি করিয়াছে। তাহাদের চরিত্র উত্তমরূপ অঙ্কিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তৎপাঠে সমাজের কিছুমাত্র শিক্ষালাভ নাই। সুতরাং ওরূপ বিবরণ লিখিয়া প্রহসন রচনার কি প্রয়োজন ছিল তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। দীনবন্ধু বাবুর ন্যায় সুসামাজিক ব্যক্তির হস্ত হইতেও এরূপ জঘন্য পদার্থ বহির্গত হইয়াছে।" দীনবন্ধু মিত্রের সৌভাগ্যের কথা এই যে, তিনি এরূপ শুচিবাইগ্রস্ত, লোকশিক্ষাপ্রয়াসী উপদেশক-বন্ধুর হস্তে না পড়িয়া, বঙ্কিমচন্দ্রের মত রসজ্ঞ বন্ধু ও সমালোচক পাইয়াছিলেন; নচেৎ তাঁহাকে 'নীতিপথ' বা 'রোমাবতী উপাখ্যান' লিখিয়া সাহিত্য-জীবন শেষ করিতে হইত।

পাদরী সাহেব বা পণ্ডিত মহাশয়ের কথা ছাড়িয়া দিলেও এরূপ সমালোচনার দিন অতীত হয় নাই। আধুনিক সময়ে রবীন্দ্রনাথও তাঁহার 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে দীনবন্ধুর উল্লেখ না করিলেও, সমকালবর্ত্তী কতিপয় লেখকের রুচি মার্জ্জিত ছিল না বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন; যখন তিনি লিখিয়াছেন যে 'নির্ম্মল শুভ্র সংযত হাস্য বঙ্কিমই সর্ব্বপ্রথম বঙ্গসাহিত্যে আনয়ন করেন', তখন বোধ হয় তিনি বঙ্কিমের সহযোগী দীনবন্ধুর কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। কিন্তু সব চেয়ে কৌতুকের কথা এই যে, বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং দীনবন্ধুর রুচিকে কখনও অসংযত বা অনির্ম্মল বলিয়া অবহেলা বা নিন্দার যোগ্য মনে করেন নাই। মার্জ্জিত রুচি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই অভিমতের সম্পর্কে, নবীনচন্দ্রের আত্মকথায় বর্ণিত রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকারের গল্পটি

মনে পড়িয়া গেল। বর্ণনাটি ব্যক্তিগত হইলেও, ইহার দ্বারা আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার হইয়া যাইবে বলিয়া এখানে তাহার উল্লেখ করিতে হইল। রাণাঘাটে অবস্থানকালে নবীনচন্দ্র একদিন তাঁহার গৃহে রবীন্দ্রনাথকে রাত্রির পানাহারের নিমন্ত্রণে অতিথিরূপে পাইয়াছিলেন। এই ঘটনাসম্বন্ধে নবীনচন্দ্রের মনে যে সংস্কার হইয়াছিল, তাহার অব্যাজ সরল বিবরণটি এইরূপ : "রবি বাবুর মার্জ্জিত সোণার চশমা, মার্জ্জিত রুচি, মার্জ্জিত ঈষদ্ হাসি। সমস্ত দিন ঠাকুর বাড়ীর ওজন-মাপা চাপা কথা, চাপা হাসি ও চাপা শিষ্টাচারে আমার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। আমি আর পারিলাম না।...আমি বলিলাম—রবিবাবু সমস্ত দিন আপনার চাপা কথা ও চাপা হাসিতে বড় জালাতন হয়েছি। আমি আর আমার ওজন ঠিক রাখতে পাচ্ছি না। দোহাই আপনার! আপনি একবার আমাদের মত প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া কথা বলুন!"

এই যে প্রাণ খুলিয়া হাসা, তাহা বর্ত্তমান রুচিবাগীশদিগের মার্জ্জিত ও ওজন-করা হাসির চাপে, বাঙ্গালীর জীবনে না হউক, বাঙ্গালীর 'উচ্চ' সাহিত্যে লোপ পাইতে বসিয়াছে। আমাদেরও প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছে। কিন্তু এরূপ শাস্তি যেন বিধাতা আমাদের না দেন যে, বাঙ্গালী জীবনের এই জাগ্রত বিশেষত্বটুকু, জীবনযুদ্ধে পীড়িত-ক্লিষ্ট বাঙ্গালীর সরল স্বচ্ছ জীবন হইতে, বিলাতী আদব-কায়দায় বা বিশ্বসাহিত্যের আব-হাওয়ায়, একেবারে লোপ পাইয়া যায়। বিশ্ব-সাহিত্যের ভাগ্যবান্ দেবতারা মার্জ্জিত হাসির হিম-শীতল অমৃত পান করুন, কিন্তু আমাদের মত সাধারণ দুর্ভাগ্য মানব যেন সহজ প্রীতির উত্তাপে প্রাণ খুলিয়া হাসিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত না হয়।

হো-হো হাসিই যে রসিকতা তাহা বলিতেছি না, কিন্তু প্রাণের সহিত যোগ না থাকিলে প্রাণ খুলিয়া হাসা যায় না। বর্ত্তমান কালের

কোন এক কবি সত্যই বলিয়াছেন যে, যে-জন নিঃস্ব, যাহার পঞ্জরতলে এই প্রাণ-ধন নাই, জীবনের এই উৎসবে তাহার নিমন্ত্রণ হয় নাই। এই বৃহৎ প্রাণ ও সর্ব্বব্যাপী সহানুভূতিই দীনবন্ধুর রসিকতার মূলমন্ত্র। বিলাতী শিক্ষার মোহে আমরা বিদেশী আদব-কায়দায় অভ্যস্ত হইতেছি, শিষ্টাচার শিখিতেছি, ভদ্রতা শিক্ষা করিয়া ওজন-করা কথা বলিতে ও চাপা-হাসি হাসিতে শিখিতেছি, উচ্চাঙ্গ হাস্য-রস বুঝিতে পারিয়া সেকেলে হাসি-তামাসা বর্জ্জন করিতেছি,—এইরূপ মনোবৃত্তিকে slave mentality, না inferiority complex, না ধার-করা বিদ্যা জাহির করিয়া পরের মুখে ঝাল-খাওয়া, কি বলিব, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। 'উচ্চাঙ্গ হাস্যরস' 'হাস্যরসে একাল ও সেকাল'—শুনিলেও হাসি পায়। আসল কথা, ইহা হইতেছে একটি কৃত্রিম বিদেশী ঠাট, যাহার মোহে পড়িয়া আমরা প্রাণের আনন্দটুকুও ভুলিতে বসিয়াছি। ঠেঁঠামি, নোংরামি বা ভাঁড়ামি রসিকতা নহে, কিন্তু যাহা স্বতঃসিদ্ধ ও বাঙ্গালীর নিজস্ব, যাহা তাহার চিরন্তন ভাব-ভঙ্গী, চাল-চলন, রীতি-বিধির স্বভাবতঃ অনুকূল ও উপযোগী,—বাঙ্গালীর সেই প্রাণখোলা, সুস্থ, অনাড়ম্বর হাসি, আজকাল বিদেশী শিষ্টাচারের কৃত্রিম ও প্রাণশূন্য আবরণে ঢাকা পড়িয়াছে। পূর্ব্বকালের হাস্য-কৌতুকে সবই যে ভাল ছিল, এ কথা বলিতেছি না; কিন্তু সে-কালের রঙ্গ-তামাসা, শ্লেষ, গালিগালাজ, এমন কি আদিরসাত্মক উক্তির মধ্যেও, একটা স্বতঃস্ফূর্ত্ত, সবল ও খাঁটী বাঙ্গালা সুর ছিল, যাহা আধুনিক, আনকোরা, অস্বাভাবিক বিলাতী-বাঙ্গালা গৎএর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিতে পারিতেছে না,—সেইটুকুই ছিল বাঙ্গালীর প্রাণের জিনিস। পাশ্চাত্যভাবে মুগ্ধ-বিহ্বল আধুনিক অতীন্দ্রিয়-রস-গ্রাহী পাঠক তাহার মর্ম্মানুভব করিতে পারেন না, কারণ তিনি বিদেশী

সভ্যতার অন্ধ অনুকরণের দিনে জন্মগ্রহণ না করিয়াও নিমচাঁদের চেয়ে ভাবে, চিন্তায় ও ভাষায় পুরাদস্তুর বিদেশী হইয়াছেন। নিমচাঁদ ইংরাজীতে লিখিবার, বলিবার, ভাবিবার ও স্বপ্ন দেখিবার দুরাশা হৃদয়ে পোষণ করিত বটে, কিন্তু অতিআধুনিক পাঠকের মত অস্থি-মজ্জায় শিরায় শিরায় বিদেশীভাবাপন্ন হইয়া সে বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্বটুকু হারায় নাই। নূতন ভাবের অত্যধিক রক্তপ্রাবল্যে উচ্ছৃঙ্খল হইলেও, বিশ্ব-সাহিত্যের নির্ব্বিশেষ ভূমানন্দে তুরীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সে জাতি-ধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হয় নাই। ভূমায় নহে, সে ভূমিতেই বাস করিত।

বিচিত্র ও নূতন পাশ্চাত্য ভাব যতটুকু বাঙ্গালীর ধাতে সয়, ততটুকু দীনবন্ধু আমদানী করিয়াছিলেন; কিন্তু এই স্বদেশী ঠাট বা স্বদেশী সুর তিনি তাঁহার রঙ্গদার ও চিত্র-বহুল রচনার ভাবে, ভাষায় ও ভঙ্গীতে মূলতঃ বজায় রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর প্রাত্যহিক জীবন ও চিন্তার সহিত তাঁহার মনোভাব ও রচনায় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল বলিয়াই, তাঁহার পক্ষে ইহা সম্ভবপর হইয়াছে। বাস্তব জীবনের সহিত ক্রমশঃ সম্পর্কবিহীন হইয়া নিছক-আর্ট-বিলাসী আধুনিক পাঠক এই জাগ্রত বাস্তব-নিষ্ঠতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। যদিও বর্ত্তমান যুগের দেশ-কাল-নিরপেক্ষ, নিরঙ্কুশ, আত্মভাব-সাধনার লীলানন্দে এই মনোভাব আরও প্রকট হইয়াছে, তবুও ইহা নূতন নহে। এই ধরণের রুচি লক্ষ্য করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন যে, আজকাল আমরা 'সরু কাজ' পছন্দ করি, 'মোটা কাজ' ভালবাসি না। কিন্তু সূক্ষ্মরসাস্বাদী পাঠক এ কথা ভুলিয়া যান যে, সরু কাজ যতই মনোরম হউক না কেন, তাহা কৃত্রিম, এবং এ ক্ষেত্রে একান্ত বিজাতীয়। মোটা কাজের সহস্র অসুবিধা থাকিলেও একটি বিশেষ গুণ আছে—ইহা সহজ ও স্বাভাবিক।

ইহা আমাদের প্রাণের কথা; ইহা পরের-পাওয়া তত্ত্বকে ধার করিয়া শুধু কল্পনার বিলাসিতা নহে। এরূপ কারুকার্য্যে মনের সৌখীনতা আছে, কিন্তু প্রাণের অনুভূতি নাই! বঙ্কিমের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—'হউক সুন্দর, এ বুঝি পরের, আমাদের নহে।' যাহা কিছু বিদেশী তাহাই মন্দ বা বর্জ্জনীয়, এ কথা বলিতেছি না, কিন্তু যাহা আত্মপ্রকৃতির বিরোধী বা উপযোগী নহে, যাহা শুধু পুঁথি-পড়া তত্ত্ব বা ধার-করা মতবাদ, তাহাকে কৃত্রিম ভাব-কল্পনার উত্তাপে নেশার মত জাগাইয়া রাখা যায়, কিন্তু আত্মস্থ বা আত্মসাৎ করা যায় না, কারণ তাহার সঙ্গে জাতি-ধর্ম্মের বা দেহ-মনের যোগ নাই। সনাতন জ্যাঠামি ছিল ভাল, কিন্তু অধুনাতন ন্যাকামি অস্বাভাবিক ও অশ্রদ্ধেয়।

সেই জন্য অতি-আধুনিক সাহিত্যে, একদিকে যেমন বদ্-হজমীর পূতিগন্ধময় রসোদ্গার দেখা যায়, তেমনি অন্যদিকে অসুস্থ চিত্তের অপুষ্ট বিলাস-কাকলী, সূক্ষ্ম-ভূমানন্দের শূন্যতায় দেশ-কাল-জাতি-নিরপেক্ষ বিশ্বসাহিত্যের আকাশে পথহারা হইয়াছে। সহজ রসিকতা স্থলে পুঁথি-পড়া কাল্‌চারের আমদানী করিয়া আজকাল রসিকতা জিনিসটি কি তাহাও বুঝাইয়া দিতে হয়। দীনবন্ধু-যুগের লেখকদের গাঢ়, বিচিত্র, বেগবান্ রচনার অন্য সহস্র দোষ সত্ত্বেও, তাহা সহজ চিত্তের সবল উক্তি, এবং প্রকৃত পুরুষোচিত প্রতিভার পরিচায়ক। সেই জন্য তাঁহাদের ভাষাও এত সজীব, সরস ও স্ফূর্ত্তিশালী। তাঁহারা জীবন্ত চিত্র আঁকিয়াছেন, রুগ্ন-কাতর কল্পনা-বিলাস বা সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের সৌখীনতায় মনোযোগ দেন নাই। যেখানে দীনবন্ধু পুস্তকগত আদর্শের আশ্রয় লইয়া কাল্পনিক নায়ক-নায়িকার সৃষ্টি করিয়াছেন, অথবা যেখানে romance বা melodramaর সূচনা করিয়াছেন, সেখানে তাঁহার রচনা ভাবে, ভাষায় বা চরিত্রাঙ্কনে সফল হয় নাই; কিন্তু যেখানে প্রত্যক্ষ ও

বাস্তব অনুভূতি তাঁহার নাট্য-কল্পনাকে প্রেরিত করিয়াছে সেইখানে তাঁহার সবল সরস লেখনীর মুখে এক একটি জীবন্ত চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আধুনিক সময়ে একদল শিক্ষিতম্মন্য কাল্‌চার-বিলাসী আছেন, যাঁহারা বিশ্বসাহিত্য ও বিশ্বমানবের সন্ধানে নিজের জাতিধর্ম্ম ও নিজের সাহিত্যকে প্রায় ভুলিতে বসিয়াছেন। ইঁহারা আপাতদৃষ্টিতে বাঙ্গালী হইলেও, মনোবৃত্তিতে বিজাতীয়, অথবা নির্ব্বিশেষ বিশ্বাত্মতায় নির্জ্জাতীয়। অবাস্তবের বিকৃত বিলাসিতায়, সাধারণ বাঙ্গালীর বাস্তব-জীবনের সঙ্গে ইঁহাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ত নাই, সহানুভূতি বা আসক্তিও নাই। ইঁহারা যে দীনবন্ধুর অনাড়ম্বর বাস্তব-জীবনের চিত্র অনুভব করিতে পারেন না, তাহা কিছুই বিচিত্র নহে। বিজাতীয় ভাব ও ভঙ্গীর পাকে প্রস্তুত যে অদ্ভুত ভাষা ইঁহারা প্রয়োগ করেন, তাহার জাতি-নির্ণয় করা দুরূহ; সুতরাং ইঁহারা দীনবন্ধুর সহজ খাঁটি বাঙ্গালাও যে বুঝিতে পারেন না, তাহাও বিচিত্র নহে। ইঁহারা চল্‌তিভাষা বলিয়া একটি ভাষা ব্যবহার করেন; ইহা আধুনিক অভিজাত সাহিত্যের দোআঁশ্‌লা চল্‌তি ভাষা হইতে পারে, কিন্তু ইহা বাঙ্গালীর বাঙ্গালা নহে। শুধু ক্রিয়া-পদগুলি 'করছে', 'বল্‌ছে' এইরূপ বদলাইয়া দিলেই তাহা ঝরঝরে জোরালো idiomatic বাঙ্গালা হয় না। এই অপূর্ব্ব ভাষা, শুধু বাঙ্গালা প্রতিশব্দ যোগে ইংরাজী বাক্য-রীতির অপুষ্ট ও অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তন। ইহা সত্য যে লেখক-বিশেষের ভাষার রীতি ব্যক্তিগত, এবং তাহার বিশিষ্ট পরিকল্পনা বা অন্তর্গত ভাব-প্রবাহের উপর নির্ভর করে। কিন্তু ভাষা বা রীতির যে রস, তাহার গুপ্তমূল কেবল মনোভূমিতে নহে, দেশের মাটির মধ্যেও বিস্তৃত। প্রত্যেক ভাষার একটি সনাতন ও সার্ব্বজনীন বৈশিষ্ট্য আছে, যাহাকে ইংরাজি ভাষায়

ইহার genius বা প্রকৃতি বলে। ভাষার এই প্রকৃতির নিখুঁত লক্ষণ নির্দ্দেশ করা কঠিন, কারণ ইহা যুগে-যুগে বহু মনস্বীর সাধনলব্ধ বৈচিত্র্যের দ্বারা পরিপুষ্ট; কিন্তু ইহার মগ্ন ভিত্তিমূল জাতির প্রাণের উপর প্রতিষ্ঠিত—তাহার স্বকীয় চিন্তার ধারা, সভ্যতা, রীতি-নীতি, চাল-চলন রাগ-বিরাগ, ভাব ও কল্পনার উপর। যাঁহারা বিশ্ব-মানব-রূপ অবাস্তবের বিহ্বল উপাসক, তাঁহারা এই বাস্তব জাতীয়তার মর্ম্ম গ্রহণ করিবেন না; কিন্তু শুধু কল্পনা-মূলক মনোবৃত্তি লইয়া, অথবা হুজুগের ওজরে, সনাতন সরণির পরিত্যাগ, শক্তির নহে, অক্ষমতার লক্ষণ; সাধনার নহে, ফাঁকিবাজির নিদর্শন। জাতির রস-জীবন হইতে ইহার ভাষা দূরে থাকিতে পারে না। আমরা এখানে কেবল ব্যাকরণ বা অলঙ্কার-সম্মত গঠনের কথা বলিতেছি না,—প্রত্যেক ভাষার এমনি একটি নিজস্ব স্বভাব আছে, যাহা তাহার ভাবাভিব্যক্তির বিশিষ্ট স্বতঃসিদ্ধ পদ্ধতি। বাঙ্গালা ভাষার এই আত্মগত বিশেষ-ধর্ম্মকে আমরা খাঁটি বাঙ্গালা সুর বলিতেছি, যাহাতে শুধু ইহার ব্যক্তিগত ভাবনা নহে, সমষ্টিগত প্রাণের কথাও প্রাণের ভাষায় ফুটিয়া ওঠে। দীনবন্ধুর ভাষায় এই অধুনা-বিরল খাঁটি বাঙ্গালার প্রাণের সুর আছে বলিয়াই ইহা আমাদের নিজস্ব, পরের নহে। পরের ধনে যাঁহারা সস্তায় বড়মানুষী করেন, তাঁহারা নিজের পরম্পরাগত পুঁজির কথা ভুলিয়া যান, বা সমাদর করেন না। সেইজন্য দীনবন্ধুর হাস্যাত্মক নাটকের যে ভাষা, তাহার স্থানকালোপযোগী সরসতা ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত সরলতা অনেক সময়ে কুরুচি বলিয়া অভিহিত হয়। কিন্তু বাস্তব-পরায়ণতা ইহার গুণ, দোষ নহে। সেই জন্য ইহা সজীব ও প্রাণবান্, এবং অদ্ভুত পরিহাসশক্তির প্রাবল্যে ইহা সহজ, সুস্থ ও স্বাভাবিক। ইহার মধ্যে অযথা ন্যাকামি, অপুষ্ট বিজাতীয় অস্বাভাবিকতা, অথবা কৃত্রিম ভাব-কল্পনার কৃত্রিম শিষ্টতা নাই। ইহ

অনেক সময় অশিষ্ট ও অমার্জ্জিত হইলেও, প্রত্যক্ষ অনুভূতি, স্বভাবসিদ্ধ মনস্বিতা ও ভাষার প্রকৃতিগত সহজ সামর্থ্যে স্বচ্ছ ও অবাধ-স্বাচ্ছন্দ্য।

আজকাল আমরা সভ্য হইয়াছি, সেইজন্য সহজ কথা সহজ করিয়া বলিতে পারি না। কৃত্রিম সভ্যতার একটি অঙ্গ—তাহার বাহিরের ফিট্‌-ফাট্‌ সাজসজ্জা ও চাকচিক্য। ভিতরে প্রাণের অভাব,—সেই জন্য তাহার পরিবর্ত্তে অনেক সময় অনেক নিকৃষ্ট জিনিসের আবর্জ্জনা দিয়া ভরাট করিয়া রাখিতে হয়। কিন্তু ভিতরে ছুঁচোর কীর্ত্তন হউক না কেন, বাহিরে কোঁচার পত্তন থাকিলেই হইল। ভাষাগত কুরুচিতে আমরা শিহরিয়া উঠি, কিন্তু ভাবগত কুরুচি, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে, আকারে ও ইঙ্গিতে, গোপন বিষ-বিসর্পের মত ওতপ্রোত থাকিলে আমাদের রুচি-ধ্বজিতার ব্যাঘাত হয় না। রাস্তার নীচে প্রচ্ছন্ন পূতিগন্ধময় শৌচস্রাব থাকিলে কি হইবে, আধুনিক সভ্য-নগরীর উপরে ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাস্তা-ঘাট, পার্ক-ময়দান, ইলেক্‌ট্রিক আলো ও ব্যাণ্ড-ষ্ট্যাণ্ড রহিয়াছে। সে-কালে রাস্তার উপরেই একধারে পয়ঃপ্রণালী থাকিত; যাহারা পথ চলিত তাহারা ইহাকে প্রত্যক্ষভাবেই দেখিয়া পরিহার করিয়া চলিত। কিন্তু এখন আমরা সভ্যতার উৎকর্ষে উঠিয়া, সমস্ত বিষ-স্রাবকে, মুক্ত জগতের আলো ও হাওয়া হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, গুপ্ত-ভঙ্গীর সুড়ঙ্গে চালাইয়া দিয়া আরও ভয়াবহ রোগের আমদানী করিতেছি। সে-কালের রসিকতা, বাঙ্গালীর বারোয়ারী-তলায়, অন্য-রসের মধ্যে বা পশ্চাতে, অনেক সময় আসরে উলঙ্গ হইয়া নামিত, অথবা আসরে নামিয়া নাচিতে নাচিতে উলঙ্গ হইত। কিন্তু আজকালকার রুচিসম্মত রসিকতা, বিনয়াভিমানী সূক্ষ্মাচার-নিষ্ঠতার আবরণে, ড্রয়িংরুমের আদব-কায়দার গূঢ়তায়, অর্দ্ধ-নগ্নতার ভঙ্গী ও ইঙ্গিতে, লোভয়িত্রী বিষ-কন্যার মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।

এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে ভাষাগত কুরুচি অপেক্ষা ভাবগত কুরুচি আরও অনিষ্টকর। দীনবন্ধুর নাটকে স্থানে স্থানে ভাষাগত কুরুচি পাওয়া যাইতে পারে; তাহার কারণ ও অর্থ আমরা পরে বলিতেছি। কিন্তু প্রকৃত ভাব-গত কুরুচি দীনবন্ধুর রচনায় বিরল। স্পষ্ট ভাবগত কুরুচির নিদর্শন Wycherleyর COUNTRY WIFE, কিন্তু বর্ত্তমান অতি-আধুনিক সাহিত্যেও ইহার প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যাইবে। এইরূপ কুরুচি সাহিত্যের গৌরব নহে। কিন্তু ইঙ্গিত বা রচনার ধারায় যে ভাবগত কুরুচি আধুনিক সাহিত্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছে, তাহা আরও গর্হিত। শিল্পী-গঠিত নগ্নমূর্ত্তিতে অশ্লীলতা নাই, কিন্তু কুরুচি আসে শিল্পীর অভিপ্রায়ে, ভঙ্গীতে বা ভাব-গঠনে। দীনবন্ধু মাতলামি বকামি প্রভৃতি সাহসিক বিষয় লইয়া লিখিয়াছেন সত্য, কিন্তু মাতলামি বা বকামিকে কখনও চিত্তাকর্ষক বা লোভনীয়রূপে অঙ্কিত করেন নাই। যে প্রবৃত্তি আর্টের ভাণে আজকালকার বঙ্গী-সাহিত্যে নির্লজ্জ ও অবিনীত আত্মপ্রকাশ করিয়া শিক্ষিতম্মন্য ব্যক্তিদের প্রশংসা লাভ করিতেছে, তাহা দীনবন্ধুর রচনায় পাওয়া যায় না। তথাপি, সম্প্রতি অতি-আধুনিক সাহিত্যের একজন উচ্চ-শিক্ষাভিমানী সমালোচক অজ্ঞতার নিশ্চিন্ত বিজ্ঞতায় লিখিয়াছেন যে, দীনবন্ধুর রচনাগুলি নাকি 'suggest that he was obsessed by a sheer love of the lewd and the filthy', তাঁহার নাটকগুলি 'grotesque stories of unimaginable crimes and perverse passions', 'he only provokes our disgust', এবং তাঁহার 'pedantic and artificial and erudite style does not save us from the feeling of nausea produced by the morbid tone of his comedies'। হরি! হরি! দীনবন্ধু এক কলমের

খোঁচায় হইলেন একাধারে pedantic, artificial, erudite, lewd filthy, grotesque, perverse, nauseating ও morbid! Melo-dramaর দিকে ঝোঁক থাকার দরুণ, গুরুতর প্রবন্ধে দীনবন্ধুর ভাব ও ভাষা অনেক সময় দীর্ঘায়ত ও আড়ষ্ট হইয়াছে সত্য; কিন্তু যে মহাপ্রভু তাঁহার হাস্যরসাত্মক নাটকের রীতি ও ভাষাকে pedantic artificial ও erudite বলে, তাহার সরস্বতীর মাতৃভাষা বোধ হয় বিভিন্ন। দীনবন্ধুর এই ভাষার প্রধান গুণ—ইহার ভাবে, ভঙ্গীতে, বর্ণনায়, সর্ব্বত্র কৃত্রিমতার একান্ত অভাব। আর বাকী কয়টি বিশেষণ, বিদেশের আঁস্তাকুড় ও স্বদেশের বস্তী ঘাঁটা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকের পক্ষে অপূর্ব্ব বটে। শুনিয়াছি, এই সমালোচক-ধুরন্ধর বাঙ্গালা নাটকের উপর এই পুস্তকখানি লিখিয়া কোনও বিলাতী বিদ্যালয়ে ডক্টর উপাধি পাইয়াছেন। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই, কারণ এ সম্বন্ধে সে-দেশে যে-কেহ যাহা-কিছু বলিবে, তাহাই নূতন; কিন্তু এ-দেশে দীনবন্ধুর গ্রন্থগুলি যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারা উক্ত বিচিত্র অভিমত দেখিয়া নিশ্চয়ই লেখকের জ্ঞান বা তাঁহার মানসিক সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হইবেন। কারণ, এরূপ অতি-অজ্ঞ ও অতি-দুষ্ট অপবাদ কোনও প্রকৃতিস্থ ব্যক্তির দ্বারা সম্ভবপর নহে। তাই বলিতেছিলাম, এরূপ সমালোচনার দিন এখনও অতীত হয় নাই।

যাঁহারা কল্পিত রুচির মুখ রক্ষা করিয়া কাগজের ফুল তৈয়ার করেন, অথবা 'অলোক-পন্থা'র অভিযানে বাস্তবকে পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা দীনবন্ধুর অতিজাগ্রত বাস্তব-অনুভূতি ও নিখুঁত স্বভাবাঙ্কন পদ্ধতি বুঝিতে পারিবেন না। জামাই-বারিকের পদ্মলোচন ও তাহার দুই স্ত্রীর চিত্র আরও সূক্ষ্ম ও মার্জ্জিত ব্যাপার হয়ত হইতে পারিত,

কিন্তু তাহা তত খাঁটি জিনিস হইত না। সূক্ষ্মাস্বাদী পাঠক যাহাকে ভাষাগত কুরুচি বলিয়া নাসিকা-কুঞ্চন করিবেন, এরূপ গ্রাম্য স্ত্রীলোকের কোন্দল যথাযথ অঙ্কিত করিতে হইলে তাহা অনেক পরিমাণে অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। রাজীবলোচনের ন্যায় গ্রাম্য বৃদ্ধ বা রতার ন্যায় গ্রাম্য ছোক্‌রা আঁকিতে গেলে, অনেক সময় গ্রাম্য রসিকতাও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া পড়ে; তাহা না হইলে চিত্র অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।' বঙ্কিমচন্দ্র ঠিকই বলিয়াছেন যে, 'দীনবন্ধু অনেক সময়ই শিক্ষিত ভাস্কর বা চিত্রকরের ন্যায় জীবিত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চরিত্রগুলি গড়িতেন, সামাজিক বৃক্ষে সামাজিক বানর সমারূঢ় দেখিলেই অমনই তুলি ধরিয়া তাহার লেজ শুদ্ধ আঁকিয়া লইতেন।' রুচিবাগীশের রুচি রক্ষা হউক বা না হউক, বাস্তবের প্রতি এই ব্যাপক ও দুর্দ্দমনীয় সহানুভূতি দীনবন্ধুর চিত্রগুলিকে সজীব, বিচিত্র ও স্বভাবসঙ্গত করিয়াছে। সেইজন্য কেবল সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ, অবাস্তবে স্বপ্ন-প্রয়াণ, অথবা অসুস্থ চিত্তের প্রচ্ছন্ন লালসা-বিলাস তাঁহার রচনায় পাওয়া যায় না। একথা বোধ হয় বলিতে হইবে না যে, যাহা সূক্ষ্ম বা জটিল তাহাই সকল সময়ে সাহিত্যে উপাদেয় নহে। আখ্যান-বস্তু বা প্রতিপাদ্য চরিত্র অনর্থক জটিল করিয়া তোলাই কিছু বাহাদুরী নহে। জটিলতা অনেক সময় জাতীয় ও সামাজিক বাহ্য কারণ-পরম্পরার উপর নিভর করে; বিভিন্ন লেখকের বিভিন্ন প্রকৃতির উপর ত করেই। কিন্তু ইহা শিল্পীর আসল শক্তির পরিমাপক নহে। একই ধরণের বিষয়-বস্তু লইয়া রচিত Balzac এর OLD GORIOT সেক্সপিয়ারের KING LEAR অপেক্ষা অধিকতর জটিল, কিন্তু ঈপ্সিত রসের উদ্রেক বা শক্তির সার্থকতা হিসাবে ইহা সে-প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই। রচনার চরিতার্থতা তাহার

স্বপ্রস্তাবিত বিষয় ও উপায়ের পরিকল্পনা এবং প্রয়োগ-নৈপুণ্যে; শুধু জটিলতার উপর ইহা নির্ভর করে না।

প্রকৃত নাট্যকারের বাস্তবনিষ্ঠ objectivity বা তদ্ভাবে ভাবিত হইবার শক্তি আছে, তাই সকল শ্রেণীর ও সকল অবস্থার লোকের মনের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ ও ব্যাপক সহানুভূতি অবশ্যম্ভাবী। দীনবন্ধুর এই আত্মবিলোপ-ক্ষম বাস্তব-তন্ময় সহানুভূতি ছিল বলিয়াই, যে চরিত্র তিনি আঁকিতেন তাহা সম্পূর্ণ করিয়াই আঁকিতেন,—সূক্ষ্মাচার-নিষ্ঠার খাতিরে কোনও-কিছু বাদ দিয়া তাহাকে কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক করিতে পারিতেন না। সেইজন্য বঙ্কিমের ভাষায়, 'আমরা একটা আস্ত তোরাপ, আস্ত নিমচাঁদ, আস্ত আদুরী দেখিতে পাই; রুচির মুখ রক্ষা করিতে গেলে ছেঁড়া তোরাপ, কাটা আদুরী ও ভাঙ্গা নিমচাঁদ আমরা পাইতাম।' আজকালকার লিরিক-পন্থী লেখক ও পাঠক অবাস্তব-বিলাসী, আত্মগত ভাব-কল্পনায় বিভোর,—নাট্যকারের এই আত্মবিমুখ ও বাস্তবোন্মুখ তন্ময়তা তাঁহাদের নাই, এবং ইহা হৃদয়ঙ্গম করাও তাঁহাদের পক্ষে দুরূহ। শুধু অঙ্কিত চরিত্রের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করা নহে, তাহার সমগ্র জীবনকে সমগ্র ভাবে পরিকল্পনা করিয়া, তাহার চাল-চলন, কথাবার্তা, ভাব-অভাব সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করিয়া, যেখানে যেটি সাজে সেইরূপ কথা, ভাব, ভঙ্গী ও আচরণ, স্থান কাল পাত্র ও অবস্থা ভেদে সন্নিবেশ করাই নাট্যকারের প্রয়োগ-নৈপুণ্য। আমরা এ কথা বলিতেছি না যে, দীনবন্ধু একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ছিলেন বা তাঁহার কোনও একখানি গ্রন্থ নির্দ্দোষ ও সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর, কিন্তু শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের যে বিশিষ্ট শক্তি না থাকিলে তাহার নাট্যকলা অসার ও অশ্রদ্ধেয় হয়, সেই objectivity বা বাস্তবের

সহিত তন্ময়ীভবন-যোগ্যতা ছিল বলিয়া দীনবন্ধুর হাস্যরসাত্মক চরিত্র-চিত্রাঙ্কন এত নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ হইয়াছে।

অনন্যসাধারণ সামাজিক অভিজ্ঞতা ও অপরিসীম বাস্তব-সচেতন সহানুভূতির ফলে, দীনবন্ধু প্রায় সকল শ্রেণীর দেশীয় লোকের সঙ্গে মিশিতে ও তাহাদের চরিত্র যথাযথ অঙ্কিত করিতে পারিতেন। বাস্তব নির্লিপ্ত অহংতান্ত্রিক মনঃকল্পিত আদর্শ প্রকৃত নাট্য-রস সৃষ্টি করিতে পারে না। যেখানে দীনবন্ধুর প্রকৃত অভিজ্ঞতা ও সহানুভূতি ছিল না, সেখানে তাঁহার স্বভাবাঙ্কনও সফল হয় নাই। কতকটা উদীয়মান ব্রাহ্মসমাজের মোহে, কতকটা কাব্যগত আদর্শের অনুশীলনে দীনবন্ধু বিজয়-কামিনী, ললিত-লীলাবতী, সিদ্ধেশ্বর-রাজলক্ষ্মী প্রভৃতির চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, কিন্তু এই প্রকৃতিগুলি তাহার মনের সহধর্ম্মী ছিল না বলিয়া ইহাদের বিষয়ে সহানুভূতি বা অভিজ্ঞতা তাঁহার যথেষ্ট ছিল না। তাঁহার নদেরচাঁদ, নিমচাঁদ, রামমাণিক্য, জলধর, জগদম্বা, ঘটিরাম, শ্রীনাথ, রাজীবলোচন, আদুরী, তোরাপ, মালতী, মল্লিকা, শারদাসুন্দরী প্রভৃতিকে তিনি যেরূপ ভাল করিয়া জানিতেন ও বুঝিতেন, সেইরূপ মামুলীপ্রথাগত বা সম্পূর্ণ বিজাতীয় পাকে প্রস্তুত নূতন চরিত্রগুলিকে জানিতেন বা বুঝিতেন না। এ সকল স্থলে নিছক কল্পনা বা কাব্যগত আদর্শের আশ্রয় লইয়া, সম্পূর্ণরূপে তদ্ভাবে ভাবিত হইতে পারেন নাই, এবং যে আপনার অভিজ্ঞতা ও স্বভাবাঙ্কন ক্ষমতাকে আনন্দে বিহার করিতে দিতে সমর্থ হন নাই।

কিন্তু এই বাস্তব-আসক্তি ও স্বভাবাঙ্কন ক্ষমতা ছিল বলিয়া, স্বভাবসিদ্ধ চিত্রকে idealise করিবার ক্ষমতা যে তাঁহার ছিল না তাহা ঠিক নহে। হাস্যরসের দিকেই তাঁহার স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল, তাই হাস্যাত্মক চরিত্র সৃষ্টিতেই তিনি অধিকতর সফল হইয়া

ছিলেন। কিন্তু এরূপ idealism না থাকিলে প্রকৃত হাস্যরসিক বা humouristএর চেষ্টা বিফল। ফটোগ্রাফি বা হুবহু নকল করা realism নহে, বোধ হয় একথা কোনও সাহিত্যরসজ্ঞ পাঠককে বলিয়া দিতে হইবে না। জীবনের অভিজ্ঞতার বিরোধী বা জীবনের স্মৃতিসম্পর্কহীন চিত্র যেরূপ নিষ্ফল, কল্পনা-স্পর্শ-বর্জ্জিত জীবনের নগ্ন প্রাকৃতিক চিত্রও সেইরূপ অসার। মানব-জীবনের প্রাকৃতিক চিত্র অধিকাংশ সময়ে তুচ্ছ, কর্কশ বা অশোভন, এবং নাট্য বা কাব্যকলার উপযোগী নহে। যাহা অকিঞ্চিৎকর, যাহা কুৎসিত, যাহা ঘৃণিত, তাহা মর্ম্মপীড়াকর; তাহা কখনও সুখদায়ক বা হাস্যরসাস্পদ হইতে পারে না। হাস্যরসিকের idealism ও সহানুভূতির পরীক্ষা এই খানেই। মানস-কল্পনা বা idealism যে শুধু অশরীরী পদার্থের সৃষ্টি করিয়া আত্মভাবের অবাস্তব লোকে বিচরণ করিবে, এমন নহে; পরন্তু যাহা বাস্তব, যাহা নিত্যদৃষ্ট ও সুপরিচিত, তাহাকেও সুন্দর ও উজ্জ্বল করিয়া চিত্রিত করাও ইহার কার্য্য। ... স্বভাব-শিল্পীর জাগ্রত চেতনা প্রত্যক্ষের রস-রূপ সৃষ্টি করে, স্বপ্নলোকের অপ্রাকৃত রসের সন্ধান করে না। কারণ, এই মানস-কল্পনার মূলে রহিয়াছে—হাস্য-রসিকের গভীর বিপুল সমবেদনা ও আত্ম-নিরপেক্ষ তন্ময়তা। যে সচেতন সহানুভূতি, যে রসগ্রাহিতা, যে কোমল-মধুর হৃদয়ের প্রীতি, Don Quixote-এর নির্ব্বুদ্ধিতা, Rosalind-এর কৌতুকপ্রিয়তা, Dr. Primrose-এর হাস্যোদ্দীপক সরলতা অথবা Falstaff-এর বিড়ম্বনা, এইরূপ বিভিন্ন বিচিত্রতাকে একটি বিস্তীর্ণ স্নিগ্ধ বেষ্টনে জড়াইয়া ধরিতে পারে, তাহাই হাস্যরসের প্রাণ। নদেরচাঁদ হেমচাঁদ, জলধর, জগদম্বা, নিমচাঁদ অটল, বগী বিন্দী, ঘটিরাম রাজীবলোচন—ইহার একটিও স্বভাবতঃ প্রীতিপ্রদ চরিত্র

নহে; কিন্তু সহস্র দোষ সত্ত্বেও ইহাদের উপর আমাদের বিরক্তি, রাগ বা ঘৃণা হয় না। ইহাদের সহিত যে শুধু লেখকের সহানুভূতি আছে তাহা নহে, সেই সহানুভূতি তিনি পাঠকের মনেও জাগাইয়া তোলেন। ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ অনেক সময় মনকে ক্ষুব্ধ ও বিচলিত করে, কিন্তু হাস্যরস সকল সময়ই সহজ আনন্দের উৎস। নাট্যকারের অসূয়া-ক্রোধ-সম্পর্ক-শূন্য অবাধ উচ্ছলিত হাস্যের স্রোতে আমরা ভাসিয়া যাই, ঘৃণা বা রাগ করিবার অবসর থাকে না।

তাহা হইলে প্রশ্ন উঠিবে যে, রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় যে মাতলামি ও বকামির কথা এবং নৈতিক শিক্ষার অভাব লইয়া আক্ষেপ করিয়াছেন, সে অভিযোগের ত উত্তর হইল না, কারণ অপ্রীতিপ্রদ চরিত্রকে হাস্যরসিক শুধু হাস্যাস্পদ করেন, তাহাকে গর্হণীয় করেন না। কিন্তু এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, হাস্যরসিকের কারবার শুধু মানুষের দুর্ব্বলতা বা মূঢ়তা লইয়া, তাহার পাপ বা দুষ্কৃতি লইয়া নহে। হিংসা, পীড়া, অপকৃতি প্রভৃতি গম্ভীর বিষয় করুণ বা অন্য রসের অঙ্গ,—তাহাতে হাসিবার কিছুই নাই। কিন্তু সমাজ যাহাকে পাপাচরণ বলে, তাহা যদি স্বাভাবিক দুষ্টতা বা দূষিত মনোবৃত্তির ফল না হইয়া, কেবল নির্ব্বুদ্ধিতা, ভুলভ্রান্তি বা ন্যূনতার ফল হয়, অথবা তাহার মধ্যে কেবল অসাধুতা, ভণ্ডামি বা ন্যাকামি থাকে, তবে সেই সকল বৈসাদৃশ্য হাস্যরসিকের বিষয়ীভূত। সেইজন্য সুস্পষ্ট নৈতিক শিক্ষা নিছক হাস্যাত্মক নাটকের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। যাহা বিহিত, অভ্যস্ত ও উপাদেয়, তাহা স্বাভাবিক,—তাহাতে হাসিবার বা কাঁদিবার কিছুই নাই। এইজন্য যাহা অভ্যস্ত নহে, যাহা অসঙ্গত, বিকৃত, অসদৃশ বা বিপরীতভাবাপন্ন তাহা হইতেই হাস্যরসের উৎপত্তি। কিন্তু এই বিকৃতি বা বৈসাদৃশ্যের একটি সীমা আছে; তাহা অতিক্রম করিলে

আর হাসি থাকিবে না। মাতালের দুর্গতি দেখিলে হাসি পায়, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তাহার প্রতি আমাদের ঘৃণা, ত্রাস, বিরক্তি বা অনুকম্পার উদয় হয়, সেই মুহূর্ত্তেই আর হাসিবার অবসর থাকে না। অনুকম্পা, ঘৃণা প্রভৃতি নৈতিক সহানুভূতি গাম্ভীর্য্যমূলক, তাহাতে হাস্যরসের প্রসর নাই। সেইজন্য হাস্যাত্মক নাটক বা প্রহসনে বর্ণিত দুর্গতি ভয়াবহ বা দুস্তর হওয়া উচিত নহে। হাস্যাত্মক নাটকের দুর্ব্বৃত্ত পাত্রদিগের প্রচণ্ড নৈতিক দণ্ড কখনও হয় না,—হইতেও পারে না। বড় জোর, জলধরের মত চিটে-গুড়, তুলো ও আল্‌কাতরায় রূপান্তর, রাজীবলোচনের মত ঝাঁটা ও চপেটাঘাত, নিমে দত্তর মত কিল-চড়, কানমলা ও গলাটিপি, অথবা নদেরচাঁদের মত শুধু গলাটিপিতে শেষ হয়। তাহাদিগকে যথেষ্ট হাস্যাস্পদ ও বিপর্য্যস্ত করাই হাস্য-রসিকের উদ্দেশ্য। এরূপ কায়িক দণ্ড সুরুচি-সঙ্গত নয় বলিয়া আপত্তি উঠিতে পারে, কিন্তু ইহা অপেক্ষা গুরুতর ন্যায়দণ্ড আনিয়া ফেলিলে নাটকে গাম্ভীর্য্য আসিয়া পড়ে। বিয়োগান্ত নাটকে যেরূপ মৃত্যু প্রভৃতি গুরুতর দণ্ডের অবতারণা, হাস্যাত্মক নাটকে সেইরূপ এই সকল লাঞ্ছনার স্থান। সমস্ত জীবনটাকে কৌতুকের চক্ষে দেখার মূলে যে কোন নীতি নাই, একথা বলিতেছি না, কিন্তু হাস্যরসিকের সুব্যক্ত নৈতিক সহানুভূতি বা নৈতিক শিক্ষার অভাব লইয়া আক্ষেপ করিলে তাহার উদ্দেশ্যের অপলাপ করা হয়। কোনও বিজ্ঞ সমালোচক সেইজন্য বলিয়াছেন: As the comedy must place the spectator in a point of view altogether different from that of moral appreciation, with what right can moral instruction be demanded of comedy?...Morality, in its genuine acceptation, is essentially allied to the spirit of tragedy.

নৈতিক সহানুভূতি না থাকিলেও, এই spirit of tragedy বা করুণরসের ছায়া যে হাস্যরসের রচনার বহির্ভূত, তাহা নহে, বরং ইহা তাহাকে আরও নিবিড় ও মর্ম্মস্পর্শী করিয়া তোলে। কারণ হাসি ও অশ্রুর এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যে একটি থাকিলে অন্যটিও আসিয়া পড়ে। প্রকৃত হাস্যরসের মধ্যে যে নিবিড় অনুভূতি রহিয়াছে, তাহা আমাদের চোখে অশ্রু না আনিয়া দিলেও তাহার কাছাকাছি পৌঁছাইয়া দেয়। ইহা যদি না হইত, তবে হাস্যরস কেবল ভাঁড়ামি, তামাসা বা ইয়ারকিতে পরিণত হইত। জীবনের গহন আকাশে যে মেঘ ও রৌদ্রের খেলা, তাহাকে মধুর-কোমল, অথচ সমুজ্জ্বল, করিয়া চিত্রিত করাই হাস্য-রসিকের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। দীনবন্ধুর হাস্যরস নানা ছন্দে, নানা ভঙ্গিমায়, বহুরূপীর ন্যায় বিভিন্ন আকারে দেখা দিয়াছে। নিছক প্রহসন হইতে বেদনার অশ্রু-দীপ্ত হাসি পর্য্যন্ত কৌতুকের নিরবচ্ছিন্ন স্ফূর্ত্তি, কথাবার্ত্তায় চরিত্র-চিত্রে, ঘটনা-সংস্থানে সর্ব্বত্র বিচিত্র রস-রূপ ধারণ করিয়াছে। দীনবন্ধুতে নাই কেবল ক্রোধ, হিংসা বা অসূয়া-প্রসূত তীব্র ব্যঙ্গ এবং মনুষ্যবিদ্বেষজাত কঠিন নিরানন্দ উপহাস। মেকির উপর তাঁহার যথেষ্ট রাগ আছে সত্য, এবং মাঝে মাঝে চড়-চাপড় কাণমলা দিতে তিনি ছাড়েন না, কিন্তু ইহার সবটাই রঙ্গ, সবটাই আনন্দ। কিন্তু এই আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে সমবেদনায় তাঁহার চক্ষুও ভারাক্রান্ত হইয়া আসে। সধবার একাদশী শুধু নিছক রঙ্গ-তামাসা নহে। ইহাতে নব্যবঙ্গের অধঃপতন ও নির্ব্বুদ্ধিতার যে হাস্য-সমুজ্জ্বল চিত্র রহিয়াছে, তাহার মধ্যে চিত্রকরের আন্তরিক বেদনা অনুস্যূত থাকিয়া তাহাকে আরও মর্ম্মস্পর্শী ও মনোরম করিয়াছে।

সেইজন্য সধবার একাদশীর সর্ব্বপ্রধান চরিত্র নিমে দত্তর আলেখ্য কেবল একটি দুর্বৃত্ত মাতালের উচ্ছৃঙ্খলতার সাদাসিদে চিত্র নহে।

যাঁহারা এই হাস্যাত্মক নাটককে কেবল মাতলামি ও বকামির বিবরণ মনে করেন, তাঁহারা ইহার মর্ম্মগ্রাহী নহেন। অবশ্য ইংরাজী শিক্ষার প্রথম যুগে দেশে কিরূপ 'কুরুচি'র স্রোত বহিয়াছিল বাহ্যতঃ ইহাই ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়। 'কুরুচি' এখানে পুস্তকের বিষয়ীভূত হইলেও, শুধু কুরুচির জন্য কুরুচি চিত্রিত করা হয় নাই ; মনের কোনও অনুচিত বিকার ঘটান ইহার উদ্দেশ্য নহে। সমাজ-দেহের এই অত্যধিক রক্ত-প্রাবল্য প্রশমনের জন্য, একদিকে ঈশ্বর গুপ্তের 'মোটা লাঠি' ও অন্যদিকে দীনবন্ধুর 'সরু ল্যান্‌সেট্‌' এই উভয়ের প্রয়োজন হইয়াছিল। কেবল নীতিশিক্ষা ও ধর্ম্মের দোহাই দিয়া লোকের চোখ ফোটান যায় না ; কঠোর বা চরম উপায়ও অনেক সময় বিপরীত ফল লইয়া আসে। যাহাদের একটু কাণ্ডজ্ঞান আছে, যাহারা সমস্ত মনুষ্যত্ব বা আত্মসম্মান একবারে বর্জ্জন করে নাই, অথবা যাহারা স্বভাবতঃ দুষ্ট বা দূষিত নয়, ব্যঙ্গের তীব্র কশাঘাত অনেক সময় তাহাদের আরও মরিয়া করিয়া তোলে। এরূপ বিপরীতগামী প্রকৃতিকে নিতান্ত হাস্যাস্পদ করিয়া তাহার আত্মসম্মানে আঘাত করিলে, অনেক সময় তাহার চৈতন্য ফিরিয়া আসে। কিন্তু কেবল আত্মাভিমানকে নির্দ্দয়ভাবে ঘা' দিলে চলে না, তাহার শোচনীয় অবস্থার সহিত সমবেদনা না থাকিলে তাহার মর্ম্মস্পর্শ করা যায় না। সেইজন্য ঈশ্বরগুপ্তের শিষ্য হইয়াও দীনবন্ধু সর্ব্বত্র নিষ্ঠুরভাবে মোটা লাঠি চালান নাই ; যেখানে দরকার হইয়াছে তাহা করিয়াছেন, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে দরদী সুচিকিৎসকের মত সরু ল্যানসেটখানি বাহির করিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন।

'কালেজ-আউট্' নব্যবঙ্গের নব-আলোক-প্রাপ্ত যুবক উচ্ছৃঙ্খলতার ও অধঃপতনের শেষ সীমা পর্য্যন্ত যাইতে কুণ্ঠিত হইত না। কিন্তু

তাহারা ভদ্রসন্তান, নিতান্ত অশিক্ষিত পশু নহে। তাহাদের সহজ জ্ঞান, দুঃশিক্ষা ও নির্ব্বুদ্ধিতার মোহে, অনাচারের মধ্যে লোপ পাইতে বসিয়াছিল, কিন্তু স্বভাবতঃ তাহারা দুর্বৃত্ত ছিল না। ইহাদের মধ্যেও বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তি ছিল। ঘটিরাম ডিপুটির যে কুসংস্কার ছিল না, তাহা দেখাইবার জন্য এই অবতারটি অনায়াসে মদ্যপান, মুরগীভক্ষণ, বেশ্যালয়ে গমন এবং তেত্রিশ কোটি দেবতা এক দিনে বিসর্জ্জন দিতে পারিত। কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে ছিল অতি নির্ব্বোধ, ভণ্ড ও কাপুরুষ। ব্রাহ্ম হইয়াও 'হিন্দুদিগের নিন্দা'র ভয়ে প্রকাশ্যভাবে এ সমস্ত করিতে সাহস করিত না, এবং বাহিরের মর্য্যাদাটুকু বজায় রাখিতে চেষ্টা করিত। এই জন্য কলেজে-পড়া হইলেও, ঘটিরাম পুরাদস্তুর নব্যবঙ্গ নহেন; নব্যবঙ্গের আদর্শস্বরূপ নিমচাঁদ তাহাকে ক্যাডাভ্যারাস্ ও arrant coward বলিয়া উপহাস করিয়াছে। নিমচাঁদ যে ঘটিরামকে silly বলিয়াছে, তাহার কারণ সে ডিপুটি বলিয়া খরাকে সরা জ্ঞান করে, সর্ব্বত্র লেজে বাধিয়া আরদালীকে লইয়া যায়, কাহারও বাড়ী গেলে উচ্চ আসনে বসে; এবং যখন শামলা মাথায় দিয়া পাইচারী করে তখন মেয়েরা যে হাসে তাহাতে সে গৌরব বোধ করে! ঘটিরাম নব্যবঙ্গের মধ্যে philistine; মদ খাইতে বা কুকর্ম্ম করিতে সম্পূর্ণ ইচ্ছা, কিন্তু সাহসে কুলায় না; এবং আঙুল ডুবাইয়া মদ চাখিয়া আঙুল ধোয়ার নিষ্ঠাটুকুও আছে। ব্রাহ্মসমাজের সভ্য, কিন্তু ধর্ম্মের ধার ধারে না; হিন্দুদিগের মন রক্ষার জন্য ঠাকুর দেখিতে গিয়া ঝনাৎ করিয়া টাকা ফেলিয়া দিয়া প্রণাম করে; ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের সময়মত দু'এক টাকা ঘুষ দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। নিজের ঘুষ লইতে প্রেজুডিস্ নাই, কিন্তু ডিস্মিসের ভয় আছে। আর কলেজে পড়িলেও ইংরাজী বিদ্যায় দিগ্গজ; অকালকুষ্মাণ্ড ভোলার সঙ্গে পাল্লা

দিতে পারে না ; নিমচাঁদের মত ইংরাজীতে বলিতে, লিখিতে, পড়িতে, চিন্তা করিতে লায়েক নয়, ইংরাজীতে স্বপ্ন দেখা ত দূরের কথা।

নিমচাঁদ মাতাল ও দুশ্চরিত্র হইলেও এরূপ অপদার্থ নহে। বাস্তবিক উচ্ছৃঙ্খল ও অনাচারী হইলেও নব্যবঙ্গের মধ্যে অপদার্থের সংখ্যা বেশী ছিল না। তাহাকে এরূপ অপদার্থ করিয়া অঙ্কিত করিলে চিত্র স্বাভাবিক হইত না, বিদ্রূপও তত সফল হইত না। নিমচাঁদের সহস্রদোষ সত্ত্বেও সে সরল, খলদ্বেষী, কৃতবিদ্য, বুদ্ধিমান ও নির্ভীক ছিল ; ঘটিরামের মত ভণ্ড, কাপুরুষ ও মিথ্যাবাদী নহে। অহঙ্কার থাকিলেও, অলীক আত্মম্ভরিতা নাই। নিজের দোষ গুণ বুঝিতে পারিত, এবং তাহার বেশী দাবী করিত না। ঘটিরামকে নিমচাঁদ বেশ অমায়িকভাবে আত্ম-পরিচয় দিয়াছে—'আমি অটলের বৈঠকখানায় মদ খাই, এক্ষণে টলে পড়ে রয়েছি…ডিপুটবাবু, আমি তোমার পেনালকোড, এতে সব ক্রাইম আছে।' পুনশ্চ—'অতি দীন, সহায়সম্পত্তিহীন, কোনরূপে অটলের টেবিলে, নকুলের বাগানে হরিনামামৃত পান করে মাতালযাত্রা নির্ব্বাহ করি।' আবার নেশার চরম অবস্থায় প্রচ্ছন্ন আত্মধিক্কারের বশে, অন্য স্থানে নিজেকে বলিয়াছে—'রে পাপাত্মা! রে দুরাশয়! রে ধর্ম্ম-লজ্জা-মান-মর্য্যাদা-পরিপন্থী মদ্যপায়ী মাতাল।' নিমচাঁদ মদ খায় বটে, কিন্তু লুকাইয়া নহে ; বরং রোগ বা নিন্দার ভয়ে মদ ছাড়িয়া কলেজের নাম ডুবান অতি ভীরুতার লক্ষণ মনে করে। মিল্টনের উন্নতচেতা শয়তানের মত—'To be weak is miserable, doing or suffering'—ইহাই ছিল তাহার motto। এমন কি শেষকালে নির্দ্দয় প্রহারের পরও, অটলের মত মদ ছাড়িয়া দিবার নামটি পর্য্যন্তও সে করে নাই। এরূপ মার খাওয়া যে তাহার স্বকৃত কার্য্যের আনুষঙ্গিক ও অবশ্যম্ভাবী ফল

তাহা সে জানিত; সুতরাং ইহার জন্য অটলকে দোষ দেওয়া অথবা প্যান্‌পেনে কাঁদুনি সে কাপুরুষতার লক্ষণ মনে করিত। স্বয়ং যে অটলের মাথাটি খাইতেছে তাহা বেশ বুঝিত এবং তাহা গোপন করা প্রয়োজন মনে করিত না। যখন অটলের পিতা জীবনচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুই কি নিমচাঁদ?' তখন কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া নিমচাঁদ উত্তর করিল—'হাঁ বাবা, আমি তোমার কালনিমে।' অন্যত্র—'অটল আমার আস্তাবলের বাঁদর, অটলের মাথায় কাঁটাল ভেঙ্গে এত মজা কচ্ছি'। অটলকে মদ ধরাইবার উদ্দেশ্য—'এক বেটা বড় মানুষের ছেলে মদ ধল্লে দ্বাদশটি মাতাল প্রতিপালন হয়', 'ওর বাপ্ অনেকের সর্ব্বনাশ করে বিষয় করেছে, টাকাগুলো সৎকর্ম্মে ব্যয় হোক্'। নিজে কতদূর অধঃ-পতিত নেশার ঝোঁকে তাহাও বুঝিত—তুমি স্কুল হতে বেরুলে একটি দেবতা, এখন হয়েছ একটি ভূত, যতদূর অধঃপাতে যেতে হয় তা গিয়েছ…আমি সকলের ঘৃণাস্পদ, আমি জঘন্যতার জলনিধি, আমি আপনার কুচরিত্রে আপনি কম্পিত হই।' Melodrama বা senti-mentality তাহার চরিত্রে নাই; তবে মদের নেশা চড়িলে মনস্তাপের কান্নাটাও বেশ জমিত। প্যান্‌পেনে গদ্‌-গদভাবের নির্ব্বেদ বা বিলাপ করিবার ছেলে সে নয়, তবে এ অনুতাপের তুষাগ্নি যখন সে সুরার সুধাসমুদ্রে ডুবাইবার চেষ্টা করিত, তখন তাহার মাতলামির কান্নাটা বেশ নিবিড় হইয়া উঠিত। তাহার মত শিক্ষিত ভদ্র যুবকের চরম অপমান—গোকুলবাবুর দরওয়ানের হাতে গলাধাক্কা খাইয়া সামান্য মাতালের মত প্রকাশ্য রাজপথে পড়িয়া থাকা, কিন্তু আপাততঃ সার্জ্জন সাহেবের son-in-law হওয়া ভিন্ন তাহার কোন উচ্চ আকাঙ্ক্ষা নাই। মদই যে তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছে তাহা সে বোঝে; সে আরও বোঝে যে বিধাতা তাহাকে যে অমৃতরস

দিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা এখন গরলে পরিণত হইয়াছে। তাই অন্তর্লীন ক্ষোভে, দুঃখে, নৈরাশ্যে বলিয়াছে—'মদ কি ছাড়বো? আমি ছাড়তে পারি বাবা, ও আমায় ছাড়ে কই? সেকালে ভূতে পেত এখন মদে পায়,—ডাক ওঝা, ডাক্ ওঝা, ঝাড়িয়ে আমায় মদ ছাড়িয়ে দিক্।' এই দুর্দ্দমনীয় পিপাসা তাহার সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা নির্মূল করিয়া তাহাকে পৃশুবৃত্তিধারী ও পরমুখাপেক্ষী করিয়াছে। তাহাতে দিন বেশ মজায় কাটে, কিন্তু ক্ষুণ্ণ আত্ম-সম্মান কাঁটার মত গোপন মর্ম্ম বিদ্ধ করে। নিমচাঁদ গর্ব্বিত, উন্নতচেতা ও আত্মাভিমানী; কিন্তু যে আত্মগৌরব ও তেজস্বিতার মুখে সে দত্তকুল-প্রাধান্য ব্যাখ্যা করিয়াছে, সেই মুখেই তাহার কিছু পরে সে সমস্ত গর্ব্ব ধূলায় নিক্ষেপ করিয়া, এই পরপিণ্ডাশনরূপ রুদ্ধ মর্ম্মবেদনা সপরিহাসে কেনারামের কাছে ব্যক্ত করিয়াছে: 'ধর্ম্ম অবতার, ঘটিরাম অবতার, বরাহ অবতার, শ্রুত আছে স্বনামো পুরুষো ধন্য, পিতৃনামে চ মধ্যম, শ্বশুরের নামে অধম, শালার নামে অধমাধম। বিচারপতি আপমি হাকিম, ঘটিরাম, আমি সেই অধমাধম—শ্যামবাজারের মহেশ্বর ঘোষ আমার শালা, তার বাড়ীতে আমি থাকি; সেই শালার নাম না করলে কোনও শালা চিন্‌তে পারে না,—হুজুর বান্দা মজুদ, ধামার ধামা দামার চাইতেও অধম।'

কিন্তু ধর্ম্মলজ্জাহীন নৈরাশ্য-পীড়িত মদ্যপ হইলেও নিমচাঁদের প্রকৃতি কেনারামের মত পদার্থহীন, বা গোঁয়ার মূর্খ অটলের মত সর্ব্বসদ্‌গুণ বর্জ্জিত নহে। নিমে দত্ত স্বভাবতঃ সরল, স্পষ্টবাদী, কুটিল ব্যবহারের চিরশত্রু, সাহঙ্কর আচরণের বিদ্বেষী, এবং প্রাণান্তে কাহারও অলীক জাঁক সহ্য করিতে পারিত না। অটলের রক্ষিতা বারবিলাসিনী কাঞ্চনের স্তোত্রটি বেশ একটি সওয়াল জবাব;

এবং তাহার মুখের উপর তাহার প্রকৃত স্বভাব বর্ণনা করিতে নিমচাঁদ একটুও ইতস্ততঃ করে না। কেনারামকে ঘটিরাম বানান, নকুলেশ্বরের সত[illegible]ার উপর বিদ্রূপবর্ষণ প্রভৃতি এই অসহিষ্ণুতার আরও নিদর্শন। দর[illegible] দিয়া অপমান করার জন্য গোকুলবাবুকে জব্দ করা নিমচাঁদের উদ্দেশ্য, কিন্তু অটলের নির্লজ্জ পাপ-প্রস্তাবে সে সম্মতি দেয় নাই—'গৃহস্থের মেয়ে বার করবের মৎলব করো না বাবা, ইহকাল পরকাল দুই যাবে। আমার কথা শোনো, গোকলো ব্যাটাকে ধরে একদিন খুব করে চাবকে দাও। কাঞ্চনকে না রাখ, তোমার মেগের কাছে যাও।' অটল আরও ধরিলে বলিল—'we have willing dames enough'; এবং অটল তাহাকে সেই অপকর্ম্মের সারথি করিতে চাহিলে সে বলিয়া উঠিল—'এ কি ভদ্রলোকে পারে?' হ্যামলেটের ভাষায় তাহাকে bloody bawdy villain বলিয়া গালাগালি দিবার পর যখন অটল টিট্‌কারী করিল, তখনও নিমচাঁদ ম্যাক্‌বেথের ভাষায় বলিল—I dare do all that may become a man; who dares do more, is none! নিমচাঁদ অটলকে মদ ধরাইয়াছে বটে, কিন্তু তাহারই মুখে আবার শুনিতে পাই—'আমি মদ খাই আর যা করি তোকে বারম্বার বলেছি রাত্রে কখন বাহিরে থাকিস্‌নি, আপনার ঘরে গিয়ে শুস্‌।'

স্থান, কাল ও পাত্রভেদে আধুনিক সময়ে নিমচাঁদের মত চরিত্র সুলভ না হইলেও, অটলের মত চরিত্র টেকচাঁদের আলালের ঘরের দুলাল হইতে এখনও পর্য্যন্ত বিরল নহে। কিন্তু অটল, নিমচাঁদের মত রক্ত-মাংসের জীব, কেবল মামুলীপ্রথাগত কল্পিত চিত্র নহে। বড় লোকের ঘরের হস্তিমূর্খ, তোষামোদপ্রিয়, বয়াটে অকালকুষ্মাণ্ড কতদূর অধঃপাতে যাইতে পারে, তাহা অটলের চিত্রে দেখানো হইয়াছে।

অটল অনুচিত-প্রশ্রয়-প্রাপ্ত, অত্যন্ত স্বার্থপর, আত্মসুখবিলাসী, আদুরে ছেলের চূড়ান্ত। তাহার আবদার সকলের উপর,—বাপের উপর, মায়ের উপর, নিমচাঁদের উপর, এমন কি কাঞ্চনেরও উপর। সে আপনাকে মনে করে অত্যন্ত রসিক, এবং কলিকাতার নামজাদা বাবুদের শিরোমণি; কিন্তু তাহার পত্নী কুমুদিনী সৌদামিনীকে যাহা বলিয়াছে তাহা ঠিক্—'তোর দাদা যে ষণ্ডামাৰ্ক, সে রসিকতার কি ধার ধারে। শুনেছে কাঞ্চনকে অনেক বড় মানুষের ছেলে রেখেছিল, অমনি তার জন্য পাগল হয়েছে। রূপ, গুণ, বয়েস তোমার দাদা ত চায় না, কিসে লোকে বাবু বল্‌বে তাই দেখে।' অটলের লজ্জা, সঙ্কোচ, মান, মর্য্যাদাজ্ঞানের লেশমাত্র নাই। নিমচাঁদ বৃদ্ধ জীবনচন্দ্রকে বলিয়াছে বটে—'তোমার মন্দোদরী'—কিন্তু অকালপক্ক জ্যাঠামিতে শিষ্য গুরুকে ছাড়াইয়া যান। সে বাবুয়ানার জন্য যে কেবল কুটিল-স্বভাবা স্বার্থ-পরায়ণা, মায়ের বয়সী কাঞ্চনকে বৃত্তিভোগী করিয়াছে, তাহা নহে, পরন্তু কাঞ্চনের গলা জড়াইয়া বারণ্ডায় নাচিয়া পাড়ার লোক জমা করিতে পারে, এবং যদি তাহাতে গুরুজন রাগ করে তবে তাহাদিগকে অপমান করিতে বাকি রাখে না। আপনার মা বাপকে দিয়া বেশ্যার খোসামোদ করাইয়া তাহাদিগকে লাঞ্ছিত করে; বাপের বা শ্বশুরের সামনে মুখের আটক নাই। জীবনচন্দ্র পুত্রের ব্যবহারে ক্ষোভে দুঃখে গলায় দড়ি দিতে চাহিয়াছেন, অটল তাহা শুনিয়া বলিল—'দাও তেরাত্রে শ্রাদ্ধ কোরবো।' সকল কার্য্যের চূড়ান্ত—নিজের খুড়শাশুড়ীকে ধরিয়া আনিতে লোক পাঠান; কিন্তু ইহারও সত্রপাত শুধু লাম্পট্য হইতে নহে,—প্রধান উদ্দেশ্য গোকুলবাবুকে জব্দ করা ও কাঞ্চনের দর্পচূর্ণ করা। অবশেষে জুতার চোটে গায়ের জ্বালায় অটল একবার বলিয়াছিল—'আমি মদ ছেড়ে দেব'। কিন্তু

পরক্ষণেই আবার বলিল—'নিমচাঁদ, ওঠ, বাবা না আসতে আসতে আমরা বাগানে যাই। যে মার খেয়েছি, অনেক ব্রাণ্ডী না খেলে বেদনা যাবে না!'

সধবার একাদশীর এই তিনটি প্রধান চরিত্রের কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে অঙ্কিত চরিত্রের সঙ্গতি ও স্বাভাবিকতা সর্ব্বত্র রক্ষিত হইয়াছে, এবং এই জন্যই বোধ হয় নাট্যকার এ নাটকের অন্য কোনরূপ সমাপ্তি কল্পনা করিতে পারেন নাই। করুণরসাত্মক সমাপ্তি অথবা পাপীর দুর্ম্মার্গ পরিত্যাগ প্রভৃতি উপসংহার নাটকের গতির সহিত খাপ খাইত না, এবং তাহাতে অঙ্কিত প্রকৃতিসমূহেরও সঙ্গতি রক্ষিত হইত না। ইহা আরও উল্লেখযোগ্য যে, যদিও মাতলামি ও বকামি ইহাদের নিত্যকর্ম্ম, তথাপি মাতলামি বা বকামি কুত্রাপি আদর্শরূপে অঙ্কিত হয় নাই। নীতি-শিক্ষক বা ধর্ম্মোপদেষ্টার আসন গ্রহণ করিয়া, হাস্যরসিক এ সমস্ত কুৎসিত বা ঘৃণিত করিয়া আঁকিতে পারেন না,—কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঘৃণা বা জুগুপ্সা আসিলে হাস্যরস থাকে না। যাহার মনে এ রস নাই সে মাতাল বা লম্পটকে মুহূর্ত্তের জন্য সহ্য করিতে পারে না; কিন্তু ভাব-কুশল হাস্যরসিক অতি দুশ্চরিত্রের মধ্যেও বিচিত্র ও হাস্যাস্পদ জিনিষ দেখিতে পান। তাই তাহার পদ্ধতিও বিভিন্ন প্রকারের।

যাহা বিরূপ, অসঙ্গত বা অসম্পূর্ণ, তাহা দেখিয়া আমরা হাসি. তাহার কারণ আমাদের মন সর্ব্বদা অখণ্ড পূর্ণতা বা স্বাস্থ্যের অভিলাষী। কিন্তু আমাদের আচারে, ব্যবহারে, চরিত্রে প্রত্যহ অসংখ্য অসঙ্গতি আসিয়া জমিতেছে,—আমরা সর্ব্বদা তাহা বিসদৃশ বলিয়া অনুভব করি না। আমাদের হাস্যপ্রবৃত্তি সর্ব্বদা এই অসঙ্গতির বিরুদ্ধে আমাদের সতর্ক করিয়া রাখে। এই প্রতিদিন খর্ব্বীকৃত আদর্শের পূর্ণতা যাহাতে

আমরা স্পষ্ট বা সম্যক্‌রূপে দেখিতে পাই, তাহাই হাস্যরসিকের কার্য্য। মানবজীবনের বৈলক্ষণ্য দেখিয়া অনেক সময় আক্ষেপ, ক্রোধ বা ঘৃণা হয় বটে, কিন্তু এই চিত্তবিকার হইতে আমাদের রক্ষা করে আমাদের হাস্যপ্রবৃত্তি। হাস্যরসিক আমাদের পীড়িত-ক্লিষ্ট জীবনে আনন্দ লইয়া আসে; সে আনন্দে ক্রোধ ঘৃণা বা ক্ষোভ নাই। হাস্যরসিকের প্রাণ সঙ্কীর্ণ বা সীমাবদ্ধ নহে; তাঁহার সহানুভূতি অতি সচেতন ও অপরিসীম, এবং তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও গভীর অভিজ্ঞতা অশেষ জ্ঞানের আধার। হাস্যরসিক চিন্তাশীল, তরল ভাব-প্রবণতার স্রোতে তাহাকে ভাসাইয়া লইতে পারে না। কিন্তু এই চিন্তাশীলতা কঠিন ধীশক্তি নহে—স্বাভাবিক প্রজ্ঞা। ইহার মধ্যে যে কোমল সহজ সমবেদনা রহিয়াছে, তাহা জীবনকে সঙ্কীর্ণভাবে না বুঝিয়া স্নিগ্ধনেত্রে ও সমগ্রভাবে বুঝিতে চেষ্টা করে। তাই কোন সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক লিখিয়াছেন—'The humourist sees life more widely and wisely than any of the seers. It is not an intense and narrow nature.... A humourist can gaze at the totality of world's life.'

দীনবন্ধুর হাস্যকৌতুক এইরূপ সহৃদ ও উদার প্রজ্ঞাপ্রসূত, এবং বিদ্বেষ-বর্জ্জিত। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ বা বিদ্রূপ, satire লেখকের কার্য্য, হাস্যরসিকের নহে। হাস্যরসিকের অনাবিল, প্রীতিপ্রফুল্ল হাস্য, উদার সমবেদনা ও বিশ্বাসের বলে, দুঃখপূর্ণ গদ্যময় জীবনে আনন্দ আনে, বল ও স্বাস্থ্য দেয়, ক্ষমা করে এবং অবসাদে উৎসাহ দান করে। দীনবন্ধু যে তাঁহার দেশ ও দেশবাসীকে ভালবাসিতেন সে শুধু মুখে নহে, হুজুগে পড়িয়া নহে; সেইজন্য সে-যুগের বাঙ্গালীর এই চঞ্চলতা, এই অন্ধ অনুকরণের মোহ তাঁহাকে নিরন্তর ব্যথিত করিত। তাই

তাঁহার রচনার কোথাও cynicism বা মনুষ্য-বিদ্বেষের ভাব নাই। বরং এই নিবিড় ব্যথা ও সহানুভূতি, অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত লুপ্ত থাকিয়া, তাহার হাস্য-কৌতুককে সরস ও মনোরম করিয়াছে। সধবার একাদশী এই নামটিই সেই বেদনা বা আক্ষেপের নিদর্শন। কালেজে পড়িলেই যে নিমচাঁদ বা কেনারামের মত উচ্ছৃঙ্খল বা অপদার্থ হইতে হইবে, ইহা যে দীনবন্ধু বিশ্বাস করিতেন না, তাহা কুমুদিনী ও সৌদামিনীর কথোপকথন হইতে বোঝা যায়। কিন্তু আক্ষেপের এই করুণ ভাবটি কখনও মুখ্যভাবে প্রকাশিত হইয়া নাটকের হাস্যরসের অন্তরায় হয় নাই, বরং ইহাকে স্নিগ্ধ ও হৃদয়গ্রাহী করিয়াছে। এমন কি, দুঃখিনী কুমুদিনীর বিষাদ-মলিন চিত্রের মধ্যেও এই করুণ ভাবটি সম্পূর্ণ ফুটিতে পারে নাই, আভাসে ফুটিয়াছে মাত্র।

অনেকে বলিবেন যে, এত প্রসঙ্গ থাকিতে দীনবন্ধু এরূপ বিশিষ্ট আখ্যানবস্তু গ্রহণ করিলেন কেন? কোন্ লেখক যে কি প্রেরণায় কি বস্তু বর্ণনা করে, তাহা বলা কঠিন। ইহা অনেকটা স্থান, কাল ও তাহার প্রতিভার গতি ও প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। কিন্তু এই সমস্যাটি সে-যুগে যে একটি বিশিষ্ট সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার প্রমাণ এই যে, নূতন সভ্যতার প্রধান গোঁড়া মাইকেলও একদিন খাঁটি সাহেব হইয়া 'একেই কি বলে সভ্যতা?' বলিয়া সেই সভ্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন। কথিত আছে, দীনবন্ধু মাইকেলের এই প্রহসনের আদর্শে 'সধবার একাদশী' লিখিয়াছিলেন। ইহা হইতে পারে; কিন্তু এস্থলে আদর্শ ও তৎপ্রতিকৃতি উভয়েরই এমন একটি নিজস্ব গৌরব আছে, যাহা পরস্পরের পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধ সত্ত্বেও ক্ষুণ্ণ হইবার নহে। কিন্তু তখনকার দিনে এই সমস্যা একাধিক চিন্তাশীল লেখকের মন আলোড়িত করিয়াছিল; এবং নূতন ও পুরাতনের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া

এ সমস্যাটি উপেক্ষা করিবার উপায় ছিল না। দীনবন্ধুর স্বদেশ-বাৎসল্য ও তাঁহার জাতীয়তা, পরিবর্ত্তনযুগের শিক্ষিত বাঙ্গালীর এই মোহ ও অধঃপতনের জন্য তাঁহার আন্তরিক মনোবেদনা, এবং তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ স্বভাবাঙ্কন ও হাস্যরসের ক্ষমতা তাঁহাকে তাঁহার প্রতিভার উপযোগী পথে প্রেরণ করিয়াছিল। তিনি বাঙ্গালীকে হাস্যাস্পদ করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সে শুধু বাঙ্গালীর মঙ্গলের জন্য। তিনি আত্মশক্তিকে, বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্বটুকুকে সকলের উপর স্থান দিতেন; বিশ্ব-সাহিত্য বা বিশ্ব-মানবের নির্ব্বিশেষ সৌন্দর্য্য-ধ্যানে বিভোর হইয়া আকাশ-কুসুম রচনা করিবার দিন তখনও আসে নাই। জাতিকে ভালবাসিতেন বলিয়া, তাহার উপর আন্তরিক বিশ্বাস ছিল বলিয়া, জাতির আপাত-অধঃপতনে আপনিও ব্যথিত হইয়াছিলেন; জাতিধর্ম্মচ্যুত হইয়া আত্মগত-ভাব-নিমগ্নতার বা অনুকৃতিমূলক কল্পনা-বিলাসের সময়ও তাঁহার ছিল না। কি ভাষায়, কি সাহিত্যে, কি জীবনে, অন্ধ অনুকৃতির মোহ বা সৌখীনতা কখনও তাঁহাকে আকৃষ্ট করে নাই। এবং এই অন্ধ অনুকৃতির বিষময় ফল নিরবচ্ছিন্ন বেদনায় তাঁহার পুরুষোচিত প্রতিভাকে প্রবুদ্ধ করিয়াছিল। সে-যুগ কেবল বিপ্লবের যুগ ছিল না, গঠনেরও যুগ ছিল। নব আদর্শের সংঘর্ষে প্রাচীন আদর্শ চুরমার হইয়া যাইতেছিল, কুপ্রথার সহিত দেশের সুপ্রথাগুলিও ভাসিয়া যাইতেছিল; এবং নূতন ধরণের কুপ্রথার আমদানীর সঙ্গে সঙ্গে যাহা কিছু জাতীয় ভাব ও জাতির স্পর্দ্ধার জিনিস ছিল, তাহা নবশিক্ষায় উদ্ধতীকৃত নব্যবঙ্গের যুবক হেলায় হারাইতেছিল। এই ভুল বুঝাইবার জন্য শুধু idealismএর প্রয়োজন নহে, realismএরও প্রয়োজন আছে; শুধু fiction নহে factএরও দরকার। সে-যুগের সুখদুঃখ, ভয়বিস্ময়, ভুলভ্রান্তি, আশা-

নিরাশা, স্নিগ্ধ সহাস নেত্রে অনুভব করিয়া, কবি-হৃদয়ের অপরিমিত সমবেদনায় অভিষিক্ত অপূর্ব্ব প্রজ্ঞার দ্বারা তাহার সমস্ত দুর্ব্বলতা ও নির্ব্বুদ্ধিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া,—আত্মসম্মান-বর্জ্জিত, জাতিধর্ম্মচ্যুত, বিপথগামী যুবকদিগকে হাস্যরস-সমুজ্জল আলেখ্য-দর্পণে নিজ-নিজ মুখ দেখাইয়া, সুস্থ ও বিহিত পথে প্রেরণ করার জন্য হাস্যরসিকেরও প্রয়োজন ছিল।

এই ক্ষমতা দীনবন্ধুর ছিল। তাঁহার অসাধারণ সামাজিক অভিজ্ঞতা, প্রত্যক্ষ অনুভূতি, বিপুল বিশ্বাস, অনবচ্ছিন্ন হাস্যরস-শক্তি, এরূপ মানব-চিত্রাঙ্কনের উপযোগী হইয়াছিল। শুধু কৌতুকের জন্য কৌতুক করা, অথবা দুএকটি ছোট-খাট বিষয় লইয়া প্রসঙ্গক্রমে বা প্রবন্ধকে হালকা ও রসালো করিবার জন্য কৌতুক করা নহে; এই বিপুল জাতীয় সমস্যা লইয়া সে-যুগের সমস্ত ভুলভ্রান্তিকে ক্ষমাশীল স্নিগ্ধ অন্তরের অনুভূতি দিয়া, হাস্যরসের রেখাপাতে সমুজ্জল করিয়া, জীবন্ত মানুষ ও তাহার জীবন আঁকিবার অসামান্য শক্তি দীনবন্ধুর ছিল। সে-যুগের যে সমস্যা এ-যুগের তাহা নহে; কিন্তু বর্ত্তমান সামাজিক ও সাহিত্যিক বৃক্ষে আরূঢ় বানরগুলিকে আঁকিবার জন্য এইরূপ হাস্যরসিকের আজও প্রয়োজন রহিয়াছে। কারণ, বানররূপ ধারণ করিলেও, মানব-প্রকৃতি সকল যুগে সমান। যুগ-সমস্যা বা পরিবেষ্টনের বৈশিষ্ট্য কোনও লেখকের শক্তির স্থায়ী বা সম্পূর্ণ মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে পারে না। নাট্যকার যে উপকরণগুলি লইয়া তাহার চিত্র অঙ্কিত করেন তাহা যুগধর্ম্মের বশবর্ত্তী সত্য, কিন্তু শিল্পীর শক্তির পরিমাণ তাহার নিয়ন্ত্রিত উপকরণে নহে; সকল উপকরণের মধ্যে যাহা চিরন্তন ও সর্ব্বগত তাহারই পরিকল্পনায় ও অঙ্কন-নৈপুণ্যে। দীনবন্ধু শুধু মাতাল আঁকেন নাই, জীবন্ত মানুষ ও তাহার জীবন আঁকিয়াছেন। এইখানেই তাঁহার

কৃতিত্ব, এবং এই কৃতিত্ব তিনি অর্জ্জন করিয়াছেন প্রধানতঃ হাস্য-রসিক ও স্বভাব-শিল্পী হিসাবে। নিছক করুণরসে দীনবন্ধুর শক্তি ছিল কি না, সে আলোচনা এ প্রবন্ধের বিষয় নহে। নিরক্ষর তোরাপের প্রভুভক্তি, নিরীহ ক্ষেত্রমণির নিরাড়ম্বর সতীত্বমাহাত্ম্য, গ্রাম্য রাইচরণ ও সাধুচরণের সাধুতা ও সহিষ্ণুতা, সরলার নীরব সারল্য, সাবিত্রী ও সৈরিন্ধ্রীর স্নেহ ও আত্মত্যাগ, কোমলহৃদয়া শারদাসুন্দরীর ধৈর্য্য ও ক্ষমাগুণ, ও দুঃখিনী কুমুদিনীর রসিকতা দ্বারা মনের বেদনা চাপিবার অমানুষিক চেষ্টা,—এই সমস্ত স্নিগ্ধ ও সরল চিত্রের মধ্যে মধুর, করুণ ও অকৃত্রিম ভাবের অভিব্যক্তি আছে কিনা, সে বিচার এখানে নিষ্প্রয়োজন। এ সমস্ত বিষয়ে তাহার শক্তি নিতান্ত উপেক্ষণীয় না হইলেও, যে বিচিত্র হাস্যেরসোদ্রেক, বাস্তব-তন্ময়তা ও স্বভাবাঙ্কন শক্তি তাঁহার হাস্যাত্মক নাটকে বিকশিত হইয়াছে, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যেও অনন্য-সাধারণ। দুর্লভ কবিত্বে বা romanceএ তাঁহার দক্ষতা ছিল না; অপরিণত যুগের অপরিণতি ও অপক্কতা তাঁহার রচনায় যথেষ্ট ছিল, কিন্তু যে অপূর্ব্ব হাস্য-রসের প্রেরণা ও আত্ম-নিরপেক্ষ বাস্তব-মুখী চেতনা, তাঁহার সরস ও আলেখ্য-বহুল রচনায় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা প্রকৃত নাট্য-রসিকের উপযুক্ত। যাহা অস্ফুট, যাহা অতীন্দ্রিয় বা যাহা আত্মগত স্বপ্নরচনায় বিভোর, তাহাতে তাঁহার সেরূপ দখল ছিল না; কিন্তু যাহা প্রকৃত, যাহা প্রত্যক্ষ, যাহা প্রাপ্ত, তাহাতে যে রস ও যে সৌন্দর্য্য, দীনবন্ধু সেই রসে রসিক, সেই সৌন্দর্য্যের কবি।

করুণ ও কোমলে দীনবন্ধু

বাঙ্গালা সাহিত্যে দীনবন্ধু প্রধানতঃ হাস্যরসের রচয়িতা বলিয়া পরিচিত, কিন্তু, তাঁহার সর্ব্বপ্রথম নাটক হাস্যরসোদ্রেকের জন্য রচিত হয় নাই। ইহা সত্য যে, হাস্য-রসিক হিসাবে তাঁহার যে শক্তি ও বৈশিষ্ট্য তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে অতুলনীয়, এবং তাঁহার প্রতিভার এই অভিব্যক্তির উপরেই তাঁহার সাহিত্য-সুপ্রতিষ্ঠিত; কিন্তু করুণ-রস-বহুল নীলদর্পণ নাটক ছাড়িয়া দিলেও, তাঁহার অন্যান্য রচনার বহুস্থলে এরূপ গাম্ভীর্য্যের উপলব্ধি হয়, যে তাহাতে তাঁহাকে কেবল হাস্য-রসিক হিসাবে ধরিলে তাঁহার প্রতিভার সম্পূর্ণ পরিচয় হয় না। মালতী-মল্লিকা, জলধর-জগদম্বার প্রসঙ্গ নাটকখানিকে সরস করিলেও নবীন তপস্বিনীর বিজয়-কামিনী বা রাজা-রাণীর উপাখ্যান গাম্ভীর্য্য-মূলক; লীলাবতীর হাস্যরসাত্মক প্রসঙ্গগুলি মূল গল্পের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হইলেও ইহা আধুনিক পল্লীবাসী জমিদার-গৃহের সুখ দুঃখের চিত্র; কমলে কামিনীতে হাস্যরস স্বতন্ত্র নহে, অন্য রসের আনুষঙ্গিক ভাবে আসিয়াছে। এমন কি, দীনবন্ধুর নিছক হাস্যরসাত্মক নাটক ও প্রহসনগুলিও করুণরসের স্নিগ্ধ রেখাপাতে আরও মনোরম ও উপাদেয় হইয়াছে। সধবার একাদশীতে যেটুকু করুণভাব আছে, তাহা ইহার উচ্ছ্বলিত হাস্যরসের তুফানে ঢাকা পড়িয়াছে, সত্য, কিন্তু বিয়ে পাগলা বুড়োর পাগলামি বা জামাই বারিকের সামাজিক রহস্যের তরলতা ইহাদের অন্তর্গত করুণ ভাবটিকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই।

হাস্যরসোত্তর রচনার মধ্যে এই যে করুণ-কোমল ভাবের অভিব্যক্তি, তাহা শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিকের উপযুক্ত। শুধু ভাবের প্রতিক্রিয়া বা relief হিসাবে নহে, জীবনের সমগ্র পরিকল্পনায় যেরূপ নিরবচ্ছিন্ন হাসি বা অশ্রু দেখা যায় না, উপন্যাস নাটকেও সেইরূপ। যে লোকোত্তর শিল্পী-বিধাতা মানব-জীবনকে হাস্য ও করুণ রসের মিশ্রণে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত করিয়াছেন, হাস্যরসিক তাঁহারই অনুসরণ করিয়া মানব-জীবনকে সমগ্রভাবে অনুভব করিতে চাহেন। অতি দুঃখের মধ্যেও হাসি পায়, এবং হাসিতে হাসিতেও অনেক সময় চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া আসে। উড্ সাহেবের সবুট পদাঘাতের পরও গোপীনাথের হাসি পাইল, ও সে বলিয়া উঠিল—'বাপ্! বেটা যেন আমার কলেজ-আউট্ বাবুদের গীন-পরা মাগ্!' নীলকরদিগের অমানুষিক অত্যাচার ও নিরীহ অসহায় দরিদ্রের দুঃখ যখন প্রাণ-মন সংক্ষুব্ধ করিয়া দেয়, তখন সহসা নিত্যদৃষ্ট পরিচিত দুই অধ্যাপকের কৌতুক-চিত্র ও তাহার বৈসাদৃশ্য, নীলকরদিগের ভয়াবহ জগতের বীভৎসতা আরও স্পষ্ট করিয়া তোলে। তেমনি অন্যদিকে, দুঃখিনী কুমুদিনীর হাসিবার অবকাশ নাই, কিন্তু হৃদয়ে যে নিরন্তর বেদনাগ্নি জ্বলিতেছে, তাহা নিতান্ত লঘু নয় বলিয়াই লঘুতার দ্বারা সে নিয়ত তাহা ঢাকিয়া রাখে। বাঙ্গালী ঘরের সহিষ্ণুতা ও ক্ষমা গুণের আধার, সরলা, শিক্ষিতা, রসিকা, পতিগত-প্রাণা শারদাসুন্দরীর স্নিগ্ধ চিত্র আঁকিবার অধিক অবসর গ্রন্থকারের নাই, কিন্তু কাব্যের তথা-কথিত উপেক্ষিতাদের মত, ইহার করুণ-কোমল আলেখ্য কয়েকটি নিপুণ রেখাপাতে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাই হাপ্ পাড়াগেঁয়ে, হাপ সহুরে বয়াটে হেমচাঁদের মুখে শুনিতে পাই—'বউ ভাল, কিন্তু ইয়ার বদ্।' হেমচাঁদ, শিথিলচরিত্র হইলেও, শারদাসুন্দরীকে ভালবাসে, এবং নদেরচাঁদের প্ররোচনায় 'ঘরের

'মাগ্‌কে খেমটাওয়ালী' করিতে রাজী নয়; তাই গুলির আড্ডায় শুনিতে পাই—'নদেরচাঁদ যে বলে হেমাকে হেমার মাগ্‌ খারাপ কল্লে, তা মিথ্যা নয়।' বয়াটে বৃত্তির চূড়ান্ত করিয়া স্ত্রীকে অপমান ও তাহার বাক্স উল্‌টাইয়া হেমচাঁদ তাহার সঞ্চিত টাকাগুলি জবরদস্তি করিয়া লইয়া গেল বটে, কিন্তু সেই নৈপুণ্য-রচিত দৃশ্যের মধ্যেই আবার তাহার মুখে আক্ষেপোক্তি শুনিতে পাই—'ভারি বদ ইয়ার'। অনুচিত বড়মানুষীর প্রশ্রয়ে উগ্রস্বভাবা অপ্রিয়বাদিনী কামিনীর হৃদয় স্নেহ-শূন্য নহে, কিন্তু তাহার স্নেহের স্রোত অহঙ্কারের পাহাড়ে রুদ্ধ হইয়াছিল। যখন অভয়কুমার অপমানে, ক্ষোভে, দুঃখে চলিয়া গেল, তখন সে বুঝিল যে অভয়কুমার নেশাখোর হইলেও জামাই-বারিকের চরিত্রহীন জাম্বুবান নহে। তাহার অহঙ্কার-দীপ্ত মুখখানি এতটুকু হইয়া গেল, চোখের জল বাধা মানিল না; তাই তাহার মুখে পরে শুনিতে পাই—'সে রাত্রি আমার কালরাত্রি, স্বামীহারা হলেম; সে রাত্রি আমার শুভ রাত্রি, স্বামীর মর্ম্ম জানিলাম'। অভয়কুমার সম্বন্ধে পদ্মলোচন ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছে—'লোকটা স্ত্রৈণ', কিন্তু এই গালাগালির মধ্যে এবং দাম্পত্য-কলহের সুনিপুণ দৃশ্যে 'গোঁয়ার হলে মাত্তেম' 'কামিনী তোমার কথায় আমার চক্ষু দিয়ে কখন জল পড়েনি, আজ পড়ল' —এই অল্প কথায় তাহার তেজস্বী, অথচ কোমল প্রেম-প্রবণ, হৃদয়ের যথেষ্ট আভাস পাওয়া যায়। অনেকেরই বৃদ্ধ বয়সে তরুণ হইবার সাধ যায়, কিন্তু এই সাধের যে একটি সীমা আছে তাহা সকলে বুঝে না। সুতরাং কালা-পেড়ে ধুতি ও কলপের সাহায্যে বাহাত্তুরে-গ্রস্ত রাজীবলোচন যে পুনরায় যুবা সাজিয়া, লোকসমক্ষে আপনার বয়স্কা বিধবা কন্যা রামমণিকে নিজের কন্যা বলিয়া পরিচিত করিতে কুণ্ঠিত হইবে, তাহা বিচিত্র নহে। গ্রাম্য দলাদলি, গোঁড়ামী, মোড়লী,

বিধবা কন্যার উপর অত্যাচার প্রভৃতি বিবিধ সৎক্রিয়ায় তাহার উৎসাহ থাকিলেও, তাহার জরাজীর্ণ দুর্ব্বল অবস্থায় কন্যা রামমণিই তাহার একমাত্র সম্বল। নকল বাসর-ঘরের সজোর কাণমলা, চড়-চাপড় বুড়ো হাড়ে কত সহিবে, তাই গ্রাম্য ছোকরাদের উপদ্রব অসহ্য হইয়া উঠিল। দ্বিতীয়-বাল্যাবস্থা-প্রাপ্ত অসহায় বৃদ্ধ, বিপদে পড়িয়া, নিজের তারুণ্যের ভাণ মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিয়া গিয়া, অতি করুণভাবে মাতৃস্থানীয়া রামমণির উদ্দেশ্যে—'উঃ বাবা—লাগে মা—মলেম গিচি—মেরে ফেল্লে—দম আট্‌কালো, হাঁপিয়েচি মা,—ও রামমণি!' বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল,—তখন অতি অল্প কথায় তাহার অবস্থার হাস্যাস্পদ, অথচ করুণ, ভাবটি অতি সুন্দর ও স্বাভাবিক রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

অধিকতর ভাব-ভূয়িষ্ঠ 'কমলে কামিনী' নাটকে এইরূপ কৌতুক-রসের নিরবচ্ছিন্ন ধারা ইহার গম্ভীর বিষয়টিকে হাল্‌কা ও রসালো করিয়াছে। অত্যধিক ভাব-বিহ্বলতা বা গাম্ভীর্য্য যদি কৌতুকপ্রিয়তা দ্বারা লঘুভাব ধারণ না করে, তবে অনেক সময় তাহা নিতান্ত অসহ্য বা হাস্যাস্পদ হইয়া উঠে। বিশ্লেষ-বিধুরা রণকল্যাণীর মনের ব্যথা, এইরূপ সুরবালার ও 'বৌ'এর সেকেলে রসিকতায় বেশ মনোরম হইয়াছে; এবং শিখণ্ডিবাহনের চরিত্রের একটি সর্ব্বদোষ-নিষ্ক্রয়ী গুণ এই যে, তিনি হাস্যপরিহাস-পটু ছিলেন। দীনবন্ধুর বিজয়-কামিনীতে বা লীলাবতী-ললিতে এই গুণ নাই বলিয়া, তাহাদের চরিত্র পুস্তকগত, বৈচিত্রহীন, বদ্ধানুরাগ, ভাবগদ্‌গদ নায়ক-নায়িকার মত হইয়াছে। মাধব বা বক্রেশ্বরের ভাঁড়ামির চরিতার্থতাও অনেকটা এইরূপ; রাজা-রাণীর পুরাকাহিনী বা কল্পনামূলক আখ্যানের করুণ ও গম্ভীর ভাবটুকুকে, তাহাদের হাস্য-কৌতুক, বাস্তব-জগতের পরিসরের মধ্যে রাখিয়া আরও হৃদয়গ্রাহী করিয়াছে।

আমাদের হাস্য-প্রবৃত্তি যেমন ভাবের অসুস্থ আধিক্য. হইতে আমাদের রক্ষা করে, তেমনিই মনের মৃদু সুকুমার ভাবগুলি আমাদের কৌতুক-প্রিয়তাকে নিরথক ভাঁড়ামি বা অট্টহাস্যে পরিণত হইতে দেয় না। হাস্যরস-রসিকের এই মনের লঘুত্ব এবং করুণরস-রসিকের এই মনের স্নিগ্ধতা দীনবন্ধুর ছিল বলিয়া উপরোক্ত চিত্রগুলি আধিক্য বা অত্যুক্তিদোষে দূষিত হইয়া অস্বাভাবিক হয় নাই। অতি অল্প কথায় ও সহজভাবে, হাস্যরসের তরলতায় অথবা করুণ-রসের স্নিগ্ধতায়, প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও আন্তরিক সমবেদনা দ্বারা কোন একটি চরিত্রের সমগ্রভাবে পরিকল্পনা করিয়া, তাহাকে ফুটাইয়া তুলিবার অনন্য-সাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দীনবন্ধুর প্রায় সমস্ত নাটকেই পাওয়া যায়। স্বতঃসিদ্ধ হাস্যরসিকের দুর্লভ শক্তি তাঁহার ছিল, কিন্তু করুণ প্রভৃতি রসে তাঁহার অধিকার নিতান্ত অল্প ছিল না। এমন কি, তাঁহার নিছক হাস্যরসাত্মক নাটক ও প্রহসনের মধ্যেও, এই করুণরস, প্রচ্ছন্ন বা ব্যাপকভাবে বর্ত্তমান থাকিয়া, হাস্যরসের অন্তরায় হয় নাই, বরং তাহাকে আরও মনোরম ও মর্ম্মস্পর্শী করিয়াছে। নীলদর্পণে করুণরস তাঁহার প্রত্যক্ষ প্রতিপাদ্য বিষয় হইলেও, কেবল ইহার দ্বারা তাঁহার করুণরসোদ্রেক শক্তির পরিমাণ করা চলিবে না ; তাঁহার এই ক্ষমতার প্রচুর নিদর্শন তাঁহার অন্যান্য নাটকেও পাওয়া যাইবে।

তথাপি, যাহা করুণ, মধুর, কোমল ও প্রশান্ত, তাহার নিছক অভিব্যক্তি হইয়াছে তাঁহার নীলদর্পণ নাটকে। বাঙ্গালার দীনদুঃখী কৃষকের যে নির্ম্মম উৎপীড়নের দৃশ্য দরিদ্রের বন্ধু দীনবন্ধুর হৃদয় আলোড়িত করিয়াছিল, তাহার সাময়িক উত্তেজনা আজ নাই, এবং তাহার দ্বারা এই নাটকের সাহিত্যিক মূল্য নির্দ্ধারিত হইবে না। কিন্তু যাঁহারা বলেন যে নীলদর্পণের এত সুখ্যাতির কারণ ইহার

সাহিত্যিক সৌন্দর্য্য নহে, পরন্তু কেবল সাময়িক রাজনৈতিক বা সামাজিক উত্তেজনাই ইহার কারণ, তাঁহারা ভুলিয়া যান যে নীলদর্পণ শুধু নীলকরদিগের সাময়িক উৎপীড়নের কাহিনী নহে; ইহাতে বাঙ্গালার দীনদুঃখীর প্রাত্যহিক পল্লী-জীবনের যে নিখুঁত ও করুণ চিত্র অপূর্ব্ব সমবেদনা ও বাস্তব-অনুভূতির জাগ্রত চেতনায় অঙ্কিত হইয়াছে, তাহার একটি চিরন্তন মূল্যও আছে। ইহা সত্য যে সাময়িক উত্তেজনা ও উদ্দেশ্য দীনবন্ধুর উন্মেষোন্মুখ প্রতিভাকে প্রেরিত করিয়াছিল, কিন্তু ইহা ছিল তাঁহার প্রতিভার উপকরণ ও উপলক্ষ্য মাত্র। একদিকে বল-দৃপ্ত পরস্বলোলুপ পাষণ্ডের পাশবিক অত্যাচার, অন্যদিকে ভাগ্যচক্রে নিরীহ অসহায় দরিদ্রের নির্ম্মম নিপেষণ,—সাময়িক উদ্দেশ্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও, যুগে যুগে দরিদ্র মানবের এই মর্ম্মন্তুদ বেদনার জীবন্ত আলেখ্য, বাঙ্গালার বিশিষ্ট পল্লী-জীবনের ক্ষুদ্রায়তনের মধ্যেও যে সুস্পষ্ট হইয়া নির্ব্বিশেষ রস-পদবীতে আরোহণ করিতে পারে, তাহা দীনবন্ধু তাঁহার সাময়িক করুণ উপাখ্যানে দেখাইয়াছেন।

এ কথা বোধ হয় সাহিত্য-রসিক পাঠককে বলিতে হইবে না যে, কোনও একটি বিশিষ্ট উদ্দেশ্য থাকিলেই রচনার সাহিত্যিক গৌরব ক্ষুণ্ণ হয় না। নীলদর্পণ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র, স্বদেশবৎসল দীনবন্ধুর পরদুঃখকাতরতা ও তাঁহার নিকট 'বঙ্গীয় প্রজাগণের অপরিশোধনীয় ঋণ'এর কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি আরও বলিয়াছেন— 'বাঙ্গালা ভাষায় এমন অনেকগুলি নাটক, নভেল বা অন্যবিধ কাব্য প্রণীত হইয়াছে, যাহার উদ্দেশ্য সামাজিক অনিষ্টের সংশোধন। প্রায়ই সেগুলি কাব্যাংশে নিকৃষ্ট; তাহার কারণ, কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য সৃষ্টি। তাহা ছাড়িয়া সমাজ সংস্করণকে মুখ্য উদ্দেশ্য ধরিলে কাজেই কবিত্ব নিস্ফল হয়।' নীলদর্পণকে তিনি কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট বলিয়া

স্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু উল্লিখিত অভিমতের দ্বারা ইহার বিশিষ্ট উদ্দেশ্যবশতার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াছেন। কিন্তু এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, রচনার উৎকর্ষ লেখকের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে, উদ্দেশ্যের উপর নহে। নৈপুণ্যের অভাব বা উদ্দেশ্যের খাতিরে নৈপুণ্যের বিসর্জ্জন—ইহা হইতেই রচনার সৌন্দর্য্য-হানি সম্ভব হয়। কিন্তু প্রকৃত নাট্যকারের বাস্তব-তন্ময়তা ও আত্ম-নির্লিপ্ততা, দীনবন্ধুকে উদ্দেশ্য-বিহ্বলতার দোষ হইতে রক্ষা করিয়াছে। আজকাল, কাব্যের চরিত্রগুলি উদ্দেশ্য সৃষ্টি না করিয়া, উদ্দেশ্যই চরিত্রসৃষ্টি করে, সেইজন্য এই সকল রচনা কাব্যাংশে নিকৃষ্ট এবং ইহাদের চরিত্রগুলিও অস্বাভাবিক। দীনবন্ধু রক্তমাংসের জীব সৃষ্টি করিয়াছেন, শুধু কতকগুলি দোষ বা গুণের প্রতীক সৃষ্টি করেন নাই। এমন কি অটল বা নদেরচাঁদের মত সর্ব্বসদ্‌গুণবর্জ্জিত বয়াটে মাতাল বা গুলিখোর আঁকিতে গিয়া, তিনি অস্বাভাবিক শয়তানের চিত্র আঁকেন নাই,—মানুষ আঁকিয়াছেন। তাঁহার মত হাস্যরসিকের এটুকু রস-জ্ঞান নিশ্চয়ই ছিল; এবং বিশিষ্ট উদ্দেশ্য-স্বীকার কখনও তাঁহার অতি-জাগ্রত বাস্তব-চেতনার অন্তরায় হয় নাই।

এই বাস্তব-চেতনা বা প্রত্যক্ষ বিষয়ের সহিত নিবিড় অনুভূতি দীনবন্ধুর যেখানে আছে,—হাস্যরসেই হউক, করুণরসেই হউক,—সেইখানেই তাঁহার চিত্র নিখুঁত ও জীবন্ত হইয়াছে। সেইজন্য নীলদর্পণের তোরাপ, ক্ষেত্রমণি, পদী, আদুরী, কৃষক, আমীন, রাইচরণ, সাধুচরণ, গোপীনাথ প্রভৃতি নিত্যদৃষ্ট পল্লী-চরিত্রের করুণভাবের সহিত তদ্ভাবিত হইয়া তিনি তাহাদিগকে স্বভাব-সঙ্গত ও পূর্ণাঙ্গ করিয়া আঁকিতে পারিয়াছেন। এই সকল চরিত্রে ভাষাগত বা ভাবগত ত্রুটি-দোষ নাই বলিলেই চলে, এবং বাঙ্গালার পল্লীজীবনের এরূপ

করুণ, কোমল ও সজীব চিত্র, শুধু তখনকার বাঙ্গালা সাহিত্যে নহে এখনও, যে অপূর্ব্ব শক্তির পরিচয় আনিয়াছে তাহা একান্ত দুর্লভ ও অতুলনীয়। বন্ধুর নাটক সমালোচনায় পাছে পক্ষপাত দোষ ঘটে, বোধ হয় এই অকারণ সতর্কতাই বঙ্কিমচন্দ্রকে দীনবন্ধুর করুণরস সম্বন্ধে সন্দিহান করিয়াছিল। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শুধু নীল-দর্পণে নহে, তাঁহার অন্যান্য নাটকের বহুস্থলেও দীনবন্ধুর করুণরসোদ্রেক ক্ষমতার অভ্রান্ত নিদর্শন পাওয়া যায়।

কিন্তু নীলদর্পণের করুণরসের একটি বৈশিষ্ট্য, romantic সাহিত্যে অভ্যস্ত, আত্মভাব-বিলাসী, আধুনিক সূক্ষ্মরসাস্বাদী পাঠকের হৃদয়গ্রাহী হইবে না। শুধু ইহার অনাড়ম্বর প্রাত্যহিক পল্লী-জীবনের কথা বলিতেছি না, ইহার অন্তর্গত tragic পরিকল্পনার কথা বলিতেছি। ইহার কর্ম্মক্ষেত্রের সঙ্কীর্ণ আয়তন, বা আখ্যানবস্তুর সারল্য ও ক্ষুদ্রতাতে বিশেষ যায় আসে না, কিন্তু মানব-হৃদয়ের যে সকল করুণ-কোমল ভাব ইহাতে অঙ্কিত করা হইয়াছে, তাহার মূল উদ্দীপনা ভিতরে নহে, বাহিরে,—অন্তর্জ্জগতের বৈচিত্র্য বা ঘাতপ্রতিঘাতে নহে, বিশাল ও অনিবার্য্য নিয়তির সহিত মানবের ক্ষুদ্র শক্তির নিষ্ঠুর সংঘর্ষে। অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে, সে-যুগের সামাজিক জীবনে বোধ হয় এত অন্তর্মুখী ভাব ও বৈচিত্র্য আসে নাই, অথবা দীনবন্ধুর প্রতিভার বহির্মুখী বাস্তব-তন্ময়তা তাঁহাকে মানব-জীবনের সূক্ষ্ম সমস্যা বা মানব-হৃদয়ের সূক্ষ্ম ভাবনিচয়ের বিশ্লেষণে আকৃষ্ট করে নাই। কিন্তু কারণ যাহাই হউক না কেন, আধুনিক romantic নাটকের বাহ্যপদ্ধতি অনুসারে রচিত হইলেও, নীলদর্পণের কেন্দ্রগত মূলভাবটি classical নাটকের অনুযায়ী। বাহিরের বৃহত্তর জীবন ও বৃহত্তর জগৎ—নিয়তির বিশালতা ও মানবের ক্ষুদ্রতা—classical নাটকের

এই ভাবটি তাঁহার আত্মভাব-নিরপেক্ষ, বাস্তব-সচেতন, বিস্তীর্ণ অনুভূতি ও কল্পনার অনুকূল উপযোগী ছিল।

কিন্তু দীনবন্ধুর করুণরসের পূর্ণবিকাশের কতকগুলি অন্তরায় ছিল; সেইজন্য নাটক হিসাবে তাঁহার নীলদর্পণ ও অন্যান্য গাম্ভীর্য্যমূলক রচনা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই। যে সকল চরিত্রসম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা বা সহানুভূতি সীমাবদ্ধ ছিল, অথবা নূতন romantic সাহিত্যের প্ররোচনায় যেখানে তিনি প্রত্যক্ষ অনুভূতির পথ ছাড়িয়া দিয়া পুস্তকগত আদর্শের মামুলী পদ্ধতি আশ্রয় করিয়াছেন, সেই খানেই শিল্পী-সমুচিত আত্ম-সংযমের অভাব তাঁহার নাটকের স্বভাবসিদ্ধ সৌন্দর্য্যের হানি করিয়াছে। আত্মসংযম অর্থে এই বুঝি যে, নাটকের মূল তাৎপর্য্য ও গতির উপর দৃষ্টি রাখিয়া যথাযোগ্য পরিমাণে ভাব ও ভাষার আয়োজন। বাস্তব-শিল্পী দীনবন্ধু যে স্থলে কাল্পনিক বা কাব্য-সম্মত কৃত্রিম আদর্শের বশীভূত হইয়া, অননুভূত বিষয় বা চরিত্র আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সেই স্থলে, অবাস্তবের কল্পনায়, তাঁহার আত্মসংযমের অভাব, ভাষাগত ও ভাব-গত অতিদোষে পরিণত হইয়াছে। সেইজন্য এই সকল স্থলে চিত্রগুলি স্বভাব-বিরুদ্ধ, কল্পিত-গুণ-বিশিষ্ট ও কৃত্রিম হইয়া উঠিয়াছে।

দীনবন্ধুর ভাষা-গত অতি-দোষের একটি কারণ এই যে, তখনও ভাষা-সমস্যার সম্পূর্ণ নিষ্পত্তি হয় নাই। তাঁহার হাস্যরসাত্মক নাটকে স্পষ্ট-অনুভূত চরিত্রগুলির মুখে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও নিখুঁত ভাষা তিনি বসাইতে পারিতেন, তাহার কারণ এই চরিত্রগুলি তিনি এত প্রত্যক্ষ ও সমগ্রভাবে আত্মসাৎ করিয়াছিলেন যে, ইহাদের প্রকৃত ভাষাও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু উচ্চশ্রেণীর বা কাব্য-সম্মত চরিত্রগুলি সম্বন্ধে তাঁহার এরূপ প্রত্যক্ষ অনুভূতি ছিল না, এবং সেইজন্য এ-ক্ষেত্রে সে সময়কার কাব্য-সম্মত 'সাধুভাষার' প্রয়োগ করিয়াছেন। হয় ত

অর্থগৌরব বর্দ্ধনের জন্য দীনবন্ধু স্বেচ্ছায় অনেক স্থলে দীর্ঘায়ত সমাস-বহুল বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু সমসাময়িক নাটকে বা যাত্রার প্রথায় এরূপ লম্বা লম্বা বক্তৃতা, স্বগতোক্তি, পয়ারের বাহুল্য অথবা সাধু-ভাষার নামে নিতান্ত অসাধু ভাষা প্রচলিত ছিল। সীতা, দময়ন্তী বা শকুন্তলার মুখে আর্য্যপুত্র, প্রাণ-বল্লভ, হৃদয়-নাথ ইত্যাদি সম্বোধন শোভা পাইতে পারে, কিন্তু গোলক বসুর পুত্রবধূর মুখে, কারামুক্তি, অর্থাভাব, মোকদ্দমা প্রভৃতি দারুণ দুরবস্থার বর্ণনায়, প্রাণনাথ, জীবনকান্ত, অকিঞ্চিৎকর, আভরণ ইত্যাদি শব্দ নিতান্ত অস্বাভাবিক। অথবা, সাবিত্রীর ক্রোড়ে নবীনমাধবের মৃতবৎ শরীর দেখিয়া তাঁহার স্ত্রীর বিলাপ—'আহা! হা! বৎসহারা হাম্বারবে ভ্রমণকারিণী গাভী সর্পাঘাতে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়া প্রান্তরে পতিত হইয়া থাকে, জীবনাধার পুত্রশোকে জননী সেইরূপ ধরাশায়িনী হইয়া আছেন'—ইত্যাদি অবস্থা ও পাত্রের অনুপযুক্ত হইয়া করুণরসের প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এরূপ ভাষা যে হাস্যজনক হইতে পারে এটুকু জ্ঞান যে হাস্য-রসিক দীনবন্ধুর ছিল না, তাহা বলা যায় না; কিন্তু মনে হয়, সাধুভাষা সম্বন্ধে দীনবন্ধু প্রচলিত প্রথা ও কালের প্রভাব সম্পূর্ণ অতিক্রম করিতে পারেন নাই। দীনবন্ধুর দীক্ষাগুরু ঈশ্বর গুপ্তের গদ্য প্রবন্ধে ইহা অপেক্ষা শতগুণ অলঙ্কার-কণ্টকিত সংস্কৃত-বহুল ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং সে সময়ে ইহাও ভাষার উৎকৃষ্ট আদর্শরূপে গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু যখন সমসাময়িক বঙ্কিমচন্দ্র টেকচাঁদী ভাষাকে মার্জ্জিত করিয়া, স্বীয় ভাষার আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালা গদ্যের গতি ফিরাইয়া দিলেন, তখন দীনবন্ধুর সম্মুখে অন্য আদর্শ ছিল না, এ কথাও বলা চলে না। ইহা ভিন্ন, ভাষার জন্য নাট্যকারের বেশী দূর যাইবার প্রয়োজন নাই—জীবনের অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট। তাঁহার হাস্যাত্মক

নাটকে এবং তোরাপ আদুরী রাইচরণ ইত্যাদি গ্রাম্য চরিত্র চিত্রাঙ্কনে দীনবন্ধু অভিজ্ঞতার এই প্রকৃষ্ট পথ অবলম্বন করিয়া সহজ, স্বাভাবিক ও খাঁটি বাঙ্গালার অপূর্ব্ব প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু যেখানে সৃষ্ট চরিত্র-গুলির সহিত তাঁহার শুধু কল্পনার যোগ ছিল, প্রাণের যোগ ছিল না, সেখানে ভাষা স্বভাবতঃই এরূপ কৃত্রিম ও কষ্টকল্পিত হইয়াছে।

ঠিক এই কারণেই নীলদর্পণে ও অন্যান্য গাম্ভীর্য্যমূলক নাটকে, দীনবন্ধুর করুণ-রস-রঞ্জিত চিত্রগুলি ভাবগত অতি-দোষে দুষ্ট হইয়া অস্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হৃদয়ের গভীর আবেগ বা দুঃখ কখনও বিনাইয়া বিনাইয়া কথা বলে না, অথবা লম্বা লম্বা বক্তৃতা ও কবিতার ধার ধারে না। সেইজন্য ক্ষেত্রমণির মৃত্যু, সাবিত্রী বা গান্ধারীর উন্মাদ ইত্যাদি দৃশ্যে বৃহৎ আড়ম্বর বা বহুবাক্যব্যয় দেখা যায় না, এবং এই ভাব-গত অত্যুক্তিদোষের চিহ্নমাত্র নাই। কমলে কামিনী কল্পনা-ভূয়িষ্ঠ নাটক হইলেও, তাহাতে এই দোষ বেশী নাই, তাহার কারণ, এই নাটকের গাম্ভীর্য্যটুকু হাস্য-কৌতুকের তরল ধারায় লঘু ও স্নিগ্ধ করিয়া লওয়া হইয়াছে। কিন্তু সৈরিন্ধ্রীর বিলাপ, নবীনমাধবের শোকোচ্ছ্বাস, বিজয়-কামিনীর ভাব-গদ্‌গদ প্রেমালাপ, অথবা ললিত-লীলাবতীর মুখে দীর্ঘ পয়ার ও মাইকেলী ছন্দ,—এই হিসাবে নীরস ও ক্লান্তিজনক হইয়াছে। এ সকল স্থলে দীনবন্ধু জীবনের প্রত্যক্ষ আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া কাব্যের কৃত্রিম আদর্শের আশ্রয় লইয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—"লীলাবতী বা কামিনী শ্রেণীর সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল না,—কেন না লীলাবতী বা কামিনী বঙ্গ-সমাজে ছিল না। হিন্দুর ঘরে ধেড়ে মেয়ে কোর্টসিপের পাত্রী হইয়া, যিনি কোর্ট করিতেছেন, তাঁহাকে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া বসিয়া আছে, এমন মেয়ে বাঙ্গালা সমাজে ছিল না,—কেবল আজ কাল নাকি দুএকটা হইতেছে

শুনিতেছি।” দীনবন্ধুর সামাজিক অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য, কিন্তু কামিনী বা লীলাবতীর শান্ত স্বভাব, লজ্জাবিজড়িত আবরণ প্রভৃতি সত্ত্বেও প্রগল্‌ভনায়িকাজনোচিত “ধেড়ে মেয়ে” ইত্যাদি আখ্যা খুব সমীচীন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এগুলি ঠিক হাল্‌-ফ্যাসানের বিলাতীধরণের কোর্টসিপ্‌ অথবা সংস্কৃত নাটকের পূর্ব্বরাগের নূতন সংস্করণ, তাহা বলা কঠিন। ঈশ্বর গুপ্তের বিদ্রূপ প্রভৃতি হইতে বুঝা যায়, সে-সময় স্ত্রীশিক্ষা ও একটু বেশী বয়সে মেয়ের বিবাহ দিবার চেষ্টা সমাজে যে ছিল না তাহা নহে। ললিত-লীলাবতীর প্রণয়-চিত্রের স্বাভাবিকতা সমর্থন করিয়া শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহা অনুধাবনযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন,—“লীলাবতীকে হিন্দুর ঘরের ঠিক হিন্দুর মেয়ের মতই দেখিতে পাই। তবে সে লেখাপড়া শিখিয়াছে, এবং শৈশব অতীত হইবার পূর্ব্বে বিবাহিতা হয় নাই। ঠিক এই অবস্থায় হিন্দুর ঘরে ও কৌলীন্য প্রথার মাঝখানে, প্রাকৃতিক ভাবে যাহা ঘটিতে পারে, দীনবন্ধুর গ্রন্থে তাহাই বর্ণিত দেখি। দীনবন্ধু ঐ প্রথাকে অবজ্ঞার জিনিস মনে করেন নাই বলিয়া “ধেড়ে মেয়ে” গোছের কথাগুলি, গুলির আড্ডার লোকের মুখেই দিয়াছেন। বিরোধ-বাদে দীনবন্ধু শিষ্টাচারের পরিহার করিতেন না; ভদ্রলোকের মেয়ের কথা সসম্মানেই উল্লেখ করিতেন। ললিতমোহন ও লীলাবতীতে বিলাতী ধরণের কোর্টসিপ্‌ চলিত এ কথা বঙ্কিম বাবু কোথায় পাইলেন? তিনি দীনবন্ধুর গ্রন্থ যথেষ্ট পড়িয়াছিলেন, কিন্তু সমালোচনা লিখিবার সময় হয়ত স্মৃতির উপরই নির্ভর করিয়াছিলেন। হিন্দু গৃহের কুমারী কন্যার সহিত স্বাভাবিক-ভাবে যাহাদের দেখাশুনা হয়, তাহাদের সঙ্গেই হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় বয়ঃপ্রাপ্তা শিক্ষিতা কুমারী, পরিবারের কোন বন্ধু যুবকের প্রতি যদি আকৃষ্ট হয়,

তবে তাহাতেও কিছু অস্বাভাবিকতা নাই। বিবাহের উদ্যোগে যে কোর্টসিপ্ হয় নাই, তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝান হইয়াছে; ললিতমোহন ও লীলাবতী বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জানিতেন না যে, তাহাদের এক জনের অনুরাগের কথা অপরে জানিতেন। আর যে দোষ থাকে থাকুক, বর্ণনার অস্বাভাবিকতা দীনবন্ধুর রচনায় কুত্রাপি নাই।" বর্ণনার অস্বাভাবিকতা না থাকিতে পারে; কিন্তু এ কথাটা স্বীকার করিতেই হইবে যে যে-সকল কাব্যগত ভাব ও ভাষা তাহাদের মুখে পদ্যে ও গদ্যে, বসান হইয়াছে, তাহা সহজ, স্বাভাবিক ও নাট্যোপযোগী হয় নাই। সাধারণ গার্হস্থ্য-জীবনের সুখদুঃখের স্নিগ্ধ চিত্রের সঙ্গে এরূপ বৈচিত্র্য-বর্জ্জিত ও কৃত্রিম নায়ক-নায়িকার আদর্শ, এবং সংস্কৃত-বহুল গদ্যে পয়ারে ও মাইকেলী ছন্দে কথোপকথন যে সম্পূর্ণ খাপ খাইয়াছে তাহা বলা যায় না। আসল কথা হইতেছে, দীনবন্ধুর যে এই সকল বিষয়ে অভিজ্ঞতা ছিল না, শুধু তাহা নহে, নূতন romantic সাহিত্যের প্রভাবে melodrama বা romance-এর দিকে একটি কৃত্রিম ঝোঁক, অন্যান্য লেখকদের মত, তাঁহারও বরাবরই ছিল। শুধু বিজয়-কামিনী, ললিত-লীলাবতী, রণকল্যাণী ইত্যাদি নহে, নবীনমাধবের উচ্ছ্বাস বা সৈরিন্ধ্রীর বিলাপ প্রভৃতিও এই নূতন ঝোঁকের অপরিপক্ক ফল। Sentiment ছাড়িয়া sentimentality-কে দীনবন্ধু প্রাধান্য দিতেন না; কিন্তু এই romance বা melodrama, তাঁহার মত হাস্য-রসিক ও বাস্তব-শিল্পীর প্রতিভার অনুপযোগী ছিল বলিয়াই বোধ হয় ইহাদের প্রতি তাঁহার একটু প্রচ্ছন্ন আন্তরিক দুর্ব্বলতা ছিল।

আজ কাল দুএকটা শুনা যাইতেছে বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র যে নূতন ভাবের উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি স্বয়ং তাঁহার রচনায় সে নূতন ভাব হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারেন নাই। যদিও প্রেমের পূর্ব্বরাগ বা

কোর্টসিপ্ অঙ্কিত করিবার জন্য তিনি রাজপুত পরিবার বা লক্ষ্মণসেনের যুগ অবলম্বন করিয়াছেন, তথাপি এই নূতন বিলাতী ছাঁচ তাঁহাকেও মাজিয়া ঘষিয়া প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল। মালতী মল্লিকার মত বিমলা আয়েষা কিছু খাঁটি স্বদেশী ছাঁচে গঠিত নহে। বিজয়-কামিনীর প্রথম দর্শনে অনুরাগসঞ্চার যদি বিলাতী হয়, তবে শিবমন্দিরে জগৎসিংহ-তিলোত্তমার পূর্ব্বরাগও সেই আদর্শে কল্পিত। নূতন আদর্শ গ্রহণ সে-যুগে অবশ্যম্ভাবী ছিল, কিন্তু সেই আদর্শ যে দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা, কিছু কম স্থান, কাল ও স্বভাবোপযোগী করিয়াছেন, তাহা ভাবিবার কোন কারণ নাই। নূতন ভাব ফুটাইবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে আধুনিক সমাজের অবস্থার বিরোধী বলিয়া ইতিহাসের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, দীনবন্ধুর সেখানে পুরাকাহিনী বা উপাখ্যানের আশ্রয়গ্রহণ অসমীচীন নহে। দোষ এখানে হয় নাই, দোষ হইয়াছে প্রয়োগ-নৈপুণ্যে। Romance বা melodramaর দিকে বঙ্কিমচন্দ্রের কিছু কম ঝোঁক ছিল না, কিন্তু তাঁহার অপূর্ব্ব কল্পনা ও কবিত্বশক্তি তাঁহাকে সর্ব্বত্র রক্ষা করিয়াছে। দীনবন্ধুর এই দুর্লভ শক্তি ছিল না বলিয়াই যেখানে তিনি বাস্তব-আদর্শ ছাড়িয়া দিয়া কাল্পনিক বা পুস্তকগত আদর্শের আশ্রয় লইয়াছেন, সেইখানেই তাঁহার চিত্রাঙ্কন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বা মনোরম হয় নাই। নূতন শিক্ষার ফলে শুধু রোমিও-জুলিয়েত প্রভৃতির আদর্শ নহে, প্রাচীন সাহিত্যের শকুন্তলা-দুষ্যন্ত, মহাশ্বেতা-পুণ্ডরীক প্রভৃতি নায়ক-নায়িকার ভাব-বহুল আদর্শও বাঙ্গালীর ভাব-প্রবণ প্রকৃতির অনুকূল হইয়াছিল। দীনবন্ধুর চরিত্রগুলি যে ঠিক অস্বাভাবিক বা অনুপযোগী হইয়াছে তাহা নহে; তবে ইহাদের মুখে যে কাব্যসম্মত ভাব ও ভাষার প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহা স্বাভাবিক বা উপযোগী হয় নাই। এই কৃত্রিম ভাব ও ভাষার আধিক্য-

গুলি যদি তাঁহার রচনা হইতে বাদ দেওয়া যায়, তবে আপত্তির কিছুই থাকে না। মনুষ্য-চরিত্রে যাহা কিছু কোমল, মধুর, করুণ ও অকৃত্রিম ভাব, বাস্তব-জীবন ও বাস্তব-জগতের চিত্রকর হিসাবে তাহার উপর তাঁহার দখল যে ছিল না, তাহা নহে ; হাস্যরসিকের আত্ম-নিরপেক্ষ বাস্তব-চেতনা ও স্নিগ্ধ-গভীর সমবেদনাও তাঁহার যথেষ্ট ছিল। কিন্তু বাঙ্গালীর প্রকৃতিগত অত্যধিক ভাব-প্রবণতা, নবীন ও প্রাচীন romantic সাহিত্যের কৃত্রিম উত্তাপে, সংযম ও সমতার সীমা অতিক্রম করিয়া, অনেক সময় অপ্রাসঙ্গিক ভাব ও বাক্যের আড়ম্বরে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ নিপুণ চিত্রাঙ্কনের ব্যাঘাত জন্মাইয়াছে। শুধু কবিতা রচনাতে নহে, কল্পনামূলক চরিত্রচিত্র আঁকিতে যে কবিত্ব-শক্তির প্রয়োজন দীনবন্ধুর তাহা ছিল না। বিজয়-কামিনী বা ললিত লীলাবতীর ভাব-ভঙ্গিস্থ অবস্থাগুলি যদি রোমিও-জুলিয়েত বা দুষ্মন্ত-শকুন্তলার মত কবিত্বপূর্ণ হইত, তবে তাহা তত নিরর্থক বা নীরস হইত না। করুণ প্রভৃতি রসে দীনবন্ধুর যে অধিকার ছিল না, তাহা নহে ; ইহা তাঁহার প্রতিভা বা প্রকৃতির বিরোধীও ছিল না। কিন্তু অভিজ্ঞতার বহির্ভূত চরিত্রের অঙ্কনে তিনি যে romantic কল্পনা ও ভাব-প্রবণতার আশ্রয় লইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল না ; বঙ্কিমচন্দ্রের মত তাঁহার উন্মেষিণী কবিত্ব-শক্তি থাকিলে এই কল্পনা-প্রবণতাকে তিনি শোধরাইয়া লইতে পারিতেন ; কিন্তু romance-এর দিকে পূর্ণমাত্রায় ঝোঁক থাকিলেও, romance-এ তাঁহার শক্তি সীমাবদ্ধ ছিল।

সুতরাং দীনবন্ধুর করুণ রসের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। এই সকল কাল্পনিক ও কৃত্রিম চিত্রগুলি ছাড়িয়া দিলে, তাঁহার নাটকের সর্বত্র করুণ রসের স্নিগ্ধ-মধুর বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়।

তাঁহার সকল হাসিখুসি, রঙ্গ-তামাসার অন্তরালে যে কারুণ্যধারা-উচ্ছলিত স্নিগ্ধ-কোমল অন্তরের প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়, তাহা তাঁহার সমস্ত রচনাকে স্নিগ্ধ ও মর্ম্মস্পর্শী করিয়াছে। এই জন্য হাস্যরসিক হিসাবেও তিনি অসামান্য সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। শুধু হাসির সহিত করুণার্থ গ্রথিত করিয়া দেওয়া নহে, নিত্যদৃষ্ট পরিচিত বাঙ্গালীর বাস্তব-জীবনের মধ্যে যাহা কিছু করুণ, কোমল ও অকৃত্রিম ভাব রহিয়াছে, তাহাকে অতি অল্প কথায়, সরস ও সহজ ভাবে, প্রকাশ করিবার নৈপুণ্যও তাঁহার ছিল। নীলদর্পণে বাঙ্গালার পল্লীজীবনের যে করুণ-রস-রঞ্জিত নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা বাঙ্গলা সাহিত্যে চিরদিন অতুলনীয় হইয়া থাকিবে। নবীন তপস্বিনীর পুরাকাহিনী, লীলাবতীর গার্হস্থ্য জীবনের সুখদুঃখময় চিত্র, অথবা কমলে কামিনীর কাল্পনিক উপাখ্যান, গল্পের মাধুর্য্য হিসাবে, একেবারে ব্যর্থ বা উপেক্ষণীয় হয় নাই। করুণরসে দীনবন্ধুর প্রতিভা ছিল না, একথা ঠিক নহে, কিন্তু এ প্রতিভার সম্পূর্ণ ও স্বাভাবিক বিকাশ হয় নাই। তিনি যে-যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের সাধনার যুগ,—ইহার তপস্যার কাল। সে-যুগের অনেক অপরিণতি তাঁহার রচনায় পাওয়া যাইবে, এবং তাঁহার কোনও নাটক যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে একথা বলা যায় না। কিন্তু শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের বাস্তব-তন্ময়তা, তাঁহার রচনাগুলিকে যতটুকু সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছে তাহাও বাঙ্গালা সাহিত্যে দুর্লভ। সিদ্ধি পূর্ণাঙ্গ না হইলেও, তাঁহার সাধনার যে পরিচয় তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালা সাহিত্যে আজও পর্য্যন্ত তাহার তুলনা পাওয়া গেল না।

সংবাদ-সাহিত্য

এক তরুণ 'বৃহস্পতি' 'শনিবারের চিঠি'কে নরুণের খোঁচা দিয়াছে। গাঁয়ের পথে চলিবার সময়ে এক জাতের গৃহপালিত জীব যেভাবে অপরিচিত মানুষ দেখিলা তাড়া করিয়া আসে, তাহাতে এক প্রকার রসিকতা করিবার প্রথা আছে, এক্ষেত্রে আমাদের তাহাই মনে পড়িতেছে—সে সময়ে উক্ত জীবটিকে বলিতে হয়, 'যা, যা, কাপড় পরিয়া আয়'। আমরা অবশ্য ঐ রসিকতাটিই এখানে উদ্ধৃত করিতেছি, অন্য উপমাটি আমাদের অভিপ্রেত নয়। ষাট্, ষাট্! সাহিত্যিক হইয়াছে বলিয়াই কি এমন সোনার চাঁদ খোকনদের এত বড় গালটা দিতে পারি!

* * *

'বৃহস্পতি'টি 'বাতায়নে' বসিয়া থাকেন, রাস্তার লোক তাঁহাকে 'শনি'র কথা জিজ্ঞাসা করে, রসের হদিস্ বাৎলাইতে বলে। ওই 'বাতায়নে' বসিয়াই তরুণ খোকন, 'ডাকঘরে'র সেই পেঁচোয়-পাওয়া ছেলেটির মত, কত রকমের দেয়ালা করে—সেই নাকীসুরের বক্তৃতা শুনিয়া মায়ের প্রাণও উড়িয়া যায়, আমরা ত' কোন ছার! মা বলেন, 'বাছারে, তোর এমন দশা কে করিল?' খোকন বলে, 'দেখনি? সেই যে আমার বাউল-দাদা!—গায়ে ঢিলা কিমোনো, মাথায় উঁচু কালো টুপি, আর নাকের নীচে থেকে বুক পর্য্যন্ত শাদা গোঁপ আর দাড়িতে একাকার! সে যে ডুগডুগি বাজায় আর নাচে, তাই দেখে আমার রস হয়েছে। এবার যদি মাষ্টার আমাকে পড়াতে আসে

তা'হলে আমি কেরোসিন তেল খেয়ে মরব'।—শুনিয়া মার চক্ষু কপালে ওঠে।

*　　　*　　　*

তরুণরা সব চেয়ে ভয় করে মাষ্টারকে। যদি কাহাকেও গাল দিতে হয়, বলে—'তুই মাষ্টার'। এ তরুণটিও আমাদের লেখাকে 'মাষ্টারী সমালোচনা' বলিয়া গালি দিয়াছে। আবার বলে, 'রবীন্দ্র-সাহিত্য-আলোচনা করতে হ'লে ভাষাজ্ঞানের চেয়ে রসজ্ঞানের প্রয়োজন বেশী'। রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভাষা নাই, আছে রস; জল নাই আছে ফেনা! ভ্যালা মোর——! আমাদের লেখায় না কি 'ঝাঝ থাকতে পারে, কিন্তু রসবোধ নেই'। কিন্তু, জিজ্ঞাসা করি, ঝাঁঝই যদি পাইলে, তবে রস পাইলে না কেন? একটু খাইয়াই দেখ; অভ্যাস হইয়া গেলে তখন এই 'রস' ছাড়া আর কোনো রসই রুচিবে না। মানে বুঝিতে পারো নাই? কেন, তোমার অমন বাউল-দাদা থাকিতে ভাবনা কি? তাঁহাকে একবার দেখাইতে হয়!

তবু যদি 'for the moment স্বীকার করেই নিই' যে, আমাদের রসজ্ঞান নেই, তবু খোকনের এই আবদারের মধ্যে একটু 'personal note' রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এ তরুণটিকে যেন চিনি-চিনি। আমাদের সেই নীলমণি নয় ত? বাছা সব জিনিষই নীল দেখে, এবারেও বাছার চোখে আমাদের লেখার 'প্রতি পংক্তি ঈর্ষায় কাতর ও নীল হয়ে উঠেছে।' এ একরকমের নীল ন্যাবা! 'বাতায়নে'র হাওয়া ভালো নয়।

বিচিত্রা-সম্পাদক এতদিন পরে বাঙ্গালী পাঠককে একটা বড় খবর দিয়াছেন—'শনিবারের চিঠি'র নাকি রসবোধ নাই, তার সাহিত্য-সমালোচনা মানুষে আবার পড়ে!—বটেই ত' পড়ে, আবার হাত-পা কামড়াইয়া অস্থিরও হয়! দেশের লোকগুলার হইল কি!

* * *

তার চেয়ে ভালো করিয়া 'বিচিত্রা' পড়ে না কেন? এক ঠোঙাতেই চানাচুর, ঘুগ্‌নীদানা, সাড়ে বত্রিশভাজা—সবই আছে; রবীন্দ্রনাথের নাত-বৌ থেকে অতি-আধুনিক 'রাত-বৌ' পর্য্যন্ত! কানে কানে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়—'কি দাদা? বলি, চলছে কেমন? আধুনিকদের নিয়েই ত' কারবার—তোমারও, আমাদেরও। তুমি খাও তাদের মাথা, আমরা মারি ল্যাজা। এর ভিতর আবার রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে টলাটলি কেন? রবীন্দ্রনাথকে আমরা ত' বুঝি না। তুমি কি বোঝ বল ত? যা'ও বুঝতাম, তোমার ফিকিরে তাও আর বুঝিনে; এর পর আমাদের উপর রাগ করাটা কি ধর্ম্মে সইবে?'

* * *

তবু আমরাও স্বীকার করি, বিচিত্রা-সম্পাদকের রাগ-দুঃখ হইবার কারণ আছে। 'বিচিত্রা'র ফরমায়েসে রবীন্দ্রনাথ যে তরুণ-মূর্ত্তি ধরিয়াছেন সেটা আমরা সত্যই বুঝিতে না পারিয়া গালি দিই। তবু এবার দেখিলাম 'বিচিত্রা'র নূতন বিজ্ঞাপনে আমাদের সে ভুল সংশোধনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এবারকার বিজ্ঞাপনে আছে—'অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ তরুণ সাহিত্যিককে বিচিত্রা সাহিত্যজগতে

সুপরিচিত করিয়াছে।' লব্ধপ্রতিষ্ঠকে সুপরিচিত করা!—সহসা হেঁয়ালি বলিয়া মনে হয়, কিন্তু এর মানে আছে। যেমন; ধরুন, রবীন্দ্রনাথ ত' লব্ধপ্রতিষ্ঠ? তবুও 'তরুণসাহিত্যিক' রূপে তাঁহাকে সুপরিচিত করিয়াছে কে? বুঝিলাম—'বিচিত্রা'র রবীন্দ্রনাথ আমাদের সেই পূর্ব্বপরিচিত প্রবীণ রবীন্দ্রনাথ নহেন, তরুণ রবীন্দ্রনাথ!

'রবীন্দ্রজয়ন্তী' সম্পর্কে অনেক কথাই বলিবার ছিল কিন্তু হঠাৎ মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতির উপর রাজকৃপা বর্ষিত হওয়াতে দেশের আবহাওয়ার এরূপ পরিবর্ত্তন হইয়া গেল যে, এই অতি ক্ষুদ্র ব্যাপার লইয়া কথার কচ্‌কচি তুলিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না। যে সামান্য দুই চারিটি কথা না বলিলেই নয়, সেইগুলিই বলিব।

শেষের কদিন দেখিলাম, যাদুকর গণপতি রবীন্দ্রজয়ন্তী প্রদর্শনী ও মেলায় ম্যাজিক দেখাইবেন, এই প্রলোভন দেখাইয়া রবীন্দ্রজয়ন্তীতে জনতাকে আকর্ষণ করার চেষ্টা জয়ন্তী-কর্ত্তৃপক্ষ করিয়াছেন—বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথকে চূড়ান্ত সম্মান দেখাইয়াছে বাঙলা দেশ। রবীন্দ্রনাথের প্রতি ভক্তি তাহাদের এতই অতি যে গণপতির ম্যাজিক ফাউস্বরূপ না দিলে রবীন্দ্রজয়ন্তীতে লোক হয় না!

রবীন্দ্রনাথ যে দেশবাসীর এই মনোভাব অবগত নহেন এরূপ মনে হয় না। ১৯১৩ সালে একবার দেশবাসীর পেয়ালাধৃত পূজা-অর্ঘ্য তিনি ওষ্ঠে স্পর্শ করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছিলেন, পান করেন নাই।

তখনও বোধ হয় তাঁহার যৌবন ছিল, আত্মবিশ্বাস ছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, ইউরোপের দেখাদেখি যে সম্মান দেশবাসী তাঁহাকে করিতে আসিয়াছে তাহা গ্রহণ করিতে তিনি অক্ষম।

আর আজ? দেশবাসীর মনোভাবের পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে রবীন্দ্রনাথের বয়সের।

—

অতি ক্ষুদ্র ব্যাপারও কখনো কখনো দেশকালপাত্র-বিচারে অতি বৃহৎ আকার ধারণ করে। দিগন্তবিস্তীর্ণ জনশূন্য বালুময় ধূধূ মরুভূমির মধ্যে অথবা নির্জ্জন শ্মশানক্ষেত্রে যদি কেহ কাঠের স্তম্ভ পুঁতিয়া তাহাতে লাল-নীল সবুজ প্রভৃতি নানা বর্ণের কাগজের কৃত্রিম ফুলমাল্য ঝুলাইয়া দেয়, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে তাহাই চক্ষুর সম্মুখে উগ্র হইয়া উঠে, ক্ষুদ্র হইলেও তাহারই বীভৎস ব্যঙ্গই সমস্ত প্রকৃতিকে বিকট হাস্যে উপহসিত করিয়া তোলে।

আজিকার দেশব্যাপী উৎসবহীন শূন্য প্রাণভূমিতে, এই নিদারুণ মৃত্যুছায়াচ্ছন্ন দেশে, রবীন্দ্রজয়ন্তীর এই কৃত্রিম নৃত্যগীতোচ্ছল ধ্বনিও সেইরূপ সমগ্রজাতিকে উপহাস করিয়া স্থরু হইল।

এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া যে সংবাদপত্রে একেবারেই লেখা হয় নাই তাহা নহে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার পার্ষদবর্গ তাহা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিয়াছেন, নহিলে যে রবীন্দ্রজয়ন্তী হয় না। করুন, তাহাতে ক্ষতি নাই। যদি ইহা সম্পূর্ণভাবে তাঁহার নিজের বা দলের খর্চে, তাঁহার দলের নামে সংঘটিত হইত তবে আমাদের বলিবার

কিছু থাকিত না। কিন্তু প্রকৃতির পরিহাস ত এইখানে যে, এ-জয়ন্তী দুর্ভাগ্য বাঙালী জাতির নামে, জাতির অর্থে উদ্বোধিত হইয়াছে।

কিন্তু সত্যই কি ইহা জাতীয় অনুষ্ঠান? এই বিষয়ে আমরা দু-একটা কথা বলিতে চাই। এই জয়ন্তী করিতেছে কে? মজা হইল এই যে জয়ন্তী হইবে ইহা স্থিঃ হইবার পরে দুই চারিটি প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয়কে ডেলিগেট্ পাঠাইবার জন্য 'নিমন্ত্রণ' করা হইয়াছিল। কিন্তু নিমন্ত্রণ করিলেন কে বা কাহারা? সপ্ততিতম জন্মোৎসব কমিটি নামে যে সকল নিয়ন্তৃগণ উদ্যোগপর্ব্বের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল কে? তাঁহাদের নিজেদের দল না বাঙালী জাতি? কমিটিগঠনের পূর্ব্বে তাঁহারা বাংলার বিভিন্ন সাহিত্যিক, সামাজিক বা জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট তাঁহাদের মতামত চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন কি? আমরা যতদূর জানি, সেইরূপ কোনও চেষ্টা হয় নাই। এমন কি 'জয়ন্তী-উৎসর্গ' নামে জয়ন্তী-উৎসবের যে রচনা-সংগ্রহ রবীন্দ্রনাথকে উপহার দেওয়া হইয়াছে, তাহাও সংকলন করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত বা দলগত প্রতিষ্ঠান, বিশ্বভারতী,—বাঙালী জাতি বা বাঙালী জাতির প্রতিনিধিস্বরূপ কোনও কমিটি বা সংসৎ নহে।

ইহাই এই আত্মনিযুক্ত জয়ন্তী-উৎসবের প্রকৃত স্বরূপ। ঠিক স্বরূপ নহে, একটি রূপমাত্র। কারণ অপর রূপটি এতই কদর্য্য, এতই

হীন যে তাহা উৎসবের সমস্ত গৌরবের হানি করিয়াছে। দেশের নামে দেশকে এত বড় অপমান আমরা রবীন্দ্রনাথের নিকটও আশা করি নাই।

উৎসবকর্ত্তারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক জানাইয়াছেন যে, উৎসবের উদ্বৃত্ত যাহা থাকিবে তাহা 'দুর্গত'দের দুঃখহরণের জন্য দান করা হইবে। উদ্বৃত্ত কিছু থাকিবে কিম্বা থাকিবে না অথবা কতটা থাকিবে প্রশ্ন তাহাই নহে। প্রশ্ন হইল এই যে, উদ্বৃত্তের কথা উঠে কেন? এই সম্পর্কে আমাদের সম্প্রতি অনুষ্ঠিত গান্ধী-জয়ন্তীর কথা মনে পড়িতেছে। তিনি যাহা-কিছু অর্থ-উপহার পাইয়াছিলেন সমস্তটাই দেশের কাজে দান করিয়াছেন। উৎসব আয়োজন, নাচ গান, হাস্য প্রমোদ, থিয়েটার কোন কিছুতেই অর্থব্যয় করেন নাই। দেশের নিকট যাহা পাইয়াছিলেন, বিনা আড়ম্বরে তাহার সবটাই দেশকে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। হয়ত বাঙালীর অত্যধিক গীতিপ্রবণ, উৎসব-উচ্ছল প্রাণ অতিঘোর দুর্দ্দিনেও দমিত হয় না। কিন্তু কর্ত্তারা ঐ ঘোষণাটি না করিলেই আজিকার দিনে শোভন হইত।

আজ এই পরপদানত দেশে দুর্গত নয় কে? বন্যা মহামারীর কথা ছাড়িয়া দিলেও, দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যে দুর্ব্বার বিষঝটিকা সমগ্র প্রকৃতিকে পর্য্যুদস্ত করিয়া সমভাবে প্রবাহিত হইতেছে তাহার ঘূর্ণাবর্ত্তে আজ উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র সকলেই ধূলোবলুণ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কয়েকটি কণ্টকবিমুখ কল্পনাবিলাসী

জমিদার যদি তাঁহাদের অচলায়তনের মধ্যে থাকিয়া এই ঝঞ্ঝার স্পর্শ হইতে আপনাদিগকে সযত্নে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্মগত সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকেন তবে আমাদের বলিবার কিছু নাই, কিন্তু আজিকার এই আনন্দোৎসবের দিনে তাঁহার অত্যুচ্চ রাজসিংহাসন হইতে দেশব্যাপী দুর্গত জনসাধারণের প্রতি ঐ কৃপাকটাক্ষটুকু বর্ষণ না করিলেই পারিতেন। এ যেন বড়লোকের বাড়ীতে উৎসব-নিশিশেষে ভোজের উচ্ছিষ্টাবশেষের দ্বারা শীর্ণ প্রভাতে কাঙালী বিদায়ের করুণ দৃশ্য। আমরাও আজ এই পাতপাড়া দুর্গত কাঙালীদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া বলিতেছি—জয় রবীন্দ্রনাথের জয়!

হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান,
মানুষের অধিকারে
বঞ্চিত করেছ যারে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

'জয়ন্তী-উৎসর্গে'র মধ্যে জগদীশচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী হইতে বুদ্ধদেব, শিবরাম প্রভৃতি সকলেরই অর্ঘ্য সঞ্চিত হইয়াছে। উৎসব উপলক্ষে যে কেবল কবিই তাঁহার শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষেরই তিথিকে প্রণাম করিয়াছেন তাহা নহে, ঐ শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষ কবিকেও প্রণাম করিয়াছে। করা উচিত বটে। পূর্ব্বপশ্চিমের সীমান্তবর্ত্তী গগনচুম্বী

গিরিশৃঙ্গে দণ্ডায়মান কবির ভালে যে লোকাতীত প্রতিভার সূর্য্যরশ্মি উদ্ভাসিত হইয়া দিগ্‌দিগন্তে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িয়াছে তাহাকে প্রণাম না করিলে শুধু যে কর্ত্তব্যহানি হয় তাহা নয়, এ প্রণাম যে করে সে নিজেকেও ধন্য করে। সে প্রণাম আমরাও বারম্বার করিয়াছি। ভাবের গুরুত্বে প্রণাম যদি সাষ্টাঙ্গ হয় তাও ভাল। কিন্তু যখন দেখি যে প্রণিপাতের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তজন পদরজ বা ব্রজরজ লইয়া মুখে ও কপালে লেপন করেন তখন সন্দেহ জাগে এ কি শুধু প্রতিভারই পূজা, না আর কিছু ?

—

'জয়ন্তী-উৎসর্গে'র 'রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন—'শ্রীমৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'। শ্রীশ্রীপ্রভুপাদ লেখেন নাই এই রক্ষা !

—

এই রামানন্দবাবুই কি এককালে গান্ধীজীকে মহাত্মা বলিতে কার্পণ্য করিয়াছিলেন ?

—

জয়ন্তী উপলক্ষে সকলেই কবিকে অভিবাদন জানাইয়াছেন, আমরাও জানাইতেছি।

—

হে রবীন্দ্র, যৌবনে তুমি শুধু কবিই ছিলে। সুরে, ছন্দে, সঙ্গীতে বাণীকুঞ্জকে এমন করিয়া পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছ যে, তাহার ঝঙ্কার দেশে [illegible] পড়িয়াছে, যুগে যুগে প্রতিধ্বনিত হইবে।

তারপর তোমার 'বাণী'মুখর মূর্ত্তি দেখিলাম। সেই 'বাণী' বহন করিয়া তুমি বিশ্বের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছ। তোমার শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষ বিস্তার করিয়া বিশ্বাকাশে উড্ডীন হইয়াছ, কোথাও বা শ্যামল প্রান্তরের পুষ্পপল্লবিত বৃক্ষের শাখাসন তোমাকে আমন্ত্রণ করিয়াছে, কোথাও বা সযত্নরচিত রাজোদ্যানের সুরম্য কুঞ্জে বসিয়া আপনার কলসঙ্গীত ধ্বনিত করিয়াছ।

আজ এই বৃদ্ধ বয়সে দেশে ফিরিয়া আসিলে। তোমার আজীবন সাধনায় গঠিত সহস্রদীপোজ্জ্বল, বংশীবীণামুখরিত, মণিরত্নখচিত যে লক্ষমহল মর্ম্মরহর্ম্ম্য নির্ম্মিত হইল তাহার দ্বারে আসিয়া বিস্ময়বিমুগ্ধ আমরা তোমার জয় উচ্চারণ করিলাম।

তাহার কক্ষে কক্ষে যে হীরক প্রবাল, যে মণিমাণিক্য থরে বিথরে সঞ্চিত হইয়াছে, কুঞ্জে কুঞ্জে যে মালতী বেলা, টগর গোলাপ প্রস্ফুটিত হইয়াছে তাহা অপূর্ব্ব। কিন্তু হায় কবি, সকল কক্ষ, সকল কুঞ্জ, সকল বাতায়ন তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলাম, মানুষ কৈ? শুভ্র শয্যা সজ্জিত হইয়াছে, কিন্তু সে-শয্যায় আলুন্ঠিত হৃদয়ের মর্ম্মভেদী ক্রন্দন কোথায়? বৈঠকে বিশাল ফরাস আস্তীর্ণ রহিয়াছে, কিন্তু সেখানে প্রাণখোলা অট্টহাস্য কোথায়?

আজ তোমার জন্মোৎসবে তোমারই একটি সঙ্গীত বার বার মনে পড়িতেছে।

শুধু তোমার বাণী নয়গো হে বন্ধু হে প্রিয়,
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিও।

হে কবি, তুমি যদি শুধু কবিই না হও, যদি বন্ধু হইয়া, প্রিয় হইয়া আজ আমাদের হৃদয়ে আপনার আসন প্রতিষ্ঠা করিতে চাও, তবে শুধু

তোমার বাণীর দ্বারা নহে, তোমার স্পর্শের দ্বারা প্রাণের বীণা ঝঙ্কৃত হইয়া উঠুক।

তোমার সুদূর দৃষ্টি আরও নিকটে সংহত করিয়া দেখ, আজ তোমারই মর্ম্মর প্রাসাদের নিম্নতলে, তোমারই উৎসব-নৃত্যের কল-ঝঙ্কারকে ছাপাইয়া উঠিয়া কাহাদের আর্ত্তধ্বনি গগনভেদী হইয়াছে। এই ধরার ধূলায় যাহাদের যাত্রা ; এই ধরণীর মাটীর ঘরে যাহাদের জন্ম মৃত্যু, বিবাহ ; ইহারই রৌদ্রে যাহাদের হাসি, বন্যায় যাহাদের কান্না ; তাহারা আজ তোমার দ্বারে আসিয়া সমবেত হইল, কিন্তু প্রবেশের অধিকার পাইতেছে না।

আজ তোমার নিষ্কণ্টক ফুলময় রত্নসিংহাসন হইতে ক্ষণেকের জন্যও তাহাদের মাঝখানে নামিয়া আসিয়া কি বলিতে পারিবে, 'হাতখানি ঐ বাড়িয়ে আনো দাও গো আমার হাতে ?' আজ কি সত্যই বলিতে পারিবে

হৃদয় আমার চায় গো দিতে
কেবল নিতে নয়,
বয়ে বয়ে বেড়ায় যে তার
যা-কিছু সঞ্চয় ?

এই জন্মোৎসবে আমাদের প্রার্থনা এই যে, তোমার দৃষ্টি আজ ঊর্দ্ধলোকের আকাশ-স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়া নিম্নলোকের এই মাটীর স্বর্গে নিবদ্ধ হোক, ক্রোধের আলোকে অসূয়ার ভঙ্গীতে নয়, প্রীতির সুষমায়, অনুভূতির গভীর বিস্ময়ে।

এ বিশ্ব শুধুই নীলাকাশের তন্দ্রাতপ, তারার দীপালি, ফুলের গন্ধধূপ, বীণার সঙ্গীতবন্দনা নহে। নটরাজের নূপুরনিক্বিত নৃত্যের নৈপুণ্য

ছাড়াও প্রমথের বীভৎস অট্টহাস্য, মহাকালের শবসাধনা রহিয়াছে। শুধু কুসুমকুঞ্জ নহে, কণ্টকগুল্মও আছে, সে কণ্টক যেন তোমাকে ভীত না করে, তাহার রক্তাক্ত তীক্ষ্ণাগ্র দেখিয়া যেন তোমার দক্ষিণ মুখ গুণ্ঠিত না হয়। বিশ্বের অন্তর্ব্বর্ত্তী এই স্বদেশ, স্বর্গের অপেক্ষা গরীয়সী এই জন্মভূমি দেবতার অপেক্ষা প্রত্যক্ষতর এই মানুষ, তোমার বাণী নয়—তোমার স্পর্শ লাভ করুক, এবং তাহাদের পুণ্য স্পর্শ লাভ করিয়া তুমিও ধন্য হও ইহাই প্রার্থনা করি, হে কবি, হে রবীন্দ্রনাথ, তোমাকে আমরা নমস্কার করি।

'প্রিয়তমা'কে লইয়া অনেক কবিই নাড়াচাড়া করিয়াছেন, কিন্তু সকলের উপর টেক্কা দিয়াছেন আমাদের নরেনদা। পৌষ সংখ্যার 'ভারতবর্ষে' নবীনা 'প্রিয়তমা'র উদ্দেশে নরেনদা বলিতেছেন—'অয়ি বিদ্যুৎ-সঙ্গমা, প্রেমসুরঙ্গ (মা) পরাণ-আত্মীয় প্রিয়তমা'—আজি আমাকে 'নিগূঢ় বন্ধনে' বাঁধহ। 'দলিয়া দুস্তর বাধা বধূ এসেছ কল্যাণি।' সুতরাং আমার 'মুখরি উঠিছে প্রাণবাঁশী।' প্রেয়সি গো, (অহো) কি রোমাঞ্চ শিহরি' উঠে'—আর সঙ্গে সঙ্গে 'অভিনব পুলকের আনে স্বপ্ন!' লো বধূ উত্তমা, একবার তোমা-হেন উর্ব্বশীর (!) নূপুর ঝঙ্কার,'—কানে নয়,—একেবারে 'তনুর অনুতে' বাজিতে থাকুক,—'উতলা নিঃশ্বাসে' একবার তুমি 'দোল দাও সর্ব্ব অঙ্গে মোর!'—'অফুরন্ত কূজন (!)' চলুক,—তারপর প্রিয়তমা গো! 'অকস্মাৎ পরিতৃপ্ত মনে' 'নির্ঝরিণী-সমা' '...সিক্ত করি' বহায়ে দাও!'—এতদিনের 'বিরহের অমা কাটিয়া যাক্।'—বেড়ে নরেন দা! বাহবা!!

কালিদাস হইতে বুদ্ধদেব পর্য্যন্ত স্ত্রী-বুকের অনেক রকম বর্ণনাই আমরা দেখিয়াছি কিন্তু 'মচ্‌মচে' বুক এই প্রথম দেখিলাম। লেখক তরুণ তইলেও 'চামড়া-অভিজ্ঞ', সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি লিখিয়াছেন,

ললিতার বুকখানা যেন কিসের ভারে মচমচ করিয়া উঠিল। সে তাহার হাত দুইখানি সবলে বক্ষে চাপিয়া ধরিল।

ইণ্টার কলেজিয়েট ম্যাগাজিনের এই লেখকটি কোনও ট্যানারি-ট্রেনিং কলেজের ছাত্র নয় তো ?

নবশক্তিতে রুদ্রের বোধনের অন্তরালে 'করুণ'ও আত্মগোপন করিতেছে: 'ট্রেজেডী' সম্ভবতঃ তাহাতেই জমিয়াছে ভাল। [গত ১৬ই পৌষের নবশক্তিতে 'ট্রেজেডী' গল্প দ্রষ্টব্য]

নায়ক মোহিত তাহার বৌদির বন্ধু রেখার সহিত তাহার কথঞ্চিৎ 'ইয়ে'র গল্প করিতে বসিয়া বলিতেছে—

"ছাদের উপর মেয়েদের খেতে দেওয়া হয়েছিল, আর পরিবেশনের ভার আমার উপর ছিল। ...তারপর পরিবেশন করবার সময় আমার হাত কাঁপছিল—আমার সর্ব্বশরীরের ভেতরটা সিঁদুরের মত লাল টক্‌টকে হয়ে উঠেছিল।"

লেখকের সর্ব্বশরীরের ভিতরটা সাধারণতঃ থাকে কি রকম? সবুজ, না বেগুনে ?

তারপর, মোহিতের

"মনে হ'ত যদি কখনও সে তার ঐ আঙুলগুলো দিয়ে আমায় স্পর্শ

করে, তবে বোধ হয়, আমার সর্ব্বশরীরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠবে।”

হ্যাঁগো, রেখা কেন স্পর্শ করিল না, তাহার ঐ আঙ্গুলগুলি দিয়া! করিত যদি, পাঁচজনের সমক্ষে তাহার কেলেঙ্কারির কথাটাও তো প্রকাশ হইত না! রেখা হয় তো আপ্‌শোষ করিতেছে!

—

কিন্তু আফ্‌শোষই বা করিবে কেন? কি যে সব হইয়া গেল শেষাশেষি, তাহা মোহিতই তখন পর্য্যন্ত বুঝিতে পারে নাই, রেখা ভদ্রঘরের মেয়ে, সেই বা বুঝিবে কেমন করিয়া?

“বাদল সন্ধ্যা—দোতলার ঘরে আমি আর রেখা। বৌদি বোধ হয় নীচেয় কিংবা অন্য কোথাও। সত্য কথা বলতে কি, আমার মস্ত দুর্ব্বলতা এই যে, মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে একটু দৌর্ব্বল্য অনুভব করি। রেখার মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে গিয়ে কথা আর বলতে পারলাম না। হাত পা কাঁপছিল, বুকের রক্ত তরঙ্গায়িত হয়ে উঠছিল! মনে হচ্ছিল, সব শরীর যেন অবশ হয়ে পড়েছে। কিন্তু দৈব ঘটনায় বলতে পারো, সব ব্যাপার তখনকার মত সহজ ও মসৃণ হয়ে গেল! তারপর কি জানি কি সব হয়ে গেল।”

এই কি জানি সব হইয়া যায় বলিয়াই তো হাঙ্গামা, তখনকার সব ব্যাপার সহজ ও মসৃণ ঠেকিলেও!

—

কিন্তু রেখারা আর এত সহজেই হইয়া যাইতে দিবেনা। ১১ই

অগ্রহায়ণের নবশক্তিতে 'বাংলার তরুণী প্রস্তুত হও' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে লেখিকা লিখিতেছেন—

'কিন্তু নারীর প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করে করে যে অভ্যাস আজ পুরুষ সমাজের স্বভাবে পরিণত হয়েছে, তা দূর করে সংস্কার পরিবর্ত্তিত করতে হলে অন্ততঃ কিছুদিন এমন তীব্র আঘাত দেওয়া প্রয়োজন যাতে পিতা, স্বামী ও পুত্রের সুপ্রচলিত অভিভাবকত্ব সহসা আতঙ্কে ডুকরে ওঠে!

আঘাত—আঘাত—নির্ম্মম আঘাত কর নারি! অস্বীকার কর সম্পর্ক—অস্বীকার কর সমাজ—অস্বীকার কর স্নেহ, প্রেম, কাকুতি ও শাসন! এক হাতে অশ্রু মোছ, অন্য হাতে তোমার মমতাহীন চাবুক চালিয়ে দাও যে সমাজ করতে চাইবে শাসন চূর্ণ কর সে সমাজ—পুড়িয়ে দাও তার পাজী পুঁথি।'

কিন্তু নির্ম্মম আঘাতের জন্য আমরা তো প্রস্তুত হইয়াই আছি। একদিকে ইংরাজ সরকার, অন্যদিকে 'প্রস্তুত বাঙালার তরুণী সম্প্রদায়।' শেষের দলের আঘাতই শ্লাঘনীয় মনে হইতেছে।

—

শ্রীমতী রাধারাণীকে আমরা অভিনন্দিত করিতেছি। এই পৌষেরই ভারতবর্ষে (যাহাতে নরেনদা'র 'প্রিয়তমা' বাহির হইয়াছে) তাঁহার 'মৌন প্রশস্তি' (মৌন সম্মতি নয় তো?) বাহির হইয়াছে; রাধারাণী বলিতেছে—'বন্ধু গো! শক্ত জিনিষ চর্ব্বণ করিবার শক্তি বোধ হয় তোমার নাই,—তাই আজ '...অবলেহ আনিয়াছি।' সে অবলেহ 'অপূর্ব্ব যৌবনবেগে (!) উচ্ছ্বসি' উঠেছে শতধারে'! বন্ধু গো! এস, এস,—উত্তরীখানি ফেনশুভ্র করে দিই'। 'বক্ষে আজি

উথলে উল্লাস!' কিন্তু 'অনাদৃতা অবজ্ঞাতা আকন্দ' (sic. আকিন্দা ?) আমি—আজ নহে, কাল নহে, পরশু নহে,—'একদা নির্জ্জন সাঁঝে পথমাঝে নিলে পরিচয়!' তারপর, 'পূর্ণ করি দিলে তাই বঞ্চিতার (?) ...প্রদেশ,—সার্থক করিলে তার প্রাণ!' আমরা বলি,—শ্রীমতী রাধারাণীর জয় হৌক—

—

ভবী না ভোলে। করুণানিধান বাবুর নিন্দা রটনা করিয়া উপাসনার 'সে' যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমরা এত দিনে তাহার কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। কিন্তু আমরা ভুলিলে কি হইবে, রাই আমাদের ভোলেন নাই টবিহারী বাবু আবার পত্রাঘাত করিয়াছেন।

—

তাহার প্রধান খেদ, শনিবারের চিঠির আসল দোষ এই যে তাঁহাদের নিজেদের কাগজে আছে, সুতরাং ইচ্ছামত লেখা ছাপাইতে পারে। অর্থাৎ তুমি বাঁচিয়া আছ তাই গান গাহিতে পারিতেছ, না বাঁচিলে ত গাহিতে পারিতে না, অতএব তুমি যে ভাল গাহিতে পার তাহার কৃতিত্ব কোথায় ? চমৎকার যুক্তি। স্ফুটবিহারী বাবু বাঁচিলে হয়।

—

স্ফুটবিহারী যে বারবার করিয়া পত্র দিতেছেন তাহার কারণ এই যে, পাছে করুণাবাবু মনে করেন—সমালোচনাটি রসচক্রের চক্রান্তের ফল। পত্র লেখকের অতিভক্তি দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। লক্ষণ ভাল।

যাহাই হউক লুটবিহারী বাবু যে ভাবে কোমর বাঁধিয়া বিশ্বপতি বাবুর তরফে ওকালতী করিয়াছেন তাহাতে আমরা 'convinced' হইলাম। তবে তিনি যে দুঃখ করিয়াছেন 'সে' বলিতে আমরা সেনগুপ্ত না বুঝিয়া বিশ্বপতি বুঝি কেন, তাহার কারণ আমরা গত বারেই দিয়াছিলাম; লুটবিহারী বাবু বোধ হয় দেখেন নাই, বিশ্বপতি বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবেন, কারণ তিনি নিশ্চয়ই পড়িয়াছেন। লুটবিহারীর জন্য আবার বলিতেছি।

—

মা যশোদার কাছে ননীচোরার বিরুদ্ধে প্রত্যহ নানান্ রকম নালিশ আসিত। সুতরাং একদা প্রভাতে যখন বস্ত্রহীনা গোপিনীগণের নিকট হইতে রাহাজানির খবর আসিয়া পৌছিল তখন শ্রীনন্দ বলিয়াছিলেন, এ আর কেউ নয়, সে। আমরাও তাই বুঝিয়াছিলাম এ আর কেহ নয়—সে। লুটবিহারী বাবু ক্ষুব্ধ হইয়াছেন দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছি।

—

সর্ব্বশেষে তাঁহার রসিকতাটা বুঝিতে না পারার জন্য আমরা সত্যই অনুতপ্ত। তিনি লিখিয়াছেন যে ডাকহরকরারা লাঠিতে ঘুঙুর বাঁধিয়া চলে। আমরা সহরে বসিয়া পায়ে বাঁধা ঘুঙুর দেখিয়াই অভ্যস্ত, গ্রাম্য হরকরার কথা মনে হয় নাই। সেইজন্য আমরা সদরে রসিকতা করিয়া ফেলিয়াছি, লুটবিহারী বাবুর গ্রাম্য রসিকতা বুঝিতে পারি নাই বলিয়া তাঁহার নিকট মাফ চাহিতেছি।

—

আবুল ফজল বি, এ; বি, টি সাহেব একখানি মাসিক পত্রিকার অঙ্গে নিজেকে প্রকটিত করিয়াছেন। উপাধি দেখিয়া মনে হইতেছে, লেখক ইস্কুলের মাষ্টার,—মাদ্রাসারও হইতে পারেন, মক্তবেরও হইতে পারেন। ইনি "মরা তারা" নামে একটি ক্রমশঃ-প্রকাশ্য গল্প লিখিতেছেন। তাহার প্রথম কিস্তীতে স্কুল-বোর্ডিংএর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। এই গল্পে শিক্ষক সাহেব "বুক ভেঙে চৌচির" করিয়াছেন, "রসঘনমূর্ত্তি টইটুম্বুর হয়ে উঠেছে" দেখাইয়াছেন, "মাছের পেয়ালা" উল্টাইয়াছেন, "যেন সব কিছু খিঁচে টেনে চুষে নিচ্ছে" বলিয়া অন্তভূতির লীলা-বৈচিত্র্যের বিকাশ-সাধন করিয়াছেন। তাঁহার গল্পের হোষ্টেল-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ "দৃষ্টি-শক্তিকে্ আরো জোরে ঘুরিয়ে এনে খিঁচে ব'লে উঠ্লেন" ইত্যাদি। তাঁহার ছাত্র বলিতেছে—

"স্যর, লাইট্যা মাছ যে-মজার মাছ, লোভ সাম্লাতে পারলাম না, মনে করলাম কাঁটা শুদ্ধই পেটের ভিতর পৌছে দিই—"

ছাত্রদের 'লাইট্যা' মাছের এই রসিকতা শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিনের এই ত্রিভুজা পত্রিকায় সংলগ্ন না হইয়া শিক্ষক সাহেবের শিক্ষা-কেন্দ্রে সংযুক্ত থাকিলেই সুশোভন হইত।

—

লেখক মাষ্টার সাহেব ছাত্র হায়দরের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—

"উগ্র বিলেতি মদ খেয়ে দেখেছি, কুল-ভাঙ্গা যৌবনের অধিকারিণী যুবতীর দেহ নিজের দেহের সঙ্গে পিষে গুঁড়া করেছি কিন্তু এমন ভয়াবহ উন্মাদনা, দেহের শিরায় শিরায় কেঁপে কেঁপে রুদ্র-বেদনায় এমন নাড়ী-ছেঁড়া উগ্র নৃত্য অনুভব করিনি।"

এই ছাত্রটি উক্ত বিদ্যাগুলি যে শিক্ষকের নিকট হইতে আয়ত্ত করিয়াছে, তিনিও বি-এ, বি, টি উপাধিধারী নিশ্চয়ই। কারণ বিশেষ ট্রেণিং ছাড়া ছাত্র এরূপ শিক্ষিত হইতে পারে না।

লেখক সাহেব 'রুদ্র-বেদনার নাড়ী-ছেঁড়া উগ্র নৃত্য' দেখাইতে গিয়া বেচারী 'উন্মাদনা'র প্রতি বড়ই অবিচার করিয়াছেন। সে হতভাগিনী সকর্ম্মক বা অকর্ম্মক একটি ক্রিয়ার জন্য যেন একঘরে হইয়া একটি কোণে দাঁড়াইয়া আছে।

এই বি এ, বি-টি লেখকটি কি এখনও শিক্ষকতা করিতেছেন? 'গর্ভবতী'-কবি গোলাম মোস্তাফা বি এ, বি, টি ভাইসাহেব কি ইঁহাকে চিনেন?

—

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম্ এ, বার-য়্যাট্-ল মহাশয় অনেক মূল্যবান্ কথা লিখিয়াছেন যথা—

'হিন্দুসমাজ যে একান্নবর্ত্তী পরিবার নয়, এ কথা কে না জানে? আর এই সব পৃথক খণ্ডকে যোগ দিয়ে যোগফল কি এক হয়? পাঁচটা আম, চারটে জাম ও তিনটে কলা যোগ দিয়ে কি এক ডজন আম কি জাম হয়, না কলা হয়?'

পাটীগণিতের সঙ্কলনে প্রমথ বাবুর যে এতটা দখল আছে, তাহা জানিয়া আমরা সুখী হইলাম।

—

অথচ প্রমথ বাবু উক্ত পত্রেই বলিতেছেন—'আমি বেহিসেবী বই লিখি, কিন্তু আমার যদি যোগ-বিয়োগের মাথা থাকৃত ত আমি বই না লিখে খাতা লিখতুম বড়বাজারে আর তাতে দু'পয়সা পাওয়াও যেত।'

কেন প্রমথ বাবু আমাদের ছেলে-ভুলানো কথা বলিয়া ঠকাইতে-ছেন ? তাঁর তো পাটীগণিতের বিদ্যা বেশ জানা আছে ? বড়বাজারের কাজে কি বীজগণিত-বিদ্যার প্রয়োজন ?

—

প্রমথ বাবুর পত্রখানিতে আরো অনেক ভাল ভাল কথা আছে—

'জাতিভেদ-প্রথার প্রসাদে যে মনোভাবের সৃষ্টি হ'য়েছে তার গায়ে কলমের খোঁচা আমরা না দিয়ে থাক্‌তে পারিনে, কারণ ও-প্রথার পক্ষ নিলে আমাদের লেখা নিতান্ত stupid হবে।'

জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, এই যদি গোরাচাঁদ, কালাচাঁদ তাহা হইলে কেমন ?

—

প্রমথ বাবু লিখিয়াছেন—

'টিকি-টুপির যে প্রভেদ আছে তা জানি, কিন্তু ও-দুয়ের নীচে মানুষের মাথা ব'লে একটা জিনিষ আছে, আর তাই নিয়েই সাহিত্যের কারবার।'

প্রভেদ কি কেবল টিকি ও টুপির ? লুঙ্গি ও ধুতি কি অপরাধ করিল ?

—

তবে কি না প্রমথবাবু বলিয়াছেন—'এ মাথা অবশ্য সে মাথা নয়।' কবিওয়ালা ভোলা ময়রাও যেন এমনি কি একটা কথা বলিয়াছিল।

—

প্রমথ বাবু ধূর্জ্জটীপ্রসাদকে অনেকবার বাঁচাইয়াছেন, তাহা না হইলে ধূর্জ্জটীর সাহিত্য-তাণ্ডবে সমগ্র বিশ্বে প্রলয় ঘটিত। ধূর্জ্জটীপ্রসাদ বলিতেছেন—

'দশ বারো বৎসর পূর্ব্বে আমি anti-intellectual Bergsonএর চেলা হই, Aliotta পড়ি—সেই ধরণের প্রবন্ধ লিখতে সুরু করি। প্রমথ বাবু আমাকে সামলাবার জন্য পত্র লেখেন। সে-সব পত্র 'নব্যভারতে'র পাতায় বেরিয়েছিল। আজকাল আবার Russellএর সম্পর্কে আমাকে সাবধান করেছেন।'

প্রমথবাবু ধূর্জ্জটীপ্রসাদকে ভাল করিয়া আটকাইয়া রাখুন। তিনি 'নব্যভারতে'র সম্পাদক ও তার পাঠক-পাঠিকাদের এক দফা বাঁচাইয়াছেন। তখন ধূর্জ্জটীপ্রসাদের বয়স কম ছিল—এখন বাড়িয়াছে। এখন আর একখানি কাগজে তাঁহার মন উঠিতেছে না, সাহিত্যের উঠান জুড়িয়া বসিতে চাহিতেছেন। এ সময়ে বেসামাল ধূর্জ্জটিপ্রসাদকে সামলাইবার জন্য আমরা প্রমথবাবুকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি।

পৌষের 'ভারতবর্ষে' জলধর দাদা শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক মহাশয়ের 'দীনের-দাবী' কবিতাটিকে 'ভাল' করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কবিতাটির শেষের চারিটি চরণে ছাপা হইয়াছে

ভাল আমাদের চল কি অচল
ব্যাকুল নহি তা জানতে,
থাক্ অধিকার আঁখি-জল দিতে
হরির চরণ-প্রান্তে।

জলধর দাদা যদি নিজের নামের গোড়াকার অক্ষর দুইটি 'ভাল'র জায়গায় বসাইয়া দিতেন, তাহা হইলে তিনি 'ভাল' করিতে গিয়া মন্দ করিয়া বসিতেন না, একথা বোধ হয় সত্য। কবি কুমুদরঞ্জন কি বলেন?

দেশের নিন্দা করিব না, দীনবন্ধুরই দোষ! তিনি যে একদা বাংলার সাহিত্যরঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাঁহার সাহিত্যিক বংশধরদের মনে সে কথা জাগ্রত রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। আবেদন করা সত্ত্বেও দীনবন্ধু সম্বন্ধে কোনও প্রকাশযোগ্য আলোচনা আমাদের হস্তগত হয় নাই। দেশব্যাপী সাহিত্যিকমণ্ডলী সম্ভবতঃ রবীন্দ্রজয়ন্তীতে রবীন্দ্রনাথকে কিভাবে বন্দনা করিবেন তাহা লইয়াই ভাবিতেছিলেন। মৃতের দাবীর চাইতে জীবিতের দাবী মানিয়া চলিলে লাভ নিশ্চয়ই আছে!

—

এই সংখ্যার ১১র ফর্ম্মাটি যখন ছাপা হইতেছিল তখন মেশিন-ম্যানের অনবধানতা বশতঃ ফর্ম্মার স্থানে স্থানে টাইপ উঠিয়া যায়। টাইপগুলি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিবার চেষ্টা না করিয়া সে ব্যক্তি অতি-আধুনিকতার গতিবেগে আত্মবিস্মৃত হইয়া মেশিন চালাইতে থাকে। তাহার ফল আমাদের পক্ষে হইয়াছে মারাত্মক। ফর্ম্মাটি পুনরায় ছাপাইয়া দিবার ক্ষমতা বা সময় আমাদের হাতে নাই, এই জন্য যে যে স্থানে টাইপ উঠিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে সেই সেই স্থান নিম্নে পুরাপুরি মুদ্রিত করিতেছি।

৫৫২ পৃষ্ঠার শেষ লাইন এইরূপ হইবে—

'অথ যদি ইহাই দাঁড়ায় তাহা হইলেও, ইহা snobbishness-এর চূড়ান্ত বলিতে হইবে। বিশ্বসাহিত্যের আসনখানি—অর্থাৎ য়ুরোপের 'নেক নজর'—লাভ করিয়াছে বলিয়াই বাংলাসাহিত্য বাঙ্গালীর গৌরবের বস্তু হইয়াছে! রবীন্দ্রনাথের পরিচয় যদি য়ুরোপ না লইত, তবে শত রবীন্দ্রনাথের উদয় হইলেও আমাদের সাহিত্য যেন সাহিত্যপদবাচ্য'

৫৫৩ পৃষ্ঠার শেষ ৮ লাইন এইরূপ হইবে—

'তারপর রবীন্দ্রনাথের রচনা সম্বন্ধে 'বিশ্ব' অবশ্যই কৌতূহল প্রকাশ করিয়াছে—রবীন্দ্রনাথের বহু রচনা ইংরেজীতে অনূদিত হইয়াছে। কিন্তু সে অনুবাদ 'বিশ্ব' করে নাই—করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং, এবং দুই চারিজন বাঙ্গালী। তার অর্থ—বাংলাসাহিত্যকে নিজের পরিচয় নিজেকেই অনুবাদ সাহায্যে দিতে হইয়াছে—বাহির হইতে কেহ আসিয়া সে পরিচয় লয় নাই। রুশীয় লেখকের রচনা যেভাবে বিশ্বের নিকট পরিচিত হইয়াছে—যেভাবে তাহা বিদেশীর দ্বারা অনুবাদিত হইয়া রুশভাষা ও সাহিত্যের সম্মান ও মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে—বাংলাভাষা বা'

৫৫৫ পৃষ্ঠার শেষ লাইন এইরূপ হইবে—

'প্রমথবাবুর মতে পূর্ব্বসূরি একমাত্র রবীন্দ্রনাথ, তাহা হইলে বংশটা'

এতদ্ব্যতীত আরো কয়েকটি ভুল আছে। যেগুলি আমাদের চোখে পড়িল তাহার শুদ্ধিপত্র নিম্নে দিলাম—

৪৪৬ পৃঃ, ১৯ লাইনের 'যে আপনার অভিজ্বতা' স্থলে 'আপনার অভিজ্ঞতা' হইবে।

৩৯৯ পৃষ্ঠা শেষ লাইনে 'অব্যর্থ প্রেরণায় ;—এর পর 'তোরাপকে কবি' এই দুইটি কথা হইবে।

৪৫৫ পৃষ্ঠা ১৪ লাইনে 'আপমি' স্থলে 'আপনি' হইবে।
" " ২২ " 'সাহস্কর' " 'সাহস্কার' " ।
৪৬০ " ১৩ " 'আখ্যানবস্ত' " 'আখ্যানবস্তু' " ।
৪৬১ " ৫ " 'সাহিত্য-সুপ্রতিষ্ঠিত' স্থলে 'সাহিত্য-গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত' হইবে।
" " ৯ " 'নল্লিকা' স্থলে 'মল্লিকা' হইবে।
" " ১২ " 'পল্লীবাসী' " 'পল্লীবাসী'' " ।

জয়ন্তীসংখ্যা

১৬ই মাঘ আমাদের 'জয়ন্তীসংখ্যা' বাহির হইবে। পূর্ব্বনির্দ্দেশমত বহু 'বেদনা' ইহাতে থাকিবে, অধিকন্তু থাকিবে, আমাদের বিশেষ সংবাদদাতা কর্ত্তৃক প্রেরিত জয়ন্তী উৎসব এবং মেলা ও প্রদর্শনীর বিস্তৃত বিবরণী—

সোনার পুঁথি

এবং

জয়ন্তী-অর্ঘ্য

একখণ্ড সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন।

প্রকাশের পূর্ব্বে লইলে কোনও discount পাইবেন না।

——০:*:*:০——

চাই! চাই!!

আমাদের জয়ন্তীসংখ্যার জন্য একজন

এবং

সোনার পুঁথির জন্য একজন

মোট দুই জন বিশেষজ্ঞ চাই।

বেতন বাবদ কিছুই দেওয়া হইবে না কিন্তু বাজেটে ট্যাক্সিভাড়া উভয়েরই ১২০০ টাকা করিয়া ধার্য্য হইয়াছে। যত রকমের এবং যত রঙের ইচ্ছা চিঠির কাগজ, পোষ্টার ও সার্কুলার লেটার ছাপিবার অধিকার ইহাদের থাকিবে। ছাপাখানা নিজেরাই ঠিক করিয়া লইবেন।

আবেদন করুন আবেদন করুন

চলচ্চিত্র

Where's that d-d flea ?
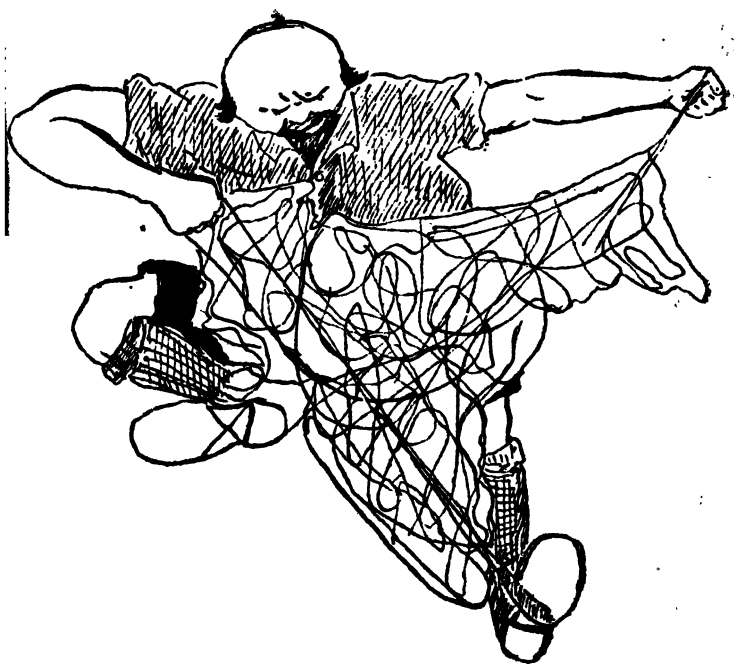
জট ছাড়াইবার নূতন কৌশল

কদলী-প্রদর্শন

উঁহু, ও ঠিক হলো না, এই রকম, বুঝলে ?

শেষপ্রশ্ন

—কিন্তু যাই বল, ভাবিয়ে ছেড়েছে—

—ওস্তাদের মার ত এখানেই, ওই শেষ—

শেষপ্রশ্ন

—পড়েছ কাকীমা? কমলের character—কি excellent! বিয়ে আমি আর করব না কিন্তু!

শেষপ্রশ্ন

—কবে এমন দিন আস্‌বে ?

শেষপ্রশ্ন

ভো কাট্টা!

অল বিশ্ব-ভ্যারাইটি-বহুরূপী-ডান্স-কম্পিটিশন

Prize Winner—ছি ছি এত্তা জঞ্জাল!

শ্রীপদামৃত মাধুরী

(সমালোচনা)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

'উপজিল প্রেমাঙ্কুর ভাঙিল যে দুঃখপুর কৃষ্ণ তাহা নাহি করে পান' এই পদের উদ্ধৃত পংক্তি নিচয় ঐ ভাবে লিখিয়া অর্থ করিয়াছেন— 'প্রেমাঙ্কুর উপজাত হওয়ায় দুঃখপুঞ্জ দূরে গেল, কিন্তু কৃষ্ণ তাহা উপভোগ করিলেন না।' দুঃখপুঞ্জ যদি দূরেই গেল, তবে আবার 'বাহিরে নাগররাজ ভিতরে শঠের কাজ পরনারী বধে সাবধান' বলিয়া বিলাপ কেন? তাহা হইলে প্রেমাঙ্কুর উপজাত হওয়ায় দুঃখপুঞ্জ দূরে যায় নাই, বরং প্রেমাঙ্কুরই এই দুঃখের কারণ হইয়াছে। এই পদটি রায় রামানন্দ কৃত শ্রীজগন্নাথ বল্লভ নাটকের একটি শ্লোকের ভাবানুবাদ। অনুবাদ করিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্যলীলা, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে। অনুবাদও ঐ পরিচ্ছেদেই আছে। শ্লোকটি এই—

প্রেম-চ্ছেদ-রুজোইব গচ্ছতি হরির্ণায়ং নচ প্রেম বা-
স্থানাস্থানমবৈতি নাপি মদনো জানাতি নো দুর্ব্বলাঃ।
অন্যো বেদ ন চান্য দুঃখমখিলং নো জীবনং বা শ্রবং
দ্বিত্রীণ্যেব দিনানি যৌবনমিদং হা হা বিধেঃ কা গতিঃ॥

'শ্রীকৃষ্ণ আমাদের প্রেমচ্ছেদজনিতক্লেশ (ব্যাধি) অবগত নহেন। প্রেম স্থানাস্থান জানে না। মদনও আমাদিগকে অবলা বলিয়া জ্ঞাত

নহে। একে অন্যের দুঃখসমূহ বুঝিতে পারে না। জীবন বচনাধীন নহে। যৌবনও দুই-তিন দিন মাত্র স্থায়ী। হায়, হায় বিধির কি বিধান।'

সমগ্র পদটি এই কয়টি কথার ভাবানুবাদ। এখন এই শ্লোকের ভাবার্থ লইয়া পদের পাঠ বিচার ও ব্যাখ্যা করিতে হইবে। সেরূপ করিলে পাঠ হইবে—

'উপজিল প্রেমাঙ্কুর, ভাঙ্গিল ; সে দুঃখপুর
কৃষ্ণ তাহা নাহি করে পা'ন।'

ব্যাখ্যা হইবে 'প্রেমাঙ্কুর উৎপন্ন হইতেই ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু কৃষ্ণ সেই প্রেমভঙ্গ জানিত (দুঃখপুঞ্জ) ক্লেশ পাইলেন না। (আমরাই দুঃখ ভোগ করিলাম)' এইজন্য 'বাহিরে নাগররাজ ভিতরে শঠের কাজ' বলিয়া ভর্ৎসনা করিতেছেন।

তুলনা করুন গোবিন্দদাসের পদ—

'প্রেম কি অঙ্কুর জাত, আত ভেল,
না ভেল যুগল পলাশা।
প্রতিপদ চাঁদ উদয় যৈছে যামিনী
সুখ লব ভৈ গেল নিরাশা॥'

খগেন্দ্রবাবুর বুঝা উচিত ছিল যে, কৃষ্ণৈকপ্রাণা গোপীগণের প্রেম শ্রীকৃষ্ণই যদি উপভোগ না করিলেন তবে তাঁহাদের সে প্রেমের সার্থকতা কি?

শ্রীকৃষ্ণের তৃপ্তির জন্যই তো সব কিছু। গোপীগণের অন্য কোন দুঃখ ছিল কি না খগেন্দ্রবাবু বলিতে পারেন। আমার মনে হয় 'শ্রীকৃষ্ণ উপভোগ করিলেন না' ইহাই তো তাঁহাদের একমাত্র দুঃখ।

স্নতরাং প্রেমের অঙ্কুর দুঃখ-সমূহকে নাশ না করিয়া বরং সমূহ দুঃখেরই কারণ হইয়াছে। সেই দুঃখ কৃষ্ণ অবগত হইলেন না, ইহা আবার দুঃখের উপর দুঃখ। তাই উক্তরূপ আক্ষেপ।

পৃঃ ২৩১, 'নাহি 'জানি' প্রাণসখী' হইবে না, হইবে
নাহি 'জানে' প্রাণসখী'।

পৃঃ ২৩৩, 'কভূ 'করি' অঙ্গীকার' হইবে না, হইবে
'কভূ 'করিবেন' অঙ্গীকার।

'সখী 'মোর' ব্যর্থ এ বচন' পাঠ নহে, পাঠ হইবে' সখি 'তোর' ব্যর্থ এ বচন'। এ পদটি শ্রীরাধার উক্তি। পূর্ব্ব ছত্রে বলিয়াছেন, 'প্রিয় সখীও আমার এ দুঃখ জানে না, এইজন্যই ধৈর্য্য ধরিতে কহিতেছে।' তারপর সখীর প্রবোধ বাক্যের উল্লেখ করিয়া কহিতেছেন, 'কৃপা-পারাবার কৃষ্ণ কখনো অঙ্গীকার করিবেন সখি তোর' এ বচন নিরর্থক। 'অগ্নি তৈছে' পাঠ নয়, 'অগ্নি যৈছে' পাঠ।

পৃঃ ২৪১, 'শ্যামল সুন্দররূপ' এই পদটির সর্ব্বত্র মিল আছে, ছন্দও সঙ্গত। এমন সুন্দর পদেরও অঙ্গহানি করিতে ব্রজবাসীর দ্বিধা হয় নাই। খগেন্দ্রবাবুও খেয়াল করেন নাই।

'রাই ছলে ফিরি ফিরি 'সো মুখ নিরখই'
ভালহি দেয়ল হাত।'

এ পাঠ ঠিক নহে। পাঠ হইবে—

'রাই ছলে ফেরি ফেরি শ্যাম মুখ হেরি হেরি
ভালহি দেয়ল নিজ হাত।'

দীর্ঘত্রিপদীর অন্তচরণ 'বধু লইয়া চলিলেন সাথ' ইহার সঙ্গে 'ভালহি দেয়ল হাত' মিলাইতে খগেন্দ্রবাবু কুণ্ঠিত হন নাই।

'যো মুখ দরশনে 'নিমিখ ঘন নিন্দই' পাঠ ঠিক নহে, প্রকৃত পাঠ—'লিমিখ নিন্দই ঘনে।'

পৃঃ ২৬০, 'আজুলি' শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন 'আজলি, আহুরি—আদরিনী'। সাক্ষাৎ অমরকোষ! আজুলি মানে 'ন্যাকা'। সং 'ঋজুকা' অপভ্রংশে 'উজ্জুকা' বাঙ্গালায় 'সরলা'। রাঢ়দেশে দাঁড়াইয়াছে ন্যাকা, নেকী!

পৃঃ ২৭১, 'সখাহে কো বিহি নিরমিল বালা' এই পদে 'অপরূপ মনোভব মঙ্গল' হইবে না। হইবে 'অপরূপ রূপ মনোভব মঙ্গল।'

পৃঃ ২৮৯, 'স্বপনে আন না হেরি' স্থলে 'স্বপনে আন না হেরিয়ে' না বলিলে ছন্দঃপতন হয়, এবং উহাই প্রকৃত পাঠ।

পৃঃ ২৯১, 'হরি হরি কো ইহ অপরূপ বালা' এই পদে 'পদমবিলম্বিত কেশা' পাঠ ধরিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন 'পদ্ম-সুশোভিত কেশ কলাপ'। আজ্ঞে না, পাঠ হইবে 'পদ-অবলম্বিত-কেশা'! পাঠান্তর 'পদ-বিলম্বিত কেশা'। অর্থ 'আগুলফলম্বিত-কেশযুক্তা'। 'পদ্মবিলম্বিত' মানে 'পদ্ম সুশোভিত' কোন্ অভিধানে আছে? সীমন্তে একটা পদ্ম দেওয়া চলে, হাতে লীলাকমল থাকে, কেশে পদ্ম কোন্‌খানে 'সুশোভিত'করে?

পৃঃ ২৯৫, 'রমণীর মণি' পদ। 'কেশের আগ চুম্বয়ে টাগ' পাঠ আছে। ব্যাখ্যায় 'টাগ' শব্দে 'জঙ্ঘা' লিখিয়া পাঠান্তর 'চাগ' লিখিয়াছেন। প্রকৃত পাঠ 'কেশের আগ চলয়ে নাগ'। কিছু পরেই আছে—'জলের কান্ধারে কেশের আন্ধারে, সাপিনী লাগিল মোয়!' ব্রজবাসী 'সাপিনা লাগয়ে মোর' পাঠ দিয়াছেন। কিন্তু ইহার দ্বিতীয় চরণ—'কেমনে কামিনী আছয়ে আপনি এমন নাগিনী মোয়' বাদ দিলেন কেন? পাণ্ডিত্য দেখাইতে হইলে এইরূপে পদের কোনো কোনো অংশ বাদ দিতে হয় না কি?

পৃঃ ৩০৫, 'থিরবিজুরি' পদটি 'রসকল্পবল্লী' প্রণেতা গোপালদাসের রচিত। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় এক প্রবন্ধে তাহা দেখাইয়া দিয়াছি। তথাপি ইহা চণ্ডীদাসের ভণিতায় দেওয়া হইল কেন? তদগদভাব ভাল, তাই বলিয়া একজনের পদ আর একজনের নামে চালানো কি উচিত? আগে ছাপা হইয়া থাকিলে ভূমিকায় লিখিয়া দিতে তো পারিতেন।

পৃঃ ৩০৮, 'চরণের ফুল হেরিয়া দুকুল জলদ-শোভিত ধার' কোনো মানে হয় না। পাঠ হইবে 'চরণের কুলে হেরিয়ে দুকুলে জলদ শোভিত ধার।' 'নীল দুকুল ও চরণের গৌর কান্তি দুইয়ে মিলিয়া ধারা শোভিত জলদের ন্যায় শোভিত হইতেছে।'

পৃঃ ৩১১, 'তুল কি করইতে চাহে কে দেহে' পাঠ ও তাহার ব্যাখ্যা—'শিশিরের মত (তুলনার অনুরূপ) করিয়া দেহকে অধিকক্ষণ রাখিতে চাহে' ইহার কি মাথামুণ্ডু অর্থ খগেন্দ্রবাবু বুঝাইয়া দিতে পারেন? পাঠ হইবে 'ও লুকি করইতে চাহে কি দেহে।' 'অবহি ছোড়ব মোয় তেজব নেহে'—এই ভাবিয়া পরিহিত বসনখানি দেহে লুকাইতে চাহে?

পৃঃ ৩১৩, 'কিবা সে দুগুলি শঙ্খ ঝলমলি সরু সরু শশি কলা। মাজিতে উদয়' পাঠ ধরিয়াছেন। কেন ময়লা পড়িয়াছিল নাকি, যে, মাজিবার আগে দেখা যাইতেছিল না? পাঠ হইবে 'সাঁঝেতে উদয়।' অর্থাৎ নাল সাড়ী শোভিত (গাত্রে) হস্তের শাঁখা দুগুলি যেন সন্ধ্যায় উদিত সরু সরু চন্দ্রকলা। পূর্ব্বে 'ঝলমলি' পাঠ হইতেই তো বুঝা যায় মাজিবার অপেক্ষা না রাখিয়াই শাঁখা দুইগাছি ঝলমল করিতেছিল। খগেন্দ্রবাবু চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত পদের ব্যাখ্যাতেও এইরূপ রসিকতা করিয়াছেন? তবে? গোঁড়াভক্ত!

পৃঃ ৩২৭, 'কি মধুর মধুর' পদ। 'তাহে নাগরালী বেশ' অর্থ করিয়াছেন 'রসিকেন্দ্র চূড়ামণি।' অহ-হ-হ! নাগরালী মানে কি রসিকেন্দ্র চূড়ামণি? নাগর মানে খগেন্দ্রবাবুর মতে যদি রসিকই ধরা যায়, নাগরালী মানে তাহা হইলে ইন্দ্র ও চূড়ামণি যুক্ত রসিক?

এই পদে ব্যাখ্যার চরম করিয়া ছাড়িয়াছেন খগেন্দ্রবাবু নীচের ছত্রে—

'যতি সতী মত হত গেল মেনে কুলব্রত
আইল জগতচিত চোর।
রাধা মোহনে কয় গোরা না ভজিলে নয়
এ ঘর করণে দেহ ডোর।'

'এ ঘর করণে দেহ ডোর' অর্থে খগেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন—'দেহ রজ্জু (ডোর) স্বরূপ হইয়া আমাকে গৃহকর্ম্মে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। রজ্জু (দড়ি) গলায় জড়ায় নাই তো? এই বুদ্ধি লইয়া বৈষ্ণব-পদাবলী সম্পাদনের স্পর্দ্ধা করেন? সোজা মানে পদকর্ত্তা বলিতেছেন 'গোরা না ভজিলে চলিবে না, ঘর করণায় ডোর দাও।' অর্থাৎ ঘর করণার (পুঁথির) পাঠ তুলিয়া রাখিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ ভজনে আত্মসমর্পণ কর। 'ডোর দাও' 'চরণা তোল' এ সব প্রবচন কি কখনো শ্রবণ গোচর হয় নাই? পণ্ডিত ব্রজবাসী কি বলেন? এই পদটি হরিকৃষ্ণ দাসের রচিত। রাধামোহনের স্বকৃত পদামৃত সমুদ্রের টীকা দেখিলেই বুঝিতেন ইহা রাধামোহনের নহে।

পৃঃ ৩৩২, 'চণ্ড বিরহে জনু আগি' মানে করিয়াছেন 'অগ্নির ন্যায় প্রচণ্ড বিরহ।' ওঃ! কি গভীর! যদি পাঠ হইত 'চণ্ড বিরহ জনু আগি', তাহা হইলেও বা কথা ছিল। মানে হইত 'প্রচণ্ড বিরহ যেমন

আগুন।' কিন্তু পাঠ ধরিয়াছেন 'বিরহে জনু।' প্রকৃত পাঠ হইবে 'চণ্ড বিরহে জলু আগি!'

পৃঃ ৩৪১, 'সো একু আখর রঙ্ক' মানে করিয়াছেন—'রঙ্ক-কৃপণ।' আচ্ছা না জানিয়া শুনিয়া এ বিদ্যা জাহির না করিলেই নয়? রঙ্ক মানে দরিদ্র, ভিক্ষুক। 'তিন অক্ষরের কৃপণ হইয়া মাত্র একটি অক্ষর (রা) বলেন' না। তিন অক্ষরের ভিখারী একটি মাত্র অক্ষর রাতি, রাতুল শুনিলেই রাধা নাম স্মরণে চমকিয়া উঠেন! 'নিরাতঙ্কো রঙ্কো বিহরতি চিরং কোটী ফলকৈঃ' স্মরণ হয়?

পৃঃ ৩৪৩, 'অব অবধারলুঁরে কানু তুয়া পরশক রঙ্গ', এখানে রঙ্গ স্থলে 'রঙ্ক' হইবে। রঙ্ক অর্থে কৃপণ মনে করিয়া সুপণ্ডিত সম্পাদকদ্বয় সংশোধন করিয়াছেন 'রঙ্গ!' কত রঙ্গই জানেন! এখানে অর্থ হইবে 'এখন জানিলাম কানু তোমার স্পর্শের ভিখারী।' শ্রীরাধিকাকে সম্বোধন করিয়া কোনো সখীর উক্ত এই পদে 'কানু তুয়া পরশক রঙ্গ' কথা আসিতে পারে? এদিকে তো ভূমিকায় খুব বিচার-আলোচনার বাগাড়ম্বর দেখিলাম।

পৃঃ ৩৮৭, সুপণ্ডিত ব্রজবাসী এবং সুরসিক খগেন্দ্রবাবু আর একটি পদের পাঠ বিচার ও ব্যাখ্যায় পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞানের পরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। পদটি 'যব হরি পাণি পরশে ঘন কাঁপসি।' ৩৮৭ পৃষ্ঠায় পাঠ ধরিয়াছেন—'চুম্বন বেরী জনি মুখ মোড়সি জনু বিধু লুবধ চকোর।' খগেন্দ্রবাবু ব্যাখ্যা লিখিতেছেন—'শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সুধা পিয়াসী চকোরের ন্যায় হইয়াছেন, সুতরাং চুম্বনকালে মুখ ফিরাইও না।' 'আস্বাদন' কি না! পূর্ব্বপংক্তিতে রহিয়াছে, 'নহি নহি বোলসি থোর'—কেন মৃদুস্বরে না না বলিস্? আর এ পংক্তি হইল 'ফিরাইও না'। 'কেন ফিরাস্' হইবে না কি? আর ঐ যে পাঠ, উহার অর্থ কি হয়?

'চুম্বনবেলায় যেন মুখ ফিরাস্ না, যেমন বিধুলুব্ধ চাকোর।' 'কৃষ্ণের চুম্বন বেলায়' এবং 'কৃষ্ণ যেমন বিধুলুব্ধ চাকোর।' টানিয়া তুলিয়া আনিতে হয়। পাঠ হইবে 'চুম্বন বেরি জনু মুখ মোড়সি কানু বিধুলুবধ চকোর' 'বিধুলুব্ধ চকোর সদৃশ কানুর চুম্বনসময়ে তুই (এমন ভঙ্গী করিস্ যেন) মুখ ফিরাস্।' পরবর্ত্তী পংক্তি 'যব হোয়ে নাহ রতন রত আরত বারত জনি অভিলাষ।' পাঠ হইবে 'যব হোয়ে নাহ রতন, রত আরত, বারসি তছু অভিলাষ।' 'তোমার প্রিয়তম যখন সুরতাভিলাষী হন তখন কেন নিবারণ কর?' ইহাই ভাবার্থ। অতঃপর ভণিতা—'গোবিন্দদাস কহ নহ বহুবল্লব কৈছে রহত নিজ পানা।' খগেন্দ্রবাবু অর্থ করিতেছেন 'এরূপ করিলে (অর্থাৎ বাধা দিলে, মুখ ফিরাইলে) সেই বহুবল্লভ নাগরেন্দ্র চূড়ামণি তোমার নিকট থাকিবেন কেন?'

সুরসিক খগেন্দ্রবাবুকে জিজ্ঞাসা করি, এরূপ করিলে নাগর যদি না-ই থাকিবেন তবে সখীগণ এরূপ মন্দ শিক্ষা দিয়াছিল কেন? তাহাদের কি উদ্দেশ্য শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া যাউন বা রাধাকে ত্যাগ করুন? স্মরণ করুন—

'পহিলহি বৈঠবি শয়নক সীম।
হেরইতে পিয়া মুখ মোড়বি গীম॥
পরশিতে দুহুঁ করে ঠেলবি পাণি।' —বিদ্যাপতি

'পিয়া পরিরম্ভনে মোড়বি অঙ্গ।
নহি নাহ বোলবি বচন বিভঙ্গ॥' —বিদ্যাপতি

'মান করবি কছু রাখবি ভাব।
রাখবি রস জনু পুন পুন আব॥ —বিদ্যাপতি

আর শ্রীরাধার এইরূপ আচরণে যদি শ্রীকৃষ্ণ বিরক্তই হইবেন, তবে

সখার নিকট তাহা বলিতে আনন্দ বোধ করিবেন কেন? রসোদ্গারের পদ দেখুন—

'অরি সম গঞ্জয়ে মন পুন রঞ্জয়ে'
'অন্তরে জীউ অধিক করি মানয়ে
বাহিরে লাগয়ে উদাসে।
কহ কবিশেখর অনুভবে জানলুঁ
বিদগধ ফেলি বিনাসে॥'

গোবিন্দদাসেরই পদ দেখুন, শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

'করে কুচ ঝাঁপিতে সজল নয়ন ধনী
অঙ্গ কয়ল কত মোড়ি।'

উপরি-উদ্ধৃত ভণিতার প্রকৃত পাঠ—

'গোবিন্দ দাস কহে নহে বহুবল্লভ
কৈছে রহব নিজ পাশে।'

গোবিন্দ দাস বলিতেছেন 'নৈলে কেন (কি উপায়ে) বহুবল্লভ নিজ পাশে রহিবেন?" অর্থাৎ রাধার বাম্যস্বভাবের মাধুর্য্যেই শ্রীকৃষ্ণ আকৃষ্ট হন। সুলভ হইলে তিনি থাকিবেন কেন? নায়ক আলিঙ্গন করিলে সহজভাবে প্রত্যালিঙ্গন করা অলঙ্কারশাস্ত্রে নায়িকার মানের অন্যতম লক্ষণ বলিয়া বর্ণিত আছে। সুরসিক খগেন্দ্রবাবু এমন 'উল্টা বুঝলি রাম' কেন করিলেন জানি না। পদেই তো রহিয়াছে 'বেশ পশায়নি রঙ্গ', 'যাহে বিনু জাগরে নিদহুঁ না জীবনি' 'নহি নহি বোলসি থোর' ইহা হইতেই তো ব্যঞ্জিত হয় যে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে কিরূপ প্রাণ দিয়া ভালবাসেন। না-না যে বলেন সে তো 'থোর'—অল্প। মুখফিরানো আদির ব্যঞ্জনা এইরূপেই বুঝিতে হইবে।

এ সব পদ তো রসোদ্গারের পর্য্যায়ে রাখা উচিত। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগে এইরূপ রসোদ্গারের পদ কয়েকটিই দেখিলাম। কেন?

পৃষ্ঠা ৪৪৭, 'রঙ্গ পুতলি কিয়ে রসমাহা পূর'। এ পাঠ ঠিক নহে, পাঠ হইবে 'রঙ্গ পুতলি কিয়ে রসমাহা বুর।' রাঙ্গের পুতলি কি পারদের মধ্যে ডুবিয়া গেল?' খগেন্দ্রবাবুদের পাঠের অর্থ হয় 'রাঙ্গের পুতলি কি পারদের মধ্যে পূর্ণ হইল?' তবে 'আস্বাদনের' কথা স্বতন্ত্র।

পৃষ্ঠা ৪৭২, 'নন্দনন্দন চন্দচন্দন গন্ধ নিন্দিত অঙ্গ।' খগেন্দ্রবাবু বলেন 'চন্দচন্দন অর্থে শ্রীল রাধামোহন ঠাকুর বলেন কর্পূর মিশ্রিত চন্দন। কিন্তু নন্দনন্দন চন্দ এক সঙ্গে গ্রহণ করিলে অর্থ সরল হইয়া যায়।' অর্থ সরল হইয়া যায় কিন্তু পদটির মুণ্ডপাত হয়। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ চন্দন নিন্দিত না বলিয়া 'কর্পূরমিশ্রিত চন্দনের গন্ধও তাহার নিকট পরাস্ত হয়', একথা বলিলে কৃষ্ণাঙ্গ গন্ধের যে মাধুর্য্য উপলব্ধি হয়, কেবল চন্দনে সেরূপ হয় কি? চন্দকে নন্দনের ঘাড়ে টানিয়া অত সরল করার দরকার কি? চন্দচন্দন তো সোজা অর্থ।

এই পদে 'জলদ সুন্দর কম্বুকন্ধর নিন্দিসিন্ধুর ভঙ্গ' এই ছত্রের খগেন্দ্রবাবু অর্থ করিয়াছেন 'সমুদ্রের তরঙ্গলীলা!' শ্রীল রাধামোহন ঠাকুর মহাশয় অর্থ করিয়াছেন 'সিন্ধুরস্য হস্তিনঃ সর্ব্বগুণান্ নিন্দতি বলবীর্য্য গমনাদি গুণেনেত্যর্থ।' কিন্তু খগেন্দ্রবাবু প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন 'এস্থলে বক্তব্য এই যে 'ভঙ্গ' কথাটি হস্তীর সম্বন্ধে প্রয়োজ্য হইতে পারে না।' কেন, পারে না কেন? ভঙ্গ অর্থে গতি, (নন্দনন্দন) জলদের মত সুন্দর, তাঁহার কন্ধর কম্বুর মত, গতি বারণ-বিনিন্দিত। এই সোজা অর্থ ত্যাগ করিয়া অমরকোষ হইতে বচন তুলিয়া দেখাইয়াছেন যে, ভঙ্গ অর্থে তরঙ্গ। শ্রীল রাধামোহন ঠাকুর মহাশয়ের জন্য দুঃখ হয় যে, তিনি অমরকোষখানা পড়িবার সৌভাগ্য লাভ করেন নাই। সিন্ধু

অর্থে সমুদ্র গ্রহণ করিয়া খগেন্দ্রবাবু বলিতেছেন (যে-হেতু) শ্রীকৃষ্ণ মেঘের মত সুন্দর, তাঁহার গ্রীবা শঙ্খের ন্যায়, অতএব তরঙ্গ ভঙ্গে লীলায়িত মেঘবর্ণ এবং কম্বুর আকর সমুদ্রের মাধুর্য্যকে তিনি নিন্দা অর্থাৎ পরাভব করিয়াছেন।' আমরা বলি 'আমেন !'

রাধামোহন ঠাকুরের তো ভুল ধরিয়াছেন, আর নিজেরা এই পদে 'কুলজ কামিনী 'কন্ত' স্থলে 'কান্ত' পাঠ ধরিয়া কবিতাটির ছন্দের মাথা খাইয়াছেন কেন ? (পৃঃ ৪৭৩)

পৃষ্ঠা ৪৮২, '. . . মেঘেরি গায়। মৃগাঙ্ক রহিতে শশাঙ্ক উদয়॥' চমৎকার ছন্দ মিলাইয়াছেন। পাঠ হইবে 'শশাঙ্ক ভায়।'

পৃষ্ঠা ৪৯২, 'শুন অনুরাগিনী কি তোহে কহিব বাণী' পদে সখী বলিতেছেন 'যবে তাহে পড়ে মনে চিত দিবে আন কামে' স্থলে ব্রজবাসী পাঠ ধরিয়াছেন 'যবে তোহে পড়ে মনে চিত দিব আন কামে।' আগাগোড়া সখীর উক্তি এই পদে মাঝের ঐ ছত্রটি কি 'ব্রজবাসীর বাণী' ?

পৃষ্ঠা ৫০০, 'কানু অনুরাগ বাঘ যব পৈঠল মন ঘন কানন মাঝ' এই পদটি বিদ্যাপতির ভণিতায় দিয়াছেন। এই পদটিতে কি এমন রস আছে যে, রূপানুরাগের মধ্যে স্থান দিবার এত অনুরাগ ? বিদ্যাপতির ভণিতায় এরূপ পদ দিবার সাহসের বলিহারী যাই। নারীর ধৈর্য্য এই পদে 'ধৈরয মেঘ' রূপে বর্ণিত হইয়াছে। এ পদেরও পাঠে ব্যাখ্যায় ভুল থাকিয়া গিয়াছে।

পৃষ্ঠা ৫০১, 'নিরসন বোল ঢোল সম ঘোষই' এই নিরসনের আস্বাদনে খগেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন—'লোকের নৈরাশ্যসূচক টিটকারীর সহিত ঢোলের বাদ্যের তুলনা হইয়াছে।' 'নিরসন' মানে নৈরাশ্যসূচক ? বাধা নিরসন মানে বাধা নৈরাশ্য ? 'নিরসন' পাঠ ধরিলে অর্থ হইবে 'বাঘ

তাড়াইবার বোল' অর্থাৎ লোকের নিষেধবাক্য। কিন্তু প্রকৃত পাঠ 'নিরসন' নয়, পাঠ হইবে 'নিজ জন বোল' আপনার লোকের কথা।

পৃষ্ঠা ৫০৩, 'বিজয়ী কুঞ্জে' হইবে না তো, হইবে 'বিজই কুঞ্জে'। ৪৮৭ পৃষ্ঠায়ও দেখিয়াছি 'বিজয়ী'। কেন ?

পৃষ্ঠা ৫১৪, ৫১৫, ৫১৬, 'কেন গেলাম যমুনার জলে' এই পদে 'ব্যাধ ছলে' পাঠ হইবে না, হইবে 'ব্যাধ ছিল'। 'লজ্জাশীল হেমাগার'— খগেন্দ্রবাবু ইহার অর্থ করিয়াছেন—'লজ্জা ও চরিত্রের সহিত স্বর্ণ-প্রাসাদের . . . তুলনা করা হইয়াছে।' আরে না মহাশয়, 'হেমাগার' মানে স্বর্ণ-প্রাসাদ নয়। আপনি তো চিরকালই আর স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন না। অধ্যাপনাও তো করিয়াছেন ? ছেলে পড়াইতেন কি করিয়া ? ছাত্রদেরও তো এই রকম মানেই শিখাইয়াছেন ? 'হেমাগার' মানে হেমভাণ্ডার। যেমন ধনাগার ইত্যাদি আর কি ?

'গর্ব্বশালে মত্ত হাতী' এ পাঠের 'শালাটা গর্ব্ব' তাহা বুঝিলাম, কিন্তু 'মত্ত হাতীটা' কে ? দুঃখের সহিত বলিতে হয়,—'হয় ব্রজবাসী নয় খগেন্দ্রবাবু অথবা দুই জনেই, কারণ উভয়েই এই মহাজন পদাবলী-রূপ কমল বন দলন করিয়াছেন।' পাঠ হইবে 'চিত্তশালে ধৈর্য্যহাতী।' গর্ব্বশালে মত্তহাতীর যে কোন মানে হয় না। (ইহার সঙ্গে তথাকথিত বিদ্যাপতির পদের 'ধৈরয মেঘ' তুলনা করুন)। 'ভনে জগদানন্দ দাস' পাঠে ছন্দ থাকে না। 'ভনয়ে' পাঠ হইবে।

পৃষ্ঠা ৫২৭ 'উঠত বসত খসত কেশ, মুরলী শবদে শ্রবণ ভেদ' সমগ্র পদখানিতে দুই-দুই ছত্রে মিল আছে, আর এই দুই ছত্রেই 'কেশ, ভেদ' দিয়া মিল হইল ? পদকর্ত্তা পরমানন্দ দাস কি এতই বেকুব ছিলেন ? খুব সম্ভব 'মুরলী শ্রবণ শেষ' পাঠ হইবে। 'মুরলী শব্দ শ্রবণের অন্তস্থলে গিয়া পৌঁছিল।'

পৃষ্ঠা ৫৩১-৫৩২, 'মাথায় করি কুলডালা, ঘুচাব কুলের জালা, তবহু পূরব মনসাধ। প্রসন্ন হইবে বিধি সাধিব মনের সিদ্ধি যবে হবে কানু পরিবাদ॥' এই পাঠ ধরিয়া খগেন্দ্রবাবু অর্থ করিয়াছেন 'উপকথায় শুনিতে পাওয়া যায়, কুলোবরণ করিয়া অমঙ্গল বা অপ্রিয়জনকে লোকে বিদায় করিয়া দিত। এখানে বোধ হয় তাহারই ইঙ্গিত আছে।' কি জালা গো! এখানে কুলোবরণের কথা কোথায় আছে? 'কুলডালা' কি কুলোবরণ? কুলোবরণ আবার কে বলে? বলে কুলোর বাতাস। তা আপনাদিগকে কুলোর বাতাস দিবার লোক তো নাই। 'বরণডালা' একটা কথা আছে তো। খগেন্দ্রবাবু দুই-দুইবারের অভিজ্ঞতায় এ কথা বেশ জানেন যে, বরকেও ডালা লইয়া বরণ করে। বরণ করা মানে কি বিদায় করা? উপরোক্ত ছত্রের পাঠ ও অর্থ এইরূপ—'শিরে ধরি কুলডালা বাহিরিব কুলবালা কবে বা পূরিবে মনোসাধে। প্রসন্ন হইবে বিধি সাধিব মনের সিধি কবে হবে কানুপরিবাদে॥' (কানুকে বরণ করিবার জন্য) কবে কুলডালা মাথায় করিয়া কুলবালা (আমি) (কুলের) বাহির হইব? কবে মনোসাধ পূর্ণ হইবে? কবে বিধি প্রসন্ন হইবে, কবে মনের সিদ্ধি সাধিব (অথবা মনের সাধনা সিদ্ধ করিব) কবে কানু-পরিবাদ হইবে?' এ পদটি বলরাম দাসের। 'জ্ঞানদাসেতে কয়', ছন্দও থাকে না। 'নিছনি' মানে লিখিয়াছেন 'পূজা অর্চ্চনা'। আর 'নিছিয়া ফেলিব' মানে লিখিয়াছেন 'নিঃশেষে ডারিয়া দিব।' পূর্ব্বকালে কোন প্রিয়জন অথবা পূজ্যজন গৃহে আসিলে কোনো একটি ফুল বা কড়ি, বা তাম্র, রৌপ্য বা স্বর্ণমুদ্রা ইত্যাদি মাথার উপরে ঘুরাইয়া পায়ের দিকে একপাশে নামাইয়া রাখা হইত। পশ্চিমদেশে 'নজর নিছোঁরা' একটা কথা আছে। রাজদর্শন করিতে হইলে কিছু নজর দিতে হয়। আর কিছু নিছনি দিতে হয়। নজরের টাকা রাজকোষে জমা হয়, নিছনিটা

ভৃত্যেরা লয়। কোনো মঠাধীশ বা সাধুসন্ত বা নিজের অভীষ্ট দেবকেও ধনবানগণ এইরূপে বরণ করেন। নিছনি অর্থে বালাই। . . . . . 'জাতি যৌবন ধন নিছিয়া ফেলিব শ্যাম পায়'। অর্থাৎ শ্যামের অমঙ্গল সহ আমার জাতি যৌবন ধন (নিছনিরূপে) শ্যামের পায়ের তলায় ফেলিয়া দিব।

পৃঃ ৫৩৩, 'ইন্দীবর বর গরব বিমোচন লোচন মনমথ ফান্দে' ইহার মিলন স্বরূপ পরে যে ছত্রটি ছিল, পুস্তকে তাহা বাদ পড়িয়াছে। খগেন্দ্রবাবু কিন্তু 'ফান্দের' মাথায় ১ অঙ্ক বসাইয়া ব্যাখ্যা লাগাইয়াছেন— 'কুলরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের ভ্রুভঙ্গ রূপ নাগ পাশে আবদ্ধ হইলে কুলদেবতাগং উদ্বিগ্ন হইলেন।' কোথাকার জল কোথায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে! লঙ্কায় রাবণ মলো বেউলো কেঁদে রাঁড় হলো!' আমরা যে পাঠ দেখিয়াছি তাহাতে পরের ছত্র এইরূপ—'কুলরমণীকুল মানস বিহঙ্গম ইঙ্গিতে অপরশে বান্ধে॥' 'সে ফান্দ এইরূপ যে কুলরমণীগণের মনোরূপ পক্ষীকে স্পর্শমাত্র না করিয়া ইঙ্গিতেই বাঁধিয়া ফেলে। অন্য ফান্দে পাখীকে স্পর্শ না করিয়া ধরিতে পারে না। এ ফান্দে কটাক্ষেই কার্য্য সিদ্ধি হয়।'

'স্থকিত কোকিলাগণ' অর্থ হয় না। হইবে 'চকিতা কোকিলাগণ।'

পৃঃ ৫৩৪, 'বাজায় বাঁশী তরুমূলে বসিয়া বসিয়া' ইহার পর একটি ছত্র নাই। ছত্রটি 'পবন স্তবধ রয় যমুনা উজান বয় মীন মকর উঠে ভাসিয়া ভাসিয়া ভাসিয়া।' পদের ছত্র গণিয়া দেখিলেই বুঝিবেন জোড়, না বিজোড়?

পৃঃ ৫৭৬, 'কানুক হই উৎকণ্ঠিত জানি' ঘট কচু ডামনি হইয়াছে। 'কানু রহই উৎকণ্ঠিত জানে'—'কানুক হই' হইয়াছে।

পৃঃ ৫৮৪, 'যাঁহা রস ধাধস ভাঙ ধুনান' ব্যাখ্যা করিয়াছেন— 'পিরীতি রসের প্রাবল্যে যেথায় ভ্রূ-যুগল ধুন্তরীর ধনুর ন্যায় কম্পিত

হইতেছে।' আস্বাদন একেবারে তুলো ধোনা করিয়াছেন! ভাঙ ধুনান—ভুরু নাচানো, এখানে ধুনুরীর ধনু কোথা হইতে আসিল? ধুনুরীর ধনুর আকারও ঠিক্ ভুরুর মত অ-বিকল!

'ধাধসে ধাবই কত পাঁচ বাণ' অর্থ 'সেই ধুনানীতে কত পাকশর তুলার ন্যায় উড়িয়া যাইতেছে।' বাপ্ স্, কী গভীর আস্বাদন! 'ভ্রু-নর্ত্তনে কত পঞ্চশর ছুটিতেছে' এই তো অর্থ। তার জন্য এত!

পৃঃ ৫৮৫, 'শ্রীযুত হসন' পাঠ হইবে না, হইবে 'শ্রীযুত হুসন।' হুসেন শাহ গৌড়ের বাদশাহ্।

পৃঃ ৫৯২, 'খত ছাড়াইতে যদি নাহি দেয় বিধি' কোনো মানে হয়, না, ছন্দ ঠিক্ থাকে? 'খত ছাড়াইতে যদি ধন নাহি দেয় বিধি' পাঠ হইবে।

'ভূমিকা'

আস্বাদন

ইতিপূর্ব্বে 'চিঠি'র পাঠকগণকে শ্রীনবদ্বীচন্দ্র ব্রজবাসী ও শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম, এ, সম্পাদিত 'শ্রীপদামৃত মাধুরীর' কথঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছি। স্থানাভাব বশতঃ ভূমিকার ও গোড়ার দিকের কয়েকটী পদের 'আস্বাদন' দেওয়া হয় নাই। এবার সে ত্রুটি সংশোধন করিলাম।

খগেন্দ্রবাবুর ব্যাখ্যা এবং ব্রজবাসীর পদসংগ্রহ দুইয়ে মিলিয়া কেমন 'মণি-কাঞ্চন' যোগ হইয়াছে পাঠকগণ সেই 'সুশ্রাব্য-দৃশ্য' উপভোগ করুন। সম্পাদকদ্বয়ের প্রতিজ্ঞা—'আমরা বর্ত্তমান-সংকলনে পদগুলির যে শুধু অর্থ দিয়াছি তাহা নহে, আস্বাদন ও কথঞ্চিৎ দিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছি। পদটীকায় এরূপভাবে পদের অর্থ দিয়াছি যাহাতে

সাধারণ পাঠকও ইহার মাধুরী গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়েন। সেইজন্য এই টীকার নাম দিয়াছি 'মাধুরী'। (ভূ।৶০)

'যাহাতে সকলেই অনায়াসে বৈষ্ণব-পদাবলীর মাধুর্য্য উপভোগ করিতে পারেন, তাহার জন্য বহু শ্রম সহকারে অর্থ ও টীকা যোজনা করিয়াছি'। (ভূ ৮৶০)

'এই গ্রন্থখানিতে আমরা যেরূপভাবে পদের অর্থ দিয়াছি, তাহাতে কীর্ত্তনীয়াগণ এ বিষয়ে অনেক সাহায্য পাইবেন বলিয়া আমরা আশা করি'। (ভূ ১৲)

উপরের 'এ বিষয়ে' অর্থে সম্পাদকদ্বয় বুঝাইয়াছেন 'কীর্ত্তনগানে ভাল 'আখর' দেওয়ার বিষয়ে।' অর্থাৎ কিনা তাঁহাদের এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে কি 'গোলা লোক' কি সমজদার পাঠক আর কি কীর্ত্তন-গায়ক পদাবলী সম্বন্ধে কাহারো কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিবে না! প্রথমে ভূমিকার একটু পরিচয় দিয়া তারপর এই 'আস্বাদন এবং অর্থ ও টীকা যোজনার' আরো একটু নমুনা দিব। খগেন্দ্রবাবু দার্শনিক বলিয়া শিক্ষিত সমাজে তাঁহার প্রসিদ্ধি আছে। শুনিয়াছি খগেন্দ্রবাবুর বিরচিত ভারতবর্ষের ইতিহাস নামক গ্রন্থ ও বঙ্গের বালক বালিকাগণ কখনো কখনো অতি আদরে অভ্যাস করিতে বাধ্য থাকে। সুতরাং একাধারে 'দার্শনিকৈতিহাসিক' রসভাবমন্দাকিনী খগেন্দ্রবাবুর ভূমিকা যে অপূর্ব্ব হইবে সে বিষয়ে সংশয়ের স্থান কোথায়? পাঠক পরিচয় লউন।

'বঙ্গসাহিত্যে এখনও গীতিকবিতার যুগ চলিতেছে বলা যায়। এই যুগের আদি গুরু চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি'। (ভূ ১৲) ইহার পর লিখিত আছে—'জয়দেবের সময় হইতে বঙ্গসাহিত্যে যে যুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহাকে গীতি-কবিতার যুগ বলা হইয়াছে'। (ভূ ১৶০)

এই এখনই 'বলা যায় আদি গুরু চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি,' আবার

পরক্ষণেই বলা হইয়াছে 'জয়দেবের সময় হইতেই বঙ্গসাহিত্যের গীতি-কবিতার যুগ।' ইহার মধ্যে কোন্‌টা সত্য? আমরা কিন্তু ভূমিকার মধ্যে গীতিকবিতার প্রসঙ্গে জয়দেবের নাম-গন্ধও খুঁজিয়া পাইলাম না।

একটা কথা বলিয়া রাখি, যদিও ভূমিকার নীচে কাহারো নাম লেখা নাই, তথাপি ইহার লিখনভঙ্গী খগেন্দ্রবাবুরই কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বিশেষতঃ "ক্যালিডোস্কোপের" উপমায় এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। (ভূ ॥/০)

এইবার ঐতিহাসিক খগেন্দ্রবাবুর কীর্ত্তনের ইতিহাস আলোচনায় দার্শনিক যুক্তি-প্রণালীর বহর দেখাইতেছি।

'ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে ইহার পূর্ব্বে সংকীর্ত্তন ছিল না।' (ভূ ১।/০) ['ইহার পূর্ব্বে' অর্থে 'মহাপ্রভুর পূর্ব্বে'] 'ইহা নিঃসন্দেহ-রূপে বলা যাইতে পারে যে মহাপ্রভুর সময় হইতেই সংকীর্ত্তনের আরম্ভ গণনা করা হয়'। (ভূ ১॥০) ইহার পরই বলিতেছেন—'ইহা হইতে বুঝা যায় যে মহাপ্রভুর পূর্ব্বে কীর্ত্তন অপরিজ্ঞাত ছিল না।' (ভূ ১॥০) আচ্ছা, ব্যাপারখানা কি? প্রথমে হইল 'অনুমান করা', দ্বিতীয় দফায় হইল, 'নিঃসন্দেহরূপে'। আমরা ভাবিলাম, যাই হৌক একটা গোলমাল মিটিয়া গেল! কিন্তু পরক্ষণেই এ-কি? 'বুঝা যায়' বলিয়া একেবারেই ডিগবাজী! বুঝিবার দার্শনিক পদ্ধতি কি এবম্বিধ? না ঐতিহাসিক চতুষ্পদসকলের চলনই এবম্প্রকার?

কেলেঙ্কারীর এইখানেই শেষ হয় নাই, ইহার পর খগেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন—'ইহা হইতে মনে হয় তিনি যেন একটি নূতন প্রথার প্রবর্ত্তন করিলেন, পূর্ব্বে যাহা লোকের নিকট অপরিজ্ঞাত ছিল।' (ভূ ১॥/০) এই কথার পর লিখিতেছেন—'কিন্তু ইহার কোনও স্থলে আমরা এমন কথা পাই না যে মহাপ্রভু অত্যাশ্চর্য্য বা নূতন কিছু

করিতেছেন। অথচ মহাপ্রভু যে কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।' (ভূ ১॥৴০—১॥৵০) 'ইহা হইতে অনুমান হয় যে সে সময়ে লীলা-কীর্ত্তন বা রসকীর্ত্তনের প্রচলন ছিল।' (ভূ ১॥৵০) কীর্ত্তনের ইতিহাস আলোচনার উপক্রম ও উপসংহারের কি অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য! উপরোদ্ধৃত খগেন্দ্রবাবুর মন্তব্য সমূহ হইতে সিদ্ধান্ত হয়—(১) 'অনুমান করা যায় শ্রীপদামৃত মাধুরীর পূর্ব্বে কোনো পদাবলীর পুঁথি প্রচলিত ছিল না।' (২) 'নিঃসন্দেহরূপে বলিতে পারা যায়, শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী ও শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম, এ, মহাশয়দ্বয়ই আস্বাদন সহ এইরূপ গ্রন্থ প্রথম প্রকাশ করেন।' (৩) 'বুঝা যায় পরিষদ কর্ত্তৃক প্রকাশিত সতীশ-চন্দ্র রায় মহাশয় সম্পাদিত পদকল্পতরু দেখিয়াই খগেন্দ্রবাবুর এই প্রাংশু-লভ্য ফলে লোভাতুর উদ্বাহু বামনের মত পদব্যাখ্যাতারূপে পরিচিত হইবার দুরাশা জাগ্রত হয়, কিন্তু বিধি বাদী, বিদ্যায় কুলাইল না।'

অতঃপর দুই একটী পদের টীকা যোজনা, ব্যাখ্যা এবং আস্বাদনের পরিচয় দিয়া এই অপ্রীতিকর আলোচনার শেষ করিতেছি। পৃঃ ৩০—৩১, তিরোভাব উৎসবের অধিবাস পদ—

শ্রীপদ কমল সুধারস পানে।
শ্রীবিগ্রহ গুণ গান করু গানে॥
শ্রীমুখ বচন শ্রবণ অনুষঙ্গী।
অনুভবি কত ভেল প্রেম তরঙ্গী॥

এই কয় পংক্তির টীকা বা ব্যাখ্যা বা আস্বাদন এইরূপ—'মহাপ্রভুর পদকমল সুধা পান করিয়া শ্রীসচ্চিদানন্দ বিগ্রহের গুণ গান কর। তাঁহার শ্রীমুখবচন শ্রবণ করিয়া কত লোক প্রেম তরঙ্গে ডুবিয়াছে।' 'পানে' অর্থে যদি 'পান করিয়া' হয়, তবে 'গানে' অর্থে কি হইবে? এখানে গানের সঙ্গে 'করু' শব্দের যোগে ব্যাকরণ বাঁচে তো? প্রকৃত পাঠ—

'শ্রীবিগ্রহ গুণ গণ করি গানে', কারণ 'অনুভবি কত ভেল প্রেম তরঙ্গী' এই পংক্তিটীর সঙ্গেই প্রথম তিন পংক্তির অন্বয় হইবে। অর্থ এইরূপ— 'শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীপদকমলসুধা পান, ও সেই শ্রীবিগ্রহের গুণাবলী গান করিয়া, এবং তাঁহার শ্রীমুখবাক্যে নিবিষ্ট কর্ণ কত ভাবুক প্রেমাকুল-চিত্ত হইয়াছেন।'

শ্রীপদামৃত মাধুরীতে এই পদের ধ্রুবকলি এইরূপ লিখিত আছে—

'আরে মন কাঁহে করসি অনুতাপ।
পহুকো প্রতাপ মন্ত্র করি জাপ॥'

'কাঁহে' কোন্ দেশী শব্দ? এ চন্দ্রবিন্দু কে আমদানী করিয়াছেন, ব্রজবাসী না খগেন্দ্র বাবু? উপরোক্ত পাঠে পদটীর মানে হয়—'আরে মন প্রভুর প্রতাপ মন্ত্র জাপ করিয়া কি জন্য অনুতাপ করিতেছিস!' মন্ত্র জাপ করিয়া অনুতাপ করা বোধ হয় পদকর্ত্তার অভিপ্রেত নয়। পাঠ হইবে—

'পহুকো প্রতাপ মন্ত্র করু জাপ।'

অর্থ হইবে 'কেন অনুতাপ করিতেছিস্, প্রভুর প্রতাপ মন্ত্র জাপ কর।'

'রঙ্গ তরঙ্গী সঙ্গী হরিদাস।
রতি মণি দেই পূরব অভিলাষ॥'

পদের অর্থ করিয়াছেন—'শ্রীরাধা-কৃষ্ণ লীলারূপ সমুদ্রে ডুব দিলে বিশুদ্ধ রতি অর্থাৎ প্রেমরূপ রত্ন পাওয়া যায়।' খগেন্দ্রবাবুর আস্বাদন, —এ কি সহজ কথা! কিন্তু খগেন্দ্রবাবুর বুঝা উচিত ছিল সকলেই ডুবুরী হইতে পারে না! আর সকলেরই ব্রজবাসী সাথী মিলে না! আস্বাদনে বুঝি সাধুসঙ্গের আবশ্যকতা থাকে না। পদকর্ত্তা বলিতেছেন '—রঙ্গতরঙ্গী (অর্থাৎ গৌরলীলারসে উদ্বেলিত হৃদয়) ব্রহ্ম হরিদাস

তোমার সঙ্গী হইবেন। তিনি রতি (প্রেম) রূপ মণি দান করিয়া তোমার অভিলায পূর্ণ করিবেন।' এই কথাগুলি লিখিলে কি সাধারণ পাঠক বা কীর্ত্তন-গায়ক, কাহারো বুঝিবার ব্যাঘাত ঘটিত, না আস্বাদনের অঙ্গহানি হইত ?

পৃঃ ৩৪, শ্রীরাধিকার বাল্য পূর্ব্ব-রাগের শ্রীগৌরচন্দ্রিকা।

'দেখ দেখ সই মুরতিময় দেহ'

কবিওয়ালা নিতাই বৈরাগীকে কে একজন ওস্তাদ বলিয়াছিলেন—'তোরে গাল' দেব কি বলে।' তুই জা'ত ব'রেগীর ছেলে॥' ব্রজবাসীকেই বা কি বলিব ? আর খগেন্দ্র বাবু ? এই মুখে ভোগ কর * * * ? ইহাতেই এত স্পর্দ্ধা ? 'মুরতিময় দেহ' কি বস্তু দয়া করিয়া সম্পাদকদ্বয় বুঝাইয়া বলিবেন কি ? মূর্ত্তির সঙ্গে দেহের পার্থক্য কি প্রকার পাঠ হইবে—

'দেখ দেখ সেই মুরতিময় মেহ'

মুরতিময় মেহ নয় মেঘ !

কাঞ্চন কাঁতি স্থধা জিনি মধুরিম
নয়ন চসক ভরি লেহ॥

'ইহার কাঞ্চন কান্তি এবং অমৃতজয়ী মাধুর্য্যে নয়নরূপ পানপাত্র পূর্ণ করিয়া লও।' মেঘের রং তো সোনার মত হয় না, তাই বলিয়াছেন সেই মেঘ ! পদকর্ত্তা আরো স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—

শ্যামল বরণ মধুর রয় ঔযধি
পূরব যো গোকুল মাহ
উপজল, জগত যুবতী উমতাওল—
যো সৌরভ পরবাহ॥

এখন খগেন্দ্রবাবু বুঝিতে পারিবেন যে 'সই মুরতিময় দেহ' প্রকৃত পাঠ নয় ; পাঠ—সোই মুরতিময় মেহ।'

ব্রজবাসী পাঠ ধরিয়াছেন—

যো রস বরজ গোরী কুচ মণ্ডল
বরে কমল কর রাখি।
তে ভেল গোর গৌড় অব আওল
প্রকট প্রেম সুখ সাখি ॥

কোন মানে হয় কি? গোরীকুচমণ্ডলবরে কমল কর রাখিয়া তিনি গৌর হইলেন? ইহারা কেন পদ লইয়া আলোচনা করিতে আসে? পূর্ব্বে পদকর্ত্তা বলিয়াছেন, সেই মেঘ এবং এখন তাঁহার কাঞ্চন কান্তি। উপরের পংক্তিতে তাহারই রহস্য বর্ণিত হইয়াছে। পাঠ হইবে—

যো রস, বরজ— গোরী কুচমণ্ডল
মণ্ডলবর করি রাখি।
তে ভেল গোর গৌড় অব আওল
প্রকট প্রেম-সুখ-সাখি ॥

'যে রস স্বরূপ ব্রজগোরী-কুচমণ্ডল শ্রেষ্ঠ মণ্ডল অলঙ্কার করিয়া রাখিয়াছিলেন, (ব্রজগৌরাঙ্গিণীর আলিঙ্গনে) তিনিই গৌর হইয়া গৌড়মণ্ডলে আসিয়াছেন। সেই প্রেমানন্দের সাক্ষীস্বরূপে প্রকট হইয়াছেন।' 'প্রকট প্রেমসুর শাখী' (প্রেম কল্পদ্রুমরূপে প্রকট হইয়াছেন) এ পাঠান্তরও পাওয়া যায়। এই পাঠ ধরিতে হইলে আরম্ভের পংক্তির পাঠ ধরিতে হইবে 'দেখ দেখ সোই মূরতি প্রেম এহ।' এই পাঠ অনুসারী ব্যাখ্যাও আছে। 'শ্যামল বরণ মধুর রয়

ঔষধি' ইত্যাদি পংক্তিরও ঐ প্রেমকল্পদ্রুম পক্ষের ব্যাখ্যা হইবে। ব্রজবাসী শেষ দুই পংক্তির পাঠ ধরিয়াছেন—

'সকল ভুবন সুখ কীর্ত্তন সম্পদ
নিত্য হরল দিন রাতি।
ভবদর লোকন কলি কলুষ মাহা
হরি বল্লভ নাহি ভাতি॥'

খগেন্দ্রবাবু আস্বাদন করিয়াছেন—'ভব ভয় অবলোকন করিয়া পদকর্ত্তা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছেন না যে কলির পাপরাশির মধ্যে কি উপায় হইবে'! (!-চিহ্ন খগেন্দ্রবাবুই ব্যবহার করিয়াছেন)

সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়িয়া শেষে সীতা রামের কে? শ্রীমন্ মহাপ্রভুর এত জয়গান করিয়া, তাঁহার সুধা জিনি মধুরিমা নয়ন চসক ভরি লইতে বলিয়া পদকর্ত্তা এখন ভবভয় অবলোকন করিয়া কলির পাপরাশির মধ্যে কি উপায় হইবে ঠাহরাইতে পারিতেছেন না? এই প্রসিদ্ধ পদটী সুপ্রসিদ্ধ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী-পাদের রচিত। তিনি 'হরিবল্লভ' এই ভণিতা দিয়া পদরচনা করিতেন। 'হরিবল্লভ নাহি ভাতি' মানে কি 'হরিবল্লভ স্থির করিতে পারিতেছেন না কি উপায় হইবে?' ভাতি মানে কি উপায়? ভূমিকায় তো খুব লম্বাই-চওড়াই, ভাষার বিশ্লেষণ! আর এখানে?

ব্রজবাসী-ধৃত পাঠে সোজা অর্থ হইবে—'ভবভয় দর্শক কলি-কলুষ মধ্যে হরিবল্লভ প্রকাশ পাইতেছেন না।' স্মরণ রাখিতে হইবে 'হরিবল্লভ' নামটী শ্লিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এক অর্থে শ্রীগৌরাঙ্গ দেব, অপর অর্থে পদকর্ত্তা। সুতরাং কলিকলুষ মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকাশ পাইতেছেন না এ অর্থ একান্তই অসঙ্গত। প্রকৃত পাঠ—

'সকল ভুবন সুখ কীর্ত্তন সম্পদ
মত্ত রহই দিন রাতি।
ভবদব কোন্ কোন্ কলি কল্মষ
যাঁহা হরিবল্লভ ভাতি॥'

'(সেই শ্রীগৌরাঙ্গ) সকল ভুবনের সুখস্বরূপ কীর্ত্তন সম্পদে দিবারাত্রি মত্ত রহিলেন। যেখানে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকাশ, সেখানে ভবদাবানলই বা কি, আর কলিকল্মষই বা কি?' 'ভাতি' অর্থে প্রকাশ, শোভা, ভঙ্গী, কৌশল, ইত্যাদি নানারূপ বুঝায়, আবার 'ভাল লাগা'ও বুঝায়। সুতরাং হরিবল্লভ অর্থে পদকর্ত্তা পক্ষে ব্যাখ্যা হইবে 'যেখানে হরিবল্লভের ভাল লাগে, অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা স্মরণে আনন্দযুক্তচিত্তে ভবদাবানল ও কলিকল্মষ তুচ্ছবোধ হইতেছে।'

আর একটী পদের খগেন্দ্রবাবুর আস্বাদন উদ্ধৃত করিতেছি। পৃষ্ঠা ৬১—

'নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাব কদম্ব॥'

'মহাপ্রভুর চক্ষু মেঘের মত কারণ অবিরল জলধারা বর্ষণ করিতেছে।'

'সেই বারি সিঞ্চনে অঙ্গে পুলক মুকুল (রোমাঞ্চ) উদ্গত হইয়াছে।'

'ঘামরূপ মধুক্ষরণে ভাবরূপ কদম্ব সমূহ ফুটিয়া মহাপ্রভুর অঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিতেছে।'

'মহাপ্রভুর চক্ষু মেঘের মত' একেবারে আস্বাদনের চরম। ইহা আরো চরমে উঠিয়াছে ঐ 'ঘামরূপ মধুক্ষরণে ভাবরূপ কদম্ব সমূহ

ফুটিয়া'! কেন সোজা অর্থ করিলে কি আস্বাদনের মুণ্ডপাত হইত? সোজা অর্থ তো এই—'শ্রীমান্ মহাপ্রভুর নীরবর্ষী (মেঘরূপ) নয়নের অশ্রু সেচনে (অঙ্গে) পুলকরূপ মুকুল উদ্গত হইয়াছে। তাহা হইতে ঘামরূপ মধু বিন্দু বিন্দু চুয়াইয়া (ঝরিয়া) পড়িতেছে। (অশ্রু, পুলক, স্বেদরূপ) ভাবকদম্ব বিকশিত হইয়াছে।' মুকুল হইতেই মধুক্ষরণ অদ্ভুত। খগেন্দ্রবাবু অত্যদ্ভুত করিয়া ছাড়িয়াছেন। ঘামরূপ মধুক্ষরণে ভাবরূপ কদম্ব সমূহ ফুটিয়া!

খগেন্দ্রবাবুকে জিজ্ঞাসা করি শব্দটা 'পূর্ণমাসি' না পৌর্ণমাসী'? ৩৫, ৩৭, ৪২, ৪৩, পৃষ্ঠায় 'পূর্ণমাসি'ই দেখিলাম। ৪৭ পৃষ্ঠায় 'বৃন্দা কহে রাণী' পাঠ হইবে না, হইবে 'বৃন্দা কহে বাণী।' ৪৯ পৃষ্ঠায় 'বিনোদ নতুনী' শব্দের কোনো অর্থ হয় না। শব্দটী 'বিনোদন তুলী' বস্তটী 'অক্ষত' 'দুর্ব্বাক্ষত'। দেবতার অর্ঘ দিবার জন্য আতপ-তণ্ডুল ও দুর্ব্বা তুলায় জড়াইয়া এই অক্ষত প্রস্তুত হয়। অনেকে এই দেবনির্ম্মাল্য উত্তরীয় প্রান্তে বাঁধিয়া রাখেন। অনেকে কোনো স্থানে যাত্রার পূর্ব্বে ইহা নাসায় ও মস্তকে স্পর্শ করিয়া থাকেন। ইহাতে চন্দন, কুঙ্কুম, কর্পূর মৃগনাভি আদি নানারূপ গন্ধদ্রব্য মাখানো থাকে। ৫৩ পৃষ্ঠায় 'ফুলয়ে গাথনী' পাঠের কি অর্থ হইবে? প্রকৃতপাঠ 'ফুল যে গাঁথনী' অথবা 'ফুলের গাঁথনী।

পুস্তকখানিতে অনেক কঠিন কঠিন শব্দের মানে দেওয়া হইয়াছে। যথা—বড়ু—ব্রাহ্মণ (৫৭ পৃঃ) জোর—জোড়া (২৬৯ পৃঃ) লোর—অশ্রু (৩৩৭ পৃঃ) স্বপনেহ—স্বপ্নেও (৩৩৭ পৃঃ) কাঞ্চন যুথি—স্বর্ণযুথী (হিন্দী সোনা জুহি) (৩৪৬ পৃঃ) পরবোধি—নানা প্রকারে প্রবোধ দিয়া (৩৩৬ পৃঃ) গহনে—বনে (৪৪২ পৃঃ) আনলে—অনলে (৪৭৯ পৃঃ) ইত্যাদি। আমাদের সৌভাগ্য বশত সোনা জুহীর মত ঐ সব শব্দের

হিন্দী প্রতিশব্দ দিতে খগেন্দ্রবাবুর 'মনে ছিল না'! দুঃখের বিষয় বইখানির মধ্যে 'চসক' ৩৪ পৃঃ ঝামর ৫৭ পৃঃ হৃদয়বলনি ৮৫ পৃঃ করভ ১৭৫ পৃঃ নবরঙ্গ ২৬৯ পৃঃ বীজকপোর ২৬৯ পৃঃ প্রভৃতি শব্দের অর্থ দেখিলাম না। বিশেষ নবরঙ্গ যে কমলালেবু বীজকপোর যে ডালিম ইহা বুঝিতে আমাদের মত সাধারণ লোককে অভিধান খুলিতে হইবে। 'বহুশ্রম স্বীকারে অর্থ ও টীকা যোজনা করিয়াছেন,'—তবে ?

আমরা 'আস্বাদন সহ শ্রীপদামৃত-মাধুরীর দ্বিতীয় খণ্ডের' আশাপথ চাহিয়া রহিলাম। নিবেদন ইতি

নারী-নির্য্যাতন

চটকের ভাবদীক্ষিত যে ভক্তটির উল্লেখ ইতিপূর্ব্বে করিয়াছি তাহার একটু সবিস্তার-পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। অতি সংক্ষেপে এবং অবলীলাক্রমে লিখিয়া যাইতেছি, গল্পও হইতে পারে, উপন্যাসও হইতে পারে, ইতিহাস হওয়াও বিচিত্র নহে।

সোমেন সমাদ্দার। য়ুনিভার্সিটির পঞ্চম বার্ষিক ইংরেজী শ্রেণীর ছাত্র। 'জীবনাঙ্ক সঙ্ঘে'র প্রেসিডেণ্ট। সঙ্ঘের নির্দ্ধারণ ছিল যে সমস্ত জীবনটাই একটা প্রকাণ্ড নাটক; প্রতি দিবস তাহার নব নব দৃশ্যপট; মানব মানবী প্রত্যেকেই নট নটী। আহারে বিহারে সর্ব্ব-বিষয়ে এই নাটকীয় অনুভূতির উপলব্ধিই মানব জীবনের চরম লক্ষ্য। চটক ছিল এই সঙ্ঘের পেট্রণ, কিছু টাকাও দিয়াছিল; কিন্তু সোমেন

সহসা সঙ্ঘের নীতি বহির্ভূত একটা গর্হিত কাজ করিয়া ফেলিল। জীবনাঙ্ক সঙ্ঘের জীবনান্ত হইল, বন্ধুবিচ্ছেদ হইল, ভবিষ্যতে সোমেনের এই দুষ্কর্ম্মের ফল ফলিলে কি হইবে কে জানে? যাহা হইবার হইবে, এখন তাহার জন্য চিন্তা করিয়া লাভ নাই—যাহা বলিতে ছিলাম—

চটকের ভাবদীক্ষিত শিষ্য ও বন্ধু সোমেন। থার্ডক্লাশ হইতে চটকের সঙ্গে রীতিমত থিয়েটার ও বায়স্কোপ দেখিয়া ফিরিতেছে। প্রতিজ্ঞা করিয়াছে বিবাহ আদৌ করিবে না, হলিউডের কোনও রূপসী আসিয়া পাণি প্রার্থনা করিলেও—না। সোমেনের দিদিমা ও বৌদিদি উভয়েই বাবা তারকনাথের মানৎ করিয়াছিলেন কিন্তু সোমেনের মতের পরিবর্ত্তন হইল না। তবে একবার দিদিমা জোর করিয়াই তাহাকে পাত্রী দেখিতে পাইয়াছিলেন কিন্তু তাহার ফল ভাল হয় নাই।

ব্যাপারটা এইরূপ; শিবরাত্রির রাত্রে চন্দ্রশেখর অভিনয় দেখিয়া সোমেন বাড়ীতে ফিরিয়া দেখিল, বারান্দায় শৈলি ঝি—ভাল নাম শৈবলিনী—অঘোরে ঘুমাইতেছে। নিদ্রিতা শৈলিঝিকে দেখিয়া সোমেন প্রতাপের ভাবে আবিষ্ট হইয়া পড়িল; রেলিংএ ভর দিয়া ডান হাত তুলিয়া সে কহিয়া উঠিল, 'এ কি সেই শৈবলিনী? বাল্যকালে যার সঙ্গে—শৈবলিনী—শৈ—' শৈলি ঝি হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। দিদিমা শিবমন্ত্র ভুলিয়া ছুটিয়া আসিলেন। বৌ-দিদি কাঁদিয়া কাটিয়া সোমেনের মাথায় জল ঢালিলেন। পরদিন বৌ-দিদি ও দিদিমা উভয়ে যুক্তি করিয়া উপবাস করিয়া রহিলেন, বাধ্য হইয়া সোমেন পাল পাড়ার বিশ্বাসদের বাড়ী কনে' দেখিতে গেল। তলে তলে বিবাহের কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। ক'নে সাজিয়া গুজিয়া আসিয়া দাঁড়াইতেই সোমেন তাহার বাঁ হাত খানি মুঠা করিয়া ধরিয়া কহিল,

'——ব্রহ্মচারী ব্রতধারী আমি
পতিযোগ্য নহি বরাঙ্গনে !'

কনে'টি থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, বেদনায় অথবা লজ্জায় জানি না। কনে'র দাদা অবিনাশ হাঁ-হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিল কিন্তু ফার্ষ্ট ক্লাশ ফার্ষ্ট সোমেন সমাদ্দারের গায়ে সেকেণ্ড ইয়ারের ফেল করা ছেলে হাত দিতে সাহস করিল না। সোমেন সহসা দ্রুতপদে বাহিরে আসিয়া ট্রাম ধরিল এবং বাড়ীতে আসিয়া বৌদি এবং দিদিমাকে শাসাইল যে ইহার পর এ বাড়ীতে যদি কেহ তাহার বিবাহ সম্বন্ধে আলাপ করে তাহা হইলে সে খালধারের নিষ্ক্রিয়ানন্দ মঠে গিয়া সন্ন্যাস লইবে।

দিদিমা বত্রিশ পাটী দাঁতের অবশিষ্ট সম্মুখের দুটি দাঁত দিয়া জিভ কাটিয়া কহিলেন, 'ষাট্! ষাট! ও কথা বলিস্‌নে মাণিক!' সোমেন পড়ার ঘরের দরজা সশব্দে বন্ধ করিয়া কহিল, 'বল্‌ব! সহস্রবার বল্‌ব! আকাশের চন্দ্রতারা সাক্ষী! স্বর্গে মন্দাকিনী সাক্ষী—' আর শোনা গেল না, জানালাটিও বন্ধ হইয়া গেল, রান্না ঘরে বসিয়া বৌদিদি আরব্যোপন্যাসের খোলা পাতার উপর মুখ রাখিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ইহার পর হইতেই বাড়ীতে সোমেনের বিবাহ-প্রসঙ্গ একেবারে বিবর্জ্জিত হইল, ভূমিকা এই পর্য্যন্ত।

২

এখন কাহিনীর পালা।

সেদিন আষাঢ়ের প্রথম দিবস। নবমেঘভারে আচ্ছন্ন নীল আকাশ যেন একটি তরুণীর সর্ব্বাঙ্গ বেড়িয়া একখানি গাঢ়নীল শাড়ীর অঞ্চল।

বিদ্যুৎ চমকাইতেছে যেন—সেই অঞ্চলে খচিত মণিমালা। আকাশে মেঘের গর্জ্জন নীচে ট্রামের ঘর্ঘর আর গলির মোড়ে মোড়ে গরম চানাচুর-ওয়ালার অশ্রান্ত চীৎকার। সোমেন এক ঠোঙ্গা চানাচুর লইয়া বাসে উঠিল। দশটার বাস্-পরিপূর্ণ যাত্রী-সমারোহ। পিছনের বেঞ্চির এককোণে একটু স্থান করিয়া লইয়া সোমেন বসিল। বাস চলিতে চলিতে থামিয়া গেল। হাতে বহি আর খাতা লইয়া উঠিল এক অষ্টাদশী। গাড়ীশুদ্ধ সমস্ত যাত্রীই একবার ঘাড় বাঁকাইয়া দেখিয়া লইল, শুধু সোমেন দেখিল নির্ব্বিকারভাবে। গাড়ী চলিল। মেয়েটি একবার চাহিয়া সোমেনের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া লোলুপ দৃষ্টিতে সোমেনের পাশের বহির গাদার দিকে চাহিল। বহিগুলি তুলিয়া লইলে তন্বীর স্থান হয় কিন্তু অত কাছাকাছি! ঘৃণায় সোমেনের সর্ব্বাঙ্গ কাঁটা দিয়া উঠিল। সে বহি লইয়া উঠিয়া গাড়ীর দেয়াল ঠেস দিয়া দাঁড়াইল এবং তরুণী অবলীলাক্রমে বসিয়া পড়িয়া কহিল, 'থ্যাঙ্ক্‌স্! কোথা যাচ্ছেন?'

সোমেন হাতের বইগুলিকে নির্দ্দয়ভাবে টিপিয়া ধরিয়া কহিল, 'চুলোয়।'

তরুণী কহিল, 'সেটা বুঝি দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংএ?

সোমেন তেমনি নির্ব্বিকারভাবে কহিল, 'হ্যাঁ।'

তরুণী কহিল, 'চলুন, আমিও যাচ্ছি।'

সোমেন কহিল, 'থ্যাঙ্কস্!'

দু'জনেই এক ক্লাশে পড়ে, মুখ দেখাদেখি ছিল, আলাপ হইল এই প্রথম।

কমলা—সেও ফার্ষ্ট ক্লাশ তবে সোমেনের দুই ধাপ নীচে। সোমেনের সহিত আলাপ করিবার ইচ্ছা তাহার বরাবরই ছিল, পড়াশুনার সুবিধা

হইবে বলিয়া। কিন্তু সোমেনের রীতি-প্রকৃতির কথা শুনিয়া কাছে ঘেঁসে নাই। দৈবক্রমে পরিচয় হওয়াতে সে খুসী হইল। সোমেনকেও চিনিয়া ফেলিল।

বাস হইতে নামিয়া হন্‌হন্‌ করিয়া সোমেন তেতলায় উঠিল, উঠিয়াই দেখিল দরজার কাছে কমলা দাঁড়াইয়া! সে লিফ্‌টে উঠিয়াছে। সোমেনকে দেখিয়াই সে চানাচুরের ঠোঙ্গাটি আগাইয়া দিয়া কহিল, 'নিন্‌! বাসে ফেলে এসেছিলেন।'

এই অসঙ্গত ঘনিষ্ঠতার চেষ্টা দেখিয়া সোমেন রাগিয়া গেল, কহিল 'চাইনে। টিফিন কর্ব্বেন।' কমলা কহিল, 'থ্যাঙ্ক্‌স্‌!'

আরও মিনিট পাঁচেক পরের কথা। সোমেন নিবিষ্টমনে কি লিখিতেছিল, কমলা পিছন হইতে আসিয়া কহিল, 'আপনার পেন্সিলটা!' সোমেন একবার চাহিল তারপর মনে মনে দাঁত খিঁচাইয়া পকেট হইতে একটা পয়সা বাহির করিয়া ডেস্কের উপর রাখিয়া কহিল 'কিনে নিন্‌ গে।' কমলা পয়সটা তুলিয়া লইয়া কহিল, 'থ্যাঙ্কস্‌!'

তারপর বেলা চারটে। সোমেন লাইব্রেরীতে বসিয়া Apologiaর একটি নূতন সংস্করণ হইতে নোট করিতেছিল, কমলা আসিয়া খোলা বহিখানার উপর একটা পয়সা ফেলিয়া দিয়া কহিল, 'চানাচুরের পয়সাটা'। বহির উপর এক ঘুঁষি মারিয়া সোমেন দাঁতে ঠোঁট্‌ চাপিয়া কহিল—'ড্যা—'তারপর সম্মুখে অকস্মাৎ জয়গোপালবাবুকে দেখিয়া কহিল'—অ্যাঙ্ক্‌স্‌।'

কমলা পিছন হইতে মৃদুস্বরে কহিল, 'ড্যাঙ্কস্‌!' এবং ঈষৎ হাসিয়া বাহির হইয়া গেল।

সোমেনের সম্মুখের বহিখানার ইংরাজী অক্ষরগুলি ফারসীর মত জড়াইয়া যাইতে লাগিল। সেদিন আর নোট লেখা হইল না।

সন্ধ্যাকালে দিদিমার সহিত বৌদিদি ছাতে আসিয়া দেখিলেন যে সোমেন কারারুদ্ধ জগৎসিংহের মত পাদচারণা করিতেছে ও বলিতেছে—

'কমলা, এঁটেকলা, কাণমলা—হুঁ! হুঁ!' লেখক বুঝিলেন যে এই অস্থিরতার হেতু ছন্দ না মিলিবার দরুণ, দিদিমা বুঝিলেন যে তাঁহার নাতির কমলালেবু খাইবার সাধ হইয়াছে, বৌদিদি বুঝিলেন যে কমলা কাহারও নাম। দিদিমা ও বৌদিদি কোনও কথা না কহিয়া নিঃশব্দে নামিয়া গেলেন, কিন্তু আমি লেখক বাধ্য হইয়া কাহিনী সমাপ্তির জন্য অশরীরী অবস্থায় সোমেনের সহিত রহিয়া গেলাম এবং ঘণ্টাখানেকের মধ্যে দেখিলাম যে জগতের যাবতীয় অভব্য অমেধ্য '-লা' সংযুক্ত শব্দের সহিত কমলার নাম সংযুক্ত করিয়া দিব্য একটি কবিতার সৃষ্টি হইল এবং প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিয়া ইজিচেয়ারে শুইয়া সোমেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল!

৩

পরদিন। প্রোফেসার আসিবার দেরী ছিল। কমলা আর তাহার সহাধ্যায়িনীরা যে বেঞ্চিটাতে বসে, সোমেন আপনার অজ্ঞাতসারেই ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে বারবার সেইদিকে চাহিতেছিল, এমন সময় ডানদিক হইতে প্রশ্ন আসিল, 'আজ মেজাজ কেমন আছে সোমেনবাবু?' সোমেন চাহিয়া দেখিল, কমলা। ঘরভরা ছেলে, চটিয়া উঠিতে পারিল না। কাল সন্ধ্যায় রচিত কবিতার কাগজখানি কমলার হাতে দিয়া কহিল, 'এটা আপনার। নিয়ে যান।' কমলা চলিয়া গেল। যাইবার সময় কহিয়া গেল, 'থ্যাঙ্কস্!' সোমেন মনে মনে গর্জ্জন করিতে লাগিল।

কমলা পরিহাসের উপযুক্ত জবাব পাইয়াছে এই সান্ত্বনা লইয়া সেদিন বায়স্কোপ দেখিয়া সোমেন ফিরিল। ফিরিতেই বৌদিদি চিঠি দিলেন, প্রকাণ্ড একখানি খাম। সোমেন তেতলায় গিয়া চিঠি খুলিল, লেখা আছে—'থ্যাঙ্কস্ ফর ইওর কম্‌প্লিমেণ্টস্! কিন্তু দুঃখ যে আমি ছবি আঁকতে জানি কিন্তু কবিতা লিখতে পারিনে, কাজেই—' ইতি

কমলা

মোটা চৌকা আর্টপেপারে লেখা কয়টি কথা পড়িয়া সোমেন চিঠি উল্‌টাইল, দেখিল একখানি ছবি অবিকল সোমেনের চেহারা, হাতে বই আর মাথায় চানাচুরের ঠোঙ্গা, নীচে লেখা, চানাচুর সমাদ্দার। নির্লজ্জা নারী! হাতের কাছে পাইলে চুলের মুঠা ধরিয়া এমনি করিয়া দুই ঘুষি লাগাইয়া দিই! সোমেন ঘুষি চালাইতে লাগিল। কাহার চিঠি খোঁজ লইতে আসিয়া জানালা দিয়া বৌদিদি দেখিতেছিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ওকি ঠাকুরপো! কাকে ঘুষি মারছ?' উদ্যত ঘুষিটাকে পকেটে লুকাইয়া সোমেন কহিল, 'বিরক্ত কোরো না! একসারসাইজ কচ্ছি।'

বৌদিদি কহিলেন, 'ডাম্বেল কোথায়?' পকেট হইতে হাত বাহির করিয়া মুঠা পাকাইয়া সোমেন কহিল, 'ডাম্বেলে হবে না, এখন মুগুর!'

সোমেনের চোখ দেখিয়া বৌদিদির ভয় হইল, তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেলেন। সোমেন আবার ছবিখানা দেখিল, দেখিল যে এ ছবির কাছে কবিতাটা কিছুই নয়। যেন পিনের আঁচড়ের বদলে ছুরীর খোঁচা।

এমন সময় দিদিমা বাহির হইতে কহিলেন, 'দাদা, আয় তোকে একটু ত্রিফলার জল খাইয়ে দিই।'

সোমেন তীব্রস্বরে কহিল, 'তিনফলাতে হবে না দিদিমা, চৌদ্দফলা ছুরী চাই।' ত্রিফলার বদলে চোদ্দফলা পাওয়া যায় কি না জানিবার জন্য দিদিমা তাড়াতাড়ি আসিয়া শৈলি ঝিকে কৃষ্ণধন কবিরাজের বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন।

৪

ত্রিফলার জল খাইয়াও সেদিন রাত্রে সোমেনের ঘুম হইল না। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া কমলার ধৃষ্টতার উপযুক্ত প্রতিশোধ দেওয়ার উপায় ভাবিতে লাগিল। কবিতাতে আর চলিবে না, কমলার একখানি ফটোগ্রাফ পাইলে কোনও আর্টিষ্টকে দিয়া একখানা কার্টুন আঁকা যায়, ভালই হয় কিন্তু ফোটোগ্রাফ চাওয়া যায় না, সব ফাঁস হইয়া যাইবে! তবে—

উপায় উদ্ভাবনের পূর্ব্বেই ভোর হইয়া গেল। কখনও অ্যাটালাণ্টা, কখনও কমলা, কখনও মিলটন—বিচিত্র বস্তুতে ধাক্কা খাইতে খাইতে মন অবশ হইয়া পড়িতেছিল, তখন দশটা বাজিল। ট্রামে চাপিয়া একরশি পথ গিয়াছে এমন সময় আর একটি তরুণীর সহিত কমলা ট্রামে উঠিল। সোমেন গম্ভীরমুখে বহিগুলি গুছাইয়া নামিবার উপক্রম করিতেছে, কমলা কহিল, 'কোথা যাচ্ছেন?'

সোমেন কহিল, 'চানাচুর কিন্‌তে।' কমলা মুচকি হাসিয়া কহিল, 'আনবেন চাট্টি আমার জন্যে—ড্যাঙ্কস্!' সঙ্গের সহাধ্যায়িনী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। সোমেন চোখ লাল করিয়া নামিয়া গেল।

ঘণ্টাখানেক পর কমলার ডেস্কে চানাচুরের একটি ঠোঙ্গা পৌছিল, কমলা খুলিয়া দেখিল তাহার মধ্যে চানাচুরের পরিবর্ত্তে কলার খোসা,

সে হাসিল। দূর হইতে সোমেন দেখিল, কমলা চটিল না। আঘাতটা লাগিল না দেখিয়া সে একেবারে মুষড়িয়া গেল। ছুটির পর সোমেন গোলদীঘির মোড়ে দাঁড়াইয়া বাসের প্রতীক্ষা করিতেছিল। পিছনে কখন স-সঙ্গিনী কমলা আসিয়া দাঁড়াইয়া মুখ টিপিয়া হাসিতেছিল তাহা লক্ষ্য করে নাই। বাসে উঠিয়া বসিয়াছে; তখন কমলার সহিত চোখোচোখি হইল। কমলা সপ্রতিভভাবে কহিল, 'আপনার খাবার আমাকে পাঠিয়েছেন সোমেনবাবু—তার জন্য থ্যাঙ্কস্!' সোমেন মুখ ফিরাইল, ইচ্ছা হইল মেয়েটাকে দাঁত নখ দিয়া কামড়াইয়া আঁচড়াইয়া টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে!

পরদিন সোমেন কলেজের সময়ের একঘণ্টা আগে বাহির হইল এবং ছুটির আগেই ফিরিল। কলেজে অবশ্য অজ্ঞাতসারে দু-একবার কমলার দিকে চাহিয়াছিল গম্ভীরমুখে, কমলাও চাহিয়াছিল কিন্তু তাহার দৃষ্টিতে কৌতুক আর বিদ্রূপ! এইরূপে প্রায় দিন পনেরো কাটিল। কথাবার্ত্তা না হইলেও তখনও প্রতিশোধ লইবার কল্পনা সোমেনের মগজে বাসা বাঁধিয়াছিল। একটা তুচ্ছ নারী তাহাকে পরাজিত করিয়া স্বচ্ছন্দে তাহারই চক্ষের সম্মুখে বিচরণ করিতে থাকিবে, এ অসহ্য! বৌদিদিকে সমস্ত ঘটনা বলিলে তিনি অবশ্যই প্রতিশোধের একটা সদুপায় উদ্ভাবন করিয়া দিতে পারিবেন এ বিশ্বাস তাহার ছিল, কিন্তু এক নারীকে জব্দ করিবার জন্য অপর নারীর সাহায্য লইতে কিছুতেই মন সরিতেছিল না। শেষে হঠাৎ প্রতিশোধ লইবার এক মহা সুযোগ উপস্থিত হইল।

প্রতিশোধ না লইলেও আর চলিতেছিল না। একে তো প্রত্যহ কমলার সেই অসহ্য কৌতুক-হাস্য, তাহার পর একসঙ্গে বাসে আসিবার ভয়ে ক্রমাগত ক্লাস কামাই করিতে হইতেছে। যেমন করিয়া হোক

চিরকালের মত কমলাকে জব্দ করিতেই হইবে। সেদিন সুযোগও জুটিয়া গেল।

পথের মোড়ে আসিতেই সোমেন দেখিল ক্লাসের আর দুটি ছাত্রীর সহিত কমলা এক ট্যাক্সিতে উঠিয়া হাঁকিল, 'বোটানিক্যাল গার্ডেন।'

সোমেন মিনিটখানেক ধরিয়া কি ভাবিয়া লইল, তাহার পর চলন্ত একখানি ট্যাক্সি থামাইয়া তাহাতে উঠিয়া পড়িয়া হাঁকিল, 'বোটানিক্যাল গার্ডেন।'

বোটানিক্যাল গার্ডেন। কাল সায়াহ্ন। সঙ্গিনীরা গাছপালা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ফিরিতেছিল, একটা বেঞ্চে হেলান দিয়া কমলা বসিয়াছিল। জনপ্রাণী নাই। সোমেন ঝোপ হইতে ঝোপান্তরের অন্তরালে আত্ম-গোপন করিয়া এই সুযোগেরই প্রতীক্ষা করিতেছিল, কমলার সম্মুখে আসিয়াই কহিল, 'খাবেন চানাচুর?'

কমলা চমকিয়া উঠিল, তেমন করিয়া হাসিতে পারিল না, তবু অভ্যাসবশে কহিয়া উঠিল, 'থ্যাঙ্কস্! দিন—'

সোমেন রক্তচক্ষু হইয়া কমলার ডানহাতখানি দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া কহিল, 'ইচ্ছে করে, চুলের মুঠি ধ'রে—'

বলিয়াই সে নিজেই চমকাইয়া উঠিল, দেখিল যে কমলার চুলের গোছা আপানা-আপনিই যেন তাহার বুকের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। কমলা নিস্পন্দ।

হতভম্ব হইয়া ধপ করিয়া সোমেন বেঞ্চির উপর বসিয়া পড়িল। এই সময় কমলা চোখে আঁচল দিল। সোমেন দেখিল, কমলা কাঁদিতেছে। হাতের মুঠা খুলিয়া শশব্যস্তে কহিল, 'হাতে লেগেছে?' কমলা হাত না সরাইয়াই কহিল 'না।' সোমেন কিছুই বুঝিল না, কহিল 'তবে—'

কমলা চোখ হইতে আঁচল না খুলিয়াই কহিল, 'ছবিটা ছিঁড়ে ফেলে দেবেন—আর ক্ষমা—'

সোমেনের কথা জোগাইল না। নির্ব্বাক্ হইয়া বসিয়া রহিল। সহসা দূরে হাসির শব্দ শুনিয়া তাহার চমক ভাঙ্গিল। দেখিল কমলারই দুই সঙ্গিনী হাসিতেছে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া সে কহিল, 'হাত মচ্‌কে গেছে—টিনচার আইয়োডিনের পটি একটা—' বলিয়া কমলাকে দেখাইয়া দিয়া সে অন্তর্হিত হইয়া গেল। দূর হইতে একবার চাহিয়া দেখিল যে মুখ নীচু করিয়া কমলা দাঁড়াইয়া আছে।

* * *

তেতলার ঘরে ঢুকিয়াই সোমেন দেখিল যে বৌদিদি কমলার আঁকা সেই ছবিখানা দেখিতেছেন আর হাসিতেছেন। সোমেন কহিল, 'বৌদিদি! সর্ব্বনাশ করেছি!'

বৌদিদি চমকাইয়া উঠিলেন, কহিলেন 'কি!'

সোমেন বিছানায় চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িয়া কহিল, 'নারী-নির্য্যাতন!' বৌদিদি সভয়ে কহিলেন, 'নাটক রাখ ঠাকুরপো! বড্ড ভয় করে আমার!' সোমেন চোখ বুজিয়া কহিল,—'শুন্‌বে তবে? শোন, সোমেন নামে একটি ছেলে ছিল'—তাহার পর এই কাহিনীরই পুনরাবৃত্তি।

বৌদিদি সমস্ত শুনিয়া কহিলেন, 'আগে যদি বলতে ঠাকুরপো, তাহ'লে ছবি পাবার পর দিনই আমি পাল্‌টা জবাব দিয়ে দিতাম। তুমি থাক আমি তাকে জব্দ করে দিচ্ছি।'

পরদিন সোমেন ঠিক্ দশটায় কলেজে গেল, কমলাকে দেখিল না। তাহার সঙ্গিনী দুইটি তাহার দিকে চাহিয়া হাসিল, হাত তুলিয়া নমস্কারও করিল। পর দিনও কমলা আসিল না।

ইতিমধ্যে স্ত্রীর তার পাইয়া সোমেনের দাদা ছাপরা হইতে আসিলেন; চিঠির ঠিকানা দেখিয়া ইতিপূর্ব্বেই বৌদিদি ও দিদিমা কমলার বাড়ী ঘুরিয়া আসিয়াছিলেন। ফলে একদিন কমলার মামা ও সোমেনের দাদার সহিত ঘণ্টাখানেক পথে কথাবার্ত্তা—উভয়ে উভয়ের বাড়ীতে আসিতেছিলেন।

পরে একদিন কমলার সহিত কলেজে সোমেনের দেখা হইল। কমলা হঠাৎ আঁচলটি মাথায় টানিতে গেল, কিন্তু আঁচল ব্রোচে আটকান ছিল বলিয়া পারিল না, অগত্যা মুখ নীচু করিয়া অত্যন্ত নিরীহ প্রাণীর মত বসিয়া রহিল আর সোমেন নীরবে পেন্সিল কাটিতে লাগিল।

শেষে একটা সামান্য নারীকে জব্দ করিবার জন্য এক দিন সন্ধ্যাকালে ট্যাক্সিতে চাপিয়া দুর্য্যোধন বেশে সোমেন কমলার মামা হারাণ মজুমদারের বাড়ীর দিকে যাত্রা করিল।

বিরহিণীর পত্র

রইব আর কত কাল সন্ধ্যা-সকাল
তোমার তরে খিল খুলিয়া?
দেখে মোর দুয়ার খোলা আপন-ভোলা
পাড়ার যত বুল্‌বুলিয়া
দ্বারে মোর ধরণা লাগায়,
গেয়ে গান রাত্রি জাগায়,
কভু মোর খিড়্‌কি দ্বারে শিকল নাড়ে
মনের ভুলে পথ ভুলিয়া।

কাটে না	দিনগুলো আর বাজিয়ে সেতার
নভেল্ পড়ে হাই তুলিয়া ;
রজনী	হয় না মধুর পরাণ-বঁধুর
হাসির রঙে রঙ্ গুলিয়া।
চলে যায় রাত্রি দিবস
নিরালা শূন্য বিবশ
কবে প্রেম-	পাওনাদারে আসবে দ্বারে,
লইয়া সাথে প্রেম-হুলিয়া।

তুমি কি	আস্‌বে না হায়! সন্ধ্যা ঘনায়
ঘড়ির কাঁটা যায় ঝুলিয়া,
রজনী	হয় উতলা, প্রাণ-পুতলা
শিউরে ওঠে চুল্‌বুলিয়া।
জনহীন ঘরটি দ্বিতল,
বিছানা শূন্য শীতল!
শুধু কি	শুকিয়ে যাবে আগুনতাপে
দেহটি মোর তুল্‌তুলিয়া ?

রয়েছে	তাক করিয়া, কেউ মরীয়া,
পাড়ার তরুণ বিলকুলিয়া,
চায় যে	আমার বুকে সকৌতুকে
কাট্‌তে সুখে ঘুল্‌ঘুলিয়া!
আমিও খিন্ন কাতর—
বুকেতে দু'মণ পাথর!

তুমিও নেই যে ঘরে, আবেশভরে
চক্ষু আমার ঢুলঢুলিয়া!

বিরহে আর কত যুগ রইবে এ বুক
তোমার তরে খিল্ খুলিয়া?
শেষে কি পাড়ার লোকে প্রেমের ঝোঁকে
পড়্‌বে ঢুকে পথ ভুলিয়া?
যদি না এসো ত্বরিত
ঝরিবে চোখের সরিৎ!
এ পাড়ার তরুণগুলো ঝাঁকড়া-চুলো
গাইছে গজল নজরুলিয়া।

প্রসঙ্গ-কথা

(১)

'বিচিত্রা'র অগ্রহায়ণ সংখ্যায় দেখিলাম 'নানাকথা'র ছলে সম্পাদক মহাশয় আমাদের একহাত লইয়াছেন। ইহাতে আমরা যৎপরোনাস্তি আপ্যায়িত হইয়াছি। সাহিত্যসমালোচনার আদর্শ সম্বন্ধে অনেক ছেঁদো কথার পরে লেখকমহাশয় আসল কথাটি বলিয়া ফেলিয়াছেন—আমরা নাকি অকারণে প্রমথ চৌধুরীকে আক্রমণ করিয়াছি। চৌধুরী

মহাশয়ের তরফ হইতে এ ওকালতির প্রয়োজন কি তাহা বুঝিলাম না ; তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা অতিশয় 'জড়তাহীন সহজ, সতেজ স্ফূর্ত্তিবান মিডিয়ম' সাহায্যেই বলিয়াছেন—তাহার মধ্যে কোনোখানে অস্পষ্টতা থাকিবার ত কথা নয়!—'রবীন্দ্রনাথ আবির্ভূত না হ'লে বাংলায় সাহিত্য বলে কোনো জিনিষ থাকত না', এবং তাহার সঙ্গে পরিশেষে তিনি নিজেই এ উক্তির যে বাল-বোধিনী টীকা সংযোগ করিয়াছেন, যথা,—'এ সাহিত্যের কর্ত্তা হিসাবে কালিদাসের এ উক্তি আমাদের সকলেরই স্বগতোক্তি।

অথবা কৃত বাগ্‌দ্বারে, ইত্যাদি।

অবশ্য পূর্ব্বসূরিগণের স্থানে একমাত্র রবীন্দ্রনাথকে বসিয়ে দিয়ে এবং বংশ শব্দের নূতন অর্থ ক'রে'—তারপরেও 'ইতি গজে'র মত কোনও নিগূঢ় বাক্যের দোহাই দেওয়া চলে কি ? বিচিত্রা-সম্পাদকমহাশয় এ ওকালতি না করিলেই ভাল হইত—তিনি শত্রু হাসাইয়াছেন।

* * *

প্রমথবাবুর সাহিত্যিক প্রতিভা সম্বন্ধে আমাদের খুব উচ্চ ধারণা নাই, এজন্য তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে আমাদের বিশেষ আগ্রহও নাই। তবে বঙ্গসরস্বতীর যে মন্দিরে আমরা পূজার্থী, সেখানে প্রমথের উপদ্রব যখন অসহ্য হইয়া উঠে, তখনই প্রতিবাদ করিয়া থাকি। সে প্রতিবাদের মধ্যে যদি কেহ ক্ষিপ্ততার লক্ষণ দেখিয়া থাকেন, তাহাতে আমরা লজ্জা না পাইয়া বরং আত্মপ্রসাদ লাভ করি। কারণ আপন ধর্ম্ম-বিশ্বাস মতে মানুষ যেখানে কোনও অনাচার দেখিয়া ক্ষিপ্ত হইয়া ওঠে সেখানে সে তাহার মনুষ্যত্বেরই পরিচয় দেয় ; এবং কালচার-স্বর্গের দেবত্ব-অভিমান আমাদের আদৌ নাই।

* * *

এই প্রসঙ্গে বিচিত্রা-সম্পাদকের একটি যুক্তি আমাদের বড়ই বিচিত্র বলিয়া মনে হইয়াছে। প্রমথবাবুর উক্তির টীকা করিতে গিয়া লেখক বলিতেছেন—"অর্থাৎ বাংলার যে সাহিত্য আজ বিশ্বসাহিত্যের আসরে তার আসনটি সগৌরবে দাবী করছে, রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব না হলে সে সাহিত্যের সৃষ্টি এত শীঘ্র সম্ভব হত না' ইত্যাদি। আমাদের প্রথম জিজ্ঞাস্য—বিশ্বসাহিত্যের আসরে আসন দাবী করিতেছে রবীন্দ্রনাথের রচনা, না বাংলাসাহিত্য? যদি বাংলাসাহিত্যই হয়, তবে কি তাহা কেবল রবীন্দ্রোত্তর, না রবীন্দ্রপূর্ব্ব সাহিত্যও? যদি রবীন্দ্র-পূর্ব্বও হয়, তবে তাহার মধ্যে বঙ্কিম প্রভৃতি আছেন কি? যদি থাকেন, বাংলায় সাহিত্য বলিতে কোনো জিনিষ রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পূর্ব্বে থাকা সম্ভব হ'ত না—ইহার অর্থ কি? তাহার অর্থ কি ইহাই দাঁড়ায় না যে, য়ুরোপ (বিশ্ব?) স্বীকার না করিলে বাংলাসাহিত্যের অস্তিত্ব থাকিত না? এবং যেহেতু তাহা সম্ভব হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের দৌলতে, অতএব 'বাংলায় সাহিত্য বলিতে যদি কিছু থাকে' তাহার জন্য বাঙ্গালী রবীন্দ্রনাথের কাছেই ঋণী। প্রমথবাবু কি ইহাই mean করিয়াছেন? অবশ্যই তাই; কারণ এইরূপ ভাষ্য না করিলে, প্রমথবাবুর উক্তির মধ্যে 'বঙ্কিম মাইকেল প্রভৃতি সাহিত্যরথিগণের প্রতি অশ্রদ্ধার ক্ষীণতম ইঙ্গিত' না পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

* * *

অর্থ যদি ইহাই দাঁড়ায় তাহা হইলেও, ইহা snobbishness-এর ভ্রান্ত বলিতে হইবে। বিশ্বসাহিত্যের আসনখানি—অর্থাৎ য়ুরোপের 'নেক নজর'—লাভ করিয়াছে বলিয়াই বাংলাসাহিত্য বাঙ্গালীর গৌরবের বস্তু হইয়াছে! রবীন্দ্রনাথের পরিচয় যদি য়ুরোপ না লইত, তবে শত রবীন্দ্রনাথের উদয় হইলেও আমাদের সাহিত্য যেন সাহিত্যপদবাচ

হইত' না—সেই সৌভাগ্য ঘটিয়াছে বলিয়াই আমরা বুক ফুলাইয়া বেড়াইতেছি ; নতুবা বাংলাসাহিত্যের নাম করিত কে ? বেশ কথা,—তাহাও না হয় মানিলাম। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাওয়াতে বাংলাসাহিত্যের আসন বিশ্বের দরবারে মঞ্জুর হয় কেমন করিয়া ? রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন তাঁহার ইংরেজী রচনার কৃতিত্বে—বাংলার অনুবাদ বলিয়াও তাহা গ্রাহ্য হয় নাই ; য়ুরোপীয় ভাষায় মৌলিক রচনা হিসাবেই তাহা নোবেলপ্রাইজের সম্মান পাইয়াছে। ইংরেজী ভাষাকেই ভাবপ্রকাশের মিডিয়মরূপে স্বীকার করিয়া রবীন্দ্রনাথকে নিজের সাহিত্যিক প্রতিভা প্রমাণ করিতে হইয়াছে—এজন্য কেহ কেহ তাঁহাকে biglot বলিয়া উচ্চ প্রশংসা করিয়াছে। অতএব নোবেল-প্রাইজের সম্মানের মূলে বাংলাসাহিত্য বা ভাষা নাই—ইংরেজী সাহিত্যেই বাঙ্গালী কবির কৃতিত্ব ঘোষিত হইয়াছে। সাহিত্যবিচারে ভাব অপেক্ষা ভাষাই যে বড়, এ কথা সর্ব্বদা মনে রাখিবার প্রয়োজন আছে ; যাহারা নোবেল প্রাইজ দিয়াছিল, তাহারাও তাহা ভালরূপেই বোঝে। তাহারা বাংলা মাসিকের সম্পাদক নহে।

* * *

তারপর রবীন্দ্রনাথের রচনা সম্বন্ধে 'বিশ্ব' অবশ্যই কৌতূহল প্রকাশ করিয়াছে—রবীন্দ্রনাথের রচনা ইংরেজীতে অনূদিত হইয়াছে। কিন্তু সে অনুবাদ 'বিশ্ব' করে নাই—করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং, এবং দুই চারিজন বাঙ্গালী। তার অর্থ—বাংলাসাহিত্যকে নিজের পরিচয় নিজেই অনুবাদ সাহায্যে দিতে হইয়াছে—বাহির হইতে কেহ আসিয়া সে পরিচয় লয় নাই। রুশীয় লেখকের রচনা যেভাবে বিশ্বের নকট পরিচিত হইয়াছে—যেভাবে তাহা বিদেশীর দ্বারা অনুবাদিত হইয়া রুশভাষা ও সাহিত্যের সম্মান ও মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে—বাংলাভাষা ব

সাহিত্যের সে আসন এখনও বিশ্বের দরবারে জুটে নাই ; বড় জোর একটা জনশ্রুতির সৃষ্টি হইয়াছে মাত্র। ইহাতেই যদি বিচিত্রা-সম্পাদক বাংলাসাহিত্যের সৌভাগ্য-গর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া থাকেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে হিংসা করিব না, কারণ বাংলাসাহিত্যের সম্মান সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ও কামনা অন্যরূপ।

* * *

কিন্তু প্রমথবাবু বাংলায় 'সাহিত্য বলে যে জিনিষ না থাকার' কথা বলিয়াছেন ('যদি রবীন্দ্রনাথ আবির্ভূত না হতেন') সে জিনিষটি যে রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যই তাহা ত স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন ; বিচিত্রা-সম্পাদক তাহা বুঝিতে চাহিলেন না কেন? এবং আমরা সেই সুস্পষ্ট অর্থ ই বুঝিয়াছি বলিয়া আমাদিগকে এমন ধমক দিয়াছেন কেন? প্রমথবাবু এ যুগের বঙ্গ-সাহিত্যকেই সাহিত্যপদবাচ্য বলিয়াছেন, এবং নিজেকে এই সাহিত্যেরই একজন 'ক্ষুদে কর্ত্তা' বলিয়া ঘোষণা করিয়া, কালিদাসের শ্লোকটির সাহায্যে নিজের এবং এই সাহিত্যের অন্যান্য কর্ত্তাদের স্বগতোক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহার মন্তব্য সংক্ষেপে এই যে, 'আমরা সকলেই রবীন্দ্র-প্রতিভার স্পর্শে প্রাণবন্ত হয়েছি।...একমাত্র রবীন্দ্রনাথই আমাদের পূর্ব্বসূরি, এবং আমাদের (এই ক্ষুদে কর্ত্তাদের) বংশ বলিতে একটা কিছু নূতন অর্থ করিতে হইবে।' তাহা হইলে; 'বিশ্বসাহিত্যের আসরে বাংলার যে সাহিত্য আজ সগৌরবে তার আসনটি দাবী করছে, রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব না হলে সে সাহিত্যের সৃষ্টি এত শীঘ্র সম্ভব হত না'— বিচিত্রা-সম্পাদকের এই ভাষ্যটিরও কি অর্থ দাঁড়ায়? অর্থ করিতে আমাদের আর ভরসা হয় না, কারণ সম্পাদক মহাশয়ের মতে আমরা 'সারবস্তুটির প্রতি লক্ষ্য না রেখে, তার spirit-টিকে সম্পূর্ণ অবহেলা

ক'রে, তার প্রতি কথাটির ইচ্ছামত অভিধানগত অর্থ করে নিতে চাই !"
আমরা যে অতিশয় অসাধু, অসজ্জন !

* * *

অভিধান-গত অর্থ ! তাই বটে ; কিন্তু কি করিব ? অভিধান ছাড়া আর কোনও সম্বল যে আমাদের নাই। আমরা ত' বিচিত্রা-সম্পাদকের মত প্রমথবাবুর সঙ্গে 'একদিল' নই, কাজেই ভাষার দ্বারদেশেই পড়িয়া থাকি ; spirit-এর অন্দরমহলে প্রবেশ করিতে পারি না। বিচিত্রা-সম্পাদক ও তাঁহার মত অন্যান্য সাহিত্যপন্থীদের নিকট আমরা একটা কৈফিয়ৎ দিব। আমরা ভদ্র নই, শিষ্টতার ধারও ধারি না। কিন্তু আমরা, অতিশয় বর্ব্বর হইলেও, যাহা বুঝি না তাহা বুঝিবার ভাণ করিয়া সাহিত্যের বৈঠকে মুরুব্বিয়ানা কামনা করি না ; এবং যাহা বুঝি তাহা বিশ্বাসও করি বলিয়া অকপটে অতিশয় রূঢ়ভাবে বলিয়া ফেলিতে আমাদের বাধে না। ললাটে এই দুর্ব্বৃত্ততার বিধি-লিপি ধারণ করিয়াই আমরা আজিকার বাংলা সাহিত্যের উন্নত-রুচি সমাজে আপতিত হইয়াছি—অন্যান্য দৈব-নিগ্রহের মত এ নিগ্রহও তাঁহাদের সহ্য করিতে হইবে।

* * *

সর্ব্বশেষে বিচিত্রা-সম্পাদকের নিকট আমাদের একটি সানুনয় অনুরোধ আছে, যদি তিনি অনুগ্রহ করিয়া প্রমথবাবুর একটি কথার অর্থ করিয়া দেন, তবেই উদ্ধার হই, নতুবা উপায় দেখি না ; কারণ, অভিধানই যে আমাদের একমাত্র সম্বল। প্রমথবাবু ওই যে বলিয়াছেন, 'বংশ শব্দের নূতন অর্থ করে'—সে অর্থটি কি ? কালিদাসের শ্লোকে আছে—বংশেঽস্মিন পূর্ব্বসূরিভিঃ, অর্থাৎ 'এ বংশে পূর্ব্বসূরিগণ কর্ত্তৃক' ; প্রমথবাবুর মতে পূর্ব্বসূরি একমাত্র রবীন্দ্রনাথ, তাহা হইলে বংশটা

কাহার বংশ? আমরা অভিধান সাহায্যে একটা অর্থ করিয়াছিলাম—রবীন্দ্রনাথকে আদি পুরুষ ধরিয়া প্রমথবাবুকে লইয়া দুই পুরুষ গণনা করিয়াছিলাম। দেখিতেছি তাহা ঠিক হয় নাই—সম্পাদক মহাশয় কৃপা করিবেন কি?

(২)

কার্ত্তিকের বিচিত্রায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বাক্ষরিত একটি লেখা বাহির হইয়াছে—লেখাটির নাম 'নবীন কবি'। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের বয়স অনেক হইয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোনও 'নবীন কবি'র সাক্ষাৎ তিনি পান নাই; 'আধুনিক সাহিত্য' নামে তাঁহার সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে যে কয়েকটি লেখা সংগৃহীত হইয়াছে তাহাতেও তিনি সেকালের কোনও নবীন লেখক সম্বন্ধে এতখানি প্রশংসা খরচ করিয়া ফেলিতে পারেন নাই; কাজেই খট্‌কা লাগে—রবীন্দ্রনাথের এই অরবীন্দ্রীয় বুদ্ধি হইবার কারণ কি?

*　　*　　*

উক্ত প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত ঠাকুর-কবি অনেকখানি গৌরচন্দ্রিকা করিয়াছেন,—বুদ্ধদেব বসু নামক নবীন কবিটিকে সার্টিফিকেট দিবার জন্য কলম ধরিয়া প্রথমে এক দফা বিপক্ষ পক্ষের উপর খানিকটা চকমকি ঠুকিয়া, শেষে হঠাৎ উক্ত নবীনটিকে এক ঝলক চোখ-ঝলসানো আলোকে দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছেন। প্রশংসা করিবার অধিকার অবশ্য সকলেরই আছে, ব্যক্তিহিসাবে রবীন্দ্রনাথেরও তাহা আছে—মানুষ মাত্রেরই রাগ-দ্বেষ একটা স্বভাব-ধর্ম্ম। কিন্তু বিধাতা রবীন্দ্রনাথকে শুধুই চায়ের দোকান বা বৈঠকখানার সভাপতি করিয়া অব্যাহতি

দেন নাই, সাহিত্যের একটি শিরোমণি করিয়া সর্ব্বোপরি স্থাপন করিয়াছেন। কাজেই তিনি যেভাবে যত অধিক বিনয়ই প্রকাশ করুন, তাঁহার ভালো লাগা-না-লাগার একটা দায়িত্ব আছেই! বুদ্ধদেব বসুর কবিতা তাঁহার ভালো যদি লাগিয়া থাকে, তবে তাহার জন্য এত কৈফিয়ৎ দিবার প্রয়োজন নিশ্চয়ই ছিল না—তাঁহার বাক্যই যখন আপ্তবাক্য, তখন আবার কৈফিয়ৎ কেন? প্রশংসাপত্রের আবার এত গৌর-চন্দ্রিকা কেন? সাহিত্যিক বিবেকবুদ্ধি সম্বন্ধে এত বক্তৃতাই বা কেন? বাঙ্গালী চরিত্রের দুর্ব্বলতার জন্যই বা এত অসন্তোষ কেন? 'নবীন কবি'টির সম্বন্ধে তিনি যে ঐকান্তিক উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়াছেন সে উচ্ছ্বাসের কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখাইবার চেষ্টা, অর্থাৎ তাহার কবিতাগুলির এতটুকুও পরিচয় এই লেখার কোনো খানে নাই, আছে কেবল সাফাই ও কৈফিয়ৎ—অতিরিক্ত বিনয়ের গুণে সে কৈফিয়ৎও বিসদৃশ হইয়া উঠিয়াছে। এত কথা না বলিয়া শেষের দুইটি প্যারাগ্রাফ সোজাসুজি চোখ বুজিয়া বেপরোয়া ভাবে লিখিয়া দিলেই ত চুকিয়া যাইত। আমার—কি না রবীন্দ্রনাথের—ভালো লাগিয়াছে, এর উপরে কাহারো কিছু বলিবার আছে? আমরা এ প্রশংসার প্রশংসা করিয়া বলিতাম—'এই প্রশংসার বাণীতে স্বকীয়তার গাম্ভীর্য্য ভাষায় ও উপমায় ঐশ্বর্য্যশালী।' আমরাও সহজে অব্যাহতি পাইতাম।

* * *

কিন্তু আমাদের বরাত এমনই যে তাহা হইবার জো নাই—এত বিনয়, এত প্রাণপূর্ণ প্রশংসার আবেগের মধ্যেও আমরা তর্ক-সংশয়ের বিভীষিকা আবিষ্কার করি! এজন্য আমরা এই সম্পর্কে ঠাকুর-কবির কয়েকটি উক্তির কিঞ্চিৎ আলোচনা না করিয়া পারিলাম না। প্রথম

উক্তিটি এই। 'কেবল মাত্র কবিত্বশক্তি নয়, এর মধ্যে কবিতার প্রতিভা রয়েছে'—কিছুকাল আগে বুদ্ধদেবের একটি কবিতা পড়িয়া তাঁহার এইরূপ মনে হইয়াছিল। 'কবিত্ব-শক্তি' এবং 'কবিতার প্রতিভা' এ দুয়ের পার্থক্য না হয় বুঝিলাম, কিন্তু চৌদ্দ-পনর বৎসরের একটি বালকের পক্ষে যদি কবিত্ব-শক্তির পরিচয় থাকে তাহাই কি যথেষ্ট নয়? তাহাই ত' প্রতিভার লক্ষণ। তাহাতেও যদি না কুলায় তবে সে কবিতাটি নিশ্চয়ই একটা অলৌকিক কিছু। প্রথমেই এই অত্যুক্তি শুনিয়া আমাদের মনে সন্দেহ হইয়াছিল। তার পরেই আছে—'শস্যক্ষেতে ফসলের চর্চ্চাকে কাঁটাগাছের স্পর্দ্ধার দ্বারা অবমানিত দেখলে অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করি।' সহসা এ উষ্মা প্রকাশের কারণ কি? বুদ্ধদেবের রচনার নিন্দা যাহারা করে, তাহাদের সেই নিন্দার নাম কাঁটাগাছ—তাহার স্পর্দ্ধায় রবীন্দ্রনাথ ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। তাহা হইলে কাঁটাগাছের খবরটা তিনি ভালোরূপই রাখেন, এবং তাহার আক্রমণে 'ফসলের স্তন'গুলির শিহরণ দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছেন? 'কিছুকাল ধরে সাহিত্যক্ষেত্রে কোমর বেঁধে এই কাঁটাগাছের আবাদ চলচে'—'আমাদের দেশ কবির লড়াইয়ের দেশ, তর্জ্জার দেশ, এদেশে নির্লজ্জ নিষ্ঠুরতায় মানুষকে অপমান করবার নৈপুণ্য...সাহিত্যের আসরেও জয়মাল্য সন্ধান করে।' এখানে কথাটা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। অর্থাৎ সাহিত্যের পুষ্টিকর ফসল উৎপাদন করিতেছে, বুদ্ধদেব বসু এণ্ড কোম্পানি; এবং কাঁটাগাছের আবাদ অর্থে কু-সাহিত্য রচনা নয়—উক্ত সুসাহিত্যের নিন্দাবাদ! এ স্পর্দ্ধা ঠাকুর-কবির অসহ্য হইয়াছে।

* * *

কিন্তু কবিবর এ সাহিত্যের বিশেষ খবর রাখেন না—'আধুনিক

সাহিত্যিক হাটের রাস্তা দিয়ে চলা প্রায় বন্ধ করেছি', 'যদি দৈবাৎ এক আধটা লেখা চোখে পড়ে', ইত্যাদি। এমন কি যে-বুদ্ধদেবের এত প্রশংসা, তারও দুইচারিটি দিলীপ রায়ের প্রশংসাযুক্ত 'কাঁচিছাঁটা' কবিতা-মাত্র দেখিয়াছেন! কিন্তু কাঁটার আবাদ সম্বন্ধে কবি এতই ওয়াকিবহাল যে তার জ্বালায় অধীর হইয়াছেন। নিন্দা কেন করে—কিসের নিন্দা করে, তাহা তিনি জানেন না; সে সাহিত্যের বিশেষ খবর রাখেন না—নিন্দার 'সাহিত্য' পড়িয়াও এই নিন্দিত সাহিত্যের কোনও পরিচয় তিনি পান নাই! কয়েকটি 'কাঁচিছাঁটা' পদ্য-পংক্তি পড়িয়াই শস্যক্ষেতে ফসলের চর্চ্চায় মুগ্ধ হইয়াছেন? ঠাকুর-কবি দীর্ঘকাল ধরিয়া ইয়ুরোপ আমেরিকার সঙ্গে কারবার করিতেছেন বলিয়া দেশের লোকদের বুদ্ধি সম্বন্ধে আর তেমন শ্রদ্ধান্বিত নহেন; তিনি মনে করেন, বাঙালী এমনই শিশু যে, তাহাদের সম্মুখে সাহিত্যিক উলঙ্গতা-প্রকাশে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন নাই—নতুবা এমন বেসামাল হইতে লজ্জা বোধ করিলেন না কেন?

* * *

রবীন্দ্রনাথ যে, সাহিত্যের শ্রীচরণে অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছেন—সেই সাহিত্যের অথবা রবীন্দ্রনাথের এই প্রশংসার মূল্যবিচার এ প্রসঙ্গের উদ্দেশ্য নয়। কারণ, কবি রবীন্দ্রনাথের মত সৃষ্টিপ্রতিভা দুর্ল্লভ হইলেও—যে-সাহিত্যের যে-প্রশংসায় তিনি সহসা পঞ্চমুখ হইয়াছেন, সে উভয়ের সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করিবার মত সাহিত্যিক জ্ঞান অনেকেরই আছে; অতএব আমরা তাহা বিশদ করিতে গিয়া সে শ্রেণীর পাঠকের বুদ্ধির অবমাননা করিব না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এতদূর মনস্তাপের কারণ কি, তাহা সম্পূর্ণ নির্দ্দেশ করিতে না পারিলেও একটু সন্ধান দিব, পাঠকগণ বাকিটুকু নিজেরাই পূরণ করিয়া লইবেন।

আশ্বিনের 'উত্তরা'য় 'পত্রধারা' নামে শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়কে লিখিত যে কয়েকটি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার একটিতে আছে—

'কোনো কোনো দল আমাকে কুৎসিত ভাষায় গাল দিচ্ছে ব'লে তুমি আক্ষেপ করেচ। আমার জন্যে, না তাদের জন্যে? এ অহঙ্কার আমার নেই যে স্তুতিনিন্দাকে সমান করে মানবার মত আমার শক্তি হয়েচে। নিন্দায় প্রথমটা বিচলিত করে, কিন্তু তার পরেই বিচলিত হয়েছি বলে অত্যন্ত গ্লানি বোধ হয়। . . . মনে সান্ত্বনা এই যে, এই সব নিন্দা যারা রটায় তারা পুলিসেরই আমলা, কিন্তু বড় আদালতের তারা কেউ না—তারা খুঁত ধরে গুঁতোও দেয়, কিন্তু বিচার তাদের হাতে নেই। সাহিত্যের বাজারে নিন্দার ব্যবসা আজকাল খুব জেঁকে উঠেচে, তাতে আন্দাজ করচি কুৎসার কাটতি আছে।'

* * *

কিছুকাল আগে এইরূপ 'গালাগালি'র বিরুদ্ধে 'সাহিত্যের ব্যবসায়' নামে 'বিচিত্রা'য় যে একটি অতিশয় শিষ্ট-শান্ত সভ্য ভাষায় লেখা প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল, এ চিঠি তাহার কিছুদিন পরে লেখা। এই সঙ্গে তাহা হইতেও কিছু উদ্ধৃত করিতে পারিলে ভালো হইত। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, গালাগালিতে তিনি প্রথমটা বিচলিত হ'ন, কিন্তু পরে আত্মস্থ হইতে পারেন। আমাদের মনে হয় বিচলিত হওয়া স্বাভাবিক, তার জন্য কাহারও লজ্জিত হইবার কারণ নাই; কিন্তু তাঁর মত ব্যক্তির আর একটু সংযম থাকা উচিত; এইরূপ বিচলিত অবস্থায় বরং প্রতিপক্ষকে গালাগালি দেওয়াই শোভন, কিন্তু সেই আক্রোশে কোনও পক্ষের প্রশংসা করিতে যাওয়া আদৌ বুদ্ধিমানের কাজ নহে।

* * *

এই সকল আক্ষেপ ও খেদোক্তির লক্ষ্য যে কাহারা, তাহা বাঙ্গালী পাঠকসমাজের অগোচর নাই। সেজন্য ইহার উত্তরে, আমরা

কিছু বলিব। রবীন্দ্রনাথকে যাহারা 'গালাগালি' দেয়, তাহারা বড় আদালতের বিচারকে অমান্য করে না; তাঁহার প্রতিভা কত বড়, বাংলা সাহিত্যে তাঁহার স্থান কোথায়, সে সম্বন্ধে তাহারা কখনও তাঁহার প্রাপ্য গৌরবের হানি করে নাই। তাহাদের অপরাধ এই যে, তাহারা রবীন্দ্রনাথকে পূর্ণাবতার মনে করে না; সকল মহাকবির মত তাঁহাকে মানুষ মনে করে, এবং তাঁহার কাব্যকীর্ত্তির মধ্যে দৈবী প্রেরণার সঙ্গে সঙ্গে যে সকল ব্যক্তিগত মানুষী দুর্ব্বলতা আছে, যাহাকে পৃথক করিয়া না লইলে তাঁহার প্রতিভার সম্যক পরিচয় হইবে না, তাহারই সম্বন্ধে রবিগ্রস্ত সাহিত্যসমাজকে সচেতন করিতে চায়। ব্যক্তি ও প্রতিভা স্বতন্ত্র, একথা বাঙ্গালী কখনও বুঝে না। প্রতিভা সেই শক্তি যে শক্তির আবেশে মানুষ কবি হয়—যতদিন বা যতক্ষণ সেই আবেশ থাকে, ততদিন বা সেই সময় মধ্যে অপূর্ব্ব কাব্যসৃষ্টি করে। এই প্রতিভা-শক্তি সকলের সমান নয়, এবং সকল লেখকের জীবনে ইহা সমকাল স্থায়ী নয়—ইহার জোয়ার-ভাঁটা আছে। প্রতিভার প্রেরণায় যাহা রচিত হয়, তাহার মধ্যে ব্যক্তির অতীত সত্যসুন্দরের আদর্শ প্রতিফলিত হয়; কিন্তু অন্য সময়ে যাহা রচিত হয়, তাহাতে সেই দিব্যদৃষ্টির পরিচয় থাকে না। রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ সাহিত্যিক জীবনে, তিনি যে নিরবচ্ছিন্নভাবে এই দিব্যদৃষ্টির অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহার রচনায় সর্ব্বকালে ও সর্ব্বত্রই যে ভাব-কল্পনার এই উচ্চ প্রেরণা আছে, একথা যাহারা মানে, তাহারা ব্যক্তি ও প্রতিভাকে অভিন্ন মনে করে। অপর সকল মহাকবির পক্ষেও যাহা সত্য, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তাহার অন্যথা হইতে পারে না। এজন্য রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকে শ্রদ্ধা করি বলিয়া তাঁহার সর্ব্বকালের সর্ব্ববিধ রচনা বিনা প্রশ্নে

শিরোধার্য্য করিয়া লইতে হইবে, অথবা, সে সাহিত্যে যে ব্যক্তিগত আদর্শের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে—জাতি দেশ, ও সাহিত্যের সার্ব্বজনীন আদর্শ—এই সকল দিক দিয়াই তাহার বিচার করিতে পারিব না, এমন অন্ধভক্তি আমাদের নাই। বরং, সেই বিচার আজিকার দিনে অবশ্যকর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিয়াই আমরা মনে করি। *

* 'গালাগালি'র সম্বন্ধেও আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। প্রথমতঃ আমরা দুর্ব্বলচরিত্র বাঙ্গালী; তর্জ্জা, কবির লড়াই আমাদের সত্যই ভালো লাগে। কিন্তু তার জন্য আমরা 'সাহিত্যের আসরে জয়মাল্য সন্ধান' করি না। ইহা মিথ্যা কথা। যদি বাঙ্গালী সাধারণ, এ রসের তারিফ করে, তাহাতে আমাদের উৎসাহ বৃদ্ধি হয় না, এমন কথা আমরা বলি না। কিন্তু দোষ কি আমাদের? সাহিত্যের আসরে জয়মাল্য সন্ধান যাহারা করে তাহারা ঠাকুর কবি ও তাঁহার দলকে চটাইতে যাইবে কেন? এতটুকু বুদ্ধিও কি তাহাদের নাই? তাহাদের চরিত্রই না হয় দুর্ব্বল, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের বুদ্ধিও যে এতটুকু থাকিবে না, শাস্ত্রে ত' সে কথা বলে না? আমরা যে দলের সে দলের কি কোনও খাতির আছে? তাহারা কি রবি-কবিকে বেষ্টন করিয়া জ্যোতিষ্কসভার জ্যোতিঃ বৃদ্ধি করিবার সামর্থ্য রাখে? তাহারা ঠাকুর-কবি অপেক্ষা বাংলাসাহিত্য ও বাঙ্গালীজাতিকে অধিক ভালোবাসে বলিয়া সকল সভ্য বাঙ্গালীর ধিক্কারভাজন হইয়াছে! তথাপি তাহারা সভ্যতাকে ভয় করে, এবং সকল অপবাদ, সকল কলঙ্ককে অঙ্গের আভরণ করিয়াছে। *

* অনেকে বলেন, সমালোচনা কি শিষ্টতার সহিত করা যায় না? ইহার উত্তরে দুইটি কথা বলিব। আমরা জানি, শিষ্টভাবে সমালোচনা করিলেও (তাহাও আমরা করিয়া থাকি) তাহা যদি

সাম্প্রদায়িক মতবিরুদ্ধ হয় তবে তাহা অশিষ্ট বলিয়াই গণ্য হয়; ভক্তগণ তাহা সহ্য করিতে পারেন না। অতএব সে পক্ষে আমাদের কোনও নৈতিক আশ্বাস নাই। দ্বিতীয় কথা এই যে, আমরা প্রধানতঃ সমালোচনা করি না, আমাদের উদ্দেশ্য তাহা নয়। যে অনাচার, অবিচার, আজিকার দিনে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, এবং যাহার সমর্থনে সকলেই একদল, তাহাকে আঘাত করিবার জন্যই আমরা মুখ্যতঃ লেখনী ধারণ করিয়াছি। এ কাজ বড় কাজ নয়, তাহা আমরা জানি; কিন্তু অনাচারের বিরুদ্ধে কেবল ধর্ম্মকথা বা sermon-ই একমাত্র ঔষধ নয়, আর একটা ঔষধও মানুষের স্বভাব হইতেই উৎপন্ন হয়। আমরা সেই স্বভাবের পন্থা অবলম্বন করিয়াছি, তাহাতে লজ্জাবোধ করি না এইজন্য যে, আমরা এখনও 'কালচারে'র মহাসাগরে স্নান করি নাই।

(৩)

আজকাল নানা পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের বহুপত্র প্রকাশিত হইতেছে, এ গুলির যথেষ্ট মূল্য আছে। এ পত্রগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের অসতর্ক ব্যক্তি-মন অনেকস্থানে অনেক confession করিয়া ফেলিতেছে। এগুলি 'ছিন্নপত্র' নয়, এগুলিতে কবি অপেক্ষা মানুষটির পরিচয় বেশী পাওয়া যায়—ইহা কম লাভ নয়। এই আত্মকথা বলিবার ইচ্ছা তাঁহার অন্যান্য আধুনিক লেখাতে প্রকাশ পাইতেছে। মনে হয়, কবি শেষজীবনে নিজের সম্বন্ধে আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছেন—আত্মপ্রকাশের সঙ্কোচ আর টিকিতেছে না। পত্রে এইরূপ ব্যক্তিগত মনোভাবের অভিব্যক্তির কথা আমরা বারান্তরে আলোচনা করিব। এবারে তাঁহার সম্প্রতি প্রকাশিত অন্যবিধ রচনা হইতে একটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

'সাহিত্যই যদি আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হোত তা হ'লে এই কাঁটাবন দিয়েও চলতে হ'ত।...সংসারে যে ক্ষেত্রে ধূলি উড়িয়ে মল্লযুদ্ধ হয়, সে ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল কাটালুম, এমন কি বঙ্গসাহিত্যের গঞ্জনহাটের মাঝখানে ব'সে সম্পাদকীও করেছি।... এ-কথা যদি কবুল করি যে, আধুনিক সাহিত্যিক হাটের রাস্তা দিয়ে চলা প্রায় বন্ধ করেছি তা হ'লে আমার এই সঙ্কোচ নিন্দার যোগ্য বলে কেউ মনে করবেন না।' *

* কথাগুলি বেশ ভারী এবং কঠিনও বটে। প্রথম দিকের উক্তিটা সত্যই চিন্তাকর্ষক। 'সাহিত্য তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নয়'—আজ রবীন্দ্রনাথের এই স্বীকারোক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এককালে সাহিত্যই যে তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল ইহাতে কাহারও কোনও সংশয় থাকিতে পারে না, কবির নিজেরও যে ছিল না, তাহার বহুপ্রমাণ, সেকালকার কবি-মানসের বহুতর নানা অভিব্যক্তির মধ্যে আছে। এখন, বাংলাসাহিত্য ত নহেই, সাহিত্যই তাঁহার নিকট ছোট হইয়া গিয়াছে, এ কথা নিজ মুখে স্বীকার করায় আর কোনও সংশয়ের কারণ থাকিবে না। অথচ সেদিনও কবি তাঁহার জন্মদিনে যে আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি আর সকল অভিমান ত্যাগ করিয়া অতিশয় সরল ও স্পষ্টভাবে জানাইয়াছিলেন যে, তিনি কবি—আর কিছু নহেন। দেখা যাইতেছে, সে কথাও যেমন সত্য, এ-কথাও তেমনি সত্য; অর্থাৎ কবির মনে তাঁহার নিজের জীবন-মন্ত্র সম্বন্ধে একটা দ্বন্দ্ব বা দ্বিধা-ভাব কিছুতেই ঘুচিতেছে না। অথচ এ-কথাও আমরা বাহির হইতে নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে, তিনি যে 'উচ্চ আদালতে'র কথা অন্যত্র (দিলীপ রায়কে লিখিত পত্রে) উল্লেখ করিয়াছেন—সে আদালতের বিচারে তাঁহার একটি দাবীই সাব্যস্ত হইবে—যে, তিনি কবি; সাহিত্যই তাঁহার জীবনের একমাত্র সাধন, একমাত্র লক্ষ্য; আর যাহা কিছু তাহা তাঁহার ব্যক্তি-জীবনের অভিমান-প্রসূত মরীচিকা মাত্র।

তথাপি, এ কথার একটা অর্থ আছে। রবীন্দ্রনাথ শেষ বয়সে তাঁহার জন্মগত প্রবৃত্তির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া একটা আধ্যাত্মিক সত্যোপলব্ধির দিকে বড় বেশী করিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার কল্পনা এই জগৎকেই, এই ধূলা মাটীর জীবনকে লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে নাই; তাঁহার অশান্ত আত্মচিন্তা, কবিপ্রতিভার নিবর্ত্তন-কালে, একটা ধ্রুবতর আশ্রয় সন্ধান করিয়াছে—তাঁহার আত্মপরায়ণ কল্পনা এই জগৎকে উত্তীর্ণ হইয়া বৃহত্তর প্রতিষ্ঠাভূমির সান্ত্বনা লাভ করিতে চাহিয়াছে। সাহিত্য সে সান্ত্বনা দেয় না,—যাহার প্রধান আশ্রয় এই জগৎ ও এই জীবন, তাহাকে ধরিয়া থাকিতে প্রাণ আর চায় না। যাহাকে এককালে শ্রেষ্ঠসাধনরূপে বরণ করিয়া তিনি তাঁহার জীবনে চরম সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, জীবন-শেষের ছায়ান্ধকারে তিনি তাহাকেই একটা অন্তরায় বলিয়া মনে করিতেছেন। কিন্তু সাহিত্যই যে এককালে তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল একথা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হওয়ার কারণ কি? জীবনে এককালে যাহা সত্য ছিল, আজ তাহা সত্য না হইতে পারে; কিন্তু আজিকার দিনে যে আর মনোহরণ করে না, একদিন সে-ই যে প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ছিল—প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেও সে-স্মৃতি যাহাকে বিচলিত করে না, সে কি কখনও ভালোবাসিয়াছিল? রবীন্দ্রনাথ যে কাব্যলক্ষ্মীকে একান্ত করিয়াই জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছিলেন, সে কথা তিনি অস্বীকার করিলেও, তাঁহার যে-জীবন কাব্যের অমরতা লাভ করিয়াছে তাহাকে হত্যা করিবার শক্তি যে তাঁহারও নাই! এককালে সাহিত্যই যে তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল, সে কথা তিনি অস্বীকার করিলেও, কাল যে অস্বীকার করিবে না! *

* এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'শাজাহান' কবিতাটির কয়েকটি পংক্তি আমাদের মনে পড়িতেছে। রবীন্দ্রনাথের আজিকার এই মনোভাব

এই পংক্তিগুলিতে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। শাজাহান ভালোবাসিয়াছিলেন, কবির মতে সে ভালোবাসা মানবাত্মার মুক্তিপথের অন্তরায়—প্রাকৃত জীবন তাহার সেই মহাজীবনের নিকট অতি ক্ষুদ্র, অতিতুচ্ছ। শাজাহান তাজ গড়িয়াছিলেন—তাহাতে তাঁহার সৌন্দর্য্যসৃষ্টিকল্পনা এই তুচ্ছকেই আশ্রয় করিয়া, মানবাত্মার সেই অমরজীবনের একটি উড়ে-পড়া বীজকে শিল্পকীর্ত্তিতে সফল করিয়াছে। এইরূপ প্রেমের চেয়ে আর্ট বড়। কিন্তু আত্মার অবাধ মুক্তগতির পক্ষে এই আর্ট, এই শিল্পকীর্ত্তিও একটা ভারমাত্র, তাহাকেও পশ্চাতে ফেলিয়া আত্মা অনন্তের পথে নব-নব লোক-লোকান্তরে মহতো-মহীয়ানের উদ্দেশে তীর্থযাত্রা করে। পংক্তিগুলি এই—

চিহ্ন তব পড়ে আছে, তুমি হেথা নাই।
যে প্রেম সম্মুখ পানে
চলিতে চালাতে নাহি জানে,
যে প্রেম পথের মধ্যে পেতেছিল নিজ সিংহাসন,
তার বিলাসের সম্ভাষণ
পথের ধূলার মত জড়ায়ে ধরেছে তব পায়ে,
দিয়েচ তা ধূলিরে ফিরায়ে।
সেই তব পশ্চাতের পদধূলি 'পরে
তব চিত্ত হ'তে বায়ু-ভরে
কখন্ সহসা
উড়ে পড়েছিল বীজ জীবনের মাল্য হ'তে খসা।
তুমি চলে গেচ দূরে
সেই বীজ অমর অঙ্কুরে
উঠেচে অম্বর পানে,
কহিছে গম্ভীর গানে—
যতদূর চাই
নাই নাই সে পথিক নাই!

কবি শাজাহানকে সম্বোধন করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিজের সম্বন্ধেই তাঁহার স্বগতোক্তি। তাঁহার কাব্যকীর্ত্তিকে পিছনে ফেলিয়া

তাঁহার আত্মা অসীমের অভিসারে যাত্রা করিতে উৎসুক। যে-প্রেম তাঁহার সাহিত্যের প্রেরণা ছিল, যে পথের ধূলার মত তাঁহার পায়ে জড়াইয়া ধরিয়াছিল—সে ধূলাকে তিনি ধূলিকেই ফিরাইয়া দিয়াছেন। জীবনের মাল্য হইতে খসিয়া-পড়া যে বীজ 'চিত্ত হ'তে বায়ুভরে' সেই ধূলির উপরে উড়িয়া পড়িয়াছিল—সেই বীজ কাব্যের অমর অঙ্কুরে অম্বর পানে উঠিয়াছে। কিন্তু সে অমর শিল্পকীর্ত্তিও তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিবে না—আত্মার মহিমার নিকটে সেও তুচ্ছ। তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, সাহিত্যই তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নয়। *

* আত্মসাধনা-পরায়ণ কবির পক্ষে শেষে এই বিশ্বাসই স্বাভাবিক। তাঁহার ব্যক্তিগত সাধনার পক্ষে হয় ত সাহিত্যের মূল্য এখন কমিয়াছে। কিন্তু এই জগতের সুখদুঃখচঞ্চল মোহ-মুগ্ধ প্রেমিক যাহারা, তাহারা তাজমহলকে প্রেমের তীর্থ-রূপে, এবং তাঁহার কাব্যগুলিকে মরজীবনের অমৃত-উৎস রূপেই পূজা করিবে—সেই কীর্ত্তিকেই তাহারা স্বীকার করিবে। কীর্ত্তির অন্তরালে যে কবি আছেন, তাঁহার কি হইল,—লোক-লোকান্তরে তাঁহার আত্মা কতদূরে কোথায় বিচরণ করিতেছে, সে ভাবনা তাহারা করিবে না। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সাধনার উচ্চ আদর্শ, এবং তাঁহার রচিত সাহিত্য, এই উভয়ের মূল্য মানুষের দিক দিয়া যে এক নহে, তাহা আমরাও ভুলিয়া যাই। সাহিত্য যদি রবীন্দ্রনাথের নিজ জীবনের একমাত্র লক্ষ্য না হয়, তাহাতে আমাদের কিছু আসে যায় না, সে কথা আমাদের পক্ষে সত্য নহে। আমাদের কাছে রবীন্দ্রনাথ কবি—আর কিছুই নহেন। তাঁহার যত কিছু রচনা, যত কিছু উক্তির মূল্য-বিচার সেই দিক দিয়াই করিব। *

* এই উক্তির সঙ্গে আর যে কথাগুলি আছে, তাহার আলোচনা এখানে না করিলেই ভাল হইত। তবুও না করিলে নয়। জগতে যিনি যে ক্ষেত্রেই যত বড়, তাঁর লক্ষ্য একমাত্রই হইতে দেখা যায়, বাকি যাহা কিছু তাহা উপলক্ষ্য মাত্র। সে যাই হোক্, এক কালে কবি বঙ্গসাহিত্যের 'গঞ্জন-হাটে' সম্পাদকী পর্য্যন্ত করিয়াছেন, তবু সাহিত্যই একমাত্র লক্ষ্য ছিল না বলিয়া, সে পাপ সেইখানেই চুকাইয়া দিয়া মুক্তিস্নান করিয়াছেন। এখন তিনি 'সাহিত্যিক হাটের রাস্তা

দিয়ে চলা প্রায় বন্ধ' করিয়াছেন! সাহিত্যই যদি তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইত তাহা হইলে এই কাঁটাবন ভাঙ্গিয়া আজিও চলিতে হইত। এই সকল কথার মধ্যে, তাঁহার জীবন-ভোর বাংলাসাহিত্যের 'গঞ্জনহাটে' একটা অস্বস্তিভোগের আভাস পাওয়া যায়। তিনি এককালে সম্পাদকী করিয়া বাংলাসাহিত্যের যে সেবা করিয়াছিলেন তাহা মনে করিয়া এখনও তাঁহার শরীর শিহরিয়া উঠে! তিনি আপনার চিত্তকে বাহিরের সর্ব্ববিধ কলঙ্ক-কলুষ হইতে মুক্ত রাখিতেই তৎপর; বাংলাসাহিত্যক্ষেত্রের আবহাওয়া এমন অস্বাস্থ্যকর যে, তার সম্পর্ক এককালে যেটুকু বাধ্য হইয়া রাখিতে হইয়াছিল তাহার ফল হজম করিতেই তাঁহাকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছে। এখনও সেই হাটের মাঝখান দিয়া চলিতে যদি না পারেন, আবার এখনকার এই কাঁটাবন ভাঙ্গিতে যদি সঙ্কোচবোধ করেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁহাকে কেহ দোষ দিবে না। রবীন্দ্রনাথ আজীবন বাংলাসাহিত্যের সেবা কি ভাবে করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে বাঙ্গালীর মনে তাঁহার প্রতি যদি গভীর কৃতজ্ঞতাবোধ জন্মিয়া থাকে, তবে তাহা এমন রূঢ়ভাবে বিচলিত করা তাঁহার উচিত হয় নাই। বাংলাসাহিত্যক্ষেত্রে যেখানে ধূলি উড়াইয়া মল্লযুদ্ধ হয়, তাহার যে অংশটা কাঁটাবন—সেখানকার ধূলি উড়াইতে বা কাঁটা বাড়াইতে যাওয়া অবশ্যই তাঁর মত প্রতিভাশালী ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব; কিন্তু তাহার সম্পর্ক হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া চলিবার এই আগ্রহ, তাহার সম্বন্ধে কেবল একটা সঘৃণ ঔদাসীন্য পোষণ করা, কোনোকালেই তাঁহার মত শক্তিমান পুরুষের কর্ত্তব্য নয়। আত্ম-সমর্থনে তিনি বলিয়াছেন—সাহিত্যই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নয়। অন্য বৃহত্তর লক্ষ্য কি হইতে পারে তাহা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি; এই উক্তির মধ্যে নৈরাশ্য ও আত্মাভিমান দুই-ই আছে—তাহার কোনটাই এতবড় কবির পক্ষে গৌরবজনক নহে।

শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ২৫।২।১ বীডন ষ্ট্রীট, শনি-রঞ্জন প্রেস হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

'শনিবারের চিঠি'র

পরিশিষ্ট

দীনবন্ধু মিত্র সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত

দীনবন্ধু মিত্র সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

১। অপ্রকাশিত বাল্যরচনা

রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী ও কবিত্ব সমালোচনা প্রসঙ্গে সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একস্থলে লিখিয়াছেন,—"দীনবন্ধু মধ্যে মধ্যে প্রভাকরে কবিতা লিখিতেন। তাঁহার প্রণীত কবিতা-সকল পাঠক-সমাজে আদৃত হইত।...তাহা পুনর্মুদ্রিত হইলে বিশেষরূপে আদৃত হইবার সম্ভাবনা।" আক্ষেপের বিষয়, বঙ্কিমচন্দ্রের এই আদেশ এখনও সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালিত হয় নাই।

দীনবন্ধু কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শিষ্য। ছাত্রজীবনেই তিনি গুপ্ত-কবির সহিত পরিচিত হন। ঈশ্বরচন্দ্র তখন দুইখানি সাপ্তাহিক পত্র সম্পাদন করিতেন। একখানি—সংবাদ প্রভাকর, সে-যুগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংবাদপত্র। অপরখানি—সংবাদ সাধুরঞ্জন। শেষোক্ত কাগজখানি ১২৫৪ সালের ভাদ্র মাসে (১৮৪৭) সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়; ইহাতে প্রধানতঃ ছাত্রমণ্ডলীর রচনা প্রকাশিত হইত। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—"আমি যতদূর জানি, দীনবন্ধুর প্রথম রচনা 'মানব-চরিত্র' নামক একটি কবিতা। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত 'সাধুরঞ্জন' নামক সাপ্তাহিক পত্রে উহা প্রকাশিত হয়।" সংবাদ সাধুরঞ্জনের ফাইল দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় দীনবন্ধুর আর কোন্ কোন্ রচনা ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা জানিবার উপায় নাই।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংবাদ প্রভাকরেও দীনবন্ধুর অনেক কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার এই সকল বাল্যরচনার কয়েকটি 'পত-

সংগ্রহে' স্থান পাইয়াছে। কিন্তু রচনাগুলির প্রকাশকালের কোন উল্লেখ দেখিতেছি না। তারিখের উল্লেখ না থাকিলে ঠিক কত বয়সের রচনা তাহা জানিবার অসুবিধা হয়। 'পদ্য-সংগ্রহ'-এর অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি রচনার প্রকাশকাল উল্লেখ করিতেছি।—

(১) মানব-চরিত্র।—বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় প্রকাশ, ইহা 'সংবাদ সাধুরঞ্জনে' প্রকাশিত হয়।

(২) দম্পতী-প্রণয় (বিজয় কামিনী)।—ইহা ১৮৫৩ সালের ১৪ই ও ১৫ই মার্চ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত হয়। বসুমতী আপিস হইতে প্রকাশিত দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলীতে মুদ্রণকালে কবিতাটিতে খুঁটিনাটি অনেকগুলি ছাপার ভুল হইয়াছে। যেমন, কবিতার প্রথম চরণটি ছাপা হইয়াছে—"কাঞ্চন-নগরাধিপ রাজা মহাশয়", কিন্তু সংবাদ প্রভাকরে 'মহাশয়'-এর স্থলে 'সদাশয়' আছে। আর একস্থলে—"বদন মধুরা, কেন কামাতুরা ঢাকিতেছ দিয়া কর"—সংবাদ প্রভাকরে "কামাতুরা" স্থলে "কামধুরা" ছাপা হইয়াছে।

এই 'দম্পতী-প্রণয় (বিজয় কামিনী)" কবিতাটি পাঠ করিয়া রঙ্গপুর কুণ্ডী পরগণার বিদ্যোৎসাহী ও সুকবি জমিদার শ্রীকালীচন্দ্র রায় চৌধুরী 'সংবাদ প্রভাকরে' (১৮৫৩, ১৪ এপ্রিল) লিখিয়াছিলেন,—"হিন্দু কালেজের বিদ্যার্থি শ্রীযুত দীনবন্ধু মিত্রের বিরচিত কবিতার ভাব উৎকৃষ্ট।" রচনা-নৈপুণ্যের জন্য তিনি, এবং রঙ্গপুর তুষভাণ্ডারের জমিদার রমণীমোহন রায় চৌধুরী, উভয়ে দীনবন্ধুকে দশ টাকা করিয়া কুড়ি টাকা পারিতোষিক দিয়াছিলেন।

(৩) জামাই-ষষ্ঠী (প্রথম বারের)।—ইহা ১৮৫২, ৫ই জুন (২৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৯) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত হয়।

(৪) জামাই-ষষ্ঠী (দ্বিতীয় বারের)।—ইহা ১৮৫২, ২৫ মে (১৩

জ্যৈষ্ঠ ১২৫৯) তারিখের সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত হয়। কবিতাটির নীচে সম্পাদকীয় মন্তব্য দেখিতেছি:—"এ জামাইটির কশুর নাই। ফুল না ধরিতেই রসের ছড়াছড়ি করিয়াছেন।"

(৫) মাঘমাসে প্রাতঃস্নান।—ইহা ১৮৫২, ২৬ জানুয়ারি (১৪ মাঘ ১২৫৮) তারিখের সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত হয়।

(৬) বসন্তের আগমনে সুমতী কুমতী সহচরীদ্বয় সহিত বিরহিণীর কথোপকথন।—ইহা ১৮৫২, ২৩ মার্চ (১১ চৈত্র ১২৫৮) তারিখের সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত হয়।

(৭) চন্দ্র।—ইহা ১৮৫২, ৪ মে (২৩ বৈশাখ ১২৫৯) তারিখের সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত। "এই কবিতাটির নীচে সম্পাদকীয় মন্তব্য আছে:—"এই পদ্য অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে।"

(৮) লয়ার্ণিট লোটস্। ইহা ১৮৬৯ সালে ডিউক অফ এডিনবরার কলিকাতাগমন উপলক্ষে রচিত।

ইহা ছাড়া 'পদ্য-সংগ্রহে' দীনবন্ধুর আর কোন বাল্যরচনা স্থান পায় নাই। ১৩১৬ সালে "গ্রন্থকারের পুত্রগণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত" "পদ্য-সংগ্রহে", অথবা বসুমতী আপিস হইতে প্রকাশিত দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত 'পদ্য-সংগ্রহে' আবার উপরিউক্ত কবিতাগুলির সব কয়টিও মুদ্রিত হয় নাই। সম্প্রতি সংবাদ প্রভাকরের কিছু পুরাতন ফাইল আমার হস্তগত হইয়াছে। তাহাতে দীনবন্ধুর কুড়ি-একুশ বৎসর বয়সের কয়েকটি রচনা দেখিতেছি। এই সকল রচনা হয়ত এখনও পাঠকের মনোরঞ্জন করিতে পারে ভাবিয়া পুনর্মুদ্রিত করিলাম।—

কালেজীয় কবিতা-যুদ্ধ

সে-সময় যে-সকল ছাত্রের রচনা 'সংবাদ প্রভাকরে' স্থান পাইত, তাহাদের মধ্যে তিনজনের নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য। এই তিনজন,—হিন্দু কলেজের দীনবন্ধু মিত্র, হুগলী কলেজের বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এবং কৃষ্ণনগর কলেজের দ্বারকানাথ অধিকারী। ১৮৫৩ সালের সংবাদ প্রভাকরে "কালেজীয় কবিতা যুদ্ধের" কিছু নমুনা পাইতেছি। যুদ্ধের সূত্রপাত করেন—দ্বারকানাথ অধিকারী। তাহারই ফলে দীনবন্ধুর তিনটি কবিতা 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, —"তরুণ-বয়সে গালি দিতে কিছু ভাল লাগে; বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রায় পরস্পরকে গালি দিয়া থাকে। দীনবন্ধু চিরকাল রহস্যপ্রিয়, এজন্য এটা ঘটিয়াছিল।"

(সংবাদ প্রভাকর, ২৫ মে ১৮৫৩। ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৬০)

সত্যের মহিমায় পাপের পরাজয়।
এবং কবিতা পরিমাণের দোষ।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

দিবস হইল শেষ, নাহি কোথা রৌদ্র লেশ,
দিবাকর বসিবেন পাটে।
হেনকালে সরোবরে, শোভা হেরে মনোহরে,
মহিলায়া জল লয় ঘাটে॥
বিমল কমল হাসে, আর রাজহংস ভাসে,
পাশে পাশে প্রিয়া হংসী যায়।

ষট্‌পদ মনোসুখে, পদ্মিনীর মধুমুখে,
চুম্বনেতে মকরন্দ খায় ॥
বহে সমীরণ ধীর, কাঁপে কি না কাঁপে নীর,
স্থির শাখা, পাতা নড়ে সব।
শোভে ফুল চারি পাশে, মধু আশে অলি আসে,
স্বরে করে আনন্দ উৎসব ॥
ভাঁজিয়ে মধুর তান, কোকিল করিছে গান,
শুনে প্রাণ বিমোহিত হয়।
শোভে ধার নব ঘাসে, নয়নের দোষ নাশে
কবির আসন সুখময় ॥
সুশোভিত হেরে বারি, অশেষ বরণ ধারী,
কল্পনা দেবীর আগমন।
দেখেন সরসী সুখে, বচন নাহিক মুখে,
ভাবাকুল হোয়ে এক মন ॥
হেন কালে সেই খানে, সুমধুর মিষ্ট তানে,
এল এক কবি মহাজন।
মনে মিলাইছে পদ, চলে কি না চলে পদ,
দেবী কাছে দিল দরশন ॥
রব হীন কবি বরে, নোলিত ললীত স্বরে,
কহে দেবী কথা মনোহর।
ওরে বাছা জাদুধন, শোন দেখি দিয়া মন,
যাহা বলি তোমার গোচর ॥
দিবসেতে কুমুদিনী, অভাগিনী অনাথিনী,
বিরূপা মলিনী মনোদুখে।

নিশিতে তাহার বেশ, সুশোভিত বড় বেশ,
পবন হিল্লোলে দোলে সুখে ॥
কুমুদিনী কেন দুখি, কিসেইবা পুন সুখি,
দিনে রেতে কেন ভেদাভেদ।
তুমি কবি বিচক্ষণ, বোলে এই বিবরণ,
কর মম মনো দ্বিধা ভেদ ॥

কবির উত্তর

পয়ার।

মানবের ভাগ্য এই, কুমুদিনী ফুল।
সত্যের স্বরূপ দিন, আলো অনুকূল ॥
পাপ অনুরূপ নিশি, আঁধার আধার।
এ তিনে প্রকাশ করে, জগৎ সংসার ॥
সত্য ধরে যত দিন, থাকে নরচয়।
তত দিন কভু নাহি, হয় সুখোদয় ॥
নাহি পায় ভাল পদ, নাহি বাড়ে মান।
অধমুখ দিবসের, কুমুদী সমান ॥
সত্য ছেড়ে যেইজন, পাপে হয় রত।
নয়ন নিমিষে পায়, সুখ শত শত ॥
মিছে কথা দিয়ে করে, ঋণ পরিশোধ।
স্বৈরিণীর সনে পায়, পরম আমোদ ॥
পর যশ হরে যশ, করে আপনার।
অতি নীচ তোষামদে, প্রিয় সবাকার ॥

পাপের অধীনে পারে, লইতে মেদিনী।
সৌভাগ্য প্রফুল্ল যেন, রেতে কুমুদিনী॥
সত্যেতে মলিন সব, পাপে আমোদিত।
প্রবল পাপেতে সত্য, শেষ পরাজিত॥
কুমুদীর সুখ দুখ, কিছু নহে আর।
পাপ পুণ্য ফলাফল, দেয় সমাচার॥

দেবীর উক্তি

মধু মাখা কথা তব, মুখে বরিষণ।
সুলোলিত ভাষা শুনে, জুড়ালো শ্রবণ॥
ভাবের সৌন্দর্য্য কিন্তু, নাহি দেখি তায়।
মজিল না মন তাই, তোমার কথায়॥
কোথায় শুনেছ তুমি, সত্য পরাজয়।
পাপে কি কখন হয়, মনো সুখোদয়॥
ধরায় পাপেতে হয়, সম্পদ নির্ব্বাণ।
'যথা ধর্ম্ম তথা জয়' বিধির বিধান॥

সুমেরু শিখর সত্য, দাঁড়ায়ে ধরায়।
ঝড় হোয়ে পাপ তারে, উড়াইতে চায়॥
দূরে পড়ে যায় বায়, ঠেকিয়ে পাথরে।
পাপের কি সাধ্য বল, সত্যে জয় করে॥
যত জোরে লাগে বাত, মহীধর গায়।
অধমীরে তত ঘুরে, দূর হোয়ে যায়॥
সত্যের বিক্রমে পাপ, আপনি পলান।
'যথা ধর্ম্ম তথা জয়' বিধির বিধান॥

সত্য তেজ অনুরূপ, রবি তেজময়।
মেঘাকারে ঢাকে পাপ, তাহার উদয়॥
অক্ষয় তপন জ্যোতি, করে দরশন।
কেঁদে বরিষণ করি, করে পলায়ন॥
জলদে নাহিক আলো, চপলে যা পায়।
সেরূপ পাপের সুখ, না হইতে যায়॥
ভানু সম সত্য জ্যোতি, সতত সমান।
'যথা ধর্ম্ম তথা জয়' বিধির বিধান॥

শুনেছ ত্রেতায় দুষ্ট, রাক্ষস রাবণ।
করিল অনেক পাপ, বধে জনগণ॥
পাইল সম্পদ বলে, নাহি হয় শেষ।
কর দিত সচীনাথ, রবি শশী শেষ॥
মহাপাপী হোয়ে পরে, হরিল জানকী।
কত সুখ পেলে পরে, পরেতে জান কি॥
সবংশে হইল নাশ, খেয়ে রাম বাণ।
'যথা ধর্ম্ম তথা জয়' বিধির বিধান॥

দ্বাপরে চাতুরি করে, রাজা দুর্য্যোধন।
পাষায় হারায়ে পাণ্ডু, বংশ দিল বন॥
লইয়ে সকল দেশ, বসিল আসনে।
সত্য ধোরে পাঁচ ভাই, ভ্রমে বনে বনে॥
পালন করিয়ে সত্য, এলো পাণ্ডুদল।
মেঘ ভঙ্গে রৌদ্র যেন, হইল প্রবল॥

পাপের শরণে কুরু, না পাইল ত্রাণ।
'যথা ধর্ম্ম তথা জয়' বিধির বিধান ॥

কলিতে কি হয় দেখ, মেলিয়ে নয়ন।
কত দেশ বোনাপার্ট, করিল দাহন ॥
খেদাইয়ে দেশ হোতে, নরপতিগণে।
এনেছিল সব রাজ্য, আপন শাসনে ॥
স্ববলে সম্রাট দলে, দিল বহু দুখ।
কোথা রৈলো অবশেষে, পাপার্জিত সুখ ॥
পড়িয়ে ডিউক হাতে, খোয়াইল মান।
'যথা ধর্ম্ম তথা জয়' বিধির বিধান ॥

তাই বলি ওরে বাপু, নব কবি বর।
পাপের ক্ষমতা নাই, সত্যের উপর ॥
হয়নি, হবেনা সত্য, কখন মলীন।
আনন্দে প্রফুল্ল মুখ, সম চিরদিন ॥
প্রথমে দেখিতে গেলে, সংসারের কায।
বোধ হয় পাপ সত্যে, সদা দেয় লাজ ॥
সুবিচার কর দেখি, সুধীর হইয়ে।
আলোচনা কর দেখি, জ্ঞানে ডাক দিয়ে ॥
অবশ্য দেখিবে তবে, মনের নয়ন।
সত্যের নীচেয় পাপ, সহস্র যোজন ॥

কবির উত্তর।

কালের পণ্ডিত তুমি, জাননা কামিনী।
তাই মন্দ বল মোর, কবিতা নন্দিনী ॥

স্বভাব অভাবে বল, কি ক্ষেতি আমার।
ভাষা দেখে ভাল মন্দ, কবিতা বিচার॥
শত শত ধরে গুণ, পদ্য সুলোচনা।
স্বর মাত্র সকলেই করে বিবেচনা॥
পাইয়ে কবিতা এক, আমি এক দিন।
ভাব বুঝিবারে ভাবে, হলেম বিলীন॥
ভাবিতে ভাবিতে ঘুমে, হইয়ে অজ্ঞান।
স্বপনেতে করিলাম, তার পরিমাণ॥
রচনা সরস বটে, ভাব বটে খাটি।
কঠিন ভাষার জন্যে করিয়াছি মাটি॥

দেবীর উক্তি।

কালের এমন ভাব, কে বলে তোমায়
ভুলেছ এখন তুমি, কাহার কথায়॥
পাগলেতে যাহা বলে, বিজ্ঞে যদি ধরে।
চলিতোনা কায তবে, সংসার ভিতরে॥
সুকবি পণ্ডিত যারা, তারা জানে বেশ।
কবিতার সার মর্ম্ম, ধর্ম্ম উপদেশ॥
ধর্ম্ম নীতি ঢাকা দিয়ে, মিথ্যার বসনে।
সহজে পাঠায়ে দেয়, মানবের মনে॥
মিথ্যা দূর হয় সাঙ্গ, যে হয় পঠন।
অনায়াসে বসে সত্য, হৃদয়ে তখন॥
মিষ্টি ভাষা থাকে যদি, চরণে চরণে॥
সুরস লাগেনা শেষ, কারো আস্বাদনে॥
বিষয় বুঝিয়ে হবে, ভাষার চলন।

স্বরে অর্থে রাখা চাই, সতত মিলন ॥
কাঠিন্য থাকিবে ভাষে, শাস্ত্রীয় কথনে।
কোমল সরল ভাষা, কামিনী বচনে ॥
ঝড়েতে কর্কশ বাক্য, হুহু করে ঘনে।
ধীরি ধীরি ওঠে পদ, মলয় পবনে ॥
সংগ্রাম বর্ণনে কথা, করে খন্ খন্।
ষষ্ঠি বাঁটা হাসি হাসি, বচনে রচন ॥
উচ্চমন উচ্চ ভাবে, সদা সুখি হয়।
কাল কিন্তু ভাবে কালা, স্বর লয়ে রয় ॥
নর বিনা অন্যে ভাব, বুঝাতে না পারি।
নর সনে স্বরে কিন্তু, পশু অধিকারী ॥
স্বপনের বিবরণ, বুঝিয়াছি সার।
দিওনা দ্বেষের ফুট, নয়নেতে আর ॥
নিজ আভা নিজগুণে, না হোলে প্রবল।
পর আভা ঢাকা দিলে, কি হইবে বল ॥
ভাষা আগে এই বার, ভাবে দেও মন।
দেখনা দেখনা আর, শুয়ে কুস্বপন ॥
উচ্চভাষা ভয়ে বুঝি, হয়েছিলে কাট।
দেয়ালা করেছ তাই, যাট্ যাট্ যাট্ ॥

উপদেশ দিয়া দেবী, বাতাসে মিশায়।
মাথা নেড়ে কবিবর, নিজবাসে যায় ॥
কোথা যাও কবি ভাই, ভাবিতে ভাবিতে।
আমরা পেরেছি কিন্তু, তোমায় চিনিতে ॥

ব্যানা বনে বাস তব, বুনো কবি নাম।
বিলাতি তাঁলের গাছ, ভাব দেখে থাম॥
আঁখি মুদে ভাব গিয়ে, আপনার স্থানে।
কেন চেয়ে কানা হও, বিভাকর পানে॥

এই পর্য্যন্ত

শ্রীদীনবন্ধু মিত্র।
হিন্দুকালেজের ছাত্র।

(সংবাদ প্রভাকর, ৯ আগষ্ট ১৮৫৩। ২৬ শ্রাবণ ১২৬০)

কালেজীয় কবিতা যুদ্ধ

চোকে আঙ্গুল দিয়া বুঝাইয়ে দিই।

নির্ম্মল বর্ণা সরলতা দেবীর পবিত্র ক্রোড়ে শয়ন পরায়ণ হইয়া তদীয় প্রাণাধিক প্রাণপুত্র সরল কবি স্তন পানে সুমধুর নম্রতা রূপ পয়ঃ পান করিয়া মাতৃগুণ প্রদর্শন পূর্ব্বক সাধারণের মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু নরনিচয়ের সুখ্যাতি শশাঙ্ক সম্যক্ নিষ্কলঙ্ক হয় না।* একদা সরলতা সুকুমারকে গৃহে রাখিয়া দিবসত্রয় জন্য তীর্থ পর্য্যটনে গমন করিলে তাঁহার সপত্নী হিংসা দেবী অবসরক্রমে সেই স্থানে আগমন করিয়া সরল শিশুর সরল রসনায় গরল দান করিলেন, যেহেতু এরূপে উভয় পরের অনিষ্ট এবং বালকের অমঙ্গল হওনের সম্ভাবনা। হিংসা ঘরে আসিয়াই সতীন সুতে কোলে লইতে হস্ত প্রসার করেন কিন্তু জন্মাবধি সরলতার বিমল বদন বিগলিত বিহিত বচন শ্রবণে একবার সুসংস্কার জন্মিলে সহসা কখন কেহ তৎসতা হিংসাদেবীর সুস্বাদু বিষাক্ত বচনে মোহিত হয়না। সুতরাং সরল

কবি প্রথমতঃ হিংসার ক্রোড়ে যাইতে অসম্মত হইলেন। কিন্তু অধিকক্ষণ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকিতে পারেন নাই। ভোজ বিদ্যাবিশারদা হিংসাদেবী এমন মধুর মধুর স্নেহ বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, ধন, মান এবং সুখসম্পাদনের এমন সহজ সহজ উপায় দেখাইতে লাগিলেন, মনোবেদনার এমন আশু প্রতীকার করিতে লাগিলেন, যে সরল কবি কুহক কুআশা ঘোরে অন্ধ হইয়া দৌড়াদৌড়ি হিংসার কজ্জল কোলে উঠিলেন এবং গলা ধরিয়া মা, মা, বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। হিংসাও প্রগাঢ় স্নেহের সহিত নূতন ছেলের মুখ চুম্বন করত মনোমত মন্ত্রণা দিতে প্রবৃত্তা হইলেন। তদবধি সতীনপোর প্রতি হিংসার এমন মায়া বসিল, যে, এক ভ্রূক্ষেপ কাল তাহার বদন সুধাকর না দেখিলে তিনি চারিদিক্ শূন্য দেখেন এবং উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে থাকেন। এজন্য 'মার চেয়ে ব্যথিত যে তারে বলে ডান'। সরল কোল ছাড়িয়া গরল কোলে আইলে শিশুর নাম সরল কবি পরিবর্ত্তে বুনোকবি হইল। তদনন্তর হিংসার মন্ত্রণায় বিহ্বল হইয়া তৎকোলে শয়ন করিয়া যে এক অপূর্ব্ব মনোহর স্বপ্ন দেখিলেন অজ্ঞানতা বশতঃ সেই স্বপ্নের কথা সর্ব্ব সাধারণের প্রকাশ করিতে বিরত থাকিতে পারেন নাই। স্বপ্নে যাহা দেখা যায় অথবা মনের ভিতর যাহা চিন্তা যোগে আপনা আপনি উদয় হয় সে কেবল বাতাসে দুর্গ নির্ম্মাণ। তাহা মনে মনে রাখাই উচিত, কারণ প্রকাশ করিলে লোকে পাগল বলে। হিংসার পালিত পুত্র এসব না জানিয়াই সুমিষ্ট স্বপ্ন বিবরণ সত্য বলিয়া পত্রে প্রকটন করিয়াছেন। একদিন সন্ধ্যাকালে সরোবর তীরে এতৎ স্বপ্নোপলক্ষে কল্পনা দেবীর সহিত তাঁহার কথোপকথন উপস্থিত হইবায় বাড়ি আসিতে কিঞ্চিৎ রাত্রি হয়, তাহাতে হিংসা দেবী নবপ্রসূত বৎস হারা গাভীর ন্যায় উন্মত্তা হইয়া নীচের লিখিত মত বিলাপ করিতে লাগিলেন।

হিংসা।

রজনী হইল ঘোর, নাড়ী ছেঁড়া ধন মোর,
এখনো এলোনা কেন ঘরে।
পোড়া জন্মে কুলনারী, বাহির হইতে নারি,
না পারি ডাকিতে উচ্চৈঃস্বরে॥
এক দণ্ড চাঁদমুখ, না দেখিলে ফাটে বুক,
নাহি সুখ প্রাণ উঠে মুখে।
কি করি কোথায় যাই, কোথা গেলে বুনো পাই,
আই ঢাই করে অঙ্গ দুখে॥
দুধের গোপাল বাছা, সব ছেলে মধ্যে বাছা,
সতত মায়ের আজ্ঞাকারী।
হয় সদা সঙ্গোপন, অধ্যয়নে দেয় মন,
সদা সৎ আচরণচারী॥
পড়িয়াছে ইতিহাস, বেদব্যাস কীর্ত্তিবাস,
পাঁজি পুঁথি কিছু বাকী নাই।
চারি যুগ সমাচার, শুন গিয়া মুখে তার,
বলে সব বোসে এক ঠাঁই॥
মুখ-অগ্র রামায়ণ, নহে কিছু বিস্মরণ,
বিবরণ মুখে মুখে বলে।
রাম-সীতে লোয়ে শিরে, বোধ হয় বুক চিরে,
রাখিয়াছে দেখাতে সকলে॥
এমন স্বোণার ছেলে, থাকিতে কি পারি ফেলে,
কখন্ আসিবে বাছা-ধন্।
ক্ষীরে স্তন হোলো ভারি, আর যে থাকিতে নারি,
যাদু পান করিবে কখন্॥

পাড়ার বালকগণে, পেলে মোর বাছাধনে,
কাণাকাণি করে হেসে হেসে।
অতি শান্ত বাছা মোর, যুবাদলে যেন চোর,
অঘোর আমার উপদেশে॥
বলিয়াছি বুঝাইয়ে, রবে মুখে গুও দিয়ে,
লুকাইয়ে করিবে আঘাত।
কেহ বুঝি পেয়ে টের, কোরেছে বিষম ফের,
নহিলে কি জন্য এত রাত॥
প্রতিদিন যাদুমণি অস্তে গেলে দিনমণি,
অমনি আসিত মোর কোলে।
করিয়ে দিয়েছি কাচ, তবে কেন হেন কাচ,
কি জানি পড়িল কোন্ গোলে॥
ওই যে আসিছে যাদু—

কাঁদিতে কাঁদিতে ছেলের আগমন

পয়ার।

ওকি ওকি, ওমা ওমা, কান্না কেন ধন।
কে বোলেছে মন্দ কথা, বল বিবরণ॥
তুমি যে আদুরে ছেলে, ঘরের সোহাগ।
তোমা বিনে মন ধনে, কারু নাহি ভাগ॥
বাপের ঠাকুর যাদু রায়, মরি মরি।
কেন কেন কান্না কেন, এসো কোলে করি॥
কে বলেছে কটু কথা, মুখে ছাই তার।
বাপ্‌ধন বাছা মোর, কেঁদোনাকো আর॥

বুনোকবি।

জননী জিজ্ঞাসা করি, বল বিবরণ।
পরেতে বলিব মম, কাঁদার কারণ ॥
করিলাম কবিতা রচনা, তিন জনে।
অর্পণ করিল রবি, তাহা সাধারণে ॥
পাচ জনে পাঁচ কথা, বলিতেছে তায়।
চুপি চুপি তুমি তবে, বলিলে আমায় ॥
'অপর দুজনে যাহা, কোরেছে রচন।
তুমি বাপু কর তার, বিচার এখন ॥'
তব বোলে মুগ্ধ হোয়ে, করিলাম তাই।
আদেশের অভিপ্রায়, শুনিবারে চাই ॥

হিংসা।

আমার বাসনা যাদু, তোমায় করিতে সাধু,
শুধু নয় স্বগুণ গৌরবে।
ছুপে রাখি পর যশ, কাদা করি পর রস,
মাটি দিই পরের সৌরভে ॥
বাড়াইতে তব মান, কবিতার পরিমাণ,
করিবারে কোরেছি আদেশ।
তা হইলে লোক সব, করিবেক অনুভব,
কবি শূন্য হয়েছে এদেশ।
তুমিই কবির সার, কাব্য লেখ একবার,
আর বার কর পরিমাণ ॥
সাপ হোয়ে কামোড়াও, ওঝা হোয়ে পরে যাও,
সহজে কাযেই বাড়ে মান।

বঙ্গ দেশে লোক নাই, তুমিই কবির চাঁই,
সকলেই ভাবে কাযে কাযে।
আপনার গুণ যত, ভাল বল মনোমত,
পরগুণ ফেলো ভ্রম মাঝে॥
যদি কারো ভাল দেখ, তার পক্ষে মন্দ লেখ,
সবার নীচেতে ফেলো তারে।
অপরের সুকিরণ, করিবারে নিবারণ,
এই বিধি আমার বিচারে॥

বুনোকবি।

কেমন কেমন লাগে, একথা আমায়।
করিনি সুযুক্তি আমি, তোমার কথায়॥
তিন পত্র তিন জনে, লিখিনু যতনে।
প্রভাকর পাঠাইল, তাহা সাধারণে॥
সাধারণ অভিপ্রায়, শুনিতে সকলে।
কাণ বাড়াইয়ে আছে, পাঠকের দলে॥
কবিতা সবিতা রবি, তিনিও নিরবে।
কোন্ ভাবে কোন্ কবি, সাধারণে লবে॥
মাঝে পোড়ে আমি কেন, তুলিলাম মাতা।
মাতা হোয়ে মোর মাতা, খেলে ওগোমাতা॥
বাদি প্রতি বাদি আসি, বিচার আলয়।
বিচারের তরে দুয়ে, উপস্থিত হয়॥
বিচার পতির কথা, না হইতে শেষ।
বাদি যদি প্রতিবাদি, প্রতি করে দ্বেষ॥
খপ্ করে ওঠে যদি, বিচার আসনে।

দুই হাত তুলে যদি, বলে সাধারণে॥
আমার বিচারে আমি, করি অনুমান।
প্রতিবাদি মিথ্যাবাদী, বাদির কল্যাণ॥
তখনি সে হয় তথা, হাসির আস্পদ।
সবে ভাবে ভুলক্রমে, হোয়েছে দ্বিপদ॥
আমিও সেরূপ মাতা, কোরেছি অন্যায়।
শিষ্য হোয়ে গুরুনাম, লিখিয়াছি গায়॥
বিশেষ জিজ্ঞাসা করি, জননী তোমায়।
কে আদি দ্বিতীয় কেবা, জানিলে কোথায়॥
আমিবা রোলেম্ কোথা, বিচার সময়ে।
"ঐ আমি কি আমি আমি" গেছে ভুল হয়ে॥

হিংসা।

বাপ রে সোণার বাছা, তোমার বয়স কাঁচা,
বোঝ নারে জননীর বাণী।
কবি বটে তিন জন, তুমি মোর প্রাণ ধন,
তার মধ্যে একজন জানি॥
যতনে তোমারে ধন, করিলাম সঙ্গোপন,
মাপের লেখনী দিনু হাতে।
তুমি তায় হোলে ভারি, কবি পরিমাণকারী,
নাবিলেনা ওদুয়ের সাতে॥
উঠিলে ছাড়িয়ে ভূমি, শাখায় কুরঙ্গ তুমি,
বোসে দেখ কবিদের মাঝে।
উপরেতে বোসে থাকি, সকলেরে দিলে ফাকি,
মানি হোলে জনের সমাজে॥

কে আদি, দ্বিতীয় কেটা, ভাবিয়ে দেখিনি সেটা,
এই মাত্র করিলাম মনে।
এসো বলি কাণে কাণে, পাছে আর কেহ জানে
মনে রাখ গোপনে গোপনে ॥

কাণে কাণে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলেন।

বুনোকবি।

যা বল তা বল মাতা, কথা ভাল নয়।
তব উপদেশ নিতে, মনে সন্দ হয় ॥
এ আদি, দ্বিতীয় ইটি, বলিলে কি হবে।
পড়িলে কুঁদের মুখে, বাঁক নাহি রবে ॥
একদল ভুক্ত মোরা, দুই তিন জন।
আমার বিচার করা, বিচার লঙ্ঘন ॥
ওরূপ কথায় কারো, মন্দ নাহি হয়।
বিশেষ বলেন তাহা, পোপ মহাশয় ॥

"Envy will merit as its shade pursue,
"But, like a shadow, proves the substance true;
"Wit envied, like the sun eclipsed, makes known
"The opposing body's grossness, not its own."

হিংসার সহিত বুনোকবির এইরূপ মনান্তর হওনের সূচনা হইলে পরিহাস নামে এক বয়স্য আসিয়া তাঁহাকে বেড়াইতে ডাকিয়া লইয়া গেল।

পরিহাস।

এসো এসো বুনো বাবু, বেড়াইতে যাই।
এদিনে লিখেছ ভাল, ভ্যালা মোর ভাই ॥
সেসব হাসির কথা, সরস শুনিতে।
জাননারে মুখে পড়ে, মাথায় মুতিতে ॥

"কমলিনী" বিবরণ, বলিলে কেমনে।
রাগ কেন বল দেখি, কি ভেবেছ মনে ॥

বুনোকবি।

দেখনা দেখনা ত . . . . [ছিন্ন] নাহি সয়।
কমলিনী কাছে ছোঁড়া দিবা নিশি রয় ॥
রাগেতে গুমুরে মরি, থাকি মনে মনে।
কিগুণে মজিল পদী ভ্রমরার সনে ॥

পরিহাস।

ধর্ম্ম শীলা কমলিনী, হরিণ লোচনা।
রূপবতী অতিসতী, পতিপরায়ণা ॥
বিধির কৃপায় পেয়ে, এমন রতন।
দিবা নিশি করে কবি, সুখ আলাপন ॥
এ দেখে শিহরে অঙ্গ, দ্বেষেতে তোমার।
বেহাত তোমায় কিন্তু, করে দেশাচার ॥
মিসর দেশের রীতি, থাকিলে এখানে
কমলিনী নাহি যেতো, আর কার স্থানে ॥

বুনোকবি।

পরিহাস, পরিহাস, কেন কর ভাই।
কি বলিতে, কি বলেছি, ভাবিয়ে না পাই ॥

পরিহাস।

বেস্ বেস্ ও কথায়, কায নাই আর।
কি ভাবে বলদ তুমি, কর ব্যবহার ॥

বলদেতে সেই অর্থ, সকলে লয়েছে।
যাতে লোক অধিকারী, বাচুর হয়েছে ॥
এ অর্থে বলদ তুমি, যদি লিখে থাক।
বৃথা কেন শাক দিয়ে, আর মাচ ঢাক ॥
তব দ্বেষ পষ্ট ইথে, হইবে প্রকাশ।
না কিছু তোমার আছে, গোপন আভাষ ॥

বুনোকবি।

No, no, ভাই, আমি নই, এমন অসার।
ও অর্থে, বলদ, আমি, করিব ব্যাভার ॥
যার বলে হয় লোক, গোরু অধিকারী।
আমি কি সে অর্থ কভু, শব্দে দিতে পারি ॥
বলদ অর্থেতে হয়, যেই দেয় বল।
জলদে যেমন অর্থ, যেই দেয় জল ॥
পাছে লোক ভাবে আমি, বলদ বলেছি।
নোট কোরে সার অর্থ, নীচেতে লিখেছি ॥

পরিহাস।

ভাল ভাল যেতে দেও, ওসব বচন।
জিজ্ঞাসা তোমায় করি, এক বিবরণ ॥
তব লেখা অনুসারে, হোতেছে প্রকাশ।
এসেছিল মিত্র বাবু, শ্বশুরের বাস ॥
তোমায় রাগত কিন্তু, দেখিয়ে জামাই।
জষ্টি ষষ্টি বিরচনে, কোরেছে কামাই।
এবার কিরূপ হোলো, জানিতে না পাই।
পত্রেতে আভাষ দিয়ে, ভাল কর নাই ॥

কেমনে আইল, মিত্র বন্ধু, কয় জনা।
কেমনে লইল দ্বারী, করিয়ে বন্দনা॥
কি বোলে, নে গেল, দাসী, বাড়ির ভিতরে
কি বলিল শালি "মুখ, ঢাকিয়া অম্বরে॥
শালাজ কেমন দিল, দুদ্ মিঠে আঁব।
কি কথা বলিল মিত্র, দেখে তার ভাব॥
কিরূপ কৌতুক হোলো, শয়ন আগারে।
কি কথা কহিল কান্তা, সেতারের তারে॥
তোমার কারণ ভাই, তোমার লিখনে।
বঞ্চিত হয়েছি মোরা, সব বিবরণে॥
লিখিয়াছ জান তুমি "বেশের বিষয়"।
এসব বলাও তব, উপযুক্ত হয়।
স্বচোকে সকলি তুমি, দেখিয়াছ ভাই।
আদি অন্ত তব কাছে, শুনিবারে চাই॥

বুনোকবি

যাও যাও জ্বালাতন, কোরনা আমায়।
মন্দ কথা ছেড়ে দাও, পড়ি তব পায়॥

—

হাসিতে হাসিতে উড়ে, গেল পরিহাস।
ফিরে যায় কবিবর, আপন আবাস॥

এখানে চ[illegible], মিত্র সমভিব্যাহারে সরলতা দেবী ভবনে প্রত্যাবর্তন করিয়া প্রিয়তম জীবনাধিক সরল কবিকে না দেখিতে পাইয়া নগর পর্য্যটনে গমন করিয়াছে বিবেচনায় উপস্থিত কা[illegible] সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন।

সরলতা।

তার পরে কি হইল, বল বল বল।
শুনিয়ে এসব কথা, হৃদয় চঞ্চল॥
তিন দিন হয় নাই, করেছি গমন।
এর মধ্যে এত কাণ্ড হোয়েছে ঘটন॥

চট্টোকবি।

তিন দিন বহুকাল, পেলে তিন পল।
করিতে পারেন দ্বেষ, সাগরে অনল॥
পথেতে শুনেছ মাতা, সব বিবরণ।
এখন উপায় বল, যাহাতে মিলন॥

মিত্র কবি।

উপায় ভাবনা ভাই, ভাবিতে হবে না।
মায়ের স্মরণে দ্বেষ, রবেনা রবেনা॥
এ ভবনে তিন জনে, হোলে দরশন।
নয়ন নিমিষে হবে, সরল মিলন॥

সরলতা।

অধীর তোমরা বাছা, হওনি নিপুণ।
ব্যস্ত হোয়ে কর গ্রাস, হিংসার আগুন॥
মমালয় থাক সবে, পরম সন্তোষে।
পতিত হবেনা কেহ, কভু কোন দোষে॥
সতত থাকিব আমি, ব্যাপিয়া ভবন।
ছেড়ে আর-এসো এসো এসো বাছাধন॥

সরল কবির আগমন*

বল দেখি বিবরণ, বিস্তার করিয়ে।
ভেয়ে ভেয়ে দ্বেষাদ্বেষ, কিসের লাগিয়ে॥

সরল কবি।

আলয়ে কখন মার, হোলো আগমন।
তোমা দুয়ে যোড় করে, করি সম্ভাষণ॥
কি বলিব জননীগো, বাক্য নাহি সরে।
বিবাদে পেয়েছি ব্যথা, সরল অন্তরে॥
কিন্তু মাগো পথ দিয়ে, আসিতে ভবনে।
তব পুণ্য অনুরূপ, পোড়ে গেল মনে॥
অমনি দাহন হোলো, কলহ কণ্টক॥
সহসা ফুটিল মনে, মিলন চম্পক॥
খাইল কাঁটার ছাই, ভ্রমের অর্ণব।
বলিতে সে সব মাতা, হলেম নিরব॥
প্রিয়বন্ধু কবি ভ্রাতা, দেখি দুই জন।
তোমার প্রসাদে মাতা, হইল মিলন॥

চট্টকবি।

মোহিত হইল মন, সরল মিলনে।

মিত্র কবি।

এইস্থানে অদ্যাবধি, রব তিন জনে॥

সরলতা।

এমন মিলন বাছা, হবে কাযে কাযে।
স্বভাব অভাব নহে, তোমাদের মাঝে॥

* হিংসাও গিয়াছে বুনোকবি নামও গিয়াছে।

বিশ্বপাতা বিশ্বপিতা, ভেবে দেখ মনে।
সে কারণ ভাই ভাই, তোরা তিন জনে॥
তিন বিদ্যালয় হয়, এক সভাধীন।
হইয়াছ ভাই ভাই, তাহাতেও তিন॥
বিরচন করি তিনে, দেহ এক ঠাঁই।
এতেও তোমরা তিনে, হও ভাই ভাই॥
কবিতায় উপদেশ, লহ রবি কাছে।
ভাই ভাই বাঁধাবাঁধি, ইথে আরো আছে॥
করোনা করোনা তাই আর দ্বেষাদ্বেষ।
তিন মিলে কর চেষ্টা, তুষিতে স্বদেশ॥

বিবাদ বাড়বানলে, ঢালিয়ে সলিল।
সরলে সরলে হলো, সুখের সুমিল॥
সম্ভাষণ আলাপন, করে তিন জন।
সুখের সাগরে ভাসে, সরলের মন॥
অমিয় বচনে মাতা, তুষিল সকলে।
শিশির পড়িল যেন, নব চারাদলে॥
অবশেষে লোয়ে তিনে, সরল সুধীর।
তপনে অর্পণ করি, হইলেন স্থির॥

শ্রীদীনবন্ধু মিত্র
হিন্দুকালেজ

(সংবাদ প্রভাকর, ১৭ নভেম্বর ১৮৫৩)

কালেজীয় কবিতা যুদ্ধ।

হাতে হাতে পাপের ফল।

এদেশের দেশাচার করিলে বিচার।
পরিতাপ তাপে হয় হৃদয়ে বিকার॥
বিধিবৈধ বিধি যাহা হয় অনুমান।
তাহার আচার দোষে না হয় বিধান॥
শিশুকালে পরিণয় হোলে সম্পাদন।
কত রূপ ঘটে মন্দ, কে করে গণন॥
আরো তায় বিদ্যাহীন যদি হয় নারী।
অনিষ্ট উদয় কত বলিতে না পারি॥
পবিত্র বলিয়ে সবে, ভাবে লোকাচার।
অভয়ে অবজ্ঞা করে, মনের বিচার॥
পিতা পিতামহ যাহা, করেনি কখন।
তাহা করিবারে কারো, নাহি সরে মন॥
সেকালে সকলে মনে, করিত বিশ্বাস।
অবনী বেড়িয়া রবি, ঘোরে বার মাস॥
জ্ঞানের প্রভাবে কিন্তু, নির্ণয় এখন।
সূর্য্য বেড়ে করে ধরা, সতত ভ্রমণ॥
পূর্ব্ব-পুরুষেরা ইহা, মানিত না মনে।
এ সব বিশ্বাস তবে, হতেছে কেমনে॥
চলিত আচার দোষ, দেখিতেছ সবে।
লোকাচার কারাগারে, বাঁধা কেন তবে॥

শিশুকালে পরিণয়, কর পরিহার।
বিধবারে দিতে পতি, কর দেশাচার॥
বিশেষ বিনয় সহ, এই অভিলাষ।
রামা মন হোতে কর, আঁধার বিনাশ॥
সকল সুখের ভাগী, রমণী রতন।
তার পরিতোষে সুখি, মানবের মন॥
বিদ্যারত্ন মহাধন, মনের নয়ন।
জীবনের সারভাগে, কর বিতরণ॥
বিদ্যা আভা বিনা রামা, ভাবে বিপরীত।
কুলটা হইতে দোষ, না ভাবে কিঞ্চিৎ॥
পড়ে দেখ নীচের কাহিনী সাধুজন।
প্রমাণ হইবে তবে, আমার বচন॥
চঞ্চলা নামেতে এক, রাজার নন্দিনী।
বিদেশি পতির তরে, চির বিরহিণী॥
কুসুমে বাঁধিয়া নাথ, গিয়েছে প্রবাসে।
চঞ্চলা চঞ্চলা বড়, তার আসা আশে॥
উথলিল সময়েতে, জাহ্নবী যৌবন।
তটে বোসে আছে বালা, উচাটন মন॥
নায়ক নাবিক বিনে, তরিবে কেমনে।
ডোবে বুঝি অবলার, জীবন জীবনে॥
এক দিন সহচরী, সঙ্গে রসবতী।
কহিতেছে হাসি-মুখে, মধুর ভারতী॥
দেখেছিলি তোরা কিলো, তাহারে বাজিয়ে।
যার সনে বাবা মোর, দিয়াছেন বিয়ে॥

নবীন বয়স কিনা, দেখিতে কেমন।
বল্‌না জানিস যদি, তার বিবরণ॥
মনে প্রেম ফোটে কিনা, দেখিলে তাহারে,
প্রাণ কেড়ে লয় কিনা, নয়নের ঠারে॥
জনেক প্রবীণা সখী, করে নিবেদন।
শোন শোন বিধুমুখি, আমার বচন॥
বরমাল্য যার গলে, দিয়াছ চঞ্চলা।
দেখিয়া তাহার রূপ, চপলা চঞ্চলা॥
তব পিতা মনে ভাল, বুঝেছিল তায়।
হাতে হাতে তারে তাই, দিয়াছে তোমায়॥
মন মিল কথা কিন্তু, কে বলিতে পারে।
যত দিন থাকে দুয়ে, অজ্ঞান আঁধারে॥
বালক বালিকা করে, মন বিনিময়।
পুতুলের বর কন্যা, অনুমান হয়॥
আর এক সহচরী, হাসিয়া হাসিয়া।
কহিতেছে মৃদুস্বরে, নিকটে আসিয়া॥
আজ কেন আদরিণি, বিমনা এমন।
পতি নামে কেন আজ, এত উচাটন॥
পাষাণ হৃদয় তার, বিফল জীবন।
ছেড়ে আছে ভুলে, আহা! তোমা হেন ধন॥
চঞ্চলা অধীরা হোয়ে, বলে তার পর।
মম মন নাহি কিন্তু, তাহার উপর॥
মনোমত নারী সেই, লয়েছে আবার।
দেখি দেখি মম মনে, কি হয় বিচার॥

ত্রিপদী।

কিছু দিন তার পর, স্মর শরে জর জর,
থর থর কলেবর কাঁপে।
একে সরস্বতী বাম, তাহাতে উদয় কাম,
পাপোদয় দ্বিগুণ প্রতাপে ॥
পঞ্চশর নিবারণ, করিবারে জলে মন,
অবলা চঞ্চলা পাগলিনী।
দূরে গেল ধর্ম্ম ভয়, কুলমান পরাজয়,
রমণী হইল কলঙ্কিনী ॥
নিশিযোগে একদিন, চঞ্চলা সুমতি হীন,
বলিতেছে সহচরী কাছে।
তোরে ভাই বার বার, বলিতে না পারি আর,
বাঁচিবার উপায় কি আছে ॥
শোন প্রাণ প্রিয়সই, তাহার উপায় কই,
বড় ঘরে বড় ভয় করে।
সঙ্গোপনে কোন জনে, আনিবারে এভবনে,
আছি আমি অন্তরে অন্তরে ॥
চঞ্চলা বলিল আর, সহেনা যৌবন ভার,
বারেক ধরিতে লোক নাই।
জান কোটালের বাড়ি, কেমন নবীন দাড়ি,
দেখ দেখি তারে যদি পাই ॥
হেনকালে কোতয়াল, লয়ে ঢাল তরবাল,
আইল সাধিতে নিজকার।

মোহিত কোটাল স্বরে, পাইল আকাশ করে,
রাজকন্যা দিল লাজে লাজ ॥
আসিয়ে ধরিল হাত, বলে এস প্রাণনাথ,
পুরাও মনের অভিলাষ।
কোতয়াল শীহরিল, হাত ছাড়াইয়া নিল,
বলে ওমা এ কি সর্ব্বনাশ ॥
বুঝাইয়ে বলে বালা, সান্ত কর কামজ্বালা,
ঠেকিবেনা তুমি কোন দায়।
মনোরম্য দেবালয়, হবে তথা সুখোদয়,
চল চল পড়ি তব পায় ॥
কামের করাল বাণ, তাতে এই যাচা দান,
কোটাল করিল মতি স্থির।
গলাগলি দুই জনে, চলিলেন সঙ্গোপনে,
উপনীত যথায় মন্দির ॥
দৃঢ়তর অঙ্গীকার, করে রামা বার বার,
পতির মুখেতে দিল ছাই।
ধনমন বিতরণে, লইলেন সঙ্গোপনে,
মনোমত বাপের জামাই ॥

পয়ার।

দেবতা মন্দির করি, প্রেমের মন্দির।
আনন্দে চঞ্চলা আছে, কিছুদিন স্থির ॥
সময়ে হইল শেষ, বিদেশ ভ্রমণ।
রাজার জামাই করে, দেশে আগমন ॥

কঠিন হৃদয়ে ছিল, ছাড়িয়ে রমনী।
বিরূপ দেখিতেছিল, শোভিত অবনী॥
বড় আশে আসে অগে, শ্বশুর আলয়।
নানাভাবে নানাভাব, হৃদয়ে উদয়॥
ছেড়ে দিয়ে অন্য কথা, সংক্ষেপ কারণ।
প্রবাসিরে দেখ সবে, প্রমদা সদন॥
চঞ্চলার মন বাঁধা, কোটালের পায়।
পতির কথায় সেকি, কিছু সুখ পায়॥
মন রাখা দুই এক, বলিয়ে বচন।
ঢুলে ঢুলে পড়ে বালা ঘুমের কারণ॥
এতদিন পরে যদি, দিলে দরশন।
ফুরাওনা এক দিনে সব বিবরণ॥
তোমা বিনে বিরহিনী ছিলেন ভবনে।
অভ্যাস নাহিক তাই নিশি ... ॥
ঘুমাও ঘুমাও আজ ... ।
উঠিয়ে ওঘরে ... ... ॥
কাছাহীন জী ... ... ।
পতি ... ... ॥
জামাই ... ... ।
নাক ডা ... ... ॥
ভয় ভাবনায় ভরা, চঞ্চলার মন।
কোথায় গিয়াছে ঘুম, ছাড়িয়ে নয়ন॥
ধীরে ধীরে পরিহার,করি নিজ ঘর।
চল চল চলিলেন, কোটাল গোচর॥

এখানে কোটাল বসে, ভাবে মনে মনে।
এসেছে জামাই বুঝি, শ্বশুর ভবনে॥
কিরূপে কেমন করে, হইবে প্রকাশ।
লাভে হোতে এদাসের, হবে সর্ব্বনাশ॥
চঞ্চলার ভাব ভক্তি, বুঝিয়া দেখিব।
অসম সাহসী কায করিতে কহিব॥
হেনকালে রাজবালা, প্রবেশিল ঘর।
পিছন ফিরায়ে আসে, কোটাল সত্বর॥
বিরস বদনে বালা, বলিল বচন।
কেন কেন কেন প্রাণ, ফিরালে বদন॥
কোন অপরাধে বল, আমি অপরাধী।
সাদরে প্রণয়ে বল, কে হয়েছে বাদী॥
মনের বিষাদ বল, ধরি দুটি পায়।
অবিলম্বে প্রতীকার, করিব উপায়॥
মাতা হেট করে তবে, বলে দুরাচার।
এখন গিয়েছে নারী, গৌরব আমার॥
এসেছে তোমার পতি, নবীন রাজন।
ছাই ফেলা ভাঙ্গাকুলা, এজন এখন॥
পতির সহিত সুখে, কাটায়ে সর্ব্বরী।
শেষ রেতে মিছে কেন, এসেছ সুন্দরী॥
পুরাণ তেঁতুল বিচি, আমিহে এখন।
নবপতি সনে কর, রস আলাপন॥
যাইবার তরে পরে, উঠিয়ে দাঁড়ায়।
কাঁদিতে কাঁদিতে কন্যা, ধরিলেন পায়॥

সেই সর্ব্বনেশে বটে, আসিয়াছে আজ।
পথে কেন তার মুণ্ডে, না পড়িল বাজ॥
কাণা কাণি জানা জানি, নিবারণ তরে।
এতক্ষণ শর্য্যা কাঁটা, সহি তার ঘরে॥
……সমান সেটা, বলিব কেমনে।
… … লয় মম মনে॥
… … হাত এগায়ে।
… … ঘুমায়ে॥
… … …।
… … …॥
… … …।
করিয়ে রাখিব তারে, তোমার গোলাম।
কোটাল বলিল তবে, শুনহে রূপসি।
মমবাক্যে তুমি যদি, এমত সাহসী॥
লয়ে মম তরবারি, ধরিয়ে স্বকরে।
পতিমুণ্ড আন গিয়ে, কাটিয়ে সত্বরে॥
চমকিয়া রাজকন্যা, উঠিল অমনি।
স্বামি শির কি করিয়ে কাটিবে রমণী॥
ভয় প্রকাশিলে পাছে, কোতয়াল রাগে।
অস্ত্র লয়ে ব্যস্ত হোয়ে, উঠিলেন আগে॥
অজ্ঞান নিশিতে যোগ, কাল কাম ঘন।
একেবারে দয়া শশী, হোলো আবরণ॥
ভাবিতে ভাবিতে রামা, ভবনে চলিল।
পতি মুণ্ড কাটি আনি, কোতয়ালে দিল॥

কোটাল বিস্ময় হোয়ে, সভয়ে কম্পিত।
বিবেচনা করিতেছে, চঞ্চলার রীত ॥
কি করিব বিধু মুখি, ভাবিয়ে না পাই।
দেশ ত্যাগ করি চল, দেশান্তরে যাই ॥
তোমার কলঙ্ক হবে, মম প্রাণ নাশ।
এই রাত্রে চল যাই, ছাড়িয়ে আবাস ॥
অগতি যুবতী সায়, কাযে কাযে দিল।
উপপতি হাত ধরে, নিশিতে চলিল ॥
যাইতে যাইতে পথে, নদী দরশন।
কেমনে হইবে পার, ভাবিছে তখন ॥
কোথায় তরণী বল, কোথায় নাবিক।
এবেশেতে ডাকাডাকি, বিপদ অধিক ॥
কোটাল বলিল ওহে, এজে বড় দায়।
সন্তরণ বিনা আর, না দেখি উপায় ॥
উলঙ্গ হইয়ে বাঁধ, বসনে ভূষণ।
জলে দাঁড়াইয়ে থাক, এক অনুক্ষণ ॥
ওপারে এসব আগে, আসিব রাখিয়ে।
পরেতে সাঁতার দিব, তোমারে লইয়ে ॥
অম্বু অম্বরেতে লাজ, করি সম্বরণ।
খুলিয়া দিলেন ধনী, বসন ভূষণ ॥
বস্ত্র অলঙ্কার লয়ে, কোটাল নির্দ্দয়।
অপর পারেতে গিয়ে, উপস্থিত হয় ॥
ওপারে থাকিয়া পরে, পাপিনীরে বলে।
কেন কেন রামা আর, দাঁড়াইয়ে জলে ॥

উপপতি পেয়ে পতি, দিলে বলিদান।
দুরাচারী নাহি নারী, তোমার সমান॥
মনোমত প্রাণকান্ত, বাছিয়া নবীন।
আমায় আহুতি ধনি, দেবে কোন দিন॥
আর দেখ রাজবালা, ভাবিয়ে অন্তরে।
অধম কোটাল আমি, জন্ম নীচ ঘরে॥
দেশেতে মানুষ ধনী, পেলেনালো আর।
বাছিয়া অবিদ্যা তূমি, হইলে আমার॥
তোমার উদরে মোর, জন্মিলে কুমার।
দেশেতে হইবে নারী, অসুখ অপার॥
অধমের অবিদ্যার ছেলে, সেই হবে।
ছোট মুখে বড় কথা, অনায়াসে কবে॥
গায় পড়ে কলঙ্কের, করিবে সোপান।
জন্মদোষে না রাখিবে, মানিদের মান॥
তাই বলি চন্দ্রাননি, শুনহে বচন।
তব সঙ্গে অনুচিত, করা আলাপন॥
যাও যাও বৃথা কেন, আর বল চাও।
হাতে হাতে পেলে ফল, বাড়ি গিয়ে খাও
এই বলে কোতয়াল, করে পলায়ন।
জীবনে যুবতী ভাবে, বিষাদিত মন॥
হেনকালে সেই স্থলে, দেখহ কৌতুক।
মাংস মুখে করি এক, আইল জম্বুক॥
তটেতে বেড়ায় শিবা, জল পানে চায়।
ভাসিতেছে মীন এক, দেখিবারে পায়॥

কূলে মাংস রেখে জলে, লোভেতে নাবিল।
সভয়ে সজীব মাচ, জলে পলাইল॥
নকুলে কূলের মাস, করিল হরণ।
ফিরে আসি শৃগালের, বিরস বদন॥
আদি অন্ত চঞ্চলার, নয়ন গোচর।
উপহাস করি পরে, বলিল সত্বর॥
কি দেখ শৃগাল, মাংস লয়েছে নকুল।
একূল ও কুল তব, গিয়েছে, দুকুল॥
শৃগাল উত্তর করে, লোহিত লোচন।
কোন্ মুখে কালামুখি কহিলি বচন॥

আত্মচ্ছিদ্রং ন জানাসি পরচ্ছিদ্রানুসারিণী।
জারস্বার্থে পতিং হত্বা জলেতিষ্ঠতি নগ্নিকা॥

ভয়ে ভীতা হোয়ে কন্যা, না গেল ভবনে।
নিলেন সুখের ভেক, সুখ বৃন্দাবনে॥

[ইহার অবশিষ্টাংশ পরে হইবে]

এই রচনার শেষ অংশ পরদিনের (১৮ নভেম্বর ১৮৫৩) সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত হয়।

গতবারের শেষ।

আমারদিগের বুনোকবিটি প্রায় চঞ্চলার মত চপল। আপনার দোষে অন্ধ কি পরের দোষে তাঁহার চারিটি চক্ষু, বিবাদ কখন একজনে সম্ভবে না, এক হস্তে কখন তালি বাজে না, প্রস্তরের সহিত ইস্পাতের সংযোগ ব্যতীত কখন অনল উৎপত্তি হয় না। আমার যত দোষ তিনি

তাহা গত পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার দোষ আছে কি না আমি বলিতে চাহিনা, যথার্থ বিচারকারকদিগের নিকট কিছুই অবিদিত থাকিবেক না।

কবিবর এরূপ কলহ করিতে আমাকে নিরস্ত হইতে লিখিয়াছেন, সুখের বিষয় বটে, কিন্তু তিনি কি জানেন না যে আমি অনেক দিন "বিবাদ বাড়বানলে সরলতা সলিল" সেচন করিয়াছি, তাঁহার তো উপদেশ দেওয়া নয়, উপদেশ ছলে মনের ঝাল মিটান। গালাগালির সহিত উপদেশ প্রদান করা কিরূপ সভ্যতা তাহা আমরা "অসভ্য" কিরূপে বুঝিতে পারিব। একজন সভ্য সুবানীর পুত্র রস আকাঙ্ক্ষায় বলিয়াছিল "কালা সিউলি রস দিবি" তাহাতে সিউলি উত্তর করিল "আহা! যে মধুর বচন, রস ছেড়ে গুড় দিতে ইচ্ছা করে।"

হে অধিকারী মহাশয়, যত্তপি বিবেচনা করিয়া দেখেন, তবে আমি কখনই "মা মাসি" তুলিয়া গাল দিই নাই, বরং আপনি এ বিষয়ে দোষী হইয়াছেন, যেহেতু বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে "বিনা আয়াসের ছেলে" বলিয়া আপনার কুচ্ছনৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আপনার পক্ষে এসকল অতি সহজ কথা, কেন না, আপনি যাহার গর্ভজাত বলিয়া স্বীয় পরিচয় দিয়াছেন তাহা পুনরুক্তি করিলেও পাপ আছে, বোধ করি এই ভ্রমকূপে নিপতিত হইয়াছেন।

আপনার অল্পবয়সে এত আত্মাভিমান কেন, ইহার কারণ বুঝিতে পারিলাম না। তুমি কি বিবেচনা করিয়াছ তুমি সূর্য্য আমি রাহু, আপনার কি নিশ্চয় বোধ হইয়াছে, আমি নীচ, আপনি সুবোধ, মহাশয় কি যথার্থ জানিয়াছেন মাদৃশ লোকেরা আপনার যোগ্য নয়। এসকল জাগ্রদাবস্থায় স্বপ্নে আপনার দৃঢ় প্রত্যয় হইয়া থাকিবে নতুবা সাধারণ পত্রে প্রকাশ করিতেন না। যত্তপি "নীচের" কথা হাস্ত করিয়া না

উড়ান তবে মহাকবি কালিদাসের অভিমানশূন্যতার বিষয় শ্রবণ করুন, "তিনি রঘুবংশের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন, যেমন বামন উন্নত পুরুষ প্রাপ্য ফল গ্রহণাভিলাষে বাহু প্রসারণ করিয়া উপহাসাস্পদ হয়, সেইরূপ অক্ষম আমি কবিতা কীর্ত্তিলাভে অভিলাষী হইয়াছি, উপহাসাস্পদ হইব" হারি বাবু, আর একটি অনুরোধ, এই শ্লোকটি পড়িবেন।

দিব্যং চূত ফলং প্রাপ্য ন গর্ব্বং যাতি
(কোকিলঃ।
পীত্বা কর্দ্দম পানীয়ং ভেকো মক মকায়তে ॥

সুন্দর রসাল পেয়ে কোকিলের কুল।
কখন না হয় তারা গর্ব্বেতে ব্যাকুল
ভেকের স্বভাব দেখ ভাবিয়ে অন্তরে।
কাদা জল খেয়ে গর্ব্বে মক মক করে ॥

তোমাকে আর শুনাইতে চাহি না কারণ অধিকক্ষণ "নীচের" কথা শুনিলে আপনার গৌরবের হ্রাসতা হইতে পারে।

বুনোকবির কেমন নির্বিরোধি স্বভাব গালাগালি না দিয়া এক দণ্ডও থাকিতে পারেন না। মিত্র কবিকে সূর্য্য সম্বোধন পুরঃসর কতকগুলিন কটু বচন বলিয়াছেন। যথা

হে সূর্য্য তোমার কামিনী সকলকে বাস দেয়, তুমি মলমূত্র খাও, তুমি কন্যা হরণ কর, ইত্যাদি এ সকল গালাগালি উত্তরে কালেজের সভ্যতানুসারে গালাগালি নয় বরং সূর্য্যের সদ্গুণ, এবং পাছে পাঠকবর্গ বুনো কবিকে এসকল গুণে বঞ্চিত বিবেচনা করেন, তিনি গালাগালির কিঞ্চিৎ পরেই আপনাকে সূর্য্য বলিয়া স্বগৌরব উচ্চ করিয়াছেন।

বুনো কবি লিখিয়াছেন মিত্র কবি যদ্যপি পুনর্ব্বার তাঁহার বিপক্ষ

লেখনী সঞ্চালন করে তবে তিনি প্রত্যুত্তর দানে বিরত হইবেন, এবং “নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে” ইহা স্মরণ করিয়া মনকে প্রবোধ দিবেন। এতদিন তবে কি মিত্র কবিকে উচ্চ বোধ করিয়া কুচ্ছশর নিক্ষেপ করিতেছিলেন না ফলভোগের অভিলাষ ছিল। নীচের কথায় সুবুদ্ধিরা রাগ করেন না, একথা সত্য বটে, কিন্তু মিত্র কবির কথায় বুনোকবি একবার ছাড়িয়া দুইবার রাগ করিয়াছেন, তবে কাযে কাযেই, হয় মিত্র কবি উচ্চ, নয় বুনো কবির বুদ্ধি নাই, কিন্তু মিত্র কবি উচ্চ নয়, সুতরাং—হে কবিবর ওকথা কি এখন খাটে, গাছের গোড়া কাটিয়া আগায় জল দিলে কি বাঁচে, নাচিতে আসিয়া ঘোমটা দিলে কি লজ্জাশীলা বলে। চারি পাঁচ লক্ষের পর ফলের আশায় নিরাশ হইয়া ফল পরিত্যাগ করিয়া যাওন কালীন, “নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে” বলা অপেক্ষা “Grapes are sour” বলিলে বলিতেও হইত ভাল শুনিতেও হইত ভাল।

কৃষকেরা বীজ বপনাগ্রে কর্ষণ দ্বারা এবং বারি সেচনে ভূমিকে কোমল করে, কেহ তাহাতে প্রস্তর এবং অঙ্গার ক্ষেপণ করে না। সদুপদেশ বীজ স্বরূপ, জনগণের মনঃক্ষেত্রে রপিত হয়, সুতরাং উপদেশ-রূপ বীজ বপনাগ্রে মিষ্টকথারূপ বারি দ্বারা মনঃক্ষেত্র নরম করা আবশ্যক। বুনোকবিটি মনঃক্ষেত্রের উত্তম চাসা নন, যেহেতু উপদেশ দিবার অগ্রে কটু বচনরূপ অনল প্রদান করিয়া মনকে দগ্ধ করিয়াছেন। যাহা হউক, তাঁহার গালাগালি মনে না করিয়া তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিলাম, কারণ গালাগালির সহিত উপদেশ থাকিলে উপদেশের মহত্ব যায় না, চৌরে যদ্যপি চুরি করিতে নিষেধ করে, তবে কি এ নিষেধ প্রামাণ্য করা উচিত হয় না, নীচ লোকে যদ্যপি মুদ্রা দান করে তবে কি মুদ্রার মূল্য কম হয়? নারিকেলের মালাস্থ অমৃত

পান করিলেও অমর হওয়া যায়। এই সকল বিবেচনা করিয়া তাঁহার গালাগালির উত্তর না দিয়া তাঁহার সদুপদেশ অবলম্বন করিলাম, কারণ তাঁহার মন্দ কথায় রাগান্ধ হইয়া যদ্যপি সৎকথা না শুনি তবে Shakespeare আমাকে বলিবেন—"You are one of those, that will not serve God, if the devil bid you."

শ্রীদীনবন্ধু মিত্র।
হিন্দুকালেজীয় ছাত্র।"

এই কালেজীয় কবিতা-যুদ্ধে শেষ পর্য্যন্ত দ্বারকানাথ অধিকারীকে হার মানিতে হইয়াছিল। ৮ই মাঘ তারিখযুক্ত তাঁহার একখানি পত্র ৩১ জানুয়ারি ১৮৫৪ (১৯ মাঘ ১২৬০) তারিখের সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত হয়। তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"...আমি রাগান্ধ হইয়া প্রথমতঃ পবিত্র মিত্র দ্বয়ের সহিত বাক্ বিরোধে প্রবৃত্ত হইয়া অনুতাপে দগ্ধ হইতেছি, এই ঘৃণিত বিবাদের সূত্রপাত আমা হইতেই হয়, এজন্য আমি ইহাতে সংপূর্ণ দোষী। তাহা স্বীকার করিয়া উক্ত কবি ভ্রাত৷ দ্বয়ের বিশেষতঃ মিত্র মিত্রের নিকট মার্জ্জনা প্রার্থনা করিতেছি। মিত্রবাবু লিখিয়াছেন 'একহাতে কখনই তালি বাজে না' ইহাতেই বোধ হইতেছে যে তিনিও আপন দোষ জানিতে পারিয়াছেন। আমি ভ্রমেও একবার আপনাকে প্রধান বলিয়া গণ্য করি নাই,...। দীনবন্ধু বাবু আমার শেষ লিখিত স্বপ্নটীকে যখন বিচার বিরুদ্ধ বিবেচনা করিলেন তখন কি মিত্রভাবে তাহার ভ্রম সংশোধন করিতে পারিতেন না? মহাশয় যদিও প্রধান তথাপি লোকের নিকট আত্মগুণ শ্লাঘা করিয়া বলা কি উচিত? আমি আপনাদিগের সহিত আলাপ করিবার জন্য প্রথম প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলাম, কিন্তু আলাপ করিতে গিয়া অদৃষ্ট ক্রমে বিষমতর বিলাপ উপস্থিত হইল।

'চাহিয়া অমৃতফল, পাইলাম হলাহল,
খুঁজিয়া সকল রত্ননিধি'

মহাশয় প্রথম কবিতায় লিখিয়াছিলেন।

'আঁখি মুদে ভাব গিয়া আপনার স্থানে।
কেন চেয়ে কানা হও বিভাকর পানে॥'
'স্বপনের বিবরণ বুঝিয়াছি সার।
দিওনা দ্বেষের ফুট নয়নেতে আর॥'
'নিজ গুণে নিজ আভা নাহোলো প্রবল।
পর আভা ঢাকা দিলে কি হইবে বল॥'

হা দীনুবাবু! ইহাতে কাহাকে আত্মাভিমানী বুঝায়, আমি কি আত্মাভা প্রকাশ করিতে অক্ষম হইয়া আপনাদিগের বিমলকর সমূহ প্রকাশ বিষয়ে প্রতিবন্ধক হইয়াছিলাম না দেষাদ্বেষ করিয়া নিন্দাবাদ করিয়াছিলাম? এ সকল বিষয়ের বিচার আপনারাই করুন। মহাশয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্রিকায় যে সকল গালাগালি দিয়াছেন তাহা এখানে উদ্ধৃত করিলাম না, কারণ সে সমস্ত কথা রসনাগ্রে আনা অনুচিত, বিশেষ মহাশয়ের দোষ দর্শাইয়া ভর্ৎসনা করা আমার অভিলাষ নহে, বিবাদ উপস্থিত হইলে উভয় পক্ষেরই অনিষ্ট হইয়া থাকে, অতএব পূর্ব্ব কৃত দোষ সকল মার্জ্জনা করিয়া সাম্প্রতি নামের গুণ ব্যক্ত করিলে পরম পরিতুষ্ট হই।..."

(সংবাদ প্রভাকর, শুক্রবার ২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬। ১১ ফাল্গুন ১২৬২)

মান্যবর শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

একদা পল্লীগ্রাম বাসিনী চারুহাসিনী কতকগুলীন কামিনী একত্রে বসিয়া হাস্য কৌতুকে সময় সম্বরণ করিতেছিলেন, এমত সময়ে এক নবীনা পতিহীনা অনুপমা নামা তথায় আসিয়া ম্লানভাবে অবনতমুখী হইয়া একপার্শ্বে বসিলেন, তাঁহার এরূপ ভাবভঙ্গি ও অসৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া নিস্তারিণী নাম্নী কোন এক কামিনী মধুর সম্ভাষণে জিজ্ঞাসা করিলেন, অনুপমা! আজি বোন তোমার সুধাংশু সদৃশ সুচারু লাবণ্যের এরূপ কৃশতা ও বিবর্ণতা কি জন্য ঘটিয়াছে ও বিমল বদন হইতে পীযূষ মাখা বাক্য সকল কেনই বা বিনির্গত না হইতেছে,

ভগিনী! একটীবার বিধুমুখে মধুমাখা বাক্য কহিয়া আমারদিগের কর্ণ যুগলকে সুশীতল ও নেত্র দ্বয়কে হাস্য করত চরিতার্থ কর, আমরা কি তোমার বিমনা ও এরূপ ভাবভঙ্গি দেখিয়া স্বচ্ছন্দ শরীরে সুস্থির হইয়া রহিয়াছি? ও তোমার নীরপূর্ণ নেত্র নিরখিয়া কি আহ্লাদিতা হইয়াছি? কখনই নয়, তোমার দুঃখানলে আমারদিগের অন্তঃকরণ অহরহই দগ্ধ হইতেছে, ভগিনি! সহাস্যবদনে বাক্য কও, মনাগুন সম্বরণ সলিলে নির্ব্বাণ কর। অনুপমা সঙ্গিনীর এরূপ সম্ভাষণ শ্রবণানন্তর অন্তরে আরো খেদান্বিতা হইয়া বলিলেন, বোন! পতিহীনা নারীর মলিনতা ও বন-দগ্ধা হরিণীর চাঞ্চল্য হইবার কারণ কেন অন্বেষণ করিতেছ? তাহারদের মনোদুঃখ অপরে কি প্রকারে বুঝিতে পারিবে, ভগিনি আমি পতিরত্ন হারাইয়া যেরূপ দুঃখিতা আছি, ও আমার অন্তর যে তাহার নীরজ ন্যায় নেত্র-যুগলের পীযূষময় দৃষ্টি অন্তর হওয়ায় কি পর্য্যন্ত বিষাদাগ্নিতে বিদগ্ধ হইতেছে তাহা বর্ণনা করিতে কাহার হৃদয় না বিদীর্ণ ও শ্রবণ করিতে কাহার মন মলিন না হয়? আহা! পতি বিচ্ছেদ কি পরিতাপ, যাহা স্মরণ করিলে মরণকেও শতগুণে শ্রেয়স্কর মঙ্গলদায়ক ও কল্যাণপ্রদ বোধ হয়, আমি কি এরূপ প্রিয়ম্বদ প্রিয় মিত্রের নেত্রের বাহির হইয়া স্থিরচিত্তে দিন যামিনী যাপন করিতেছি? ও আমার নয়ন কি তাহার মোহনমূর্ত্তি পরিহার পূর্ব্বক অপরের অসামান্য ও অকিঞ্চিৎকর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে? ও আমার শ্রবণ কি প্রিয়তমের প্রিয় সম্ভাষণ ও সুললিত শব্দ বিন্যাস শ্রবণে প্রয়াস না করিয়া অপরের লালিত্য রহিত যৎসামান্য বক্তৃতা-রসে সুশীতল হইতেছে কোথায়? তাহারা সততই সন্তোষ বিহীন হইয়া স্বীয়২ কার্য্য সম্পাদনে সঙ্কট ভাবিতেছে, চিত্ত ভগ্ন, নেত্র নীরে মগ্ন, শ্রবণ বধির ন্যায় রহিয়াছে, একে বিধবা হইয়া পতি বিরহে দেহে

সুখ শূন্য হইয়া ক্ষুণ্ণ মনে সময় সম্বরণ করিতেছি, তায় আবার আজি নিদারুণ একাদশী উপবাস-রূপ-অসি দেখাইয়া শরীর শুষ্ক করিতেছে, আমি কি বোন জীবন বিহীনে জীবন ধারণ ও আহার না করিয়া ক্ষুধা সম্বরণ করিতে সমর্থা হইতে পারি? আমার শরীরে কি এ কঠোররূপ একাদশীর উপবাস সহ্য হয়? প্রাণ যায় যায় আর বাঁচিনা, শরীর শুষ্ক ও কম্পিত হইতেছে, ক্ষণে২ যেন চারিদিক্ শূন্য দেখিতেছি, এ অভাগিনীকে আর কতকাল এরূপ বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবেক, ও একাদশীর উপবাসে কলেবর জীর্ণ শীর্ণ করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইবেক, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, আমার চতুর্দ্দশবর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে কি দুর্দ্দশা না ঘটিল? বসন ভূষণে বর্জ্জিত হইয়াছি, বেশ ঘুচিয়াছে, কেশ গিয়াছে, অবশেষ শেষ হইলেই বোন অশেষ ক্লেশ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি, আর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা নাই, জনক জননী যাঁহারা প্রাণ তুল্য প্রিয়পাত্রী করিয়া অপরির্য্যাপ্ত প্রীতি ও স্নেহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহারা এক্ষণে হতভাগ্য ও পাপীয়সী ভিন্ন আর কোন সম্ভাষণই করেন না, শ্বশুর শাশুড়ী যাঁহারদের যতনের ধন ও কণ্ঠের হার ও আনন্দের আধার স্বরূপ হইয়া অসীম সুখ সম্ভোগ করিয়াছিলাম তাঁহারদেরও এক্ষণে বিষ দৃষ্টি হইয়াছি ও তাহারা রাক্ষসী বলিয়া আর মুখাবলোকনও করেন না, আহা। আর কতকাল এরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিব, প্রাণ পরিত্যাগ করিবারওতো কোন উপায় দেখিতেছি না, লার্ড বেণ্টিক ও মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সহমরণ নিবারণ করিয়া কি যোষিৎ-গণের বিহিত উপকার করিয়াছেন, নানা আমার বিচারেতো তাঁহার-দিগের এরূপ চির স্মরণীয় মহৎ পুণ্যকে অশেষ ক্লেশকর ও দূষণাবহ বলিয়া বোধ হইতেছে যদিস্যাৎ পতির লোকান্তে নারীগণের পক্ষে

পতি পাইবার কোন উপায়ান্তর থাকিত তাহা হইলে উক্ত মহাত্মাগণের এই অনির্ব্বচনীয় করুণা ও কীর্ত্তির কতই শোভা প্রকাশ পাইত, পতির মৃত্যু হইলে বিধবা হইয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করা অপেক্ষা সহমরণকে শতগুণে শ্রেয়স্কর বলিলে সম্ভব হইতে পারে পতির সহিত সন্দর্শন হউক বা না হউক তাহাকে পাই বা না পাই যাবজ্জীবন দুঃখানলে দগ্ধ হওয়া অপেক্ষা এক দিবস দগ্ধ হইয়া প্রাণ বিনাশ করা কতই ক্লেশকর বল ?

অনুপমার এরূপ আক্ষেপ শুনিয়া গিরিজা নাম্নী কোন গুণবতী কহিলেন, অয়ি সুশীলে! স্থির হও আর উতলা হইও না বোধ করি এতদিনে আমারদিগের দুঃখের নিশি অবসান হইবার উপক্রম হইয়াছে সুখরূপ সূর্য্য আমারদিগের সৌভাগ্যরূপ গগনমণ্ডলে অচিরাৎ উদয় হইবেক নগর পল্লি সকল স্থানে ও ঘরে পরে সর্ব্বত্রই এইরূপ জনরব হইতেছে পতিহীনা মলিনা বিধবাগণের যন্ত্রণা নিবারণার্থে পরম করুণাকর শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিবার ব্যবস্থা প্রস্তুত করিয়াছেন বোধ করি অবিলম্বেই গবর্ণমেণ্ট সহমরণ রহিত করণের ন্যায় বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিবার অনুমতি প্রদান করিবেন। অহং

দী

ইহার শেষ পরে প্রকাশ হইবে।

(সংবাদ প্রভাকর, সোমবার ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬। ১৪ ফাল্গুন ১২৬২)

মান্যবর শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

[গত শুক্রবারের শেষ।]

ভগিনী! আর ভাবিও না আমারদিগের পক্ষে এবড় কম পড়তা নয়, একথা শুনিয়া আর একটী স্ত্রীলোক বলিল ঠিক লো ঠিক এজন্যই

বুঝি বোন কাল আমার কর্ত্তাটি এরূপ কৌতুক করিয়াছিলেন, "প্রিয়সী মনে রেখো, তোমারদের আর বার পায় কে ? আজ কাল তোমারদের কচেবারো আর যুগ ভাঙ্গিতে হবে না বিধবাগণের বিবাহ হইবেক; বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আশীর্ব্বাদ কর তিনি তোমারদের সহজ উপকারক নন এত দিনে তোমারদের সিঁতের সিন্দূর ও হাতের লোহা অক্ষয় হইল" পতি মুখে এইরূপ কৌতুক শুনিয়া প্রথমতঃ তাঁহার মনোরঞ্জন ও সুশীলা স্বভাব প্রদর্শন জন্য বলিলাম ওমা কি ঘৃণা এ কেমন করিয়া হবে, আবার আমরা অন্য পুরুষের নিকট কি প্রকারে ঘোমটা খুলিয়া মুখ তুলিয়া কথা কহিব, কি লজ্জা মেয়ে হোয়ে কি এত বেহায়া কেউ হইতে পারে, পরে মনে২ কহিলাম হে জগদীশ্বর! বিদ্যাসাগর মহাশয়কে শত হস্তে লেখনী সঞ্চালনে ক্ষমতাবান করুণ, তিনি যেন সহস্রলোচন হইয়া একেবারে সহস্র গ্রন্থ অবলোকন করিয়া সংযুক্তি সকল সঙ্কলন করিতে পারেন, তিনি দীর্ঘজীবী ও বৃহস্পতি তুল্য বুদ্ধিবান হউন। পরে মতি নাম্নী একটী বিধবা বলিলেন যথার্থ বোন আমিও অনেক দিন শুনিয়াছি যে আমারদিগের শাকে বালী ঘুচিয়া দুগ্ধে চিনি হইবেক, কেবল লোক-লজ্জায় এতদিন প্রকাশ করিতে পারি নাই প্রতিদিনই কপালে করাঘাৎচ্ছলে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যথাযোগ্য নমস্কার করিয়া থাকি ও হে ঈশ্বর! আমাকে বৈধব্য যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ কর বলিবার-ছলে উক্ত ইশ্বরকেই স্মরণ মনন করিয়া থাকি, কিন্তু বোন পা ফাটা মাথা চাঁচা পোড়াকপালে ভট্টাচার্য্য ও গোঁসাঞি আটকুড়রা যে পেছু ডাকিতেছে বিদ্যাসাগরকে বোসে যেতে হোলেই তো বোন বিলম্ব হইয়া পড়িবে। নিস্তারিণী বলিলেন না বোন ভট্টাচার্য্য ও গোসাঞি সর্ব্বনেশেদের যে শ্রী ও বিদ্যা বুদ্ধি তাহারা কি বিদ্যাসাগরের সহিত বিচার করিতে পারে, তাহারদিগের শরীর দেখিলেই বোন ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা

হয় পণ্ডিত পোড়ারমুখোরা পা ফাটা মাথা চাঁচা গায়ে কতকগুলা গঙ্গামৃত্তিকা মাখিয়া ঠিক যেন কুমারটুলির একমেটে ঠাকুর, আ মরি! গোসাঞিদের বা কি ঢং ঠিক যেন অক্রূর দত্তের রাসের সং গাময় তিলক ছাব দিয়া যেন সদর দেওয়ানী আদালতের ফয়সালা বেরুলেন, তাঁহারদিগের কর্ম্ম কি বোন বিদ্যাসাগরের সহিত বিচার করিয়া বিজয়ী হইতে পারে, বিবেচনা করিলে বোন আমারদিগের বড়ই সুখের সময় উপস্থিত।

পদ্য।

মেয়েলী ছন্দঃ।

এমন সুখের দিন কবে হবে বল, দিদী কবে হবে বল লো, কবে হবে বল।
এতদিনে যাবে যত বিপক্ষের দল, দিদী বিপক্ষের বল লো, বিপক্ষের বল॥

বিধবার বিয়ে হবে এত বড় কল, দিদী এত বড় কল লো, এত বড় কল। ভুগিতে হবেনা আর অধর্ম্মের ফল, দিদী অধর্ম্মের ফল লো, অধর্ম্মের ফল॥ বিবাদি হয়েছে এবে যত সব খল, দিদী যত সব খল লো, যত সব খল। ঈশ্বরের লেখনীতে সব যাবে তল, দিদী সব যাবে তল লো, সব যাবে তল॥ পরামর্শ করিয়াছে যত যুবা দল, দিদী যত যুবা দল লো, যত যুবা দল। ঘুচাইবে আমাদের নয়নের জল, দুটি নয়নের জল লো, নয়নের জল॥ বিধবার নাহি আর জুড়াবার স্থল, দিদী জুড়াবার স্থল লো, জুড়াবার স্থল। কতই হইব সুখী বিয়ে হোলে চল, দিদী বিয়ে হোলে চল লো, বিয়ে হোলে চল॥ অঙ্গে দিলে অলঙ্কার লোকে ধরে ছল, পোড়া লোকে ধরে ছল লো, লোকে ধরে ছল। অভয়ে পরিব পায়ে চারি গাছা মল, দিদী চারিগাছা মল লো, চারি গাছা মল॥ অবলা সরলা অতি নাহি কোন বল, দিদী নাহি কোন বল লো, নাহি কোন বল। পতিরে পড়িলে মনে আঁখি ছল ছল, করে আঁখি ছল ছল লো, আঁখি ছল ছল॥ কেন আর মন দুঃখে গৃহে চল চল, দিদী গৃহে চল

চল লো, গৃহে চল চল। ঈশ্বরের পরামর্শে জানিবে অটল, দিদী জানিবে অটল লো, জানিবে অটল॥ ধ্বক ধ্বক করে মনে সদা দুখানল, দিদী সদা দুখানল লো, সদা দুখানল। শীতল হইবে পেলে বিবাহের জল, দিদী বিবাহের জল লো, বিবাহের জল॥

১০ ফাল্গুণ — অহং

সন ১২৬২। — শ্রীদী, * * *

২। গ্রন্থাবলীর কালানুক্রমিক তালিকা

দীনবন্ধু মিত্র যে-সব গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহাদের সঠিক প্রকাশকাল সংগ্রহ করা নিতান্ত সহজ নহে। গ্রন্থাবলীতে কোন গ্রন্থেরই আখ্যাপত্র বা প্রথম সংস্করণ প্রকাশের তারিখ পাইবার উপায় নাই। তাহার উপর কলিকাতার যে দুই-চারিটি লাইব্রেরিতে দীনবন্ধুর কয়েকখানি গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ পাওয়া যায়, তাহাতে আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আখ্যাপত্র মেলে না। বিশেষ যত্ন ও অনুসন্ধানের ফলে আমি নিম্নলিখিত তালিকাটি সঙ্কলন করিয়াছি।—

১৮৬০—নীল দর্পণং নাটকং

আখ্যাপত্রে আছে:—"ঢাকা, বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত। শকাব্দা ১৭৮২। ২ আশ্বিন।"

১৮৬৩—নবীন তপস্বিনী নাটক

আখ্যাপত্রে আছে:—"কৃষ্ণনগর। অধ্যবসায় যন্ত্রে শ্রীরজেন্দ্রনাথ গুহ দ্বারা মুদ্রিত। সন ১২৭০ সাল।" ১৮৬৩, ৭ই সেপ্টেম্বর (৩০ ভাদ্র ১২৭০) তারিখের 'সোমপ্রকাশে' নবীন তপস্বিনীর প্রশংসাপূর্ণ এক

দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হয়। ইহার একস্থলে সম্পাদক লিখিয়াছেন, "ফলতঃ কুলীন কুলসর্ব্বস্ব ও নীলদর্পণের পর আমরা বাঙ্গালা নাটক পাঠে এরূপ প্রীতি অনুভব করি নাই।"

১৮৬৫ (?)—দ্বাদশ কবিতা

আখ্যাপত্রের তারিখ :—সন ১২৭২।

১৮৬৬—বিয়ে পাগলা বুড়ো

১৮৬৬, ২১ জুলাই তারিখের THE BENGALEE নামক সাপ্তাহিক পত্রে ইহার সমালোচনা দেখিতেছি। সম্পাদক লিখিয়াছেন যে তিন মাস পূর্ব্বেই এই সমালোচনা প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল।

১৮৬৬—সধবার একাদশী

১৮৬৬, ২৪ নভেম্বর তারিখের THE BENGALEE পত্রে ইহার সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে।

১৮৬৭—লীলাবতী

লীলাবতীর প্রথম সংস্করণ এখনও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরীর বাংলা পুস্তকের তালিকায় এই নাটকের তিনটি সংস্করণের তারিখ যথাক্রমে ১৮৬৭, ১৮৬৯ ও ১৮৭৪ দেওয়া আছে। নাটকখানি যে প্রথম ১৮৬৭ সালে প্রকাশিত হয় তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণ ১৮৬৮ সালের ১ জানুয়ারি তারিখের THE NATIONAL PAPER নামক সাপ্তাহিক পত্রে ইহার সমালোচনা দেখিতেছি।

১৮৭২—জামাই বারিক

ইহা ১২৭৮ সালে প্রকাশিত হয়। ১৮৭২, ১লা এপ্রিল তারিখের THE HINDOO PATRIOT নামক সাপ্তাহিক পত্রে ইহার সমালোচনা দেখিতেছি।

১৮৭২—সুরধুনী কাব্য

আখ্যাপত্রের তারিখ :—প্রথম ভাগ—"শকাব্দা ১৭৯৩।" ১৮৭২, ১১ এপ্রিল (৩০ চৈত্র ১২৭৮) তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় ইহার সমালোচনা বাহির হইয়াছিল।

গ্রন্থকারের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রেরা সুরধুনী কাব্যের দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশ করেন। তাহার আখ্যাপত্রের তারিখ :—"ইং ১৮৭৬ নভেম্বর।"

১৮৭৩—কমলে কামিনী নাটক

আখ্যাপত্রের তারিখ :—"১২৮০। ১৮৭৩।" ১৮৭৩, ২৫এ সেপ্টেম্বর তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় ইহার সমালোচনা দেখিতেছি।

—যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ

ইহা প্রথম বর্ষের 'বঙ্গদর্শনে' (কার্ত্তিক ১২৭৯, পৃ. ৩০২-১৭) প্রকাশিত হয়।

দীনবন্ধুর নিম্নলিখিত রচনাগুলির প্রকাশকাল এখনও জানিতে পারি নাই :—(১) পোড়া মহেশ্বর (২) কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ (৩) পদ্য-সংগ্রহ। ইহার মূল সংস্করণের দুই খণ্ড যথাক্রমে বাগবাজার রীডিং রুম ও চৈতন্য লাইব্রেরিতে আছে, কিন্তু কোনখানিরই

আখ্যাপত্র নাই। পরে ১৩১৬ সালে "গ্রন্থকারের পুত্রগণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত" পদ্য-সংগ্রহে দেখিতেছি দীনবন্ধুর অনেকগুলি বাল্যরচনা বাদ দেওয়া হইয়াছে।

২১ মে ১৮৭৪ (৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৮১) তারিখের অমৃত বাজার পত্রিকায় নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হইয়াছে :—

৺দীনবন্ধু মিত্র রায় বাহাদুর
মহোদয়ের প্রণীত

সকল গ্রন্থ (প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত)
সকল গ্রন্থ একত্রে
তাঁহার সন্তানগণের উপকারার্থ উক্ত মহাশয়ের প্রতিমূর্ত্তি এবং
একটি ভূমিকা সহিত

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধারণে
পুনঃ মুদ্রিত হইবে।

মূল্য স্বাক্ষরকারিদিগের প্রতি—৬ টাকা
অন্যের প্রতি ৭ টাকা

তদ্ভিন্ন মফস্বলে ডাকমাশুল লাগিবে। গ্রহণেচ্ছু মহাশয়েরা নাম ঠিকানা ও টাকা কলিকাতা আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ৬৪ নং ভবনে দীনবন্ধু বাবুর পুত্র বাবু চারুচন্দ্র মিত্রের নিকট পাঠাইবেন।

এই প্রবন্ধের ৶০ পৃষ্ঠায় শেষ প্যারার প্রথম পংক্তির পূর্ব্বে এই অংশটুকু বসিবে :—

পদ্য সংগ্রহে আরও কয়েকটি লেখা স্থান পাইয়াছে ; যথা,—সন্ধ্যার পূর্ব্বে সরোবরের শোভা, নায়কের অনাগমে নায়িকার খেদ, বসন্তের আগমনে বিরহিনীর খেদ, জনক জননীর স্নেহ [গদ্য পদ্য], প্রভাত।

৩। দীনবন্ধু-রচিত নাটক ও প্রহসনের অভিনয়

নীলদর্পণ

১৮৬১ সালে ঢাকায় নীলদর্পণ নাটক প্রথম অভিনীত হয় বলিয়া জানা যায়। ১৮৭২, ৭ ডিসেম্বর তারিখে ইহারই অভিনয়ের সহিত কলিকাতায় সাধারণ রঙ্গমঞ্চ—ন্যাশন্যাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা হয়।

নবীন তপস্বিনী

১৮৬৬ (?) সালে আহিরীটোলায় জনাইয়ের পূর্ণ মুখুয্যের বাড়ির বাঁধা ষ্টেজে 'নবীন তপস্বিনী'র অভিনয় হয়। এই সময় কোন্নগরেও ইহা অভিনীত হইয়াছিল। *

১৮৭০ সালের মাঝামাঝি কৃষ্ণনগরে নবীন তপস্বিনীর অভিনয় হয়। ১৮৭০, ১৮ই আগষ্ট তারিখের অমৃত বাজার পত্রিকায় পাইতেছি :—

"কৃষ্ণনগর হইতে একজন আমাদিগকে নিম্নোক্ত সম্বাদটি উপহার দিয়াছেন :—

'কৃষ্ণনগরে নাটক অভিনয় করা একটি রোগ হইয়া উঠিল। ইহার মধ্যে দুই রকমের (একবার মার্চেন্ট অব বিনিস আর এক বার নবীন তপস্বিনী) দুইটি নাটক হইয়া গিয়াছে। আবার কৃষ্ণকুমারী নাটক অভিনয় হওয়ার উদ্যোগ হইতেছে।...' "

সধবার একাদশী

একদল সম্ভ্রান্ত যুবক The Baghbazar Amateur Theatre নামে বাগবাজারে একটি থিয়েটারের দল খোলেন। ইহাদের মধ্যে নগেন্দ্রনাথ

---

* রাধামাধব করের স্মৃতিকথা।—পুরাতন প্রসঙ্গ (২য় পর্য্যায়) শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত, পৃ. ১৬২।

বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধামাধব কর, গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহারা ১৮৬৮ সালে বাগবাজারে দুর্গাচরণ মুখুয্যের পাড়ায় প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়িতে ষ্টেজ বাঁধিয়া সপ্তমী পূজার দিন 'সধবার একাদশী' অভিনয় করেন। দ্বিতীয় অভিনয় হয়—কোজাগর পূর্ণিমার নিশীথে শ্যামপুকুরে নবীনচন্দ্র সরকার মহাশয়ের বাড়িতে। অল্পদিনের মধ্যেই এটর্ণি দীননাথ বসুর বাটীতে তৃতীয় অভিনয় হয়। চতুর্থ অভিনয় হয়—১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের শ্রীপঞ্চমীর দিনে রায় রামপ্রসাদ মিত্র বাহাদুরের ভবনে। দীনবন্ধু মিত্র এই অভিনয়ে দর্শক ছিলেন।* ইহা ছাড়া আরও দুইটি অভিনয় হইয়াছিল। †

বিয়ে পাগলা বুড়ো

১৮৭২ সালের পূজার সময় লক্ষ্মীনারায়ণ দত্তের চোরবাগানের ড়তে 'সধবার একাদশী' নাটকের সহিত এই প্রহসনখানি অভিনীত হয়। ‡

লীলাবতী

লীলাবতী নাটক প্রথমে অভিনীত হয় কৃষ্ণনগরে—মহেশপুর গ্রামে। ১৮৭১ সালের ২৭ ডিসেম্বর তারিখে একটি অভিনয়ের সংবাদ, ২৫ জানুয়ারি ১৮৭২ (১৩ মাঘ ১২৭৮) তারিখের অমৃত বাজার পত্রিকায় প্রকাশিত একখানি প্রেরিত পত্রে এইরূপ পাওয়া যায়ঃ—

---

* রাধামাধব কর মহাশয়ের স্মৃতিকথা।—পুরাতন প্রসঙ্গ (২য় পর্য্যায়), পৃ. ১৬৭-৬৮, ১৭৮।

† পঞ্চপুষ্প—চৈত্র ১৩৩৬, পৃ. ১৭৮১-৮৫।

‡ রাধামাধব করের স্মৃতিকথা।—পুরাতন প্রসঙ্গ (২য় পর্য্যায়), পৃ. ১৭৮।

"মহাশয় বিগত ১৩ই পৌষ তারিখে মহেশপুর গ্রামে লীলাবতী নাটকাভিনয় পুনঃ সংস্করণ মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে।...

কৃষ্ণনগর, ১৩ জানুয়ারি	}	বশম্বদ শ্রীঅবিনাশচন্দ্র শর্ম্মা।"

১৮৭২ সালের মার্চ্চ মাসে চুঁচুড়ায় দীনবন্ধুর এই নাটকখানি মহাসমারোহে অভিনীত হয়। এই সম্প্রদায় স্থাপন করিয়াছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র ও অক্ষয়চন্দ্র সরকার। ১৮৭২, ৪ এপ্রিল (২৩ চৈত্র ১২৭৮) তারিখের অমৃত বাজার পত্রিকায় এই অভিনয়ের প্রশংসাসূচক এক দীর্ঘ সম্পাদকীয় মন্তব্য বাহির হইয়াছিল। তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

> "চুঁচুড়ায় সম্প্রতি লীলাবতী নাটক অভিনয় হইয়া গিয়াছে।... অভিনয়টি অতি সুচারু পূর্ব্বক হইয়াছিল।...আমরা নাটক অভিনয়টি দেখিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়া আসিয়াছি। যদিও ইহা সম্পূর্ণ রূপে দোস শূন্য হয় নাই তথাচ এদেশে যত উৎকৃষ্ট২ অভিনয় হইয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে এটি একটী।"

বাগবাজারের সখের দল 'সধবার একাদশী'র অভিনয় শেষ করিয়া তখন লীলাবতী নাটকের মহলা দিতেছিলেন। এমন সময় চুঁচুড়ায় লীলাবতী নাটকাভিনয়ের সুখ্যাতি অমৃত বাজার পত্রিকায় বাহির হইল। অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফি, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রাধামাধব কর প্রভৃতি বিশেষ উদ্যমের সহিত লাগিয়া গেলেন—চুঁচুড়ার দলকে হারাইতেই হইবে। তাঁহাদের প্রথম অভিনয় হয় ১৮৭২, ১১ই মে (৩০ বৈশাখ ১২৭৯) তারিখে। রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হইয়াছিল শ্যামবাজারে রাজেন্দ্র পালের বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণে। ১২৭৯ সালের ৬ই জ্যৈষ্ঠ (শনিবার) তারিখের 'মধ্যস্থ' নামক সাপ্তাহিক পত্রে দেখিতেছি :—

"সংবাদ।···বিগত শনিবার রজনীযোগে শ্যামবাজার নাট্যসমাজ কর্ত্তৃক প্রসিদ্ধ লীলাবতী নাটকের অভিনয় হইয়াছে এবং কয়েক সপ্তাহ হইবার কল্পনা আছে।···শুনিলাম রঙ্গভূমি সুসজ্জিত ও অভিনয় কার্য্যটী সাধারণতঃ উত্তম হইয়াছিল।"

শ্যামবাজারের এই রঙ্গমঞ্চে লীলাবতী নাটকের আরও দুইটি অভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যায়। ১২৭৯ সালের ১৬ই আষাঢ় তারিখের "অতিরেক মধ্যস্থে" দেখিতেছি :—

লীলাবতী নাটকাভিনয়।

সম্পাদক মহাশয়! কয়েক দিবসাবধি বাগবাজারস্থ কতকগুলিন যুবকবৃন্দ শ্রীযুক্ত রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর-প্রণীত লীলাবতী নাটকের অভিনয় করিতেছেন। তাঁহাদের অভিনয়ে কতকগুলিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষ সত্ত্বেও অদ্যাবধি যে সকল উৎকৃষ্ট অভিনয় হইয়া গিয়াছে তন্মধ্যে তাঁহাদেরও এক্ষণে গণনা করিতে হইবে।

অভিনেতৃবর্গের মধ্যে হরবিলাসবাবু, ক্ষিরোদবাসিনী, ললিতমোহন, হেমচাঁদ, লীলাবতী, শ্রীনাথ, রঘুয়া, নদেরচাঁদ, শারদাসুন্দরী প্রভৃতি ক্রমান্বয়ে প্রশংসাভাজন। হরবিলাসবাবু, ক্ষিরোদবাসিনী ও ললিত-মোহনের ন্যায় অভিনেতা অতি বিরল বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

লীলাবতীর অভিনয় যদিও অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু তাহা অনেকাংশে রক্ষিত হইয়াছিল। তাঁহার কতকগুলিন পাঠ অতীব সুন্দর।

ক্ষিরোদবাসিনীর বিলাপলহরী এত স্বাভাবিক ও ভাব পূর্ণ হইয়াছিল যে, তচ্ছ্রবণে দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেরই হৃদয় আর্দ্র হইয়াছিল। হেমচাঁদ, নদেরচাঁদ ও শ্রীনাথের বক্তৃতা ও রসিকতা শ্রোতৃবর্গের অপার আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছে।

নাটকোল্লিখিত কতকগুলিন কবিতা, বোধ হয়, অনাবশ্যক বোধে পরিত্যাগ করিলে ভাল হইত, কারণ অনেকে কবিতার প্রাচুর্য্য বশতঃ বিরক্ত হইয়াছিলেন।

অভিনয়-ত্রয়-দিবসে অভিনেতৃবর্গের মধ্যে অনেকেই পুনঃ পুনঃ অভিনয়ের সজ্জাতেই রঙ্গভূমির বহির্ভাগে আগমন করিয়াছিলেন, তাহাতে অভিনয়ের গাম্ভীর্য্য থাকে না। অভিনয়ের সময় বিশেষ প্রয়োজন না হইলে আদ্যোপান্ত ভিতরে থাকিলেই ভাল হয়। অথবা অন্য বেশে বাহিরে আসা উচিত।

কলিকাতা। }
আষাঢ়, ১২৭৯ সাল। } কশ্চিৎ দর্শকঃ।"*

গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন:—"লীলাবতী অভিনয়ের অতিশয় প্রশংসা হইল। অভিনয় দর্শনে মুগ্ধ হইয়া দীনবন্ধু বাবু আমায় বলিয়াছিলেন, 'তোমাদের অভিনয়ের সহিত চুঁচুড়া দলের তুলনাই হয় না,—আমি পত্র লিখিব—তুয়ো বঙ্কিম!" †

লীলাবতী নাটকের অভিনয়ের খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ায় টিকিটের জন্য দলে দলে উমেদার আসিতে লাগিল—স্থানাভাবে অনেককেই হতাশ হইয়া ফিরিতে হইল। এই অবস্থায় টিকিটের দাম করিবার প্রস্তাব হয়। প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত হইল লীলাবতী

* লীলাবতী অভিনয়ের তারিখ লইয়া অনেকেই গোল করিয়াছেন। অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফি তাঁহার একটি বক্তৃতায় এই অভিনয়ের তারিখ দিয়াছেন—১৮৭১ খৃঃ—১২৭৮ সাল। গিরিশচন্দ্র ঘোষের চরিতকার অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ও এই তারিখ দিয়াছেন। আবার তাঁহাদের কথা নিঃসংশয়ে গ্রহণ করিয়া আরও অনেকে ভুল করিয়া আসিতেছেন।

† নটচূড়ামণি অর্দ্ধেন্দুশেখর—শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ। গিরিশ গ্রন্থাবলী, ৭ম ভাগ।

নাটক অভিনয়ের মাস-ছয় পরে। এই সখের নাট্যসম্প্রদায় 'ন্যাশন্যাল থিয়েটার' নাম লইয়া, দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটকের অভিনয়ের সহিত ১৮৭২, ৭ই ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতায় বৈতনিক থিয়েটারের সূত্রপাত করেন। *

যাহা হউক, যে মুষ্টিমেয় ভদ্রসন্তান সখের থিয়েটার হইতে শেষে কলিকাতায় সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহারা দীনবন্ধু মিত্রের নিকট কতটা ঋণী, তাহার পরিচয় পাওয়া

---

* টিকিট বেচিয়া অভিনয় প্রদর্শন ন্যাশনাল থিয়েটারের পূর্ব্বে ঢাকাতেই প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। ১৮৭২, ১৮ই মার্চ (১৬ চৈত্র ১২৭৮) তারিখের অমৃত বাজার পত্রিকায় নিম্নলিখিত সম্পাদকীয় মন্তব্য দেখিতেছি :—

"সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নূতন আমোদ আহ্লাদের আবির্ভাব হয়। ইংরাজি সভ্যতায় এ দেশে অন্যান্য আমোদের মধ্যে মদ্য পান এবং নাটকাভিনয় আনয়ন করিয়াছে। বিষ ও বিষহরি বিধাতা একেবারে সৃষ্টি করেন। মদ আসিয়া যেমন হিন্দু সমাজে নানা পাপ প্রস্রবণ খুলিয়াছে, সমাজ সংস্কার করিবার নিমিত্ত তেমনি নাটক অভিনয়ের সৃষ্টি হইয়াছে।...

ঢাকার সুশিক্ষিত যুবকেরা সম্প্রতি রামাভিষেক নাটক [মনোমোহন বসু রচিত] অভিনয়ে ব্যাপৃত হইয়াছেন।... ঢাকার যুবকেরা উৎসাহী এবং সরলচেতা। তাঁহারা অভিনয় কার্য্যে যেরূপ কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত হইয়াছেন তাহাতে অভিনয়টি সুচারু পূর্ব্বক হইবার সম্ভাবনা। আমরা এক দিন ইহাদের কয়েক জন অভিনেতৃগণের অভিনয় দেখিয়াছিলাম এবং আমাদের বিবেচনায় উহা চমৎকার হইয়াছিল। যুবকেরা চাঁদা দ্বারা বিস্তর অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। একটি রঙ্গভূমি প্রস্তুত করিয়াছেন, কলিকাতা হইতে চিত্রকর লইয়া গিয়া উত্তম উত্তম চিত্র চিত্রিত হইয়াছে। অভিনেতৃগণের মধ্যে ঢাকার প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা আছেন। পাছে উহার দ্বারা কোন অমঙ্গল হয়, এই নিমিত্ত তাঁহারা উহাতে স্কুলের কোন ছাত্রকে প্রবেশ করিতে দেন নাই। আমাদের দেশে নাটক অভিনয়ের নিমন্ত্রণ প্রায় বন্ধুবান্ধবের মধ্যে হয়।

যায় গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'শাস্তি কি শান্তি' নাটকের উৎসর্গ-পত্র হইতে। গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

নাট্যগুরু স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র

মহাশয় শ্রীচরণেষু—

বঙ্গে রঙ্গালয় স্থাপনের জন্য মহাশয় কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন।··· যে সময়ে 'সধবার একাদশী' অভিনয় হয় সেই সময় ধনাঢ্য ব্যক্তির সাহায্য ব্যতীত নাটকাভিনয় করা একপ্রকার অসম্ভব হইত; কারণ পরিচ্ছদ প্রভৃতির যেরূপ বিপুল ব্যয় হইত, তাহা নির্ব্বাহ করা সাধারণের সাধ্যাতীত ছিল। কিন্তু আপনার সমাজচিত্র 'সধবার একাদশী'তে অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয় নাই। সেই জন্য সম্পত্তিহীন যুবকবৃন্দ মিলিয়া 'সধবার একাদশী' করিতে সক্ষম হয়। মহাশয়ের

যাহার ইচ্ছা সে উহা দর্শন করিতে যাইতে পারে না। ঢাকার অভিনয়ে সেটি হইবে না। অভিনয় কর্ত্তারা উহার নিমিত্ত টিকিট বিক্রয় করিবেন, টিকিট চারি দুই এবং এক টাকা মূল্যে থাকিবে। অভিনয় উৎপন্ন টাকা দ্বারা তাঁহারা দেশের সৎকার্য্যানুষ্ঠান করিবেন। প্রকৃত তাঁহারা টিকিট বিক্রয়ের প্রথা বাহির করিয়া দেশের একটী অভাব যেমন দূর করিতেছেন, তেমন সৎকার্য্যানুষ্ঠানের একটা প্রধান পথ বাহির হইতেছে। এরূপ অর্থ উপার্জ্জন দ্বারা উপার্জ্জনকারী দিগের গৌরব লাঘব না হইয়া প্রত্যুত বৃদ্ধি হইবে।"

ঢাকায় রামাভিষেক নাটকের অভিনয় হয় ১৮৭২, ৩০ মার্চ তারিখে। ১৮৭২, ৪ এপ্রিল (২৩ চৈত্র ১২৭৮ বৃহস্পতিবার) তারিখের অমৃত বাজার পত্রিকায় দেখিতেছি:—"গত শনিবারে ঢাকায় রামাভিষেক নাটক অভিনয় হইয়া গিয়াছে। এ সম্বন্ধে একজন বন্ধু লিখিয়াছেন:—

'অভিনয় দেখিতে বিস্তর লোকের সমাগম হয়। অনেক অনেক প্রধান মুসলমান, ঢাকার ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিনটেনডেন্ট, পোগোজ সাহেব এবং অন্যান্য কয়েক জন খৃষ্টান

নাটক যদি না থাকিত, এই সকল যুবক মিলিয়া 'ন্যাসান্যাল থিয়েটার' স্থাপন করিতে সাহস করিত না। সেই নিমিত্ত আপনাকে রঙ্গালয়-স্রষ্টা বলিয়া নমস্কার করি।'

জামাই বারিক

ন্যাশনাল থিয়েটার দ্বিতীয় অভিনয় রজনীতে—১৮৭২, ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে—ইহার অভিনয় করেন (অমৃত বাজার পত্রিকা, ১৯ ডিসেম্বর ১৮৭২)। অনেকে ভুল করিয়া বলেন যে এইদিন 'নীলদর্পণ' নাটক অভিনীত হয়।

কমলে কামিনী

১৮৭৩, ২০এ ডিসেম্বর তারিখে ন্যাশনাল থিয়েটার কর্তৃক জোড়াসাঁকো ঘড়িওয়ালা বাড়িতে ইহা অভিনীত হয়। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে 'কমলে কামিনী'র ইহাই প্রথম অভিনয়।

[দীনবন্ধুর নাটক ও প্রহসনগুলি বাংলার সাধারণ রঙ্গমঞ্চে বহুবার অভিনীত হইয়াছিল। সে-সব অভিনয়ের উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন]

উপস্থিত হন এবং সকলেই অভিনয় দেখিয়া অত্যন্ত তৃপ্ত হইয়া গিয়াছেন। সুপারিন-টেনডেণ্ট সাহেব এমন আনন্দিত হন যে তিনি বলেন যে আবার যখন অভিনয় হইবে তখন আমি মেম সাহেবদিগকে আসিতে বলিব। এবং পোগোজ সাহেব বলেন যে অভিনয়ের টিকিট কিনিতে যে পাঁচ টাকা ব্যয় হইয়াছে তাহা তিনি অতি সৎকার্য্যে লাগাইয়াছেন। সকল বিষয় অতি সুচারু পূর্ব্বক নির্ব্বাহ হইয়া গিয়াছে।...'

এত অর্থ, এত যত্ন, পরিশ্রম করিয়া যে ঢাকার অভিনয়টী সুচারু পূর্ব্বক নির্ব্বাহ হইয়াছে ইহা শুনিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম।"

৪। জীবনীর উপাদান

সে-যুগের ইংরেজী ও বাংলা সংবাদপত্রগুলি অনুসন্ধান করিলে দীনবন্ধুর চরিত-কথার এখনও বহু উপাদান মিলিতে পারে। সম্প্রতি কয়েকখানি পুরাতন কাগজ দেখিতে দেখিতে আমি দীনবন্ধু সম্বন্ধে যেটুকু জানিতে পারিয়াছি তাহার কথাই এখানে বলিব।

কৃষ্ণনগরে দীনবন্ধুর বক্তৃতা

১৮৬১, ১৪ই জুন তারিখে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়। এই স্বদেশবৎসল সম্পাদকের উপযুক্ত স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের জন্য অনেকেই উৎসুক হইয়াছিলেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় সুকিয়া ষ্ট্রীটে দুই বিঘা জমি ও পাঁচ শত টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হন। ১৮৬২, ২৬ জুলাই তারিখে কৃষ্ণনগরে একটি সভা হয়। এই সভায় দীনবন্ধু একটি দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। 'কস্যচিৎ কৃষ্ণনগর-বাসিনঃ' এই সভার বিবরণ ও দীনবন্ধুর বক্তৃতা প্রকাশের জন্য 'সোমপ্রকাশ' পত্রে প্রেরণ করেন। বক্তৃতাটি অতি দীর্ঘ বলিয়া 'সোম-প্রকাশ'-সম্পাদক তাহার কিয়দংশ ১৮৬২, ১১ই আগষ্ট (২৭ শ্রাবণ ১২৬৯) তারিখের পত্রে প্রকাশ করেন। তাহা হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত হইল :—

"সম্প্রতি এক দিন শ্রীযুক্ত বাবু রামতনু লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত বাবু উমেশ-চন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুক্ত বাবু দীনবন্ধু মিত্র এই কয় মহাশয় সমবেত হইয়া মৃত মহাত্মা হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মরণার্থ কলিকাতা নগরীতে প্রারব্ধ অট্টালিকার সাহায্য করণের মন্ত্রণা করেন। দীনবন্ধু বাবুই প্রধান সম্পাদকের ভার গ্রহণ করিয়া অকপট যত্ন সহকারে অত্রত্য মহারাজ বাহাদুরের আদেশানুসারে এক সভার অনুষ্ঠান করেন। ২৬এ জুলাই

শনিবার বেলা ৪টার সময় পবলিক লাইব্রেরিতে এই সভা সংস্থাপিত হয়। কৃষ্ণনগরস্থ বহুতর ভদ্র ব্যক্তি সমাগত হইয়া এই সভা মণ্ডপ মণ্ডিত করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু তারিণীচরণ ঘোষ মহাশয় সভাপতি পদে ব্রতী হন। অনন্তর দীনবন্ধু বাবু যে বক্তৃতা দ্বারা সমাগত সভ্য-গণকে আর্দ্র করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে প্রকটিত করা গেল।

'হরিশ বাবু যেরূপ দেশহিতৈষী ছিলেন, হরিশ বাবু যেরূপ পরোপ-কারী ছিলেন, হরিশ বাবু যেরূপ সুলেখক ছিলেন, হরিশ বাবু স্বদেশের উন্নতি জন্য যে পরিশ্রম করিয়াছেন, হরিশ বাবু রাজপুরুষদিগের যে সহায়তা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার স্মরণার্থ কোন চিহ্ন স্থাপন করা না করা সমান, কারণ তিনি চিরস্মরণীয়, তিনি প্রাতঃস্মরণীয়, তিনি ভুলিবার যোগ্য নন, তাঁহাকে ভুলেও ভোলা যায় না। হরিশ বাবুর স্মরণার্থে কোন অট্টালিকা প্রস্তুত হউক না বা হউক তিনি আমাদের অন্তঃকরণ অট্টালিকায় সতত বিরাজ করিতেছেন, হরিশ বাবুর স্মরণার্থ কোন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হউক বা না হউক, তিনি আমাদের হৃদয় মন্দিরের আরাধ্য দেবতা হইয়া আছেন, হরিশ বাবুর প্রতিমূর্ত্তি কোন রাজপথে স্থাপিত হউক না হউক, তিনি আমাদের স্মরণপথে দেদীপ্যমান দণ্ডায়মান আছেন। কিন্তু ভাবি কালে তাঁহার নাম বিলুপ্ত না হয় এবং সকল দেশেই এরূপ সৎ প্রথা আছে যে, দেশের হিতকারী অসাধারণ গুণসম্পন্ন মহোদয়ের পরলোক হইলে তাঁহার স্মরণার্থ তাঁহার দেশস্থ লোকে কোন চিহ্ন স্থাপন করিয়া রাখে, এই জন্য 'হরিশ্চন্দ্র সমাজ' নামক অট্টালিকার অনুষ্ঠান হইয়াছে।

'হরিশ্চন্দ্র শিশুকালে উপায় হীন ছিলেন। তাঁহার পিতা মাতার তাদৃশ সম্পত্তি ছিল না যে তাঁহাকে সুচারুরূপে শিক্ষা দেন, কিন্তু তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি ছিল, তিনি প্রথমতঃ ইউনিয়ান স্কুলে বিদ্যাভ্যাস

করিয়াছিলেন। তার পরে আপনি আপনার শিক্ষক হইয়াছিলেন, আপনি আপনার উপদেষ্টা হইয়াছিলেন, তিনি প্রত্যহ কলিকাতার পবলিক লাইব্রেরিতে গিয়া সকল সংবাদপত্র এবং নানাবিধ পুস্তক পাঠ করিয়া আসিতেন এবং তাহাতেই যে ভুবনবিখ্যাত বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার ভুবনবিখ্যাত 'হিন্দুপেট্রিয়াট' সংবাদপত্রেই প্রকাশ আছে। পিতা মাতা পরিজন প্রতিপালনের ভার তাঁহার কোমলস্কন্ধে পতিত হওয়ায় তিনি অতি অল্পবয়সে টালার নিলামে এক ক্ষুদ্র কেরাণির কর্ম্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু সেখানে তাঁহার অধিক দিন থাকিতে হয় নাই। মিলিটারি আডিটার জেনেরেল আপীশে ২৫ টাকা বেতনের এক কর্ম্ম খালি হইলে তিনি পরীক্ষা দিয়া ঐ কর্ম্ম প্রাপ্ত হন। হরিশ্চন্দ্র শুভক্ষণে মিলিটারি আডিটার জেনেরেলের আপীশে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ঐখান হইতেই তাঁহার উন্নতির সোপান হইল। তাঁহার কর্ম্ম দক্ষতা দেখিয়া তাঁহার মনিব সাহেবেরা অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং যখন পন্থা পাইয়াছিলেন তখনই হরিশের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন। অতি অল্পকালের মধ্যে ঐ আপীশে হরিশের চারিশত টাকা বেতন হইয়াছিল।

'শিশুকাল হইতেই হরিশের সংবাদ পত্রে অনুরাগ ছিল, কারণ তিনি জানিতেন সংবাদ পত্রই দেশের উন্নতির মূল, সংবাদপত্রের দ্বারাই দেশের সভ্যতা সাধন হইতে পারে, সংবাদ পত্রের দ্বারাই দেশের উপকার জনক রাজনিয়মের সৃষ্টি হইতে পারে। তিনি প্রথমতঃ সংবাদ পত্রে স্বদেশের মঙ্গলজনক পত্র প্রেরণ করিতেন কিন্তু সম্পাদকেরা তাঁহার সকল পত্র ছাপিতে সাহসী হইত না, এই জন্যে তিনি বিরক্ত হইয়া আপনি নিজে একখানি সংবাদ পত্রের সৃষ্টি করিলেন, সেই সংবাদপত্রের নাম 'হিন্দু-পেট্রিয়াট', হরিশ্চন্দ্র অর্থলাভ করিবার জন্য হিন্দুপেট্রিয়াট প্রচার করেন

নাই, কেবল স্বদেশের উপকার করিবার জন্যে হিন্দুপেট্রিয়াট প্রচার করিয়াছিলেন, তিনি যখন ১০০৲ টাকা বেতন পান, তখনই হিন্দু-পেট্রিয়াটের প্রথম সৃষ্টি হয় কিন্তু তখন ঐ পত্রে মাসে ৫০ টাকা করিয়া ঘর হইতে দিতে হইত, স্বদেশ অনুরাগী হরিশ্চন্দ্র তার জন্যে একদিনের তরেও কাতর হন নাই। কাতর হবেন কেন? তাঁহার অন্তঃকরণ অতি মহৎ, তাঁহার অন্তঃকরণ অর্থের দিকে দৃষ্টিপাত করিত না, কেবল স্বদেশের উপকারই পরমার্থ বলিয়া জানিত। হরিশ্চন্দ্র যে কাগচে লেখনী সঞ্চালন করিতে লাগিলেন সে কাগচে লোকসান ক দিন থাকিতে পারে? হরিশের লেখা যে একবার পড়ে সেই মোহিত হয় এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার জগৎবিখ্যাত হিন্দুপেট্রিয়াটের গ্রাহক হয়। অতি অল্প দিনের মধ্যে হরিশ্চন্দ্রের হিন্দুপেট্রিয়াট হইতে ৩০০।৪০০ টাকা লাভ হইতে লাগিল। হিন্দুপেট্রিয়াট, হিন্দুবন্ধু হরিশ্চন্দ্রের লেখার কৌশলে বঙ্গদেশে অতিশয় আদরণীয় হইয়াছে। কেবল বঙ্গদেশ কেন বলিতেছি, ভারতবর্ষময় হিন্দুপেট্রিয়াটের গৌরব হইয়াছে। কি মান্দ্রাজ, কি বোম্বাই, কি লাহোর, কি আগরা সকল স্থানেই হিন্দুপেট্রিয়াটকে অতি সাহসী সংবাদ পত্র বলিয়া গণ্য করে। ইংলণ্ডেও হিন্দুপেট্রিয়াটের অতিশয় আদর হইয়াছে। ইণ্ডিয়া কাউনসেলে আদর হইয়াছিল, মহাসভা পার্লিয়ামেণ্টে আদর হইয়াছিল, প্রীবি কাউনসেলে আদর হইয়াছিল। বিলাতে আবওরিজিনিস প্রোটেকশন নামক এক সভা আছে, বিলাতের রাজ্যাধীন যত দেশ আছে সেই সকল দেশের আদিম বাসেন্দা লোকদিগের উন্নতি সাধন করা সে সভার উদ্দেশ্য। হরিশের হিন্দুপেট্রিয়াট এই সভার চক্ষু হইয়াছিল। হরিশ যে সকল মত প্রচার করিতেন এই সভার সভ্যগণ সেই মত অতিবিধেয় বলিয়া গণ্য করিতেন। কলিকাতার বৃটিস ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসানের এক্ষণে যে গৌরব

দেখিতেছেন, সে গৌরব হরিশ্চন্দ্রের লেখনীর জোরে হইয়াছে, ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসানের দ্বারা ভারতবর্ষের যে উপকার জন্মিতেছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই, লেপ্‌টেনণ্ট গবর্ণরের নিকটে, গবর্ণর জেনেরেলের নিকটে, ইণ্ডিয়া কাউনসেলের সেক্রেটারির নিকটে, ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসানের প্রস্তাবাদি অতি আদরণীয় হইয়াছে। তাঁহারা জানেন এই ভারতবর্ষীয় সভার যে অভিপ্রায় তাহা ভারতবর্ষের সমুদায় লোকের অভিপ্রায়, ভারতবর্ষীয় সভাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে ভারতবর্ষের সমুদায় লোক সন্তুষ্ট হইবে, তাঁহারা জানিয়াছেন এই ভারতবর্ষীয় সভা ভারতবর্ষের পার্লিয়ামেণ্ট হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় সভার সভ্য মহোদয়েরা হরিশের বিদ্যা বুদ্ধি কৌশল ও রাজকার্য্যে পারদর্শিতা বিশেষ রূপে জ্ঞাত ছিলেন, তাঁহারা হরিশকে পুত্রের মত স্নেহ করিতেন, কোন মহৎ বিষয় সুসম্পন্ন করিতে হইলেই তাঁহারা হরিশকে ভার দিতেন, হরিশ সে বিষয় এমনি সমাধা করিতেন তাঁহারা সকলে চমৎকৃত হইতেন এবং হরিশ দীর্ঘজীবী হউক, জগদীশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা করিতেন। কিন্তু ভারতবর্ষীয় সভার সভ্য গণের কি দুরদৃষ্ট! তাঁহাদের কি পরিতাপ! তাঁহারা অতি অল্প দিবসের মধ্যেই হরিশের অসাধারণ সহায়তা হইতে বঞ্চিত হইলেন।

গত ৫৭ সালের মিউটিনির সময় যে সময় সেপাইগণ রাজ বিদ্রোহিতা করিয়াছিল সে সময় হরিশবাবু যে ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা কখনই ভুলিতে পারিব না। সে কথা মনে করিতে গেলে আমার অন্তঃকরণ অদ্যকার সভার সমুদায় লোকের অন্তঃকরণ ও ভারতবর্ষের সমুদায় লোকের অন্তঃকরণ কৃতজ্ঞতারসে আর্দ্র হয়। সেপাইদিগের অত্যাচারে ভারতবর্ষের প্রায় যাবতীয় ইংরাজলোকে রাগান্ধ হইয়া ভারতবর্ষের সমুদয় লোকের প্রাণ সংহার করিবার জন্য

চীৎকার ধ্বনি করিতে লাগিলেন, তখন কাহার সাধ্য তাঁহাদের এই অসংগত মতে বিমত করে, তখন তাঁহাদের মতকে অন্যায় মত বলিলে ফাঁসি হয়, তখন তাঁহাদের বিরুদ্ধে একটী কথা কহিলে তদ্দণ্ডে কাটিয়া ফেলে। আমরা কোন কীটস্য কীট। গবর্ণর জেনেরেল লার্ড ক্যানিং তাঁহাদের মতকে অন্যায় মত বলিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার কত চেষ্টা হইয়াছিল। এই ভয়াবহ সময়ে আমাদের হরিশ্চন্দ্র, আমাদের হিন্দুবন্ধু হরিশ্চন্দ্র, আমাদের সাহসী হরিশ্চন্দ্র চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। এক দিকে তিনি তাঁহার লেখনী দ্বারা স্বদেশের লোকদিগকে মাভৈঃ মাভৈঃ শব্দে সাহস দিতে লাগিলেন, আর দিকে রাগান্ধ ইংরাজদিগের মতকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতে লাগিলেন। এবং যে সদুপায় দ্বারা রাজ বিদ্রোহিতা একেবারে নিরাকৃত হইবে এবং ইংরাজ-রাজ্য ভারতবর্ষে সগৌরবে চিরস্থায়ী হইবে তাহার প্রস্তাব করিতে লাগিলেন। আহা! হরিশ্চন্দ্র কিছুমাত্র প্রাণের শঙ্কা করিতেন না, তিনি কেবল দেখিতেন কিসে স্বদেশের উপকার, হইবে, তিনি স্বদেশের উপকারের কাছে তাঁহার জীবন অতিতুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। তিনি বিলক্ষণ জানিতেন, সেই ভয়াবহ সময়ে এক জন ইংরাজে যদি বলে এই ব্যক্তি আমাদের মন্দ কথা বলেছে তবে তাহাকে তৎক্ষণাৎ কোন বিচার না করিয়া কোন প্রমাণ না লইয়া ফাঁসি দেয়, তা বলে কি হরিশ্চন্দ্র পিচপা হবেন, তা বলে কি হরিশ্চন্দ্র যথার্থ কথা লিখিতে সঙ্কুচিত হবেন, তিনি জানিতেন তাঁহার জীবন দিয়া দেশের যদি কিঞ্চিৎমাত্র উপকার হয় সেই তাঁর যথেষ্ট। লার্ড ক্যানিং মহোদয়, এই সময়ে হিন্দুপেট্রিয়াট সংবাদ পত্রকে অতিশয় আদর করিতেন, তিনি রাগান্ধ হন নাই, তাঁহার মহৎ অন্তঃকরণ চঞ্চল হয় নাই। তিনি তাঁহার মহানুভব সুপ্রিম কাউনসেলের সভ্যগণের পরামর্শ যেরূপ

শুনিতেন সেইরূপ হিন্দুপেট্রিয়াট সংবাদ পত্রের পরামর্শও শুনিতেন, তিনি তাঁহার সভার সভ্য গণের দ্বারা যেরূপ উপকৃত হইয়াছিলেন, সেই রূপ হরিশ্চন্দ্রের হিন্দুপেট্রিয়ট পত্রদ্বারা উপকৃত হইয়াছিলেন। লার্ড ক্যানিং প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন হরিশ্চন্দ্র আগামি বারে কি লেখেন। এক দিবস হিন্দুপেট্রিয়ট পৌছিবার সময় অতীত হইয়া গেল, হিন্দুপেট্রিয়াট না আসাতে লার্ড ক্যানিং ব্যস্ত হইয়া তাঁহার প্রাইবেট সেক্রেটারিকে বলিলেন এখন পর্য্যন্ত হিন্দুপেট্রিয়াট পাইলাম না ইহার কারণ কি? প্রাইবেট সেক্রেটারি এই কথা তৎক্ষণাৎ হিন্দুপেট্রিয়াট যন্ত্রালয়ে লিখিলেন এবং অবিলম্বে হিন্দুপেট্রিয়াট ক্যানিং মহোদয়ের হস্তগত হইল। সেই মহাত্মা লার্ড ক্যানিং সাহেবের জন্যে এবং আমাদের হরিশের জন্যে আমরা অন্যায় অপমৃত্যু হইতে রক্ষিত হইয়াছি। হরিশ্চন্দ্র আমাদের দেশের জন্যে এত করিয়াছেন, আমরা কি তাঁহার স্মরণার্থ অকিঞ্চিৎকর কিঞ্চিৎ অর্থদান করিতে পারিব না। হে সভাস্থ লোক! অর্থদান করিতে পারিব কি না পারিব বলিয়া জিজ্ঞাসা করা আমার অন্যায়, যখন হরিশ্চন্দ্রের নাম মাত্রে আমাদের প্রাণ প্রফুল্ল হয় যখন অদ্যকার সভার কথা শুনিবামাত্র এখনকার যাবতীয় লোকে আনন্দিত হইলেন এবং উৎসাহপ্রফুল্ল বদনে সভায় আগমন করিয়াছেন তখন যে উদ্দেশে সভা হইয়াছে তাহা সুসম্পন্ন হইবে তাহার সন্দেহ কি।'

"দীনবন্ধু বাবুর এই রূপ কারণ্যরসাশ্রিত বক্তৃতাশ্রবণে সভাস্থ যাবতীয় লোক মুগ্ধ আর্দ্র ও সজল লোচন হইয়া উঠিলেন। অনন্তর স্ব স্ব শক্তি অনুসারে যিনি যাহা প্রদান করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের নাম নিম্নে নির্দ্দিষ্ট হইল।

মহারাজ সতীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	২০০৲
বাবু তারিণীপ্রসাদ সেন	১০০৲
... ...	
উমেশচন্দ্র দত্ত	৪০৲
দীনবন্ধু মিত্র	৩০৲
...	
কার্ত্তিকচন্দ্র রায়	২৫৲
...	
লালমোহন ঘোষ প্রভৃতি	২৫৲
মোট	১০৪১৷৷০

কর্ম্মক্ষেত্রে দীনবন্ধুর কৃতিত্ব

১৮৭২, ৭ই জুন (২৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৯) তারিখে অমৃত বাজার পত্রিকা দীনবন্ধু সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন :—

টুইডী সাহেব ও দীনবন্ধু বাবু।...সুপার নিউমারারি ইনেস্পেক্টার রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর বোধ হয় টুইডি সাহেবকে [পোষ্টমাষ্টার জেনারেল] অনেক সাহায্য করিয়াছেন কারণ আমরা যখন পোষ্ট আফিস বিভাগের নূতন বন্দবস্তের কথা শুনিতে পাই দীনবন্ধু বাবু প্রায় সেই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া গমন করেন। লুসাই যুদ্ধে অনেক সৈন্য গমন করিয়াছিল তাহাদের নিয়মিত পত্র যাইবার সুবিধার জন্য দীনবন্ধু বাবুকে পাঠান হইয়াছিল, বিরভূমে প্রায় ২।৩ মাসের জন্য তিনি গমন করিয়াছিলেন, কিশের নিমিত্ত তাহা বলিতে পারি না। দীনবন্ধু বাবু নূতন বন্দবস্তের নিমিত্ত প্রায় বিদেশাভিমুখে গমন করিয়া থাকেন এবং তাহাতে তিনি কৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসেন তাহার সন্দেহ নাই। দীনবন্ধু বাবু পোষ্ট অফিসের কর্ম্মে বিশেষ পারদর্শিকতা দেখিয়াছিলেন সেই জন্যে তিনি গবর্ণমেণ্ট হইতে রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু এই সঙ্গে তাহার উচ্চপদ এবং বেতন বৃদ্ধি হওয়া উচিত ছিল। আমরা ভরসা করি গবর্ণমেণ্ট সত্বর তাঁহাকে উচ্চ পদাভিষিক্ত করিয়া দিয়া তাঁহার পরিশ্রমের যথার্থ ফল তাঁহাকে প্রদান করিবেন।

৫ম সংখ্যা] মাঘ, ১৩৩৮ [৪র্থ বর্ষ

কবি-বরণ

আমারও পড়েছে ডাক আজিকার উৎসবসভায়,
কবিতার অর্ঘ্যে, কবি, করিবারে তোমার বন্দনা—
জানি না কি দুঃসাহসে গাঁথি' মালা অতসী-জবায়
দুলাইব ওই কণ্ঠে—পারিজাতও পায় যে গঞ্জনা !
তোমারে বরণ করি লয়েছিনু সে যে বহুদিন—
কৈশোর-সীমায় সেই দুরাশার কুয়াশা-রঙীন
তারকিত চন্দ্রাতপতলে ; তখন ছিল না ভাষা,
শুধু তব বাণীরূপ—অনবদ্য অনির্ব্বচনীয়
নেত্র ভরি' লয়েছিনু ; দূর হ'তে তব উত্তরীয়
হেরিয়াছি কতবার—করি নাই পরশের আশা।

২

আজিও তেমনি আমি সুনিভৃত এ মন-ভবনে
একান্তে আসন পাতি' ভেবেছিনু আনন্দ-চন্দন

পরাইয়া দিব ভালে ; রাখীটি বাঁধিয়া সঙ্গোপনে
দিব যবে, এই ভাবি' উপজিবে সঘন স্পন্দন—
ভারতীর পাণিস্পর্শ-পূত তব ওই করমূল !
চরণ বন্দনা করি' বিরচিব মনোমত ভুল
দ্বিধাহীন অসঙ্কোচে, মানিব না কোন ভয় লাজ ;
আমারে ঘেরিয়া কত অপরূপ গীতি-বিহঙ্গম
কূজিবে যৌবন-বনে, জরামৃত্যু করি অতিক্রম
উত্তরিব সেই দেশে, তুমি যেথা চির-ঋতুরাজ ।

৩

সেই কবি তুমি মোর ; সেই গান আজও অবিরাম
শুনি আমি এ জীবন-যমুনার প্রতনু সলিলে ;
ভুলি নাই ধরিত্রীরে মোর সেই প্রথম প্রণাম,
যৌবনের মায়াবতী জাগে আজও ম্লান আঁখি-নীলে ।
সে গানে এখনো শুনি, ডাকে যেন মোর নাম ধরি'—
হারায়েছি যারে সেই বনপথ-যাত্রাসহচরী
সখী মোর ; মন্ত্রস্তব্ধ দ্বিপ্রহর জ্যোৎস্নারজনীতে
আজও করে আমন্ত্রণ—খেলিবারে সেদিনের মত
ছায়া-ধরাধরি খেলা ; অন্ধকারে আজও তন্দ্রাহত
সে গানে চমকি' জাগি' হেরি দীপ জ্বলিছে নিশীথে !

৪

যে সুরে সাধিল গীত একদা সে অজয়ের কূলে
আঙিনায় একা বসি', হেরি' মেঘে মেদুর অম্বর,
যে রস অমৃত-বিষে মূরছিয়া মরমের মূলে
'দ্বিজ'-কবি করেছিল এ জাতিরে গানে জাতিস্মর,

সেই রসে সেই স্থরে এতকাল পরে তুমি কবি
যুক্ত বেণী মুক্ত করি' বহাইলে হৃদয়-জাহ্নবী
বাঙ্গালার ; এই জল, এই মাটি, এই ছায়ালোক
গুঞ্জরিল স্থন্দরের স্বপ্নময় স্নেহের কাহিনী,—
এ জীবনে এত শোভা !—নহে শুধু শ্মশান-বাহিনী,
এ নদীর উভ-কূলে বারাণসী, ভূলোকে দ্যুলোক !

৫

মোদের কুটীর-দ্বারে দাঁড়াইয়া দেখেছি তাহারে—
গ্রামান্তের বন-রেখা অন্তরালে, সায়াহ্ন-ধূসর
সীমন্ত-গুণ্ঠনবাসে ঢাকি' আঁখি, ঢাকি' অশ্রুভারে,
খুঁজিয়া যে লয় নিতি বিস্মৃতির তিমির-বাসর ।
তুমি তারে ফিরাইলে অস্ত হ'তে উদয়ের পানে,—
সে মুখে পড়িল আলো, তব গীত-অভিষেক-স্নানে
মোহভঙ্গে দাঁড়াইল দেশলক্ষ্মী রাজরাজেশ্বরী ;
স্যমন্তক-মণি শিরে, অঙ্গে বাস হরিত-হিরণ,
বাণীর মঞ্জীর-বাঁধা দুইখানি রাতুল চরণ,
ধরি' আছে বক্ষে তবু করপদ্মে নীবার-মঞ্জরী !

৬

সেই রূপ-ধ্যান শেষে করি' আমি তোমারে বরণ
হে বরেণ্য বঙ্গকবি, জাতি-দেশ-ভাষার দিশারী !
আজ তুমি বিশ্ব-কবি—সেই গর্ব্ব জানি অকারণ,
যা দিয়েছ বিশ্বে তুমি, আমি তার নহি যে ভিখারী।
নিখিলের নীলাকাশে আছে শুধু মহা মরু-পথ,
নাই সেথা স্নেহ-শ্যাম ছায়া-তরু—নীড়ের জগৎ ;

রচিয়াছ যেই নীড় সুনিবিড় হর্ষে শিহরিয়া—
ভুঞ্জিয়াছি শুধু মোরা যে নবান্ন অমৃত-সমান,
যে আনন্দ-অধিকারে বিদেশীর বৃথা অভিমান,
তারি গর্ব্বে সমর্পিনু এই অর্ঘ্য অঞ্জলি ভরিয়া।

'জয়ন্তী'

রবীন্দ্রনাথের বয়স সপ্ততি বর্ষ অতিক্রম করিয়াছে, এই সুদীর্ঘ জীবন-কালে তিনি বাংলা সাহিত্য ও বাঙ্গালীর ভাব-চিন্তাকে যে ভাবে সমৃদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে গৌরব ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবের কল্পনা যাঁহারা করিয়াছিলেন, তাঁহারা আমাদের ধন্যবাদভাজন।

কিন্তু এই উৎসব জাতির যে অবস্থায় যে ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে তাহাতে কবির প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ হওয়া দূরে থাক, তাঁহার মর্য্যাদা-হানি করা হইয়াছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথের বয়স হইয়াছে, নানা কারণে এই ব্যাপারটিকে বাহিরের দিক হইতে নির্ব্যক্তিক ভাবে দেখিবার শক্তি হয় ত' তাঁহার আর নাই; নতুবা, সারা জীবন ধরিয়া তিনি সর্ব্ব বিষয়ে যে শালীনতা ও শোভনতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন—তাঁহার যে অতি কঠিন আত্মসংযমকে দেশবাসী অনেক সময়ে ভুল বুঝিয়া তাঁহার উপর দোষারোপ করিয়াছে—সেই দুর্লভ আচরণ-জ্ঞান তিনি আজিকার দিনে এমন করিয়া হারাইলেন কেন? তিনি কেন একবারও বুঝিয়া দেখিলেন না যে এই অনুষ্ঠানের

উদ্যোগ যাহারা করিতেছে তাহারা জাতির প্রতিনিধি নয়, তাঁহারই পরিজন; সে ভঙ্গি ও জাতীয় উৎসবের ভঙ্গি নয়; বরং অজ্ঞ মূঢ় দেশবাসীকে চমক লাগাইবার, দেশবাসী অপেক্ষা বিদেশীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার—এক কথায়, ইংরাজীতে যাহাকে বলে snobbery, তাহারই একটা প্রকাণ্ড গগনভেদী আস্ফালন করিবার—সুযোগ তাহারা পাইয়াছে; রবীন্দ্রনাথকে লইয়া কতিপয় লঘুপ্রকৃতি, কাল্‌চার-অভিমানী, 'তোমারি গরবে গরবিনী আমি'—ভাবের ব্যক্তি এই মর্ম্মান্তিক প্রহসনের অভিনয় করিয়াছে। সমস্ত জাতির পক্ষ হইতেই আমরা ক্ষোভ ও দুঃখের সহিত এই অপ্রিয় অথচ অতিশয় সত্য কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি।

দেশের বর্ত্তমান অবস্থা যে কি তাহা কাহাকেও বুঝাইতে হয় না; যে যেখানে যে ভাবে কালযাপন করিতেছে সে-ই আজিকার এই যুগ-বিপ্লবে মুহ্যমান। দেশের ইতিহাসে এই কয়টি বৎসর, এই যুগ—যে বর্ণে চিত্রিত হইয়া থাকিবে, তাহার মধ্যে এইরূপ একটা অনুষ্ঠানের কাহিনী কতখানি বিসদৃশ বলিয়া বোধ হইবে, এবং সেই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নাম কতখানি শ্রদ্ধার উদ্রেক করিবে, তাহা অনুমান করা দুরূহ নয়। কারণ, এই অনুষ্ঠানে ভক্তগণের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজেও যে ভাবে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন—সেই অফুরন্ত নৃত্যগীত ও কলাসম্মত উপচারের আড়ম্বর কাহারও অবিদিত নাই। অদৃষ্টের বিড়ম্বনা এমনই যে, ঠিক সেই সময়েই দেশে এমন সকল ঘটনা ঘটিয়াছে যাহাতে জাতির প্রাণ হইতে আমোদ-প্রমোদের শেষ লালসাটুকুও মুছিয়া গিয়াছে; তথাপি, এই উৎসবযাত্রীগণ তাহা উপেক্ষা করিয়া আত্মসুখের ঘূর্ণানৃত্যে নটরাজের সম্বর্দ্ধনা করিয়াছে। 'নটীর পূজা' নামক নাটিকার মারফৎ রবীন্দ্রনাথের অন্তরবাসিনী নটীও জানাইয়াছে যে, এই গীতনৃত্যকলাই

তাহার ইষ্টদেবতার একমাত্র অর্চ্চনা-বিধি। কথাটি রবীন্দ্রনাথের পক্ষ হইতে অতিশয় সত্য—বিশ্বনৃত্যের উৎসবে চির-নিমগ্ন তাঁহার অত্যুচ্চ কবি-হৃদয়ের পরিচয় ইহাতে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। কিন্তু এই দেশে, এই কালে, জাতির এই অতি দুঃখের দিনে এমন ভাবে তাঁহার সেই মহনীয় আদর্শকে লোকসমাজে জাহির করিবার আকাঙ্ক্ষা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে শোভন হয় নাই। কালচারপ্রাপ্ত নরনারী কবি রবীন্দ্রনাথকেই শ্রদ্ধা করিলেও, তাঁহার মধ্যে যে মানুষটির স্পর্শ-লাভ করিবার জন্য সর্ব্বসাধারণ লালায়িত—শুধু মনোদেবতা নয়, যে দেহ-দেবতার সাক্ষাৎ পরিচয়ে আশ্বস্ত হইতে না পারিলে মানুষের প্রেম পরিতৃপ্ত হয় না—সেই মানুষটির সঙ্গে অন্তরের যোগস্থাপন পথে এই 'নটী' বড়ই বাদ সাধিয়াছে। তাই বলিতেছিলাম এ অনুষ্ঠানের উৎসাহে রবীন্দ্রনাথ যে-ভাবে আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন, তাহাতে দেশবাসীর চক্ষে তাঁহার মর্য্যাদাহানি হইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

প্রশ্ন উঠিতে পারে,—মানুষ হিসাবে বড় ও কবি হিসাবে বড়—এই দুই বড়ত্ব এক নহে। হয় ত' তাহাই যথার্থ! আমরা যাহাকে মনুষ্যত্ব বলি, কবির মনুষ্যত্ব তাহা হইতে এত উচ্চ যে তাহাকে আর মনুষ্যত্ব আখ্যাই দেওয়া যায় না—দিলে কবিকে ছোট করা হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গানে অসংখ্য বার যাহা বলিয়াছেন, নোবেলপ্রাইজ পাওয়ার পর হইতে যে উচ্চতর ভাবসাধনায় অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছেন, মহামানবের মিলন-ধর্ম্মের যে মহামন্ত্র তিনি ঋষির মত দর্শন করিতেছেন, তাহাতে রবীন্দ্রনাথকে সাধারণ মানুষের পর্য্যায়ভুক্ত করিলে তাঁহার প্রতি অবিচার করা হয়। তাঁহার মানুষ-জীবনের কাহিনীই বা আমরা কতটুকু জানি? সেই কাহিনীর প্রয়োজনও নাই। তাঁহার রচিত নাটকগুলিতে ও সে গুলির নৃত্যগীতাভিনয়ে আমরা রবীন্দ্রনাথের

যে ভাবমূর্ত্তি, যে কবি-চরিত্র প্রত্যক্ষ করি তাহাই তাঁহার একমাত্র পরিচয়। রবীন্দ্রনাথ আমাদের মত মানুষ নহেন, তিনি মহামানবের প্রতীক বিগ্রহ—এইরূপ সংস্কারই আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। দেশে যখন নূতন করিয়া ইতিহাসের আরম্ভ হইতেছে, জগতে যখন বহুতর মানব-গোষ্ঠী জীবন-ধারণ সমস্যায় উদ্‌ভ্রান্ত, মন্বন্তরের আসন্ন ধ্বংসলীলায় ধরণী যখন টলমল করিতেছে, তখন পৃথিবীর এক প্রান্তে আমাদের এই বাংলাদেশের দুঃস্থ জনসমাজেই, রোগ শোক অন্নাভাবের দারুণ বিভীষিকার মধ্যেই, যে কবি মহাকালের তাণ্ডব-তালে ত্রস্ত না হইয়া, তাহা হইতে নৃত্যগীতের কলাকৌশল আহরণ করেন, তিনি কত বড় কবি, স্বয়ং মহাকালের তিনি যে কত বড় অন্তরঙ্গ সখা, তাহাই মনে করিয়া আমরা ভক্তি-ভয়ে বিস্ময়-বিহ্বল হইয়া পড়ি। অতএব রবীন্দ্রনাথকে বুঝিতে হইলে সাধারণ মানবীয় সংস্কার বর্জ্জন করিতে হইবে ; রবীন্দ্র-জয়ন্তীর অনুষ্ঠান যাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের এই মাহাত্ম্য বিশেষ করিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন। এ অনুষ্ঠান যে ভাবে তাঁহারা সম্পন্ন করিয়াছেন তাহাতেও তাঁহারা যে সেই অলৌকিক প্রতিভা হইতে প্রেরণা লাভ করিয়াছেন, ইহাও অসম্ভব নহে।

'মানুষ-বনাম-কবি'র প্রসঙ্গে বহু মনীষীর বহুকাল প্রচলিত একটি অভিমত আজও কিন্তু ভুলিতে পারিতেছি না। 'খুব বড় মানুষ না হইলে খুব বড় কবি হওয়া যায় না'. 'কবি না হইয়াও খুব বড় মানুষ হওয়া যায়, কিন্তু খুব বড় কবি হইতে হইলে খুব বড় মানুষ হওয়া চাই—হইতেই হইবে'—এ কথা কি সত্য ? কিন্তু বড় 'মানুষ'—কিনা, 'মহাপ্রাণ'—তার পরিচয় কি কেবল কল্পনায় বা ভাবরূপের বিচিত্র সৃষ্টিলীলায় পাওয়া যায় না ? আমাদের মনে হয় উপরি-উক্ত

অভিমত যথার্থ নহে। কবি যদি তাঁহার মনুষ্যত্বকেও কবিত্বে ডুবাইতে না পারেন, তবে তাঁহার গৌরব কোথায়? সেক্‌স্‌পীয়ার একজন সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মত জীবন যাপন করিয়াছিলেন, তিনিও কায়মনোবাক্যে কবি হইতে পারেন নাই। তাঁহার জীবনে হয় ত' প্রাকৃতজনসুলভ হৃদয়ধর্ম্ম প্রবল ছিল; স্নেহ, প্রেম, লোভ, মোহ প্রভৃতি সাংসারিক দুর্ব্বলতা তাঁহারও নিশ্চয় ছিল, বিষয়বুদ্ধিও অল্প ছিল না। জগতের মহাকবিগণের মধ্যে এই সকল দোষাশ্রিত গুণের পরিমাণ কিছু অধিক ছিল বলিয়াই তাঁহাদিগকে শুধু 'বড় কবি' নয়, 'বড় মানুষ' হিসাবেও লোকে গণনা করিয়াছে—'কবি ও মানুষ', এই দ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষ অদ্বৈতবাদের পক্ষপাতী, তাই, এতদিন যাহা সম্ভব হয় নাই, আমাদের দেশেই আজ তাহা সম্ভব হইয়াছে; আমরা দ্বৈতহীন বিশুদ্ধ কবিপ্রকৃতির স্বরূপ দেখিয়াছি।

বিগত জয়ন্তী-উৎসবে আমরা রবীন্দ্রনাথের এই মাহাত্ম্য আরও নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করিয়াছি। কিন্তু একটা সংশয় তবুও রহিয়া গিয়াছে। এই উৎসবে যাহারা যোগদান করিয়াছিল, তাহারা কি কবিকে সেই লোকোত্তরচরিত্র মহামানব রূপে বুঝিতে পারিয়াছিল? জানি, এই উৎসবে যোগদান করিবার অধিকার সকলের ছিল না; থাকা সম্ভব নয়; সকলের মন-প্রাণ সেই উচ্চসুরে বাঁধা হইতে পারে না; তাই প্রবেশাধিকার ক্রয় করিবার সামর্থ্য সকলের হয় নাই। তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই; রবীন্দ্রনাথের জয়োচ্চারণ করিবার মত উৎকৃষ্ট কালচার, বাংলাদেশে কেন, কোনোদেশের জনসাধারণ এখনও অর্জ্জন করিতে পারে নাই। যেদিন এইরূপ উৎসব-শালার দ্বার অবারিত করা সম্ভব হইবে সে দিন জগতের এক মহাদিন;

সেদিন ধনী-নির্ধন-ভেদ ত' থাকিবেই না, ইতরভদ্র নির্ব্বিশেষে সর্ব্বমানবের মধ্যে মহামানবের আবির্ভাব হইবে। সেই 'সর্ব্বং খল্বিদং-ব্রহ্ম' যুগের স্বপ্নই রবীন্দ্রনাথ দেখিয়াছেন—উপনিষদের এই ঋষিবাক্য তখন আর পুঁথিগত হইয়া থাকিবে না—নিখিল মানব-গোষ্ঠীর মহামিলন-মন্ত্র রূপে তাহা আকাশ বাতাস প্রতিধ্বনিত করিবে; সেই অনতিদূর ভবিষ্যৎকে কবি নিজের ভাবজীবনে বর্ত্তমান-রূপে দেখিতেছেন বলিয়াই ত' তিনি এত বড় কবি। সে বিশ্বাসে যাহারা আশ্বস্ত হইয়াছে, অনুমান করি, তাহারাই এ যজ্ঞে প্রবেশ মূল্য সংগ্রহ করার সামর্থ্য রাখে, এবং সেই অতিশয় সাত্ত্বিক শ্রদ্ধার আবেগেই তাহারা 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' যাপন করিয়াছে। শোনা যায়, এই সকল উন্নতমনা, হৃদয়দৌর্ব্বল্যবর্জ্জিত, পুণ্যলোভাতুর তীর্থযাত্রীর সংখ্যা সেদিনের মহাসভায় প্রায় পাঁচ হাজার হইয়াছিল, এবং তাহারা এমনই ভক্তিবিহ্বল ভাবে ইহাতে যোগ দিয়াছিল, যে এত বড় সভায় এতটুকু কোলাহল হয় নাই। নৃত্যগীতাভিনয়েও নাকি একদিনও দর্শকগণের মধ্যে একটুকুও রসাস্বাদনবিমুখতার লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। রবীন্দ্র-ভক্তির এই অকাট্য প্রমাণে অবিশ্বাসীর দলও অবাক হইয়াছে। রবীন্দ্রজয়ন্তীর সাফল্যের ইহাই নাকি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। দেখা যাইতেছে, দেশ তাহা হইলে মরে নাই! এখনও এদেশে পরমানন্দের দিগ্বিজয়ে এত বড় 'মুক্তিসেনা' জগতের সম্মুখে সাজাইয়া ধরিতে পারে! কিন্তু এতখানি আশা-আশ্বাসের মধ্যেও অবিশ্বাসের বজ্রকীট আমাদের হৃদ্‌পিণ্ডে দংশন করিতেছে। কেবলই মনে হইতেছে, যাহারা উচ্চ-মূল্যের টিকিট কিনিয়া সভার শোভা ও নৃত্যগীতের পরাকাষ্ঠা উপভোগ করিতে গিয়াছিল, তাহারা থিয়েটার ও সিনেমাযাত্রী হইতে কোন্ অংশে শ্রেষ্ঠ? তাহারা এ আমোদে বিঘ্ন ঘটাইবে কেন—ঘটাইতেই

বা দিবে কেন? বিস্ময়ের কারণ যেটুকু আছে তাহা নূতন নহে, বাঙ্গালী চরিত্রের সেদিকটি বহুপূর্ব্বে বাঙ্গালীর কবি লক্ষ্য করিয়াছিলেন —"এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ, তবু রঙ্গ ভরা!"

কিন্তু আর একটি সংবাদ অনুধাবনযোগ্য। সেদিনের সভায় সেই সমবেত জনমণ্ডলী যে কত উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া আসিয়াছিল, তাহারা রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট বাণীমূর্ত্তিটিকে কেমন যথার্থভাবে অন্তরের মধ্যে চিনিয়া লইতে সক্ষম, তাহার প্রমাণ স্বরূপ, একজন উদারমনা, রবীন্দ্রভক্ত মুসলমান সাহিত্যিক বন্ধু আমাকে একটি ঘটনার কথা বলিলেন। সেদিন রবীন্দ্রনাথ যখন সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন জনতার মধ্যে কোথাও কোথাও 'বন্দে মাতরং' ধ্বনি উঠিয়াছিল, কিন্তু পরম আনন্দ ও আশ্বাসের বিষয় এই যে, সেই প্রাকৃতজনসুলভ নিকৃষ্ট মনোবৃত্তি মূলক বিশ্বমৈত্রীর বিরোধী জাতীয় হর্ষধ্বনি সে সভায় বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই; রবীন্দ্রনাথের বাণীর প্রতি শ্রদ্ধার এই সুস্পষ্ট নিদর্শনে বন্ধুবর মুগ্ধ হইয়াছেন। বলা বাহুল্য আমরাও ততোধিক আশ্বস্ত হইয়াছি। 'বন্দে মাতরং' ধ্বনি যে সে সভার পক্ষে কতখানি রসভঙ্গকর, তাহা সমবেত জনমণ্ডলীর অধিকাংশের অগোচর ছিল না। সে যজ্ঞে 'বন্দে মাতরং' ধ্বনি, যজ্ঞবিশেষে শিবনাম উচ্চারণের মত আশঙ্কাজনকও বটে। অতএব বন্ধুবরের এই উল্লাসে আমরা বিপরীত-ভাবেই আশ্বস্ত হইলাম, বুঝিলাম এই উৎসব-আনন্দের উৎস কোথায়,—রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে যাহারা সমবেত হইয়াছিল, জাতির সহিত প্রাণের যোগ তাহাদের কতটুকু!

কিন্তু আমরা যে রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা করি, না করিয়া পারি না! রবীন্দ্র প্রতিভার অন্তরালে যে ঐশীশক্তি রহিয়াছে তাহাকে অস্বীকার করিবার মত নাস্তিক যে আমরা নই! বাঙ্গালী তাহার ভাষায় ও

সাহিত্যে বিধাতার অকুণ্ঠিত আশীর্ব্বাদের মত এই যে বাণীবরপুত্রকে লাভ করিয়াছে,—যাঁহার কল্পনাবলে তার অন্তর-গহনের নিভৃত পূজা-গৃহে, বাঙ্গালীজীবন, বাংলাদেশ ও বাংলার প্রকৃতি নন্দন-পৌর্ণমাসীর শোভায় অভিষিক্ত হইয়াছে, যাঁহার সঙ্গীতের সহস্র সুরে জননান্তর-সৌহৃদ-স্মৃতির মত পুলক-বেদনা বাঙ্গালীকে অধীর করিয়াছে—বাঙ্গালী হইয়া কোন মুখে আমরা তাঁহার পূজায় পরাঙ্মুখ হইব? আমাদের বক্ষে সেই বাঙ্গালী-প্রাণ এখনও স্পন্দিত হইতেছে বলিয়াই জয়ন্তী-উৎসবের এই বিরাট প্রহসনে আমরা যোগ দিতে পারি নাই। যাহারা রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বকবিরূপে খাড়া করিতে না পারিলে তৃপ্তি পায় না, যাহারা দেশবিদেশ হইতে প্রশংসাপত্র ভিক্ষা করিয়া তাহাই সুবর্ণমণ্ডিত করিয়া কবিকে উপহার দেয়, তাহারা যে সর্ব্বতোভাবে বাঙ্গালীর জাতীয় মনোভাবের বিরুদ্ধাচরণ করিবে, ইহাই স্বাভাবিক। কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালীকে যাহা দিয়াছেন তাহাই যে তাঁহার প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান, তাঁহার জীবন ও জন্ম যে তাহাতেই সার্থক হইয়াছে, বাঙ্গালীও কৃতকৃতার্থ হইয়াছে—ইহা যাহারা বুঝিল না, তাহারাই বিশ্বের নামে কৃতজ্ঞ হইতে গিয়া বাঙ্গালীর পক্ষ হইতে রবীন্দ্রনাথের প্রতি ঘোরতর অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছে; এ অপরাধে যোগ না দিয়াই বাঙ্গালী জাতি ধন্য হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ছলে, জাতির এই দুর্দ্দিনে, তাহারা রবীন্দ্রনাথকে লইয়া যে-অভিনয়ের অনুষ্ঠান করিল, তাহাতে নিজেদের ক্ষতি করে নাই; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সত্তর বৎসর বয়সের যে দুর্ব্বলতার সুযোগ তাহারা লইয়াছে, তাহারা যেভাবে 'the last infirmity of the noble mind' দেশবাসীর চক্ষে প্রকটিত করিয়াছে, তাহাতে রবীন্দ্রনাথের জন্য দুঃখ হয়। জগতে যাহারা ছোট তাহারা বড়কে বড় থাকিতে দেয় না। এই উৎসবে দেশ কি

রবীন্দ্রনাথকে বরণ করিয়াছে? যে-অর্ঘ্য বাঙ্গালী জাতির নিকটে তাঁহার প্রাপ্য, বাঙ্গালী কি এই উৎসবে তাঁহাকে সেই অর্ঘ্য দিবার অবকাশ পাইয়াছে? রবীন্দ্রনাথ কি তাহাতে তৃপ্ত হইয়াছেন?—এ প্রশ্ন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করাও এক প্রকার নিষ্ঠুরতা। আজ উৎসবরজনী ভোর হইয়াছে; সেই প্রহরে-প্রহরে নৃত্যগীত ও অর্ঘ্যদানের অভিনয়-উন্মাদনা এখন শান্ত হইয়াছে; এখন এই প্রভাতের মত্ততা-নিবারণ আলোকে সেই উৎসব-স্মৃতি কি নির্ম্মল গ্লানিহীন বোধ হইতেছে? সেই জয়রবের প্রতিধ্বনি কি অট্টহাসির মত শুনাইতেছে না? মনে হইতেছে না—কোথায় এই অধঃপতিত জাতি, আর কোথায় আমি? হায় রবীন্দ্রনাথ! তুমি কেন এদেশে জন্মিয়াছিলে? আজ তোমার অবস্থা দেখিয়া বোধ হয় বিধাতার ললাটও ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিয়াছে!

—— —

প্রসঙ্গ-কথা

গত শ্রাবণের 'ভারতবর্ষে' 'মণ্টুকে' লেখা রবীন্দ্রনাথের দুইখানি পত্র ছাপা হইয়াছে। এইরূপ পত্রধারা-বর্ষণ আজকাল সর্ব্বত্র দেখা যাইতেছে; এগুলির মধ্যে যেখানে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বর্ত্তমান মনো-জীবনের পরিচয় কিঞ্চিৎ আল্‌গা ভাবে প্রকাশ করিয়া ফেলেন, সেইখানেই এইরূপ ধারা-বৃষ্টি পাঠকের মনে তাঁহার পরিচয়-ক্ষেত্রটি শ্যামল করিয়া তোলে। কিন্তু সব সময়ে তাহা হইবার যো নাই: আজকাল রবীন্দ্রনাথ নিজ জীবনের কেবল সূত্র নয়, টীকা-ভা[illegible]

লিখিবার ভারও লইয়াছেন—কবি রবীন্দ্রনাথ এখন দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ হইয়াছেন।

* * *

পঞ্চাশোর্দ্ধে বনে গিয়া 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'র চর্চ্চা কেবল সঙ্গত নয়, কর্ত্তব্যও বটে; কিন্তু যৌবনের পুষ্পোদ্যানটিকেও তথায় তুলিয়া লইয়া গিয়া চম্পক-শাখায় হরিতকী ফলাইবার চেষ্টা শুধুই হাস্যকর নহে, মিথ্যাচারও বটে। রবীন্দ্রনাথ যে অধুনা কবি হওয়া অপেক্ষা ঋষি হওয়ার দিকে ঝুঁকিয়াছেন তাহা আমরা জানি। কিন্তু সেই সঙ্গে, ষোল বৎসর বয়স হইতে সত্তর পর্য্যন্ত তিনি যে কেবল ব্রহ্মজিজ্ঞাসাই করিয়াছেন, এই কথাটি আমাদিগকে বিশ্বাস করাইবার জন্য এ সাধ্য-সাধনা কেন? রবীন্দ্রনাথ 'মণ্ট'কে পত্রচ্ছলে লিখিয়াছেন—

...ঐইটুকু নিঃসন্দেহে পাওয়া গেল যে, আমি কবি। কিন্তু কবি বল্‌লেও সংজ্ঞাটা অসম্পূর্ণ থাকে। কবির প্রেরণা কিসের, এবং তার সাধনার শেষ ঠিকানাটা কোনখানে এরও একটা পরিষ্কার জবাব চাই। সে-ও আমি জানি। আমার সব অনুভূতি ও রচনার ধারা এসে ঠেকেছে মানবের মধ্যে। বার বার ডেকেছি দেবতাকে, বার বার সাড়া দিয়েছেন মানুষ, রূপে এবং অরূপে, ভোগে ও ত্যাগে। সেই মানুষ ব্যক্তিতে এবং মানুষ অব্যক্তে।

—এ যে কেমন 'মানুষ' তাহা বুঝাইবার ক্ষমতা বা অধিকার আমাদের অবশ্য নাই, যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্মবাদ ও জীববাদ যিনি ব্যাখ্যা করিতেছেন তাঁহার উপরেই ইহার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চাই।

* * *

"কবির প্রেরণা কিসের, এবং তাহার সাধনার শেষ ঠিকনাটা কোনখানে এরও একটা পরিষ্কার জবাব চাই"—তারই জবাবে রবীন্দ্রনাথ

এই কথাগুলি বলিয়াছেন। জবাবটি যে পরম উপাদেয় সে বিষয়ে আশা করি দুই মত হইতে পারে না, কিন্তু জবাবটিতে বড় বিলম্ব ঘটিয়াছে। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে যাহারা তাঁহার কাব্য পড়িয়াছিল তাহারা নিশ্চয়ই এ রহস্য জানিত না। তবে কি, কবির 'সাধনার শেষ ঠিকানা' না জানায়, 'কবির প্রেরণা কিসের' তাহা সম্যক বুঝিতে না পারিয়া, তাহারা কাব্যরস-আস্বাদনে বঞ্চিত ছিল? তাহারা যখন যে কবিতা পড়িয়াছে সেই কবিতার প্রেরণা কবিতাকেও অতিক্রম করিয়া কবির নিজস্ব ব্যক্তিগত সাধনায় কোথায় গিয়া পৌছিবে—সে সংবাদের অপেক্ষা তাহারা কি রাখিত? না এক একটি কবিতার মধ্যে যে রসসৃষ্টি সম্পূর্ণ হইয়া আছে তাহাতেই তাহারা পরিতৃপ্ত হইত? কবির এই দুর্দ্দম ঋষিত্ব প্রেরণার পরিচয় যাহারা পায় নাই, কোন্ ঘাটে তাঁহার তরী আসিয়া ভিড়িয়াছে তাহা জানিবার সুযোগ যাহাদের হয় নাই—যাহাবা ইতিমধ্যেই ভবলীলা সাঙ্গ করিয়াছে, সেই দুর্ভাগাগণ কি অন্ধকারেই ঘুরিয়া মরিল! রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাগুলি যে ফলের ফুল সেই ফল যখন তাহারা দেখিল না, তখন ফুলের গন্ধ-মধুর কি অসম্পূর্ণ পরিচয়ই তাহারা পাইয়াছে! রবীন্দ্রনাথের সব অনুভূতির ধারা যে-মানবের মধ্যে আসিয়া পৌছিয়াছে সে মানব তখনও প্রকট হইয়া উঠেন নাই—উঠিলে, কি ভূমানন্দই তাহারা ভোগ করিতে পারিত! তাহারা 'রবীন্দ্রনাথ'-কাব্যের প্রথম কয়েক পৃষ্ঠাই পড়িয়াছে; একটিও সম্পূর্ণ কবিতা পড়ে নাই—সে সকল কবিতা বিচ্ছিন্ন পংক্তি মাত্র। এক কথায় রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, কবিতা পড়িলে হইবে না, আমাকে পড়; আমার শেষ না পাইলে আমার কবিতার শেষ পাইবে না।

*　　　*

কবি একটি দৃষ্টান্তও দিয়াছেন।—

বহুকাল আগে 'কড়ি ও কোমলে'র যে একটি কবিতায় লিখেছিলুম—

"মানুষের (sic) মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।"

তার মানে হচ্চে এই মানুষ যেখানে অমর সেইখানেই বাঁচতে চাই। সেই জন্যই মোটা মোটা নামওয়ালা ছোট ছোট গণ্ডীগুলোর মধ্যে আমি মানুষের সাধনা করতে পারি নে। স্বাজাত্যের খুঁটাগাড়ি করে' নিখিল মানবকে ঠেকিয়ে রাখা আমার দ্বারা হ'য়ে উঠ্‌ল না, কেন না অমরতা তাঁরই মধ্যে যে-মানব সর্ব্বলোকে। আমরা রাহুগ্রস্ত হয়ে মরি যেখানে নিজের দিকে তাকিয়ে তাঁর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াই।

—'তার মানে হচ্ছে'—শুন্‌লেই ভয় করে! কবি এখন একাধারে কালিদাস ও মল্লিনাথ। সত্তর বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিলে কবিকেও কি এমন মরা মরিতে হয়! এ ত' কবি নয়—এ যে মানবানন্দ স্বামী! রবীন্দ্রনাথের কি একবারও মনে হইল না যে তিনি বুড়া হইলেও তাঁহার কবিতা বুড়া হয় নাই? সেই চির-যৌবনা অপ্সরীকে এমন করিয়া নিজের সঙ্গে সহমরণে বাঁধিতে চাহিলে সে শুনিবে কেন? 'কড়ি ও কোমলে'র ঐ কবিতাটির উপর অত্যাচার না করিয়া তাঁহার আধুনিক কালের কোনও শুক্লকেশিনীকে বাছিয়া লইলেই ত' ভালো হইত! কিন্তু তিনি যে প্রমাণ করিতে চান—কবিতার হবিষ্যান্নই তিনি আজীবন পাক করিয়াছেন! হায় 'মানব'! তুম তখন 'প্র'ে খেলায় তরঙ্গিত' হইতে—'বিরহ মিলন কত হাসি অশ্রুময়'! তুমি ত' তখন 'নিখিল-মানব' হইয়া উঠিতে পারো নাই। বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের এই 'নিখিল-মানব' বহুবচন নয়, খাঁটি একমেবাদ্বিতীয়ং, যথা—"আমরা রাহুগ্রস্ত হয়ে মরি যেখানে নিজের দিকে তাকিয়ে তাঁর দিকে পিছন ফিরে দাড়াই"। এ সেই ব্রহ্মণ্—একেবারে neuter gender। "স্বাজাত্যের খুঁটিগাড়ি ক'রে এঁকে ঠেকিয়ে রাখা" তাঁর অসাধ্য।

কবির মনে আজকাল স্বাজাত্যের বিভীষিকা এতই বেশি যে, পাছে, মানুষকে ভালোবাসার কথায় স্বদেশ-বিদেশের কথাও আসিয়া পড়ে, তাই সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে পিণ্ডীভূত করিয়া তাহার ব্রহ্ম-নির্য্যাসটুকুই তিনি পেটেণ্ট করিয়া লইয়াছেন।

*　　　*　　　*

'কড়ি ও কোমলে'র সেই কবিতাটি নাকি এই ব্রহ্ম-নির্য্যাস-ভরা একটি শিশি। পাঠকগণ মূল কবিতাটি পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন।—

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্য্যকরে এই 　পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই।
ধরায় প্রাণের খেলা চির তরঙ্গিত.
বিবাহ মিলন কত হাসি অশ্রুময়,—
মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সঙ্গীতে
যদি গো রচিতে পারি অমর আলয়।
তা যদি না পারি তবে বাঁচি যতকাল
তোমাদেরি মাঝখানে লভি যেন ঠাঁই,
তোমরা তুলিবে ব'লে সকাল বিকাল
নব নব সঙ্গীতের কুসুম ফুটাই।

*　　　*

'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে', 'এই সূর্য্যকরে, এই পুষ্পিত কাননে', 'জীবন্ত হৃদয় মাঝে', 'মানবের সুখ দুঃখে', 'তোমাদেরি মাঝখানে'—এ সকলের 'মানে হচ্ছে'—'মানুষ যেখানে অমর সেইখানেই বাঁচতে চাই। কেন না, অমরতা তাঁরই মধ্যে যে-মানব 'সর্ব্বলোকে',— 'এই সূর্য্যকরে এই পুষ্পিত কাননে' নয়! 'জীবন্ত হৃদয় মাঝেও' নয়,

কারণ তাহা হইলে যে সত্যই মরিতে হইবে—'জীবন্ত হৃদয়' ত জীবন্ত বলিয়াই একদিন মরিতে বাধ্য। 'তা যদি না পারি তবে বাঁচি যতকাল, তোমাদেরি মাঝখানে লভি যেন ঠাঁই'—এ কথারও বোধ হয় অর্থ—'যেখানে মানুষ অমর সেইখানে'। অপূর্ব্ব!

* * * *

কিন্তু এ রোগের কি ঔষধ আছে? রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, তিনি যাহার জনক তাহাকে গলা টিপিয়া মারিবার অধিকারও তাঁহার আছে। এককালে মানুষকে মানুষের চক্ষে দেখিয়া, মানুষের প্রেমকেই মহিমান্বিত করিয়া, নির্ব্বিশেষ নিখিল-মানবের পরিবর্ত্তে এই দেহধারী বিশেষ-দেবতার বন্দনা করিয়া তিনি যে পাপ-কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহার দায়িত্ব কি এমনই করিয়া অস্বীকার করা যায়? এই আত্ম-পরায়ণতার মোহে তিনি তাঁহার এককালের যথার্থ কবিত্বের উপর আজকাল যে অত্যাচার সুরু করিয়াছেন, তাহাতে আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। পুরানো নাটকগুলিকে ক্রমাগত ভাঙ্গিয়া যে ভাবে তাহাদের মুণ্ডপাত করিতেছেন তাহাতে কাহার না দুঃখ হয়? এখন আবার সেকালের কবিতাগুলিরও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, তাঁহার নিজেরই সেই ভবিষ্যৎবাণী বুঝি বা সত্য হইল!—

> পরজন্ম সত্য হ'লে
> কি ঘটে মোর সেটা জানি,
> আবার আমায় টান্‌বে ধ'রে
> বাংলাদেশের এ রাজধানী।

* * *

যে বইখানি পড়বে হাতে
দগ্ধ করব পাতে পাতে,
আমার ভাগ্যে হ'ব আমি
দ্বিতীয় এক ধূম্রলোচন।
আমায় হয় ত' করতে হবে
আমার লেখা সমালোচন।

অতএব সাধু সাবধান! রবীন্দ্রনাথের যে জন্মান্তর ঘটিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এখন রবীন্দ্রনাথের হাত হইতেই রবীন্দ্রনাথের লেখাগুলিকে বাঁচাইবার জন্য সকলের অবহিত হইতে হইবে!

২

এবারকার একটা অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, তিনি কবি—আনন্দদানই তাঁহার কাজ, অতএব প্রতিদানে কেবল প্রেমই তাঁহার প্রাপ্য। বড় ভালো কথা। আদান-প্রদানের দুই দিকই বেশ সরল সহজ নয় কি? কাব্য যাহার ভালো লাগে সেই কবিকে ভালবাসে। ইহার অর্থ কিন্তু ইহাই নয় যে, কবিকে কাব্য হইতে পৃথক করিয়া ভালোবাসিতে হইবে। কাব্যের মধ্যে যদি কবিই ব্যক্ত হন, মানুষটি অব্যক্ত থাকেন, তাহা হইলে আনন্দও যেমন সুলভ হয়, প্রতিদানে ভালবাসাও তেমনি সহজ হইয়া উঠে। কিন্তু অব্যক্ত মানুষটি যেখানে বেশীমাত্রায় ব্যক্ত হইতে চান, এবং কাব্যের বাহিরেও যদি ব্যক্তিটি নানা ভঙ্গিতে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন, তাহা হইলে এই প্রেম অবিচলিত থাকিতে পারে না। আবার যদি কবির সঙ্গে ব্যক্তিটিকেও অভিন্ন করিয়া ভালোবাসিতে হয় তাহা হইলে অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে বাধা বিস্তর। কারণ, যে দিক দিয়াই হোক, ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে ভালোবাসা সম্ভব হইলেও রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁহার সেই

ব্যক্তিত্বকে এমন 'অব্যক্ত' করিবার পক্ষপাতী—শুধু ব্যক্তি-প্রেম নয়, স্বাজাত্যবোধকেও অস্বীকার করিয়া তিনি যে 'নিখিল-মানবে'র ধ্যানে নিমগ্ন, সেখানে মানবীয় সংস্কারের ভালোবাসা পৌঁছিতে পথ পায় না। এমত অবস্থায় কাব্যগত কবিটিকে ধরি-ধরি করিয়াও ধরা যায় না। তিনি নিজ কাব্যের যে টীকা-ভাষ্য প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে সে কাব্যে মানুষের পাঞ্চভৌতিক সত্তাই লোপ পাইতে বসিয়াছে। এ অবস্থায় প্রেম যে পথ খুঁজিয়া পায় না! কবিকে ভালোবাসা আগেকার কালে সহজ ছিল; কারণ তখন কবিতার লোকেই কবির পরিচয় নিবদ্ধ ছিল—সে কবিতায় কোনও আধ্যাত্মিক মতবাদ, কোনও স্বতন্ত্র আদর্শ-সাধনা, কোনও ব্যক্তি-ধর্ম্মের ঘোষণা থাকিত না।

* * *

রবীন্দ্রনাথ যে প্রেম দাবী করিয়াছেন, তাহা কবি-ব্যক্তির প্রতি প্রেম বলিয়াই মনে হয়। কাব্যে যিনি আনন্দ বিতরণ করিয়াছেন তিনি অবশ্যই কবি—কিন্তু সেই আনন্দের প্রতিদানে যিনি প্রেম চাহিয়াছেন, তিনি নিশ্চয় কেবল কবি নহেন, মানুষও বটে, এ প্রেম সেই ব্যক্তির প্রতিই প্রেম বলিয়া বুঝিতে হইবে। ভালোবাসিতে হইলে রক্তমাংসের মানুষ চাই—উভয় পক্ষেই। কবি আনন্দ দেন বলিয়াই, কবি-ব্যক্তিটিকে প্রেম করার প্রয়োজন হয় না—কবি-ব্যক্তির সহিত কাব্যের কবিমানসের কোনও সম্পর্ক নাই; তাই কবিতা ভালো লাগে বলিয়া মানুষটিকেও ভালো লাগিবে এমন কোনও কথা নাই। দেখা যায় যাহারা এই কবি মানুষটিকে লইয়াই নাচে তাহারাই কবিতার ভাবনা সব চেয়ে কম ভাবে। আবার ইহাও দেখা যায়, যে কবি যত যথার্থ কবি তিনি জন-সমাদরে তত উদাসীন। রবীন্দ্রনাথও

যদি এই জন-সমাদরই বিশেষ করিয়া চাহিতেন, তবে নিশ্চয়ই তিনি এত বড় কবি হইতে পারিতেন না। কিন্তু আজ তাঁর সেই কবিশক্তি ক্ষীণ হইয়াছে, তাই জনসমাদরের প্রতি তাঁহার লোভ আর চাপা থাকিতেছে না। কে কোথায় তাঁহার কবিতার ছল ধরিতেছে, কাহারা তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে না বলিয়া ভয় দেখাইতেছে, কোন দলকে অগ্রাহ্য করিয়া কোন দলের প্রীতি সাধন করিতে হইবে—এই সকল ভাবনা তাঁহাকে ক্লিষ্ট করিতেছে। তিনি এখন নিজ কাব্যের মূল্য নিজেই নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে, সে কাব্যের আদি ও শেষ প্রেরণার সঙ্গতি সাধন করিতে, সকল কালের সকল কবিতায় সেই এক ঋষি-মন্ত্রের বিকাশ বুঝাইয়া দিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

* * *

জানি, অনেকেই বলিবেন, রবীন্দ্রনাথ যদি তাঁহার কবিকর্ম্মের পুরস্কার স্বরূপ দেশের কাছে একটু প্রেমই দাবী করিয়া থাকেন, তাহাতে এত কথা বলিবার প্রয়োজন কি? কবির পক্ষে এটুকু দুর্ব্বলতা কি অতিশয় স্বাভাবিক নয়? কিন্তু যাঁহারা উক্ত প্রতিভাষণটি ভালো করিয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন কথাটা শুধু ইহাই নয়। রবীন্দ্রনাথ জানেন, তিনি দেশবাসীর হৃদয়ে আশানুরূপ প্রীতির উদ্রেক করিতে পারেন নাই; এবং ইহাও আমরা জানি যে তিনি তাঁহার কাব্যের যথার্থ সমালোচনা পছন্দ করেন না। তাঁহার অভিভাষণের একস্থলে ইহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিতও আছে। প্রথমটির সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, তাঁহার কাব্যে জনমন-মোহিনী কল্পনার অবকাশ খুবই অল্প—কাব্যে যে হৃদয়-ঘনিষ্ঠ ভাব-সংস্কারের আন্দোলনে সাধারণ মানুষের প্রাণ সাড়া দেয়, সেই স্থূল সুখ-দুঃখ হর্ষ-শোক তাঁহার কাব্যের প্রধান প্রেরণা নয়; একারণ, যে জন-সমাদর তিনি আকাঙ্ক্ষা করেন

তাহা তাঁহার প্রাপ্য নয়। সেজন্য দুঃখ করাও উচিত নহে। কবিকে মানুষ ভালোবাসে যে গুণে, ঠিক সেই গুণ তাহার কাব্যে নাই; কিন্তু কবিতাকে ভালোবাসিবার মত যথেষ্ট গুণ তাঁহার কাব্যে আছে—সে ভালবাসা প্রেম নয়, সূক্ষ্ম রসবোধের অপেক্ষা রাখে। অতএব যাহারা তাঁহার কাব্যকে ভালোবাসে তাহারা যথার্থই কাব্য-প্রেমিক। কিন্তু এ ভালোবাসা ব্যক্তি-সম্পর্কের ভালোবাসা নয় বলিয়াই তাহারা তাঁহার কবিতাকে তাঁহার কবিতা বলিয়াই ভালবাসিবেন না—তাঁহার সকল কবিতাই নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিবে না। তাহাতে যদি কবির প্রতি প্রেমের অভাব প্রকাশ পায় তাহাতে কবির আত্মাভিমানে আঘাত লাগিতে পারে, কিন্তু চিরন্তনী কাব্যসুন্দরীর তাহাতে কোনও অমর্য্যাদা হইবে না।

* * *

একটা দৃষ্টান্ত দিব। রবীন্দ্রনাথের 'এবার ফিরাও মোরে' নামক কবিতাটি একটি অতি উৎকৃষ্ট ও জন-প্রিয় কবিতা বলিয়াই আমরা জানি। এই কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের কল্পনাভঙ্গী, তাঁহার জন্মগত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, একটা ভাব-বিরোধের মধ্যে পড়িয়া আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কবিতাটি জন-প্রিয় হইবার কারণ, উহার কতকগুলি পংক্তিতে তিনি বাস্তব জীবনের দুঃখ-দুর্দ্দশার ওজস্বিনী বর্ণনা সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, এবং তাহার প্রতি গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন।—

> ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির
> মূক সবে,—ম্লানমুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
> বেদনার করুণ কাহিনী, স্কন্ধে যত চাপে ভার
> বহি' চলে মন্দগতি, যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার,—

তারপর সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি',
নাহি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি',
মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান,
শুধু দুটি অন্ন খুঁটি' কোন মতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া! সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে,
সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্ব্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে,
নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে,
দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে
মরে সে নীরবে। এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা;

শুনিলে মানুষমাত্রেরই হৃদয় সাড়া দেয়, মনুষ্যত্ব-পিপাসা জাগে। কবি তাঁহার নির্জ্জন-বাসিনী আত্ম-মুগ্ধা কল্পনাকে জনতাজীবনের দিকে ফিরাইবার জন্য কবিতা-লক্ষ্মীর নিকট আকুল প্রার্থনা জানাইয়া এই কবিতাটি আরম্ভ করিয়াছেন। বেশ বুঝা যায়, ব্যক্তিগত আদর্শের সজ্ঞান সাধনায় তিনিও মাঝে মাঝে কুণ্ঠা বোধ করেন; তাঁহার গান যেন অতি উচ্চ ভাবসাধনাতেই নিঃশেষ না হয়, বাস্তব জীবন-সংগ্রামে তাহা যেন মানুষের প্রাণে আশা উৎসাহ ও শক্তি সঞ্চার করে—এমন ইচ্ছাও হয়। কিন্তু, এই কবিতাটিতেই আমরা দেখিতে পাই, এ প্রবৃত্তি তাঁহার কবিতার পক্ষে সম্ভব নয়; তাঁহার সে প্রেরণা অতি শীঘ্র নিঃশেষ হইয়া যায়; কিয়ৎক্ষণ মাত্র এই বাস্তব দুঃখ দুর্দ্দশার কথা, এই আর্ত্তত্রাণ-ব্রতের মানব-প্রেম ঘোষণা করিয়া তাঁহার কবিতা আবার সেই ব্যক্তি স্বপ্ন, সেই লোকাতীত আদর্শচর্য্যা, সেই 'বিশ্বপ্রিয়া' ও 'নিরুপমা সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মী'র ধ্যানে এই ধরা ছাড়িয়া উর্দ্ধস্বর্গে উন্মার্গগামী হয়। কোথায় বাস্তবজগতের বাস্তব দুঃখের প্রতিকার-বাসনা, আর কোথায়

সুদূরনক্ষত্রলোকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া কেবল আত্মগত আদর্শের সত্য-নিষ্ঠাভিমানের জয়যাত্রা!—

মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে, সত্যের করিয়া ধ্রুবতারা।
মৃত্যু'রে করি না শঙ্কা! দুর্দ্দিনের অশ্রু জলধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি—তারি মাঝে যাব অভিসারে
তার কাছে,—জীবনসর্ব্বস্ব ধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি'! কে সে? জানি না কে! চিনি নাই তারে
শুধু এইটুকু জানি—তারি লাগি' রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানব যাত্রী যুগ হ'তে যুগান্তর পানে

ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর-প্রদীপ খানি!

কিন্তু কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কবি বলিতেছেন—

সম্মুখেতে কষ্টের সংসার,
বড়ই দরিদ্র, শূন্য, বড় ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার!—
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু,...

অথচ ইহার জন্য তিনি মানুষকে যে আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে চান তাহাতে জনহিতৈষণা অপেক্ষা সৌন্দর্য্য সাধনার আত্মনিষ্ঠা অথবা আধ্যাত্মিক সত্য-পিপাসার আবেগেই প্রবল। এই সকল মূঢ় মূক ম্লান মুখে অন্ন তুলিয়া দিবার পক্ষে,—প্রাণ, স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু প্রভৃতি লাভের পক্ষে,—খৃষ্ট, চৈতন্য, বুদ্ধ, গ্যালিলিও, লুথারের সত্য-সাধনা কতখানি উপযোগী? সে সকল মহাপুরুষের নৈতিক বা আধ্যাত্মিক চরিত্র-মহিমা মানুষের জীবনকে যেদিক দিয়া যে

ভাবে অনুপ্রাণিত করে, সাংসারিক দুর্দ্দশা-মোচনের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ কতটুকু? 'সম্মুখেতে যে কষ্টের সংসার' রহিয়াছে তাহার কল্যাণ সাধন করিতে হইলে কি এইরূপ সত্যসাধনার পন্থাই উপযুক্ত? বরং এই একটি অতি সহজ সত্য আমরা জানি যে, মানুষের দুঃখমোচনব্রত যিনি গ্রহণ করেন, তাঁহার কাছে এই প্রত্যক্ষ নর-মূর্ত্তি ছাড়া আর কোনও নারায়ণ থাকিতে পারে না, তাঁহার কাছে 'বিশ্বমানব' 'বিশ্বজীবন' বা 'বিশ্বপ্রিয়া' প্রভৃতি যাবতীয় ধারণা কল্পনাবিলাস মাত্র, তিনি নিজ ইষ্টদেবতার সাযুজ্যলাভ বা কোনওরূপ স্বর্গ কামনা করেন না—'নিরুপমা সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর ধ্যানও করেন না। তাঁহার একমাত্র প্রার্থনা হয় এই—

ন ত্বহং কাময়ে রাজ্যং ন স্বর্গং ন পুনর্ভবং।
কাময়ে দুঃখতপ্তানাং প্রাণীনামার্ত্তিনাশনং॥

* * *

অতএব দেখা যাইতেছে, এই কবিতাটি যেন পূর্ব্বমুখে যাত্রা আরম্ভ করিয়া, সহসা মধ্যপথে পশ্চিমমুখে ফিরিয়াছে; অর্থাৎ যেদিকে ছিল সেই দিকেই ফিরিয়া গিয়াছে। 'এবার ফিরাও মোরে—' কবির এ আবেদন তাঁহার কাব্যলক্ষ্মী মঞ্জুর করেন নাই। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই, বরং কবিকল্পনা এখানে স্বধর্ম্মই পালন করিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া, এই কবিতাটির মধ্যে যে সুস্পষ্ট ভাব-বিরোধ ঘটিয়াছে, তাহাতে ইহাকে একটি সুপরিকল্পিত, সুসম্বদ্ধ বা সুসম্পন্ন কবি-কীর্ত্তি বলা যায় না। কিন্তু না বলিলেও রক্ষা নাই। উহার মধ্যে কত ভালো ভালো sentiment, উৎকৃষ্ট বাক্যবিন্যাস এবং অপূর্ব্ব ছন্দ-ঝঙ্কার রহিয়াছে তাহাতে কোন্ বাঙ্গালী পাঠক মুগ্ধ না হইবে?

যে মুগ্ধ না হয় সে শুধুই হতভাগ্য নয়, দুর্ব্বৃত্তও বটে—রসের আবার বিশ্লেষণ করে! কাব্যরস যে ফুলের গন্ধের মত, তাহা কি বুঝিবার বা বুঝাইবার? কবিতায় ভাব-বিরোধ হইলই বা! সকল ভাব কি সেই এক রসে গিয়া মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যায় না? তা' ছাড়া কবি যদি বড় কবি হ'ন, তাহা হইলে তাঁহার সকল কবিতাই বড় কবিতা। এমন করিয়া সমালোচনা করিলে কবিকে প্রেম করা হয় না।

* * *

এই প্রেম-নিবেদনের প্রসঙ্গে সবশেষে একটা কথা বলিব। রবীন্দ্রনাথকে এ যুগের বাংলা-সাহিত্যিক যে প্রেম নিবেদন করিয়াছে, তার তুল্য প্রেম আর কোন্ কবি পাইয়াছেন? আর কোন্ সাহিত্যে এক যুগ ধরিয়া আর কোন্ কবির—'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' এই অকথিত বাণী এমন ভাবে প্রতিপালিত হইয়াছে? রবীন্দ্রোত্তর বাংলাসাহিত্য রবীন্দ্রনাথের চরণে নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়াছে—সে সাহিত্যের আর কোনও ধর্ম্ম নাই, সে রবীন্দ্রময় হইয়াছে; তাই একালের বাংলাসাহিত্য সেই সকল সাহিত্যিকগণের মুখ দিয়া যথার্থই বলিতে পারে—'ও গো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ, আরও কি তোমার চাই!'

৩

রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকিয়াছেন; শুধু আঁকা নয়—আঁকিয়া জগতের গুণী সমাজে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। রবীন্দ্র-প্রতিভার ইহা বিকাশ না বিবর্ত্তন?—বিস্ময়ের যে আর সীমা রহিল না! যতগুলি কলা ছিল, ক্রমে ক্রমে প্রায় সবগুলিই রবীন্দ্র-প্রতিভাশশীর তিথিতে তিথিতে পূরিয়া উঠিয়া এতদিনে কি ষোলকলা সম্পূর্ণ হইয়া পৌর্ণমাসী দেখ

দিল ? না কৃষ্ণপক্ষের রবীন্দ্রশশী একে একে সকল কলাগুলি ত্যাগ করিয়া শেষ কলায় আসিয়া ঠেকিয়াছে ?—'কলামাত্রশেষাং হিমাংশোঃ' ! আমরা প্রার্থনা করি, ইহাই যেন শেষ কলা না হয় ; মূর্ত্তি ও বাস্তু এই দুইটি কলা এখনও বাকি আছে, আশা হয় এ দুইটিও বাদ যাইবে না, অন্ততঃ বাস্তব-কলাটি।

কিন্তু আমাদের শ্রেষ্ঠ কবির এই চিত্রকলানুশীলন, তেমন চমকপ্রদ হইতে পারিল না। কিছুকাল আগে ভিক্টর হিউগোর একখানি ছবির বহি দেখিয়াছিলাম ; এতকাল পরে তাহা প্রকাশিত হওয়ায় য়ুরোপের গুণীসমাজে একটা হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। তার পরেই রবীন্দ্রনাথের এই ছবিগুলি, কাজেই মনে হয় কবিমহলে অতঃপর এটা একটা ফ্যাশন হইয়া দাঁড়াইল। আমাদের কবিও ভিক্টর হিউগো হইলেন, দুঃখ আর রহিল না।

* * *

ভিক্টর হিউগো বা রবীন্দ্রনাথ যদি ছবি আঁকেন, তবে সেটা ছবিরই সৌভাগ্য বলিতে হইবে, তাহাই তাহার গৌরব। অতএব এসকল ছবির মর্ম্ম যাহাই হোক—চিত্রকলার যে অভিনব ভঙ্গিই তাহাতে ফুটিয়া উঠুক—সেইটাই বড় কথা নয় : মহাকবিগণের চিত্রাঙ্কন-বিলাস হিসাবেই তাহা অধিকতর মূল্যবান, আশা করি একথা কেহ অস্বীকার করিবেন না। ভিক্টর হিউগো ছবি আঁকিয়াছিলেন—সে ছবি যতই ভালো হউক, তাহার কথা এতদিন অপ্রকাশ ছিল ; সেগুলিকে কবি বোধ হয় নিজেই পরিচয়-যোগ্য মনে করেন নাই, তাঁহার কবিপ্রতিভার পার্শ্বে এই চিত্র-প্রতিভাকে স্থান দিতে বোধ হয়, তাঁহার নিজের মনেই সঙ্কোচ বোধ হইয়াছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই—তিনি তাঁহার ছবিগুলিকে জগতের সমক্ষে বিশেষ

করিয়া প্রকাশ করিতে উৎসুক। হিউগো অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের সাহস বেশি, কারণ তিনি এ যুগের মানুষ; এ যুগে সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তির আত্মপ্রকাশই পরম ধর্ম্ম। রবীন্দ্রনাথ এতকাল ছিলেন আধুনিক, এখন অতি-আধুনিক হইয়াছেন—এই ছবিগুলি প্রকাশ করিয়া তিনি যুগধর্ম্মকে বরণ করিয়াছেন।

* * *

আমরা এই ছবিগুলি সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করিব—সমাজদার হিসাবে নয়, সে অধিকার আমরা দাবী করি না। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ অথবা নন্দলাল বসু মহাশয় সে কাজ করিলে ভালো হয়। এতদিন তাঁহারা সে কর্ত্তব্য করেন নাই বলিয়া যে অনর্থ ঘটিতেছে, আমাদের মন্তব্যে পাঠকগণ তাহারই কিছু নমুনা পাইবেন। অনধিকার-চর্চ্চা বটে, কিন্তু উপায় নাই, আমাদেরই মত অজ্ঞ সমাজে একটা আলোচনা করিতেছি, না করিলে ভাল দেখায় না যে! একটা জিনিষ আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, এই ছবিগুলির সম্বন্ধে যেখানে যেটুকু আলোচনা আমাদের চোখে পড়িয়াছে তাহা কেমন যেন ভাসা-ভাসা, শূন্যগর্ভ প্রশংসা ছাড়া, এগুলির বিশিষ্ট শিল্প-প্রেরণা বা অঙ্কন-রীতির কোনও বিচার-সম্মত ব্যাখ্যা তাহাতে নাই। কবিকে যেটুকু বুঝিয়াছি—চিত্রকরকে সেটুকুও বুঝিবার উপায় নাই!

* *

আমাদের মনে হয় (আপনারা শুনিয়া নিশ্চয়ই হাসিবেন), রবীন্দ্রনাথ সকলকে লইয়া একটু মজা করিতেছেন। আজিকার দিনে বিদ্যাবুদ্ধি ও রসজ্ঞতার প্রমাণ এতই সূক্ষ্ম—যে তাহার অভাব বা সদ্ভাব নির্দ্দেশ করা সত্যই দুরূহ। কালোকে সাদা, এবং সাদাকে কালো বলিতে

পারাই সবচেয়ে বাহাদুরী। এ হেন সমাজে খ্যাতিজিনিষটা যে কত উপায়ে কত রকমে আদায় করা যায়—যাহারা অতিশয় চতুর তাহাদের সেই অতিচাতুরী দ্বারাই তাহাদিগকে কেমন পরাস্ত করা যায়—পরম-পরিহাস-রসিক রবীন্দ্রনাথ, বোধ করি, তাহাই প্রমাণ করিতেছেন। যাঁহার কবি-খ্যাতি একটা এত বড় মূলধন, তাঁহার নামে credit-এ আর সকল প্রকার খ্যাতিও সহজলভ্য। যাহার মুখ সুন্দর, তাহার মুখ-বিকৃতিও সুন্দর না হইয়া পারে না।

* * *

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় আমাদের এ অনুমান সমর্থন করিবেন না। তিনি এই ছবিগুলির সম্বন্ধে যে সব কথা নিজেই বলিয়াছেন তাহাতে হাস্যরসচর্চ্চার আভাস আদৌ নাই। বিদেশে তিনি খুব গম্ভীর ভাবেই তাঁহার চিত্রগুলির মূল্য ঘোষণা করিয়াছেন—সেগুলি নাকি কবিতা অপেক্ষাও তাঁহার বাণীকে আরও সার্ব্বজনীন করিবার উপযোগী; সেগুলির ভিতর দিয়া য়ুরোপ তাঁহাকে আরও প্রত্যক্ষ ভাবে পাইবে! কিন্তু আমাদের এখানে তিনি যে কথাটি হাস্যচ্ছলে বলিয়াছেন, তাহাই আরও serious বলিয়া মনে হয়। তিনি বলিয়াছেন—ছবি তাঁহার তৃতীয় পক্ষ, অর্থাৎ বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা। উপমাটি ভালো করিয়া বুঝিয়া দেখিলে যথার্থ বলিয়া মনে হয়। যৌবনে যে তাঁহার সহধর্ম্মিনী ছিল, সে তাহাকে অতিশয় সুস্থ ও সুন্দর সন্তান-সন্ততি উপহার দিয়াছিল; সেই অমর বংশবিস্তারের ফলে তিনিও অমর হইয়াছেন; কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে এই যে তরুণী কলা-বধূটি তাঁহার স্কন্ধে ভর করিয়াছে, ইহার প্রেমের পরিণাম এমনই যে, সন্তান-জন্মের পরিবর্ত্তে যাহা হইতেছে তাহা দেখিলে হৃদ্‌কম্প হয়; কিন্তু তৃতীয় পক্ষের গর্ভজাত

বলিয়া বৃদ্ধস্বামীর তাহাতেই আহ্লাদ ধরে না; একজিবিসন করিয়া দেখাইতে হয়। অদৃষ্টে যাহা আছে তাহা খণ্ডাইবে কে?

* * *

ছবিগুলি ছবি হউক আর না হউক—একটা কিছু বটেই, আমরাও তাহা অস্বীকার করি না। অনেকগুলিতে শ্যাওলা-ছ্যাংলা-মেছেতা জাতীয় একটা রূপ আছে; আবার কতকগুলিতে যে বিকট হিলিবিলির মত রেখা-বিন্যাস আছে তাহার সহিত লালাক্লিন্ন সরীসৃপের সাদৃশ্য আছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ছবিগুলির অঙ্কনরহস্যের যে আভাস দিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, এগুলি তাঁহার অবচেতনা হইতে উদ্ভূত। যদি তাহাই হয় তবে এগুলিকে চিত্রশিল্পের অন্তর্ভুক্ত না করিয়া মনোবিকলন-শাস্ত্রের অধীন করাই ত' সঙ্গত। সজ্ঞান সৌন্দর্য্যসাধকের নির্জ্ঞানে যে কুৎসিত-কুরূপের প্রীতি অবরুদ্ধ হইয়া থাকে, এগুলিতে কি তাহাই কবি-প্রতিভার তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় মুক্তি পাইবার চেষ্টা করিতেছে? শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয় এসম্বন্ধে কি বলেন?

নৃত্যময়ী

ছিনু এতদিন কোন্ মহাঘুমে মজ্জিত—
নয়ন মেলিয়া দেখি একি আঁখি-ভ্রান্তি রে !
চৌদিকে মোর, করি বেশবাস বর্জ্জিত
সুরসুন্দরী নাচে অপরূপকান্তি রে।
নাচে উল্লাসে মেনকা-রম্ভা-উর্ব্বশী,
নৃত্যের তালে পড়ে কুন্তল-চূর খসি'
—দেহ হ'তে মোর নিতে চায় বুঝি প্রাণ ছিঁড়ে !

টানি নাই মাল মাধ্বী পৈষ্টী গৌড়ীয়া
সেবন করিনি চণ্ডু চরস গঞ্জিকা ;—
নহি উন্মাদ—উদোম ফিরি না দৌড়িয়া,
পথ চলি দেখে গুপ্তপ্রেসের পঞ্জিকা।
তবে একি হল ? মরিয়া ঢুকিনু স্বর্গে কি ?
স্বপ্নের ঘোরে লভিনু চতুর্ব্বর্গে কি ?
কিম্বা এ মায়া কল্পনা-অনুরঞ্জিকা !

—স্বর্গ এ নয়, ওরে মন, নয় কল্পনা
আহা মরি মরি ! এ যে নিতান্ত সত্য রে !
নহে এ লাস্য হেমা-রম্ভার ছল্‌পনা ;

—বঙ্গ মহিলা নাচছে রঙ্গ-চত্বরে !
চরণে চরণে মঞ্জীর মৃদু গুঞ্জিয়া
তনুতরঙ্গে কলাকৌশল পুঞ্জিয়া
আপন নৃত্যে আপনি মগন মত্ত রে !

গুরু নিতম্ব শোভে কাঞ্চন কাঞ্চীতে ;
কঞ্চুকী-আঁটা পীন পরিসর বক্ষ রে !
ভ্রু-ধনু হইতে হানে বিষাক্ত বাণ চিতে—
ঘায়েল হইয়া পড়ে যত রূপদক্ষ রে ।
ফিরায়ে আনিল কে কহ প্রাচীন লাস্য এ ?
অজন্তা-আঁকা চিত্রের চারু ভাষ্য এ ?
—নাম তার লেখা রবে স্বর্ণ অক্ষরে ।

নটীর ছন্দে নাচিছে সাজিয়া নর্ত্তকী
দেবদাসী সেজে নাচে কভু নাট-মন্দিরে !
ভ্রম হয়, এটা সেই পুরাতন মর্ত্ত্য কি—
অথবা এ দেবসভা পারিজাত-গন্ধী রে !
নাচিতে নাচিতে নটীর চরণে খাল্ ধরে
দেখিতে দেখিতে দর্শকমুখে নাল্ ঝরে—
কি নাচ ! আমরি ! সুধারসনিঃস্যন্দী রে !

নাচের নেশায় মাতিল বঙ্গ-অঙ্গনা
রঙ্গমঞ্চে নাচিল কুহক ভঙ্গিতে !
অন্তরীক্ষে বাজিল মৃদু-মৃদঙ্গ না ?

তবলায় চাঁটি কে দিল স্থতাল সঙ্গীতে ?
নিজে নটরাজ বাজান ডমরু গম্ভীরে—
তবু নাচিবে না কে আছে এমন দম্ভী রে !
কে পারে তাঁহার রসানুশাসন লঙ্ঘিতে !

নাচিতেছে তাই তরুণী সবাই উল্লাসে
ভঙ্গিমাভরে কটিদেশ করি বঙ্কিত :—
লাস্য-আলসে নয়নে আবেশ-ঢুল্ আসে
শিরায় স্নায়ুতে শৃঙ্গার-স্বর ঝঙ্কৃত।
বাংলা ভাসিল নৃত্য ফেনিল বন্যাতে
নাচে এক সাথে পিসী-মাসী-মাতা-কন্যাতে।
—আমি চেয়ে থাকি বোকার মতন, শঙ্কিত।

জয়জয়ন্তী *

ঘন ঘন ধনমপি নায়ক জয় হে জয়ন্তিভাগ্যবিধাতা!
ইংলণ্ড-ফ্রান্স-সুইডেন-ইটালী-আরব-তুর্কী-কঙ্গো-
আল্‌প্‌স্‌-ককেশস-দনিয়ুব-ভল্‌গা-নাইল-মিসিসিপি-হংহো
তব ফরমাসে আসে বাংলা কবিতা চাষে
পূরিল কুষ্টির খাতা।
ঘন ঘন লাঙ্গল-দায়ক জয় হে, জয়ন্তিভাগ্যবিধাতা !
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় জয় হে !

---

* মূলের প্রভাবে পড়িয়া দ্বিতীয় ও সপ্তবিংশ পঙ্‌ক্তিতে লঘু-গুরু-জ্ঞান থাকে নাই।

অহ অহ কত প্রোগ্রাম প্রচারিত অগুণিত অগণিত তাহা,
চিঠি-পোষ্টারে অর্থ ফুঁকীকৃত সহস্র অযুত ত ডাহা !
পোয়া বারো হাতে আড়ি মার' তুমি তাতে
পাকা ঘুঁটি ঘর্ যাতা।
ঘন ঘন অক্ষ-বিছায়ক জয় হে, জয়স্তিভাগ্যবিধাতা !
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় জয় হে।

পতন-রব্যুদয়-দুর্গম-পন্থা চিন্তা কর তুমি থোড়া,
হে পয়সারথি, তব রথচক্রে শহর লহর সম জোড়া।
সদর-মফঃস্বল মাঝে তব হর্ণধ্বনি বাজে
ডাউন মিটার-হাতা।
ঘন ঘন রথ-'পরি ধায়ক জয় হে, জয়স্তিভাগ্যবিধাতা !
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় জয় হে !

"শৈল"-"নীর"-"নৃপ"-"বিমলা"-নন্দিত পিরীত-চর্চ্চিত দেশে,
জাগ্রত ছিল তব সুতীক্ষ্ম ঈক্ষণ,—কি সুক্ষণে পশ' শেষে।
কণ্ঠে তেরেলেল্লা ফতে হইল তব কেল্লা
ট্রাই ট্রাই করি ভ্রাতা !
ঘন ঘন লক্ষে জয় হে, জয়স্তিভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় জয় হে।

যাত্রী মাতিল শুধি প্রাক্তন ঋণ ঘৃত ছুঁড়ি হোমজ ভস্মে,
গাহে সুরঙ্গম-সুরঙ্গমা কত বিচিত্র দীর্ঘে হ্রস্বে।
কত তরুণারুণ-রাগে কলিকা স্ফুট-বর মাগে
লিষ্টিত কাগজ তা তা।
জয় জয় জয় হে বগলে-ধৃতরবি, জয়স্তিভাগ্যবিধাতা !
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় জয় হে !

চলচ্চিত্র

"ফল ইন্ অ্যাড্‌মায়ারার্স"

শ্রীশ্রীঠাকুরপূজা

'ভজন পূজন সাধন আরাধনা সমস্ত থাক্‌ পড়ে'

দুর্গত-বিদায়

'এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে—'
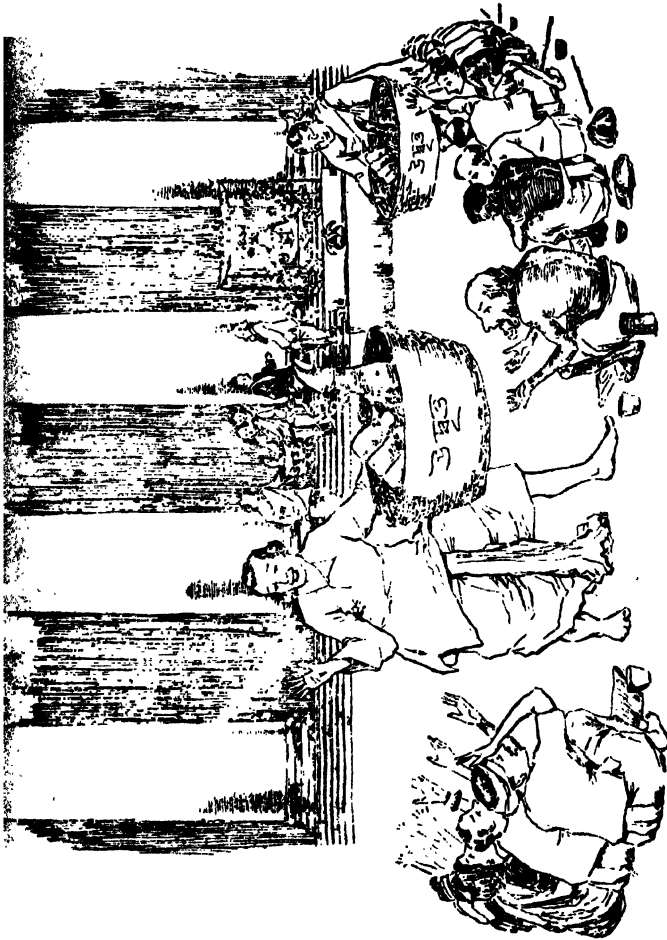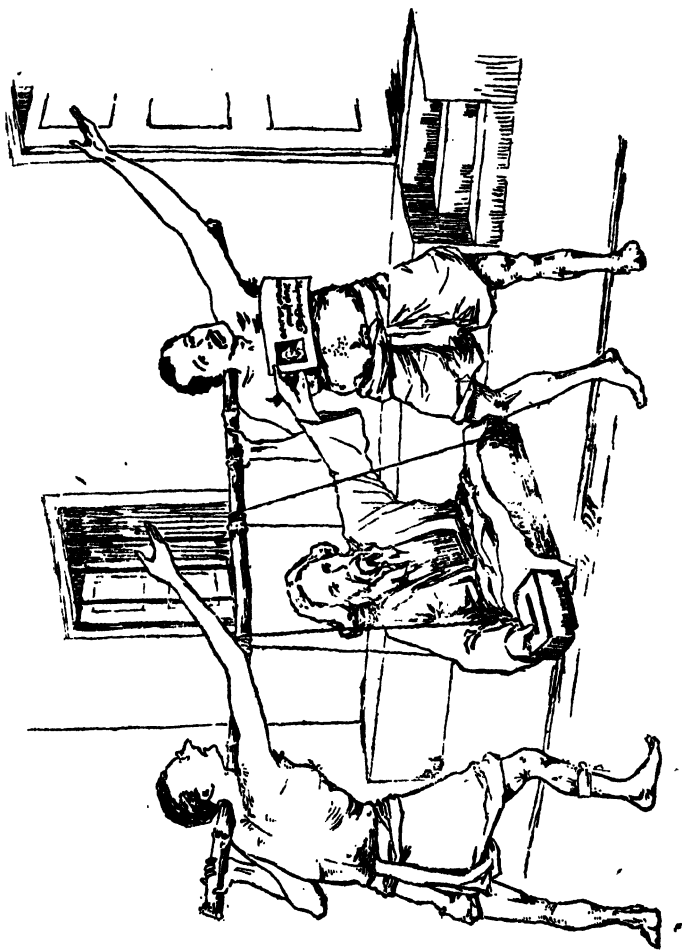
বিশ্বভারতী-দিবস

রবীন্দ্রনাথের চিত্রসংবেদনা বা ছবিতা

কার্ত্তিক মাসের মাঝামাঝি হইবে, 'জয়ন্তী-উৎসবী'রা তখন পাঁচ টাকা মূল্যে মেম্বরশিপ কার্ড বিক্রয়ার্থ ট্যাক্সি হাঁকাইয়া কলিকাতার অলিতে গলিতে টহল মারিয়া ফিরিতেছেন, 'সোনার পুঁথি'র দল টেলিফোন গাইড বহি ও জমিদার এসোসিয়েশনের লিষ্টি খুঁজিয়া শিকার-সন্ধানে ব্যস্ত, দেয়ালে দেয়ালে রবীন্দ্রনাথের তেরঙা ছবি-শোভিত পোষ্টার মারা হইয়াছে, কাগজে কাগজে দুর্গতগণকে উদ্বৃত্ত অর্থ সাহায্যের মহিমামণ্ডিত, আর্ট পেপারে দু'রঙে ছাপা ক্রোড়পত্র ছাড়া হইয়াছে, শ্রীযুক্ত অমল হোম করপোরেশন হইতে ছুটি লইয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ মহাশয় বোম্বাই ছুটিয়াছেন—এমন সময় খবর পাইলাম আমাদের পাড়ার বটুক চাটুয্যে আমেরিকা ইংলণ্ড ফ্রান্স জার্ম্মাণি জয় করিয়া দেশে ফিরিয়াছে। আমাদের সেই বটুক, যে তিনটি কথা বলিতে গিয়া তের বার 'ইয়ে' বলিয়া ঢোক গিলিত, খোলাসুদ্ধ চিনাবাদাম খাইয়া একদিন যে মরিতে মরিতে টিঁকিয়া গিয়াছিল, খাইতে বসিলে পাতে বীচে-বেগুন দেখিলে যে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিত, সেই বটুক পাশ্চাত্য দেশগুলি এমন অবলীলাক্রমে ভ্রমঞ্জয় (ভ্রমণ+জয়) করিয়া আসিল! বড়ই আনন্দ হইল। ভাবিলাম, বটুক নিশ্চয়ই ফুটবলের সাহায্যে এই কাণ্ড করিয়াছে। বটুকের মত সেণ্টার হাফব্যাক কলিকাতায় তো ছিলই না, সমগ্র ভারতবর্ষে ডিফেন্সে অমন একটি খেলোয়াড় খুঁজিয়া পাওয়া শক্ত ছিল। শেরউড ফরেষ্টারের সঙ্গে ম্যাচে সেবার সে কি কাণ্ডটাই ন

করিয়াছিল! খ্যাঁদা বোস ছিল ব্যাকে। হাফ টাইমের পরেই শেরউডের সেণ্টার ফরোয়ার্ডের হাঁটুর গুঁতায় খ্যাঁদার খাঁদা নাক দিয়া ঝরঝর করিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল। খাঁদা ঘায়েল। ধরাধরি করিয়া তাহাকে বাহিরে লইয়া যাওয়া হইল। তখন শেরউড দুগোলে লীডিং। রক্ত দেখিয়া বটুকের রক্ত গরম হইয়া উঠিল। সে সব্যসাচীর মত একাই ব্যাক এবং হাফব্যাক সেণ্টারে কি অদ্ভুত খেলাটাই না দেখাইল! চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। দু গোল শোধ এবং বলিলে বিশ্বাস করিবেন না, উল্টা আরও তিনটি। খেলার শেষে শেরউডের ক্যাপটেন বটুকের শুধু পায়ের ধূলা লইতে বাকী রাখিল। যাক্, বটুক কোথায় কোথায় কোন্ টীমের হইয়া খেলিল জানিবার বাসনা হইল।

গেলাম। গলির মোড়েই বটুকদের বাড়ী। বাড়ীটা দুমহল, খুব বড়। বটুকরাই ছিল পাড়ার সব চাইতে বনেদি বড়লোক। বটুক বাড়ীর সর্ব্বকনিষ্ঠ হইলেও উপরওয়ালারা সব মরিয়া হাজিয়া গিয়াছে, এখন বটুকই মালিক।

দূর হইতে দেখিলাম, বটুকের বাড়ীর সামনে খুব ভিড়। কাছে আসিতেই, সবাইকেই প্রায় চিনিলাম, পাড়ার ছেলে বুড়ো অনেকে মিলিয়া জটলা পাকাইয়াছে। ব্যাপারখানা কি? দুই একটা কথাও এদিক ওদিক হইতে কানে আসিতে লাগিল—'অল্প বয়সে অনেক কাঁচা পয়সা হাতে পেয়ে ছোঁড়ার মাথা বিগ্‌ড়েছে'—'তা ভাই, ওদের ওসব খেয়াল সাজে'—'বদ্ধ পাগল হয়েছে' ইত্যাদি মন্তব্য নিশ্চয়ই বটুকের সম্বন্ধেই করা হইতেছে। সামনেই হলধর খুড়োকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্যাপার কি খুড়ো? খুড়ো দুহাত উপরে তুলিয়া হাই তুলিতে তুলিতে বলিলেন, মাথা আর মুণ্ডু! তোমাদের বটুক হঠাৎ আর্টিষ্ট হয়ে উঠেছে যে! রুবেই যে এসব আবোল তাবোল ছবি আঁকল

আবার সেগুলো নিয়ে পশ্চিমে গেল দিগ্বিজয় করতে, কিছুই তো শুনিনি। হঠাৎ আজ শুন্‌ছি, ওর জয় জয়কার পড়ে গেছে। ওদেশের বড় বড় হোমরা-চোমরা কাগজে ভারী সুখ্যাত করেছে ওর। বলেছে এমনটি 'ন ভূতো ন ভবিষ্যতি'—ছোঁড়াটা একেবাবে ক্ষেপে গ্যাছে। আজকে পাড়ার পাঁচজনকে ডেকে ও সেই সব ছবি আর কোথায় কি প্রশংসা করিয়েছে, ওদেশের কোন্ বড় আর্টিষ্ট মুখে কি বলেছে এই সব শোনাচ্ছিল—জানই তো পাড়ার ছেলেদের! ভারী মজা পেয়ে গিয়েছে তারা।

বলিলাম, চলো না খুড়ো, দেখিই গিয়ে। ভিড়ের মধ্যে পথ করিয়া আমরা বটুকের বৈঠকখানায় হাজির হইলাম। তখন সেখানে কজন ছোকরা উপস্থিত ছিল, বটুকের ছবির এলবাম তুলিয়া লইয়া দেখিতেছিল ও মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিতেছিল। বটুকের খেয়াল নাই। পাংলুন ও শার্ট পরণে, শার্টের হাতা কনুই পর্য্যন্ত গুটানো, বটুক ছবি দেখাইতে ও কথা বলিতে বলিতে ঘামিয়া উঠিয়াছে। আমাকে দেখিয়াই সে সোৎসাহে জড়াইয়া ধরিল, বলিল এই যে কেবলরাম দাদা, তুমিও এসেছ। তুমিত আবার কাগজের সম্পাদক! তোমাকে এসব দেখাতে সঙ্কোচ হয়। জিনিষটা একেবারে নতুন কিনা! আর নতুনই বা বলি কি করে? ফ্রান্সের ফুসে জার্ম্মাণির রণ্টারবাউপ্লেন—আমি বলিলাম, নজির থাক্ ভাই দেখিই না কি কাণ্ড করে এলে!

বটুক চুপি চুপি বলিল, দেখাচ্ছি, এই এদের সব বিদেয় করে একটু নিরিবিলিতে—

নিরিবিলিতেই হলধর খুড়ো ও আমি ছবিগুলি ও সংবাদপত্রের মন্তব্যের কাটিং দেখিলাম। সর্ব্বনাশ, এই ছবি! রঙ বেরঙের

কালিলেপা, অদ্ভুত কতকগুলো জীবজন্তু, না মানুষ না বাঁদর—না পারি হাসিতে না পারি কাঁদিতে। বলিলাম, চমৎকার। কিন্তু ফুটবল ছেড়ে তোমার এ খেয়াল কি করে হ'ল বল তো?

বটুক বলিল, সে অনেক কথা। খুলে বলবার সময় আজও হয় নি হয় তো। যদি পাবলিশ করো তোমার কাগজে তাহলে ছবিসুদ্ধ একটা আর্টিকল লিখি। ব্লকের খরচা আমিই দেব।

আমতা আমতা করিয়া বলিলাম, তা বেশ কিন্তু এ মাসে কাগজ তো প্রায় তৈরী হয়ে এসেছে, আস্ছে মাসে—

বটুক এলবামগুলি বন্ধ করিতে করিতে বলিল, কিন্তু এদেশে রিকগ্‌নিশন পাব না হয়তো, হয়তো কেন—আমাকে পাগল ঠাওরাবে অনেকে। তাইতে এখানে কাউকে ছবি না দেখিয়ে সটান ছুটে গিয়েছিলাম ইউরোপ আর আমেরিকায়। কিউবিজম, ফিউচারিজ্‌মের বাপ তার উৎরেছে। এর কদর তারা বুঝবে এবং বুঝেছেও। দেখছ তো কাটিংগুলো।

মাথা চুলকাইয়া বলিলাম, দেখছি বটে—

হলধর খুড়ো তখন বিদায় লইয়াছেন। আমি আর বটুক একলা, বাহিরের ভিড়ও পাৎলা হইয়া আসিয়াছে। বটুক বলিল, চা আনাই, কেবলরামদা'—

চায়ে অরুচি আমার কোনো কালেই নাই। বলিলাম, আনাও, কিন্তু—ছবিগুলোর কথা ভাব্‌ছি। শুনেছি রবিবাবুও—

বটুক আমার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল, ওসব দেশে তাঁর ছবিরও একজিবিশন হয়েছে। অদ্ভুত! তাঁহার সঙ্গে আমার নাম করো না। তবে ওদেশে অনেকে আমার ছবি সমালোচনা করতে গিয়ে টাগোরের ছবির উল্লেখ করেছে—এইটেই আমার গৌরব।

বলিলাম, শুনেছি রবিবাবু এদেশে তাঁর ছবিগুলো দেখাতে কুণ্ঠিত। বলেন, এখানে তাঁকে ভুল বুঝবার সম্ভাবনা আছে। ছবি নাকি তাঁর তৃতীয় পক্ষ। স্বদেশে তৃতীয় পক্ষকে বের করার লজ্জা আছে। আরো নাকি বলেছেন, রবির রঙের খেলা হয় পশ্চিমাকাশে—তাই পশ্চিমকেই তিনি তাঁর এই রঙের খেলা উপহার দিয়েছেন।

বটুক উৎসাহিত হইয়া উঠিল, বলিল, ঠিক বলেছেন তিনি। তাঁর আর দুই পক্ষ আছে, তিনি তৃতীয় পক্ষের কথা বল্‌তে পারেন। আমি, আমার ছবিকে কি বলি জানো? এ যেন আমার উপপক্ষ, ফুটবল মাঠ আমার সহধর্ম্মিনী, ব্যবহারে ব্যবহারে হয়ে এসেছে পুরাণো পড়া পুঁথির মতো—উপপক্ষের আদর বেশী, তাকে চেনা-লোকের সমাজে লুকিয়েও রাখ্‌তে হয়, কিন্তু কাশী যাও, হরিদ্বার যাও, নিঃসঙ্কোচে তাকে সঙ্গে নিয়েই তুমি ঘোরা-ফেরা করতে পার। পশ্চিমে যাবার কারণই তাই—

দেখিলাম বাড়াবাড়ি হইতেছে। বলিলাম, আজ উঠি ভাই আবার আস্‌ব।

বটুক একটু নিরাশ হইয়া বলিল, ছবিগুলি ছাপা সম্বন্ধে ভেবে দেখো—

বাহিরে আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। আর একটু হইলেই মারা গিয়াছিলাম! ওই ছবি ছাপিয়া শেষে মার খাই আর কি! ভাবিলাম, আর ওমুখো হওয়া নহে, দূরে দূরে থাকাই ভাল।

ইতিমধ্যে মহা তোড়জোড়ে জয়ন্তী-উৎসব আসিয়া পড়িল। শুনিলাম টাউনহলে রবীন্দ্রনাথের চিত্র-প্রদর্শনী হইবে। বটুকের ছবি তো দেখিলাম, রবীন্দ্রনাথের ছবি কি বস্তু হইবে দেখিবার জন্য ভারী কৌতূহল হইল। বহুকষ্টে চারি গণ্ডা পয়সা সংগ্রহ করিয়া একদা রবীন্দ্র-

চিত্র-প্রদর্শনী দেখিয়াও আসিলাম। প্রদর্শনী-গৃহে সুকৌশলে বহু পয়সা ব্যয় করিয়া দিবালোকের অনুকরণে আলোকের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সেই আলোকে থরে থরে সজ্জিত সেই বিচিত্র ছবিগুলি দেখিয়া যেন আমার তৃতীয় নেত্র উন্মীলিত হইল; মগজের কোনও একটি বিশেষ ভাণ্ড যেন সরা-চাপা ছিল, তাহার মুখ খুলিয়া গেল। হঠাৎ অনুভব করিলাম, এতকাল, র‍্যাফেল, ভ্যাণ্ডাইক, বটিচেলি, ভিঞ্চি, হেরোশিগে প্রভৃতির যে সকল ছবি দেখিয়াছি. সেগুলি ছবিই নয়, তাহারা মানুষের অজ্ঞতার সুবিধা লইয়া জুয়াচুরী করিয়া গিয়াছেন। যাহা দেখিয়া প্রত্যক্ষ ও বাস্তব জগতের কোনও কিছুর কল্পনা মনে উদিত হইল তাহা যদি ছবি হয়, তাহা হইলে ফটোগ্রাফও ছবি। বুঝিলাম, এতদিন অভিধানে ছবির সংজ্ঞাই ছিল ভুল। সত্যকার ছবি দেখিলাম আজ—ছবি দেখিয়া ছবির বিষয়-বস্তুর কথা মনেও থাকে না, আর্টিষ্টের মগজের কথা মনে হয়। এইই তো ছবি! মানুষের ছবি দেখিতে দেখিতে মনে হইল, বানর বনিয়া গিয়াছি, অমনি ছবির কথা ভুলিয়া ডারউইনের বিবর্ত্তনবাদ মনে আসিল। পাখীর ছবি দেখিতে দেখিতে চীনা রেষ্টুরেণ্টে বার্ডস্‌নেষ্ট-সুপের কথা মনে ঝিলিক মারিয়া গেল; ফুলের ছবি দেখিতে দেখিতে ফুলকপির চাষে কোন্ সার শ্রেষ্ঠ তাহাই মনে উদিত হইল। অদ্ভুত, অদ্ভুত! এই সব অপূর্ব্ব সৃষ্টি দেখিবার জন্য আজও যে বাঁচিয়া আছি ইহা ভাবিয়া পুলক-বিস্ময়ে মস্তক নত হইয়া আসিতেই মনে পড়িল, বটুকের কথা। বুঝিলাম, অন্যায় হইয়া গিয়াছে, বটুকের ছবিত্ব-শক্তি বা ছবিতাও উপেক্ষার সামগ্রী নহে; রবীন্দ্রনাথ ও বটুক একবৃন্তে দুইটি ফুল যেন। একই প্রেরণা, একই অনুভূতি উভয়ের ছবির অন্তরালে কাজ করিতেছে। টাউনহল হইতে বাহির হইয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে বটুকের

বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলাম। বটুক বাড়ীতেই ছিল, পাঁচ সাত শিশি 'কাজল কালি' পাশে লইয়া অনাবৃত হাঁটুতে কালি লাগাইয়া তক্তপোষে বিছানো সাদা কাগজের উপরে হাঁটুর সাহায্যে ছবি আঁকিতেছিল। আমাকে দেখিয়া থতমত খাইয়া ধুতিটা টানিয়া হাঁটুর নীচে নামাইয়া দিতেই খানিকটা কালি তাহাতে লাগিয়া গেল।

আমি হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলাম, বটুক, তোর ছবিগুলো দে, ছাপ্‌ব আমি। রবি বাবুর ছবি দেখে এলাম। তোর প্রতিভাকে আমি উপেক্ষা করেছি, অবহেলা করেছি, আমায় ক্ষমা কর ভাই—

বটুক যেন আকাশ হইতে পড়িল। বলিল, ব্যাপার কি কেবলদা' ?

করুণকণ্ঠে বলিলাম, আজ আমার জ্ঞান-নেত্র খুলেছে, বুঝতে পেরেছি তোর ছবি। আমার কাগজে ছাপ্‌ব, যা থাকে কপালে। কিন্তু হায়, আমার পয়সা নেই, রঙীন করে ছাপতে পারব না, অনেক খরচ।

বটুক বলিল, তাতে কি কেবলদা'—এক রঙেও ছবির যা ভেতরের বস্তু তা ফুটে উঠবে। কিন্তু, হঠাৎ কি হোলো বলো তো ?

শিশির ভাতুড়ীর অনুকরণে বলিলাম, বল্‌ব, বল্‌ব আমি। শোন্ তবে। টাউনহলে দুধারে কাঠের পার্টিশানে লট্‌কানো রবিঠাকুরের ছবি, মাঝখানে আমি দাঁড়িয়ে, ওপরে নকল সূর্য্যালোক বিকীরণ কচ্ছে ইলেকট্রিক ল্যাম্পগুলো। এপাশে ওপাশে ছবি দেখে এগিয়ে চলেছি—হঠাৎ দূরে সিঁড়ির কাছে অমল হোমকে দেখলাম। অমনি কি যেন কি এক ভাব-বিপর্য্যয় হ'ল আমার। মনে হ'ল, আমি খাইবার গিরিবর্ত্মে দাঁড়িয়ে আছি। আমার দুই পাশে উত্তুঙ্গ গিরিচূড়া, গগনস্পর্শী। আর সেই গিরিগাত্রে লট্‌কানো ছবি নয়—সারি সারি

বিচিত্র উদ্যান, ঝিরি ঝিরি ঝরণা আর অপরূপ সুন্দরী গিরি বালিকারা, মাথায় ফেট্টা বাঁধা, টক্ টকে লাল গাল, টুস্‌কী মারলে রক্ত ফেটে পড়বে যেন—আরো কত কি! অমনি মনে হ'ল তোর কথা। তোর ছবির কথা। মনে হ'ল অন্যায় হয়েছে, অন্যায় করিছি। প্রতিভার অবমাননা করিছি, অমনি ছুটে এলাম তোর কাছে। দে ছবিগুলো।

বটুক বাছিয়া বাছিয়া কতকগুলি ছবি দিল, বলিল, নাম দেবে কি?

—তাই তো! একজিবিশনে রবিবাবুর দু একটা ছাড়া কোনো ছবিতেই নাম ছিল না। বলিলাম, নাম দেব না।

বটুক বলিল, না, তা কোরো না, এদেশের লোক এখনো তত উন্নতি করেনি, নাম না দিলে তাদের ব্রেণের উপর বড্ড বেশী ট্যাক্স করা হবে। তুমি এক কাজ করো, প্রত্যেকটা ছবির নীচেই নাম দাও, একটা নয়, চার পাঁচটা করে নাম দাও; যার মগজের গ্রহণ-ক্ষমতা যে রকম, সে সেই রকমের নামটাই নেবে এবং সূত্র ধরে ছবির কথা ভাব্‌তে থাক্‌বে।

বলিলাম, সে তো মহা হাঙ্গামের ব্যাপার, এত নাম খুঁজে বের করি কি করে?

বটুক হাসিল, বলিল, রবিবাবুই সে সুবিধা করে দিয়েছেন। তাঁর কাব্যে ও গানে এত অফুরন্ত ভাবের ভাণ্ডার তিনি খুলে দিয়েছেন, কবিতার বা গানের লাইন তুলে তুলে তলায় বসিয়ে দাও—এক ঢিলে দুপাখী মারা হবে, ছাব্য ও কাব্য প্রচার এক সঙ্গে।

কথাটা আমার মনে ধরিল। তবু মহাজনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবার জন্য মনে মনে স্থির করিয়া রাখিলাম যে, রবীন্দ্রনাথের ছবি প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ুতে বাহির হইবেই এবং সে সম্বন্ধে কিছু

আলোচনা থাকিবেই। তাহা দেখিয়াই বটুকের ছবি সম্বন্ধে আলোচনাদি করিব।

সত্যসত্যই প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ুতে রবীন্দ্রনাথের ছবি বাহির হইল—কোন নাম নাই কিন্তু নাম কেন নাই তাহার কারণ সম্পাদক দিয়াছেন। কেমন করিয়া ছবি আঁকা সুরু হইল, কি ভাবে রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকেন, ছবির নামের কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি কি জবাব দিয়াছেন, এ সকলই প্রকাশিত হইয়াছে। মডার্ণরিভিয়ুর সম্পাদকীয় মন্তব্যে আরও লিখিত হইয়াছে যে ব্লক করিয়া ছাপিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথের ছবির অঙ্গ ও বর্ণহানি ঘটিয়াছে। অন্য কোনও চিত্রকরের চিত্র প্রকাশ করিতে গিয়া প্রবাসী বা মডার্ণরিভিয়ু একথা বলেন নাই। সম্ভবতঃ তাঁহাদের ছবি প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ুতে ব্লক করিয়া ছাপার দ্বারাই ছবিগুলি আরো খোলতাই হয়। রবীন্দ্রনাথের ছবি ভিন্ন ধরণের, ব্লক করিলেই ছবির অঙ্গহানি হইয়া যায়। বটুকের ছবি সম্বন্ধে আমাদেরও সেই কথা।

আমার সুবিধা হইল। বটুককে বলিলাম, প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ু হইতে সম্পাদকীয় ও রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যগুলি যদি তোমার ছবি সম্বন্ধে প্রয়োগ করি তাহা হইলে অন্যায় হইবে কি?

বটুক গম্ভীর হইয়া বলিল, তাহার কি কোনও প্রয়োজন আছে? তা' ছাড়া নীচে রবীন্দ্রনাথের কবিতার পংক্তি তুলিয়া দিতেই হইবে; সেগুলি যে নাম হিসাবে দেওয়া হইবে তাহা নহে, দর্শকের জ্ঞাননেত্র উন্মীলনে সেগুলি চাবিকাঠির মত কাজ করিবে। তবে সে কি করিয়া চিত্রাঙ্কণে উদ্বুদ্ধ হইল তাহার একটা ইতিহাসও দিতে হইবে।

নিম্নে সেই ইতিহাসটকু দিয়া আমরা বটুকের বারোখানি চিত্র প্রকাশ করিতেছি। এই ছবিগুলির দ্বারা মানবমনের গোপন

কক্ষে কবিতার উদ্বোধন হয় বলিয়া এগুলির নাম দেওয়া হইয়াছে 'ছবিতা'।—এগুলি সম্বন্ধে আলোচনার দ্বারা আমরা পাঠকের কাব্য-মনের অবমাননা করিব না। বটুকের তুলনা রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্র-নাথের তুলনা বটুক, ইহার অতিরিক্ত এ বিষয়ে আমাদের কিছু বলিবার নাই। আর এক কথা, বটুক তুলি দিয়া ছবি আঁকে না; কলম দিয়া, কলমের বাঁট দিয়া, আঙল দিয়া, কনুই দিয়া, পায়ের পাতা দিয়া এবং নিতান্ত একলা থাকিলে হাঁটু দিয়াও ছবি আঁকিয়া থাকে। ফুটবল খেলিত বলিয়া হাঁটুটা বটুকের বৈশিষ্ট্য।

চিত্রাঙ্কণ অভ্যাসের উৎপত্তির ইতিহাস সম্বন্ধে বটুক স্বয়ং লিখিয়াছে —"ফুটবল খেলিতে গিয়া আছাড় খাইয়া পড়িয়া হাঁটুতে আঘাত পাই, সে অনেক দিনের কথা। বাড়ী ফিরিয়া মাকে বলি, হাঁটুতে টিংচার আয়োডিন পেণ্ট করিতে। মা আয়োডিন পেণ্ট করিয়া দিলে হাঁটু দেখিতে গিয়া হঠাৎ দেখি আয়োডিনের প্রলেপে আমার হাঁটুতে এক অপূর্ব্ব ছবি আঁকা হইয়া গিয়াছে। অরণ্যানী-সমাকীর্ণ হিমাচলের উপরে যেন রাশীকৃত পুঞ্জীভূত মেঘ—নীচে জলাশয়ে একটি বক, এক ঠ্যাং তুলিয়া গম্ভীর ভাবে কি দেখিতেছে। মাকে বলিলাম, মা তুমি ছবি আঁকিয়াছ, তুমি আর্টিষ্ট। আমার হাঁটুর আঘাত আমার মগজে পৌঁছিয়াছে ভাবিয়া মা কাঁদিয়া ফেলিলেন। সেইদিন হইতে আমি টিংচার আয়োডিন ও শেষে কালির সাহায্যে ছবি আঁকিতে শিখিলাম। আমার কলমের ছবি আমার মনোজগতের জীব এইটুকুই তাহাদের সম্বন্ধে সত্য। এক কথায় বলিতে পারি, they are my football playing in lines and patches."

বটুকের ছবি সম্বন্ধে Mr. Joseph Southall লিখিতে পারিতেন—

"The drawings of Batuk Chatterjee prove that the footballer, though a master of the use of feet, feels that certain things can be better kicked or expressed or perhaps only expressed in the language of line, tone and colour."

কিন্তু কি কারণে জানি না, Mr. Joseph Southall তাহা লেখেন নাই, সম্ভবতঃ তিনি বটুকের ছবি দেখেন নাই।

'রিপ্রডাকৃশন' করিতে গিয়া যে এই চিত্রগুলির অঙ্গহানি হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু উপায় নাই, এই কারণেই একজিবিশন ইত্যাদির অনুষ্ঠান আবশ্যক। এক্ষেত্রে যখন তাহার সম্ভাবনা নাই তখন আমরা আমাদের সহৃদয় পাঠকগণকে গড়পারের মোড়ে বটুক-ষ্টুডিওতে গিয়া অরিজিন্যাল ছবিগুলি দেখিতে অনুরোধ করি।

দুই নম্বর চিত্র অর্থাৎ 'অত চুপি চুপি কেন কথা কও' অথবা 'ওহে সুন্দর মরি মরি' চিত্রখানির রহস্যময় চোখের দৃষ্টি একটু বিশেষ ভাবে অনুধাবন-যোগ্য। ইহা আমাদিগকে র‍্যাফেলের মাতৃমূর্ত্তির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এমন কি, আমাদের মনে হয় র‍্যাফেল অঙ্কিত ম্যাডোনার চোখের দৃষ্টির চাইতে এই ছবিতে অঙ্কিত ছবিটির দৃষ্টি অধিকতর স্নিগ্ধ ও মাতৃত্বভাবব্যঞ্জক। এই দৃষ্টিতে শুধু মায়ের করুণ আকুতি নাই, একটা উগ্র প্রতিহিংসার ভাবও যেন দেখা যায়। শুধু হাসি নয়, কৌতুক নয়, বিরাগ নয়, ব্যঙ্গ নয়।

ছয় নম্বর চিত্র, অর্থাৎ 'ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে'—সৃষ্টিরহস্যের একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত এই ছবির মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ—দুইই মাধ্যাকর্ষণের দ্বারা প্রপীড়িত, অথচ তাহারই মধ্যে কি অপরিসীম সহানুভূতি, কি অদ্ভুত আত্মনিবেদন! যাঁহারা রেনল্ডসের 'লাষ্ট সাপার' ছবিখানি দেখিয়াছেন তাঁহারা এই চিত্রের কথঞ্চিৎ মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিবেন।

নয় নম্বর চিত্রে অর্থাৎ 'হতাশ পথিক, সে যে আমি সেই আমি'র সেই আমিটি একটি রহস্যময় জিজ্ঞাসা-চিহ্নের আকার ধারণ করিয়া আছে। সেই আমিটি কে?

'ওহে স্থন্দর মরি মরি, তোমায় কি দিয়ে বরণ করি'
'চোখে চোখে দেখা হ'ল পথ চলিতে'
'এখনো তারে চোখে দেখিনি, শুধু বাঁশী শুনেছি'

আমি তো চাহিনি কিছু
বনের আড়ালে দাঁড়ায়ে ছিলাম নয়ন করিয়া নীচু'
'তোমাতে আমাতে য়ত ছিনু যবে কাননে কুসুম চয়নে'

চোখে কেন লাগ্ছে নাকো নেশা
মনে মনে ভাব্ছে কেসর খাঁ।'

'ওগো মা রাজার দুলাল যাবে আজি মোর ঘরের সুমুখ পথে'
'মন্ত্রমুগ্ধ অচেতনসম চড়িনু অশ্ব 'পরি'

জয়-যাত্রায় যাও গো,
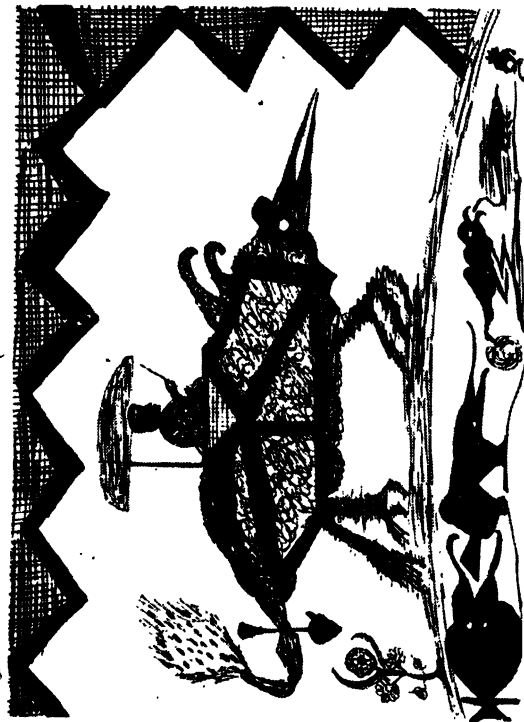
'মম চিত্তে নিতি-নৃত্যে কে-যে নাচে,
তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ!'
'জানি না কি মরণ নাচে নাচে গো ঐ চরণ-মূলে'
'প্রলয় নাচলে যখন হে নটরাজ'
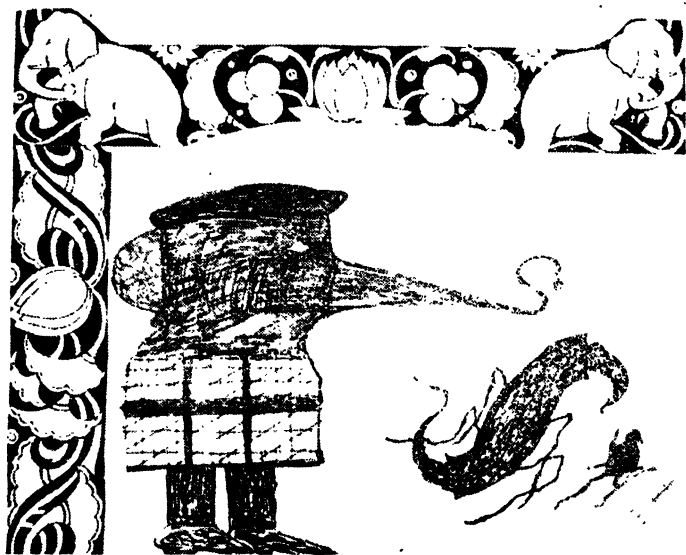
'ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে'

'ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে'

'ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা'

'সে যে পাশে এসে বসেছিল তবু জাগিনি'

'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির'

'বীর্য্য দেহ, চিত্তেরে একাকী

প্রত্যহের তুচ্ছতার উর্দ্ধে দিতে রাখি'

'বাজালে যে সুরে প্রভাত-আলোরে

সেই সুরে মোরে বাজাও'

'এস দাড়ি নাড়ি কলিমুদ্দি মিঞা'

'কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে'

'যেন মোর জননীর গর্ভের আঁধার আমারে ঘেরিছে আজি'

'হুঁকাটি বাড়ায়ে রয়েছে দাঁড়ায়ে মোর পুরাতন ভৃত্য'

'হতাশ পথিক সে যে আমি, সেই আমি'

'নগরীর নটী চলে অভিসারে যৌবন মদে মত্তা'

'বেলা যে প'ড়ে এল জলকে চল।'

'তুজনের চোখে দেখেছি জগৎ, দোঁহারে দেখেছি দোঁহে'

'লাগবে লড়াই মিথ্যা এবং সাঁচায়'

'চল চপলার চকিত চমকে
করিছ চরণ বিচরণ'

'আজি আসিয়াছ ভুবন ভরিয়া,
গগনে ছড়ায়ে এলো চুল,
চরণে জড়ায়ে বনফুল।
ঢেকেছে আমারে তোমার ছায়ায়,
সঘন সজল বিশাল মায়ায়।
আকুল করেছ শ্যাম সমারোহে
হৃদয়-সাগর-উপকূল।'

'কথা ছিল এক তরীতে কেবল তুমি আমি'

বড়ো বুধুর বন্দনা

সেদিন প্রভাতে সূর্য্য যেই উঁকি মেরেছে অম্বরে,
বুদ্ধ ওস্তাদের লেনে বত্রিশ নম্বরে
ছিলিম-বাপ্পের কৃপা লভি'
ছোটো বুধু উবু হয়ে দেখিল শ্রীরবীন্দ্রের ছবি।
—আমলকি-বীথি-প্রান্তে কাষ্ঠাসনে বসিয়া একাকী
ধ্যানমগ্ন আঁখি—
বক্ষ কাঁপে দুরু দুরু কি সে অন্তহীন আকাঙ্ক্ষাতে—
পিরীতি ও ভীতির সংঘাতে!
প্রশংসা-প্রবন্ধ রচি আপনার করে
পাঠাইলা ছাপার অক্ষরে
বিচিত্রা-পত্রিকা অঙ্গে; তবুও কি মিটেছে পিপাসা?
সে প্রশংসা যেন ভাসাভাসা,
তৃপ্তি নাহি মানে মন,
নিন্দাও হইতে পারে দ্ব্যর্থক সে বিচিত্রা-লিখন!
সে লেখা পড়েছে জানি, সাহিত্যিক যে আছে যেখানে,
শত্রুপক্ষ করিয়াছে বিপরীত মানে।—
ভাবিতে ভাবিতে ক্ষুব্ধ মন
করিল গ্রহণ
খাতা ও কলম বুধু, সরাসরি ওঠে গিয়ে ছাতে,
বসি এক কোণে আলিসাতে

লেখে আর কাটে,
দেখে নীচে উঠানেতে সারমেয় এঁটো পাত চাটে—
প্রভাত আলোয়
সহসা বুঝিল বুধু শাদায় কালোয়
যথেষ্ট পার্থক্য আছে, কি হবে এসব যা' তা' লিখে—
লুপ্ত হয় নিমিখে নিমিখে!
কি হবে প্রশংসা-পত্রে, চক্ষু মোদ' সবি অন্ধকার—
অকস্মাৎ করে মন্ত্রোচ্চার—
বুধু অবিশ্রাম—
"বুদ্ধের শরণ লইলাম।"

বার্ত্তা রবীন্দ্র-কর্ণে একদিন পঁহুছিল এসে—
ছোট বুধু বুদ্ধ হ'ল শেষে,
দুঃসংবাদ রটিয়াছে দেশে ও বিদেশে—
ছোটো বুধু কহে অবিরাম—
"বুদ্ধের শরণ লইলাম।"

শুনি কবি অন্তরে শিহরে,
বুদ্ধ যদি বৌদ্ধ হয় কে বুঝিবে তাঁর কাব্য পরে?
পশ্চিমে নামিছে রবি, শেষ হয়ে এল তাঁর দিন—
কণ্ঠ ক্রমে হইতেছে ক্ষীণ।
অনেক ভাবিয়া শেষে জানালেন সশঙ্কিত প্রাণে
কবিতা ও গানে
আপনার মনের প্রণাম—
দুই অর্থ ভরা বাণী;—"বুদ্ধের শরণ লইলাম।"

যথাকালে ছোট বুধু পড়িল সে লিখা—
বেরালের ভাগ্যে ছেঁড়ে শিকা!
অর্ঘ্য-শূন্য কবিতায় ছোট বুধু মনে মনে হাসি'
চলি গেলা কাশী—
মোটা হয়ে এল ফিরে ফাউল মাটন কারি গ্রাসি'।
চিত্ত তার শান্তিহীন লোভের বিকারে,
হৃদয় নীরস অহঙ্কারে।
ক্ষিপ্রগতি বাসনার তাড়নায় ধরা মানে সরা—
ভাঙা আর গড়া
এই হ'ল কাজ—কাব্য লিখে কাল্পনিক প্রিয়ার উদ্দেশে
এর আর তার আর তাহাদের নাম দিয়ে ছাপায় স্বদেশে।
নিপীড়িত বাসনার আহুতি মাগিয়া
দাউ দাউ কামানল উঠিল জাগিয়া—
রাত্রি আর দিন
পুড়ে পুড়ে ছাই হ'ল সিগারেট টিন!
আবার তাহারে
কে ডুবাল কামনা-পাথারে—
এইবারে
লালাপঙ্কক্লেদ হতে তুলি নত শির
কালিমাবিধৌত দেহে হতে হবে সুবোধ সুস্থির—
ওদিকে রবীন্দ্র অবিরাম
সভয়ে জপেন মন্ত্র—"বুদ্ধের শরণ লইলাম।"

দি গোল্ডেন বুক অব ট্যাগোর ও জয়ন্তী-উৎসর্গ

গোল্ডেন বুক অব ঠ্যাগোর বা ঠাকুরের সোনার পুঁথি এমন কি একটা অভিনব ব্যাপার হইবে, যাহার জন্য নগদ বারোটা টাকা ফেলিয়া প্রকাশিতপূর্ব্ব গ্রাহক হইব, প্রকাশের পরে তেমন ভালো জিনিষ হইলে চেষ্টা করিয়া দেখা যাইবে—ইত্যাদি ভাবনার বশবর্ত্তী হইয়া সুবিধা থাকিতেও তখন গোল্ডেন বুক অব ট্যাগোরের গ্রাহক হই নাই। ইতিপূর্ব্বে বাংলা সোনার পুঁথি অর্থাৎ জয়ন্তী-উৎসর্গ কেতাবখানা কমিশনবাদ মূল্যে খরিদ করিয়া ফেলিয়াছি। চলনসই বই একখানা—বাংলাদেশের বড় বড় কবি ও সাহিত্যিকের লেখা রবীন্দ্রনাথ নামক বস্তু বিষয়ক প্রশংসাপত্রের সমষ্টিমাত্র। একটা কথাই বারবার মনে হইতে লাগিল—যেন বিজয়া দশমীর পর একটা গাঢ় রকমের কোলাকুলি ব্যাপার ঘটিয়া গেল; নতুবা রবীন্দ্রনাথের প্রশংসাপত্র-দাতাগণের মধ্যে 'সাহিত্যিকা' লেখক শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত, notorious শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী, অধুনাস্তব্ধ-'প্রগতি'-সম্পাদক শ্রীবুদ্ধদেব বসু, 'সম্মুখে বসিয়া থাক্ পথ রুধি রবীন্দ্র ঠাকুর' কবিতার লেখক শ্রীঅচিন্ত্য সেনগুপ্ত প্রভৃতির লেখা এই 'উৎসর্গে' স্থান পাইল কেমন করিয়া! যে বালখিল্য ঋষিগণের তপস্যায় রবীন্দ্রনাথ একদা বিঘ্ন ঘটাইয়াছিলেন, দেখিলাম জয়ন্তী উৎসর্গে তাহারাই কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছে।

যাক্, গোল্ডেন বুক অব ট্যাগোরও শেষে বাহির হইল। অযোধ্যা সিংএর [illegible] একবার ক্ষণিকের জন্য দেখিয়াও লইলাম। পেল্লায় ব্যাপার!

ছাপা কাগজ ছবি ডেকোরেশন বাঁধাই—এমনটি এদেশে আর চোখে দেখি নাই। যে পাতাই খুলি (অবশ্য পাতা কাটিতে পাই নাই) সেই পাতাতেই একজন বিশ্ববরেণ্য মহাভাগ। মনে বড় দুঃখ হইল। বারোটা টাকার লোভ ছাড়িলেই হইত! শুনিলাম, এখন আর এক পয়সাও কমিশন মিলিবে না। অযোধ্যা সিংএর খোসামুদি করিয়া ফল হইবে না; দুই একটা দিনের জন্য পুঁথিখানি যে কাছে রাখিয়া পূজা করিব তাহার সুবিধা হইল না। অযোধ্যা সিং পুঁথি লইয়া চলিয়া গেল। হায় হায়! এই বাজারে আঠারো টাকা, তাই খরচ করিতে হইবে! শেষে গেলাম গোপালদার দোকানে। অনেক কৌশলে তাঁহাকে ভজাইয়া, 'পাতা কাটিব না' এই প্রতিশ্রুতি দিয়া ১২ ঘণ্টার জন্য সোনার পুঁথিখানি লইয়া ঘরে আসিলাম। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। গৃহিণী ধূপের ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার করিয়া শাঁখ বাজাইতেছিলেন। আমার হঠাৎ মনে হইল, ঘরে ঠাকুর আসিতেছে, তাঁহাকে বরণ করিবার জন্যই এই আয়োজন।

আলো জ্বালিয়া অতি সন্তর্পণে পুঁথিখানি লইয়া আসন-পিঁড়ি হইয়া বসিলাম। আ-কাটা পাতা ফাঁক করিয়া এপাতা সেপাতা উল্টাইয়া ঠিক তিনঘণ্টা কাল পুঁথির সুবর্ণ-সলিলে অবগাহন করিলাম। তারপর আহারাদি সারিয়া ভুক্ত বস্তুর গুরুত্ব নিবন্ধন চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িয়া বুকের উপর গোল্ডেন বুক অব ট্যাগোর লইয়া দেখিতে লাগিলাম—শিয়রে রহিল 'জয়ন্তী-উৎসর্গ' কেতাবখানি।

সোনার পুঁথির স্পর্শ নয়, যেন সোনার কাঠির স্পর্শ; অতি সন্তর্পণে পা টিপিয়া টিপিয়া নিদ্রালোক অতিক্রম করিয়া স্বপ্নলোকের দরজায় উপনীত হইলাম। শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ মহাশয় দ্বার রক্ষা করিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া মহাখুসী। বলিলেন, তুমিও আসিয়াছ

দেখিতেছি! আমি বলিলাম, আজ্ঞে, আপনাদের কৃপায় এহেন স্থানেও আসিতে পারিয়াছি। কিন্তু প্রোগ্রামটা কি, এখনও শুনিতে পাইলাম না, ভিতরে প্রোগ্রাম মিলিবে?

ততক্ষণে একটি সুবৃহৎ স্ত্রীপুরুষের সম্মিলিত জনতা দরজার কাছে আসিয়া পড়িয়াছে; কালিদাস বাবু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, ভিতরে সব পাকা বন্দোবস্ত—হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার টিকিটটা দেখি—সি গ্রুপ, ১৭২নং সীট; তাঁহার মুখে একটু মৃদু হাসি খেলিয়া গেল। অন্যের টিকিট লইয়া আসিয়াছি তাহা তিনি টের পাইয়াছেন বুঝিলাম। বুঝিলেন-তো-বহিয়া-গেল এইরূপ একটা ভাব দেখাইয়া একটু দ্রুত পদচারণা করিতেই বাসন্তীরঙের কোর্ত্তা ও পাঁৎলুনের ধরণের ধুতি পরিহিত একটি মিহি ছোকরা মিহি গলায় বলিল, আপনার প্রবেশপত্র? সেখানি তাহার হাতে দিতেই সে নটীর পূজার ধরণের একটা ভাব দেখাইয়া কহিল, আসুন।

জায়গাটা প্রায় কলিকাতার টাউনহলের সামনেকার জায়গার মত। বাঁ-ধারে কোন একটা বৃহৎ কম্পাউণ্ডওয়ালা বাড়ীর রেলিং ঘেঁসিয়া একটি মঞ্চের মত করা হইয়াছে, মঞ্চের চারিপাশে খুঁটি গাড়িয়া বিচিত্র সামিয়ানা টাঙানো। সেই মঞ্চের উপরে এবং আশে পাশে সম্মুখে পশ্চাতে চারিদিকে নরনারীর মুণ্ড—শিরস্ত্রাণ-অবগুণ্ঠন-শোভিত এবং খালি। ভারতবর্ষের এবং পৃথিবীর (India and the World) সর্ব্ব-জাতীয় নরনারী বিভিন্ন গ্রুপে উপবিষ্ট হইয়া ব্যাকুলভাবে মঞ্চের দিকে চাহিয়া আছেন। মঞ্চের ঠিক মধ্যভাগে বেদীর উপর পট্টবস্ত্রপরিহিত রবীন্দ্রনাথ—মঞ্চের উপর উপবিষ্ট মহারথীগণের (পুং ও স্ত্রীং) দুই একজনকে ছাড়া আর কাহাকেও ভাল করিয়া চিনিলাম না। হাওয়া লাগা অমল ধবল পালের মত শ্রীযুক্ত অমল হোম চঞ্চল হইয়া

উঠিয়াছেন—ভাবটাও একটু ফোলা-ফোলা। রবীন্দ্রনাথের পিছনে দুইজন কিশোরী চামর হস্তে দণ্ডায়মান, কিন্তু চামর ব্যজন করিতেছেন না। রবীন্দ্রনাথের সম্মুখে মঞ্চের উপর আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়া তিনজন তরুণী, হাতের পিত্তল থালিকায় ডাব ও কদলী; সম্ভবতঃ কবিকে ডাবার্ঘ্য ও কলার্ঘ্য দেওয়া হইবে।

মঞ্চের ঠিক সম্মুখে সজ্জিত নরনারীমুণ্ডের পরেই একটি অট্টালিকার ধাপ ধাপ সিঁড়ি—অট্টালিকাটি দেখিতে ঠিক আমাদের টাউনহলের মত; সেই অট্টালিকার স্তম্ভশীর্ষে সবুজ বাতির অক্ষরে 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' এই কথাটি লেখা। ব্যাজ পরিহিত ভলাণ্টিয়ার দল সিঁড়ির ধাপে ধাপে বসিয়া। কবির সম্মুখে মাইক্রোফোন—এবং দুই সুবৃহৎ বটবৃক্ষ হইতে রিসিভার বিলম্বিত।

আমি আমাদের পত্রিকার জন্য সংবাদ সংগ্রহের আশায় প্রস্তুত হইয়াই গিয়াছিলাম। নোটবই ও পেন্সিল শানাইয়া শান্ত হইয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলাম। রবীন্দ্রনাথের পিছনে দুই পাশে দুইটি সুবৃহৎ রক্তপ্রদীপ আমার একাগ্রতা বাড়াইয়া দিতেছিল।

প্রথমেই অভিনন্দনের পালা। কোন্ এক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কর্ত্তৃক বৈদিক স্তোত্র উচ্চারিত হইবার পরই সর্ব্বজাতীয় মরমীগণ, সর্ব্বকামীয় তরুণগণ, সর্ব্বহারা দুর্গতগণ, সার্ব্বভৌম চিত্রকরগণ, সর্ব্বংসহ কবিগণ এবং সর্ব্বশেষ-রাত্রীয় ওস্তাদগণ আপন আপন দলের তরফ হইতে অভিনন্দন-লিপি পাঠ করিলেন। দীর্ঘশ্বাস ও হা-হুতাশে স্বপ্নলোক চঞ্চল হইয়া উঠিল। গোল্ডেন বুক অব ট্যাগোর অথবা জয়ন্তী উৎসর্গ পুঁথিতে এগুলি স্থান পায় নাই—ইঁহারা ছাপা অভিনন্দনও বিলি করেন নাই। সুতরাং আমার নোটবহি হইতে ইঁহাদের বক্তৃতার মূল কথাগুলি লিপিবদ্ধ করিতেছি—কিন্তু সে ভাষা পাইব কোথায়?

সর্ব্বজাতীয় মরমীগণ কহিলেন, হে চরমতম মরমী, আমাদের মর্ম্মলোকের সন্ধান তুমি জানো, তোমাকে আর নূতন করিয়া কি অভিনন্দন দিব। তুমি আমাদের মর্ম্মমূলে আঘাতের পর আঘাত করিয়া আমাদের চর্ম্মকেও নরম করিয়া আনিয়াছ—দৈহিক কর্ম্মে ঘর্ম্মপাতের দ্বারা জীবন ধারণের ধর্ম্ম আমাদের নহে—আমরা পদ্মপাতার উপর শয়ন করিয়া শতদল ভক্ষণ করিয়া জীবনাতিপাত করিতেছি। তোমারই দেখাদেখি আমাদের কুঞ্চিত কেশপাশ আমাদের ঘাড় ছাড়াইয়া পিঠ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে, তোমার চশমার কালো ফিতার নাগপাশে আমরা নাগিনীদের বন্ধন করিতেছি, তোমার আলখাল্লা আমাদিগকে প্রেমের বৈরাগী করিয়া ছাড়িয়াছে; তোমার মিহি স্বর অনুকরণ করিয়া আমরা আজ পঞ্চশরকেও কাবু করিয়াছি। আমরা পুরুষ কি নারী এই সমস্যার সমাধান করিতে গিয়া নারীরাও পুরুষ হইয়া উঠিল।

সর্ব্বকালীয় তরুণগণের ভাষা স্বতন্ত্র, তাহারা এত বিনীত নহে। তাহারা কহিল, হে প্রবীণ তরুণ, হে সিদ্ধকাম, তোমার তারুণ্য আজ তরুণদেরও করেছে তরুণ, বৃদ্ধেরা মনে আর দেহে সামঞ্জস্য রাখবার জন্যে ছুটছে সব হ্বিয়েনায়। একদা আমাদের যে পুচ্ছনাচ দেখে তুমি পুলকিত হয়েছিলে; আজ আমাদের সেই পুচ্ছের পালক মুহুর্মুহু খস্‌ছে; আমরা পুলকিত হয়ে দেখ্‌ছি—সেই পালকশোভিত হয়ে নাচ্‌তে নাচতে তুমি আমাদের ওপরও টেক্কা দিলে।

সর্ব্বহারা দুর্গতগণ বেশবাসহীন রুক্ষ দেহে, শূন্য উদরে যেরূপ ভাষার ব্যবহার করিতে লাগিল তাহাতে বিস্মিত হইলাম—শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর সর্ব্বহারাদের নিবেদন ইহার কাছে হার মানিয়া যায়। তাহারা কহিল, হে কবিসম্রাট (সাজাহান?) হে কবি-জমিদার, তুমি

কবিতার এবং জমিদারীর উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াও শ্রীযুক্ত শরৎ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট কর্‌করে একটি লক্ষ নগদ টাকার থলিয়া পাইবার আশা পাইয়াও যে আমাদিগকে বিস্মৃত হও নাই—তাহাতেই আমরা খুসী হইয়া উঠিয়াছি। তোমার জয়ন্তীর দল শেষে যদি আমাদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠও দেখায় তাহা হইলেও আমরা শূন্য উদরে তোমার জয়গান করিব; বার বার বলিব—তুমি মানুষের নারায়ণে নমস্কার করিয়াছ, দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসিয়া সকলের সাথে অন্নপান ভাগ করিয়া খাইয়াছ।

সার্ব্বভৌম চিত্রকরগণের অদ্ভুত বেশভূষা দেখিয়া একটু হাসি যে পায় নাই তাহা বলিলে মিথ্যা বলা হইবে, কিন্তু তাঁহারা যাহা বলিলেন, তাহাতে আমার হাসি উবিয়া গেল—রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল। তাঁহারা কহিলেন, হে বিচিত্রচিত্রী, চিত্রাঙ্কণের উপলবন্ধুর পথে চলিতে চলিতে আমরা হঠাৎ একদা অনুভব করিলাম, যে, আমরা বদ্ধ জলাশয়ের মতো স্রোতোহীন হইয়া পচিয়া মরিতেছি, নূতন কিছু করিবার শক্তি হারাইয়াছি—পঙ্কবদ্ধ হস্তীর ন্যায় তিলে তিলে তলাইয়া যাওয়া অথবা পচিয়া মরা ছাড়া আমাদের উপায়ান্তর নাই—এমন সময়ে ভগীরথের ন্যায় মুক্তিজাহ্নবী বহন করিয়া তুমি আসিলে, ঐরাবতরূপী আমরা ভাসিয়া মুক্তিস্রোতে পড়িলাম। হে চিরনূতন, নূতন পথ তুমি আমাদের দেখাইলে। *

---

* এই বিষয়ে Rupam সম্পাদক O. C. Gangoly মহোদয়ের প্রবন্ধ Rabindranath Tagore's Drawings দ্রষ্টব্য। তিনি লিখিয়াছেন—The original creations of the poet in a new world of Expression will help us to realise the fundamental values of Forms for their own sake, and incidentally to chide away the prejudices and misconceptions which had misled us to regard Art as the imitative representation of

সর্ব্বংসহ কবিগণ একটি কবিতা পাঠ করিলেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ—হে কবি, তুমিই আমাদের শিখিয়েছ, বাবাকে বাবা বলতে, মাকে বলতে মা। মাসী এবং মাসতুতো বোন যে কি বস্তু তাহা তোমার কৃপায় বুঝেছি আমরা। তোমার কবিতা পড়ার আগে হিমালয়কে ভাল লাগতো না, বলাকাকে শুধু হাঁসের সারি বলেই জানতাম—সজনেফুল ভাজা এবং সজনে ডাঁটার চচ্চড়ি খেয়েই সজনে গাছের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ যেত চুকে—নটীদের আমরা জানতাম অস্পৃশ্যা। হে কবি, তুমিই শিখিয়েছ আমাদের যে দুই আর দুইয়ে পাঁচ হয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছয়ও; তুমিই শিখিয়েছ ভূমি আর ভূমা এক নয়।

সর্ব্বশেষরাত্রীয় ওস্তাদগণ কি বলিলেন ঠিক অনুধাবন করিতে পারিলাম না, সঙ্গীতে আমি একেবারে অনভিজ্ঞ। তবে কড়ি মধ্যম, কোমল গা ইত্যাদি শুনিয়া বুঝিলাম সঙ্গীতবিষয়ক আলোচনাই হইতেছে।

অভিনন্দন ব্যাপার সমাপ্ত হইতেই এক তাজ্জব ব্যাপার ঘটিল। হঠাৎ উৎসব প্রাঙ্গণের সকল আলো নিবিয়া গেল। হৈ হৈ হল্লা, প্রথমে কিছুই ঠাহর হয় না; এঁকে ওঁকে সাধিয়া সাধিয়া যাহা অবগত হইলাম তাহা এই; স্বপ্ন-লোকের সোনার পুঁথি ও জয়ন্তী উৎসর্গের লেখকগণ অন্ধকারের পরপার হইতে কবির নিকটে নিজেরাই তাঁহাদের স্ব-স্ব রচনা, বাণী ও অভি-বেদনা পাঠ করিবার জন্য স্বদলবলে আসিতেছিলেন—অমল হোমের

natural appearances. The neglected artists of the Modern Revival in Bengal, the starving outcastes of the modern Bengali culture, are rejoicing in the fact that the conversion of a great literary genius to the true doctrines of plastic creeds is a veritable triumph for them.........

দল তাঁহাদিগকে বাধা দেয়, তাহারা বলে মেম্বরশিপ টিকিট না দেখাইতে পারিলে প্রবেশ নিষেধ। নাগ মহাশয় সোনার পুঁথির তদারক, মর্ত্ত্যলোকে এবং স্বপ্নলোকেও; তিনি ইঁহাদের অনেককেই চেহারায় চিনিতেন, তিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। আগাগোড়া ব্যাপারটা বিধানচন্দ্র রায়ের নিকট পেশ করা হয়; তিনি অনুমতি দিতে যাইবেন, এমন সময় সমস্ত আলো যায় নিবিয়া—আগন্তুকদের কেহ আলো নিবাইয়া অন্ধকারে রবীন্দ্রনাথকে চুরী করিবার মৎলব করিয়া থাকিবেন কিন্তু সুকৌশলী অমল হোমের তৎপরতায় তাহা ঘটিতে পায় নাই।

যাহা হউক, আলো জ্বলিয়া উঠিল, আগন্তুকেরা ছায়ার মত কায়া লইয়া ত্রিশঙ্কু ফ্যাশনে শূন্যেই আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়া স্ব-স্ব আশীর্ব্বেদনা ও অভিবেদনা পাঠ করিলেন। প্রথমেই এক জটাজুট-মণ্ডিত ঋষি—শুনিলাম তিনি উপনিষৎ-রচনাকারীদের মধ্যে একজন—গম্ভীর গলায় এক স্তোত্র আবৃত্তি করিলেন। ভাষাটা সংস্কৃতের মতো ঠেকিলেও কিছুই বোধগম্য হইল না। তারপর আরো কয়েকজন ঋষি—তাঁহাদের অনেকেই ভিন্নদেশীয়—আশীর্ব্বাদবাণী উচ্চারণ করিলেন। ইহার পরে যিনি উঠিলেন তাঁহার চেহারাটা চেনা চেনা—প্রিন্স দ্বারকানাথ বলিয়া বোধ হইল। আশীর্ব্বাদ শুনিয়া বুঝিলাম, প্রিন্স দ্বারকানাথই বটেন। তিনি বলিলেন, বৎস, তুমি আমার কুল উজ্জ্বল করিয়াছ; একদা যে কাশ্মিরী শাল আমি পশ্চিমের আভিজাত বর্গকে বিলাইয়া আসিয়া 'প্রিন্স' আখ্যা লাভ করিয়াছি, তুমি নিজগুণে সেই সকল 'শালী'দের নিকট হইতে উপঢৌকন আদায় করিয়াছ, আমি তোমাকে শতমুখে আশীর্ব্বাদ করিতেছি।

ইহার পর অনেকেই উঠিলেন এবং বহুবিধ আশীর্ব্বাদবাণী পাঠ করিলেন; এত ঘন ঘন এই ব্যাপার ঘটিতে লাগিল যে সব নোট

করিয়া লইতে পারি নাই। যে কয়জনের কথা মনে আছে লিখিতেছি।

বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, রবির পিছনে একদা যে ছায়া লক্ষ্য করিয়া আমি ভয় পাইয়াছিলাম, সে ছায়া যে ছায়াই রহিয়া গেল, ইহাতেই আমি প্রীত হইয়াছি।

নবীনচন্দ্র বলিলেন—আমার ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হইয়াছে—আজ ঠাকুরবাড়ীর কাঁচামিঠা আঁব পরিপক্ক ফজলী। রবিবাবু আজ বাঙালার 'শেলি' কীট্‌স' এডগার পো'—কতকিছু বলিয়া পরিচিত। নব্যবঙ্গ তাঁহার সাহিত্যের ও তাঁহার সখের অনুকরণে উন্মত্ত।

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ বলিলেন, একদা রবীন্দ্রনাথের পুলক বাঙলার গাছে গাছে নাচিতে দেখিয়া আমি যে আশঙ্কা করিয়াছিলাম, আজ দেখিতেছি মানুষের মাথায় মাথায় সে পুলকের ঢেউ খেলিতেছে—
—আমার মিঠে কড়ায় কাজ হয় নাই দেখিয়া খুসীই হইয়াছি।

'শোন নলিনী খোল গো আঁখি'র নলিনী এবং শেষের কবিতার অমিট্ রায়ে ও এই দলে ছিলেন। নলিনী বলিলেন, হে রবি, আমি যখন কোরক-জীবন যাপন করিতেছিলাম, তুমি তখন আমার আঁখি খুলাইবার জন্য গান গাহিয়াছিলে, আমার সেই আঁখি খুলিয়া গিয়া মৃত্যুস্পর্শে নির্নিমেষ হইল। কিন্তু হে নিষ্ঠুর, তুমি আর আমাকে গান শোনাইতে আসিলে না। তোমার উন্মীল চক্ষু তুমি আজিও সমানে খুলিয়া আছ বেশ।

অমিটরায়ে তাহার সেই বাঁকা একপেশে হাসি হাসিতে হাসিতে বলিল, এ অভিনন্দনে আমি প্রাণ খুলে যোগ দিতে পারছি না। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে আমার এই নালিস আজও ঘুচ্‌ল না যে বুড়ো ওয়ার্ডস্বার্থের নকল করে ভদ্রলোক অতি অন্যায় রকম বেঁচে আছেন।

এতদ্‌ব্যতীত, লীলালোক হইতে লীলাবতী, লক্ষ্মণাবতী হইতে লক্ষ্মণ, কপিলাবস্তু হইতে বুদ্ধদেব, ব্রহ্মলোক হইতে যাজ্ঞবল্ক্যের পুত্র, বেহেস্তে আকবরের নবরত্নের সভালোক হইতে বীরবল, প্রশ্নলোক হইতে শেষ প্রশ্ন, শিবলোক হইতে শিব—অনেকেই অভিনন্দন পাঠ করিলেন।

কপিলাবস্তুর বুদ্ধদেবের বাণীতে একটু বৈচিত্র্য ছিল বলিয়া স্মরণ আছে। তিনি বলিলেন, হে কবি, তোমার বিদায় অভিশাপের একটি পংক্তি আমি আজীবন ধ্যান করিয়া আসিলাম কিন্তু আজিও আমার সাধনা সম্পূর্ণ হইল না। এই ধ্যান করিতে করিতেই আমি মরিব। —তুমি লিখিয়াছে,

রমণীরমণসহস্র বর্ষের সখা সাধনার ধন।

মুদ্রাকর প্রমাদ আমিই সংশোধন করিয়া লইয়াছি। এই পংক্তিটির জন্যই তুমি আমার নমস্য।

বিদেশ হইতে প্রায় সকল মহারথীই কিছু না কিছু বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন, ইংরাজী ফরাসী, জার্ম্মাণ, চেক, ডেনিশ, সোয়েডিশ, রুষ, ইতালীয় সকল ভাষাতেই অভিনন্দন ছিল। সব চাইতে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কামস্কাট্‌কা হইতে বিথলোতেলাচুংভিস্কি, মাদাগাস্কার হইতে হবুদামক্ ও হনলুলু হইতে কূল্যালুও অভিনন্দন-বাণী পাঠ করিয়া গেলেন।

তারপর প্রবন্ধ পাঠের ঘটা, রবীন্দ্রনাথের এমন একটা দিকও রহিল না, আলোচনায় যাহা বাদ পড়িল। এই প্রবন্ধগুলি সম্বন্ধে এককথায় অল্প পরিসরে কিছু বলিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। জয়ন্তী উৎসর্গ কেতাবখানি দেখিলেই এই সকল প্রবন্ধের বহর সম্বন্ধে পাঠকের কিঞ্চিৎ জ্ঞান হইবে। কোনও প্রবন্ধ, বা তন্নিহিত বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে কোনও বিশেষ পরিচয় আমরা দিতে চেষ্টা করিব না। যে-যে বিষয়ে প্রবন্ধ

পাঠ করা হইয়াছিল তাহার উল্লেখ করিতেছি। যদি সুবিধা হয় ভবিষ্যতে এই সকল প্রবন্ধ ক্রমে ক্রমে আমরা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

প্রবন্ধগুলির নাম যথাক্রমে এইরূপ—

প্রশংসাপত্রে	রবীন্দ্রনাথ
রুদ্র	”
বুদ্ধ	”
প্রবুদ্ধ	”
পক্ষীতত্ত্বে	”
নাগরিক	”
অন্ধকারে	”
যৌনতত্ত্বে	”
গন্ধে	”
অচলায়তনে	”
দীক্ষায়	”
ভিক্ষায়	”
শিক্ষায়	”
প্রতীক্ষায়	”
কবিরাজ	”
হোমিওপ্যাথিতে	”
পত্রধারায়	”
হলচালনে	”
নটরাজ	”
তিনপুরুষে	”

যাত্রী	রবীন্দ্রনাথ
রসায়নে	,,
বিশ্বমানব	,,
সাক্ষাতে	,,
পরোক্ষে	,,

এতদ্ব্যতীত, সভার সময় উত্তীর্ণ হওয়াতে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলির লেখকেরা প্রবন্ধ পাঠ করিবার অনুমতি পান নাই। তবে সেগুলি পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

অপূর্ব্ব	রবীন্দ্রনাথ
অমল	,,
প্রশান্ত	,,
প্রমথ	,,
রথী	,,
চক্রবর্ত্তী	,,

অতঃপর 'জয়-জয়ন্তী' * গানটি আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সকলে শ্রদ্ধায় দণ্ডায়মান হইলেন। গান শেষ হইলে সভা ভঙ্গ হইল।

সভাভঙ্গ হইলে ভক্তিগদ্‌গদচিত্তে সমবেত মহিলাবৃন্দকে পথ ছাড়িয়া দিতে দিতে আমরা অনেকে মেলাঙ্গনে প্রবেশ করিলাম। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে যে-যে শিল্পের উন্নতি হইয়াছে সেই সেই শিল্পের নিদর্শন ষ্টলে ষ্টলে সজ্জিত। এক স্থলে ম্যাজিকের ব্যবস্থাও দেখিলাম। মেলা দেখিয়া এবং পরস্পর মিলিত হইয়া চিত্ত পুলকিত হইল—আমরা অট্টালিকাভ্যন্তরে শিল্প-প্রদর্শনী দেখিতে গেলাম। চামড়া, কাঁথা,

* এই সংখ্যায় অন্যত্র।

ছবি, কেতাব, পাণ্ডুলিপি ও ফটোগ্রাফের সে যেন অষ্টবজ্রসম্মেলন! মনে মনে অতিশয় গর্ব্ব হইল, এবং গর্ব্বিত অন্তঃকরণে বহুকষ্টে সংগৃহীত টিকিটের সাহায্যে 'লটির পূজা' নাটক * দেখিতে ছুটিলাম।

নাটক দেখিতে দেখিতে এমনই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, অভিনয় শেষে নিতান্ত তালকানার মত মাঝ রাস্তা ধরিয়া হাঁটিতে গিয়া মোটরচাপা পড়িয়া ইহলীলা সম্বরণ করিলাম।

লটির পূজা

(নাটিকা)

[প্রারম্ভেই বলিয়া দেওয়া ভাল যে গোল্ড রিজার্ভ ষ্ট্যাণ্ডার্ডের সহিত এই নাটিকার কোনই যোগ নাই—কম্যুনাল সমস্যার কোন মীমাংসার চেষ্টাও ইহাতে করা হয় নাই। তপোবনের মেয়েদের একটি কলাসম্মত অকুপেশনের ব্যবস্থা করাই এই নাটিকার উদ্দেশ্য। সবাক চিত্রে—যাক্ সে কথা। দর্শকের মনে প্রশ্ন জাগিতে পারে—পূজা হইতেছে কাহার এবং পূজা করিতেছে কে? ইহার উত্তর অতি সহজ, যাঁহার পূজা হইতেছে, রঙ্গমঞ্চে তাঁহার উপস্থিত হইবার প্রয়োজন নাই; নাটক অভিনীত হইবার কালে তিনি নেপথ্যে সোফায় শয়ন করিয়া গলার আওয়াজ দানাদার করিয়া লইবার জন্য স্বরকল্যাণ-বটিকা সেবন করিতে পারেন—অনুপান কুক্‌সীমের রস এক ছটাক। পূজা করিবে লটি ও

* 'লটির পূজা' নাটকের চুম্বক এই সংখ্যায় অন্যত্র দ্রষ্টব্য।

তাহার দলবল। এই নাটকে লিসি ও সিসিকে দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন তাহারা 'শেষের কবিতা'র অমিট রায়ের ভগিনীদ্বয়, একজন লিলিও এই দলে আছে, কিন্তু সে লিলি গাঙ্গুলি নয়, হাজরা। তবে শেষের কবিতার সিসি-লিসির সহিত লটির পূজার লটি, লিসি-সিসির গোত্র ও গাঁই এক। এদেরও "উঁচু খুরওয়ালা জুতো, লেসওয়ালা বুক-কাটা জ্যাকেটের ফাঁকে প্রবালে অ্যাম্বারে মেশানো মালা, সাড়িটা গায়ে তির্য্যগ্‌ভঙ্গীতে আঁট করে ল্যাপটানো, এরাও 'মুখ ঈষৎ বেঁকিয়ে উঁচু কটাক্ষে চায় এবং পুরুষ বন্ধুর চৌকির হাতার উপরে ব'সে···।' ষ্ট্যাণ্ডার্ড আর বেবি অষ্টিন গাড়ীর তফাৎ এরা জানে। শুধু প্রভেদ এই যে, হিল্‌-তোলা জুতোর ভিতরে এদের টুকটুকে পায়ে আলতার ছোপ—কুঞ্চিত ভুরুর কাছটায় সিঁদুরের টিপ। এরা মায়ের সঙ্গে থাকিতে ততটা পছন্দ করে না যতটা পছন্দ করে দাদার সঙ্গ। এদের পূজার ধরণটা—ভূতপূর্ব্ব এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে যাঁহারা মধু বোসের নেতৃত্বে অভিনীত 'আলিবাবা' দেখিয়াছেন, তাঁহারাই অনুমান করিতে পারিবেন।

সমস্ত নাটিকাটি মহিলাদের দ্বারা অভিনীত হইবে—শুধু নেপথ্যে থাকিবেন আচার্য্য—ইচ্ছামত ও খেয়ালমত তিনি রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতে পারিবেন। কোনও অভিনেত্রী নাচে বা গানে বা অভিনয়ে ভুল করিলে রঙ্গমঞ্চেই চোখ রাঙাইবার অধিকার তাঁহার থাকিবে, কিন্তু চোখে সুরমা মাখিলে চলিবে না।

আর থাকিবে নেপথ্যে গানের দল বা সখা-সম্প্রদায়, ইহারা আকৃতিতে মোটা হইলে ক্ষতি নাই, কিন্তু বেঁটে হইলে চলিবে না। গানকে রুচি-সঙ্গত করিবার জন্য ইহাদিগকে হাঁপানি প্র্যাকটিশ করিতে হইবে; এইজন্য বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যেন রঙ্গমঞ্চের

আনাচে কানাচে কোথাও আরসোলা না থাকে। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আবিষ্কার—আরসোলা হাঁপানির ঔষধ।

সমস্ত অভিনয়টি নদীর ধারে কদম গাছ তলায় হওয়া আবশ্যক—মেঘাচ্ছন্ন আকাশে বিদ্যুৎ চমক ও দুই চারিটি ঘুড়ি দৃষ্ট হওয়া চাই। মেঘ-গর্জ্জন ও টিট্টিভ পক্ষীর ডাক শোনা গেলেই নাটকের যথার্থ অ্যাট্‌মস্‌ফিয়ার সৃষ্টি হইবে। অভাবে ছাদাচ্ছাদিত ঘরের স্থানে স্থানে কদমা ঝুলাইয়া একজন হরবোলার সাহায্যে শাঁক আলুর মতো শব্দ করিতে হইবে। উত্তর কলিকাতায় এ অভিনয় চলিবে না।

এই নাটিকার মূল প্রেরণা—পাঁচজন কিশোরীকে লইয়া দশজন দর্শকের সম্মুখে একটু রঙ্গরস করা। দর্শকদের এমন সম্প্রদায়ের ও এমন বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন যেন ট্যাকের পয়সা ব্যয় করিয়া নাটক দেখিয়াও তাহারা মনে করিতে পারে যে কৃতকৃতার্থ হইলাম। পদ্মিনীর দেশের লোক যত হয় ততই ভাল।

'যাদুকর' নাটিকার ন্যায় এ নাটিকাতেও মাঝে মাঝে ঘণ্টা বাজাইতে হইবে। ঘণ্টা অভাবে ভাঙা কাঁসার থালা বাজাইলেও চলিবে।

অভিনয়ের দিন অভিনেত্রীদের ষ্টেজের বাহিরে চা, এগ্‌-পোচ্‌ ও সিগারেট খাওয়া নিষেধ।]

নাট্যোল্লিখিত পাত্রীগণ

রিণি···বালিগঞ্জ লাভলক্‌ প্লেসের ব্যারিষ্টার এস্‌ তালুকদারের গৃহিণী।

কেট্‌···ঐ কন্যা—এন আর দাশ আই-সি-এস ইহাকে বাগ্‌দান করিয়াছেন।

বিনি···এন আর দাশ আই-সি-এস এর ভগিনী, গ্রাম্য।

লিসি··· |
সিসি··· |
লিলি··· | কেটের দক্ষিণাঞ্চলের সখিগণ
লবি··· |
জিতা··· |

মল্লিকা···বিনির দাসী।

লটি······ব্যারিষ্টার এস তালুকদারের কর্ত্তৃক প্রতিপালিত।

রামমোহিনী দেবী—আচার্য্য ব্রহ্মসুন্দর বলের সহধর্ম্মিণী।

আয়া, লেডী ডাক্তার ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

[ব্যারিষ্টার এস তালুকদারের গাড়ী বারাণ্ডা, সাম্নের দিক আইভি লতায় আচ্ছন্ন। পাশের গারাজে সিক্স শিলিণ্ডার সিডানবডি শেবরুলে গাড়ীখানা ষ্টার্ট পাইয়া ধ্বক্ ধ্বক্ করিতেছে! রিণি তালুকদার ও রামমোহিনী দেবী কথোপকথন-নিরতা।]

রিণি। চুলোয় যাক্ ধর্ম্ম, ধর্ম্ম করে যা লাভ হয়েছে তাতো দেখতেই পাচ্ছি। নইলে, আমার মত মন্দির আর করল ক'জন? লাভ হ'ল কি? স্বামী রইলেন একটা দুশ্চরিত্রা—যাক্; আর ছেলে? ছেলেই হ'লনা। অথচ দেখুন লতাকে,—লতা বাঁড়ুয্যে জন্মে অবধি অধর্ম্ম অনাচার আর স্ফূর্ত্তির মধ্যে ডুবে রইল—তার স্বামী তার কি রকম হাত-ধরা, আর ছেলে! ছেলের জ্বালায় সে বাড়ীতে পা দেবার যো আছে? গিজ গিজ কচ্ছে।

রামমোহিনী। ও কথা বলো না, মা, আপাত-দৃষ্টিতে যা সুন্দর,

সুন্দর সে না হতেও পারে। আজ হয়তো কোনও কারণে তোমার স্বামী তোমার প্রতি বিরূপ কিন্তু, তুমি যদি সত্যই ধর্ম্মকে কামনা করে থাক—

রিণি। (উত্তেজিত কণ্ঠে) যদি কি মিসেস বল্, সে কথা তো আপনিও জানেন! আমি মেয়েকে সে জন্যে সর্ব্বদাই ধর্ম্মের কবল থেকে বাঁচিয়ে চলেছি। অন্ততঃ একটা পরীক্ষাও তো হবে।

রামমোহিনী। তা'হলে সত্যিই মাঘোৎসবে তোমার মেয়েকে গান গাইতে পাঠাবে না? ১১ই মাঘেও সে যাবে না?

রিণি। না না, তার চাইতে বরং লটিকে নিয়ে যান। সেও তো বেশ গায়।

রামমোহিনী। [স্বগতঃ] কিন্তু তোমার মেয়ের জন্যে যে আমার ছেলে খেপেছে বাছা! [প্রকাশ্যে] ভেবে দেখো বাছা, এতটা বাড়াবাড়ি ভাল নয়। বিয়েও তো দিতে হবে মেয়ের।

রিণি। নমস্কার, সে জন্যে আপনাকে ভাবতে হবে না। হরিশ, হরিশ, কেট্‌কে ডাক। আচ্ছা, আসুন তা'হলে।

[রামমোহিনী দেবীর ধীরে ধীরে প্রস্থান। খুট খুট জুতার আওয়াজ করিতে করিতে সিঁড়ির রেলিংয়ের কাঠের উপর বাম হাত বুলাইতে বুলাইতে ও গুণ গুণ করিয়া গান করিতে করিতে কেটের প্রবেশ। বুক-কাটা ব্লাউজ, খোপা এলোমেলো ভাবে জড়ানো এবং সাড়ীটা এমন ভাবে কোমর হইতে পা পর্য্যন্ত ল্যাপ্টানো যে দূর হইতে দেখিলে তাহাকে ছবিতে দৃষ্ট মৎস্য-বালার মতো বোধ হয়। ডান হাতে টেনিস র‍্যাকেট।]

কেট। গেছে? হাম্‌বাগ কোথাকার! আমার সম্বন্ধে নাকি সমাজ-পাড়ায় বড্ড কথা শুনছেন উনি? এদিকে ওঁর ছেলে তো হ্যাংলার মতো—

রিণি। থাম্ বাপু। লটি কোথায় ?

কেট। তিনি গান প্রাকটিস্ করছেন, মাঘোৎসবে সম্মিলনী-সমাজে গাইবেন। চল মা, দেরী হয়ে যাচ্ছে। ওরা হয়তো এসে বসে আছে।

রিণি। হুঁ, গান প্রাকটিস্ করছে, আচ্ছা!

[উভয়ে গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন]

[দৃশ্য পরিবর্ত্তন]

[আধ ঘণ্টা পরে, সামনের লনে লটি ও এন আর দাস, আই সি এসের ভগিনী বিনি পায়চারি করিতেছে। লটির পরণে একটা সাদা-সিধা লালপাড় সাড়ী, পায়ে চটি। বিনির সকল দেহে ও সাজ-সজ্জায় আধুনিক হইবার একটা হাস্যকর প্রয়াস]

বিনি। ভালই হয়েছে ভাই, আজ ওরা বেরিয়ে গেছে। দুদণ্ড নিরিবিলিতে কথা বল্‌তে পারব। সত্যি ভাই, দাদা তোমার কথা বড্ড বলেন। বলেন, একই বাড়ীতে মানুষ অথচ দুজনে কত তফাৎ।

লটি। (হাসিতে হাসিতে) তোমার দাদার তো এখন একথা বলা শোভা পায় না—

বিনি। আমিও তো তাই ভাবি ভাই, কেটকে দাদা পছন্দ করল কি করে? কোনও জিনিষের একটু এদিক ওদিক দাদা সইতে পারে না। রবিবার দিন যদি দাদাকে দেখ তো বুঝতে পারবে।

লটি। অথচ কেট—

বিনি। দাদা ছোঁয় না সিগারেট, শুনেছি সিগারেট না হলে কেটের একদণ্ড চলে না। ফাষ্ট লাইফ দাদা একদম—

লটি। থাক্‌গে ভাই, পরের কথা নিয়ে এমন সুন্দর সন্ধ্যেটা মাটি

করে কি হবে? তার চাইতে তোমার দাদার কথা বল। আচ্ছা, বিলেত থেকে ফিরে তাঁর কি কিছু বদল হয় নি?

বিনি। [স্বগতঃ] ছুঁড়ি মরেছে দেখ্‌ছি—তা দাদার সঙ্গে এর বিয়ে হলে দুটিতে ঠিক মানাতো। [প্রকাশ্যে] তা ভাই, হয়েছে বই কি। বিলেতে যাবার আগে যদিও বা কিছু বিলিতি ধরণ ছিল—ফিরে এসে একেবারে খাঁটি স্বদেশী—

লটি। (স্বগতঃ) তাহলে আমি ভুল করিনি। (প্রকাশ্যে) এস ভাই, একটু বসি।

বিনি। তুমি একটা গান গাও, তোমার গান অনেক দিন শুনিনি—

লটি। (হাসিয়া) জীবন ভোর কেটের গান শোনার সৌভাগ্য যাদের হবে তাদের কি আর আমার গান পছন্দ হবে?

বিনি। (লটির গালে মৃদু করাঘাত করিয়া) গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল—নে ভাই, গা'।

[লটির গান]

কোথায় সুরু কোথায় খেলার শেষ,
না পাই তাহা ভেবে,
আমি ভাবি, খেলার শেষে মোরে
কি দান তুমি দেবে।
পথের ধূলায় ধূসর অঙ্গ মম
মালা হতে খসা ফুলের সম—
নিজের গুণে যদিও তুমি ক্ষম—
বক্ষে তুলে নেবে?

তুমি আমায় দেখ্‌লে যখন প্রভু
দেখিলে জনতায়—
ধূলি যদি ধূলায় মিশে কভু
কে দেখে তায় হায় !
সোনার আলো ছুঁইল নদী জল—
সন্ধ্যা বিছায় তিমির-অঞ্চল।
প্রভু কখন আসবে তুমি বল—
সময় হল এবে ?

দ্বিতীয় অঙ্ক

[ভোম্বল মুখার্জ্জির কম্পাউণ্ডের ভিতর টেনিসকোর্ট। পাশে এলোমেলো ভাবে চেয়ার সজ্জিত ; চার পাঁচটি চেয়ারের মাঝখানে একটি করিয়া টিপয়। তদুপরি পেয়ালা, পিরিচ ও অ্যাশট্রে। বিভিন্ন গ্রুপে রিণি, কেট, লিসি, সিসি, লিলি, লবি, জিতা—কাহারও হাতে পেয়ালা ; কেহ সিগারেট টানিতেছে। সকলেই ঘর্ম্মাক্তকলেবর ; পুরুষপার্টনারেরা ভিতরে ড্রইং রুমে মদ্য ও ধূমপান নিরত]

[লিলি ও জিতা জনান্তিকে]

লিলি। What's up ? এতদিনের engagement, অথচ বে' হচ্ছে না কেন ? ওদের কি রক্তমাংসের শরীর ?

জিতা। সত্যি ! কোথায় কোন্ স্ক্রুয়ে কে প্যাঁচ মেরেছে কে বলতে পারে ভাই ? তবে শুনছি দাস কেটের এমন going head over heels পছন্দ করে না।

[দূরে কেট তাহার মাকে লক্ষ্য করিয়া]

কেট। শুনেছ মা, ভবানীপুরে লটির নাকি জয়জয়কার পড়ে গ্যাছে। এ অঞ্চলের ছেলেদের আইডিয়াল্ উয়োম্যান না কি সেই।

সিসি। (হাসিয়া) দাস কোন্ অঞ্চলে থাকে কেট? প্রাণ খুলে বল্‌তে পারলি? বাধ্‌ল না?

কেট। বাধবে কেন? Dases there are enough and to spare—

লিসি। All equal as bedfellows?

কেট। চুপ, মা শুন্‌বে।

জিতা। তা, আজ লটি এল না কেন?

বিনি। [দূর হইতে উচ্চ গলায়] তিনি মাঘোৎসব প্রাকটিস করছেন।

সিসি। শোভনাল্লা! এ winter-টা পেরোতে দিলে না দেখ্‌ছি!

লবি। চুপ্—they are coming।

[নেপথ্যে উচ্চহাস্য ও অসংবদ্ধ আলাপ]

তৃতীয় অঙ্ক

[দশই মাঘ রাত্রি দশটা। রিণির শয়ন-কক্ষ আধুনিক প্রথায় সজ্জিত। রিণি চঞ্চল ভাবে পদচারণা করিতেছে।]

রিণি। দেব না যেতে, দেখি ওর ঘাড়ে কটা মাথা! ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া! নেপেনকে হাত করার চেষ্টা! ও! আমি দুধ কলা দিয়ে সাপ পুষেছিলুম! ধর্ম্ম? উঃ কি চালাক মেয়ে! হরিশকে বলেছি, ভোরে গেট কিছুতেই খুলবে না। গাড়ী তো বের হবেই না। আজ তালুকদার থাক্‌লে মুস্কিল হত। ভালই হয়েছে। মেয়েটার উপর ওর টান আছে। আর পরের মেয়ের দিকে ওর টান নেই

একথা ওর পরম শত্রুতেও বল্‌বে না। ছি ছি! কি বল্‌ছি আমি! পাগল হয়ে গেলুম নাকি! (সোফায় উপবেশন]

[দৃশ্য পরিবর্ত্তন]

[রাত্রি সাড়ে তিনটায় বাহিরের সাজ পরিহিত লটি লোহার কোলাপ্‌সিব্‌ল্‌ গেটে করাঘাত করিতে করিতে আর্ত্তকণ্ঠে]

লটি। হরিশ, হরিশ। তোমার পায়ে পড়ি, গেট খুলে দাও, আমাকে যেতেই হইবে। হরিশ—

[দুই হাতে গেট ধরিয়া ধীরে ধীরে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া শূন্য দৃষ্টিতে বাহিরের অন্ধকার আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। এই অবস্থায় অতি মৃদু কণ্ঠে আত্মবিস্মৃতভাবে গাহিতে লাগিল—

আমায় ক্ষমোহে ক্ষমো, নমোহে নমঃ
তোমায় স্মরি, হে নিরুপম
নৃত্যরসে চিত্ত মম
উছল হয়ে বাজে।
আমার সকল দেহের আকুল রবে
মন্ত্রহারা তোমার স্তবে
ডাইনে বামে ছন্দ নামে
নব জনমের মাঝে।
তোমার বন্দনা মোর ভঙ্গিতে আজ
সঙ্গীতে বিরাজে।

পূর্ব্বাকাশ ধীরে ধীরে লোহিতাভ হইতে লাগিল। লটির খেয়াল নাই। তাহার দুই চোখে অশ্রু উছলিয়া পড়িতে লাগিল। এমন সময় বাহিরে মোটরের আওয়াজ শোনা গেল। দূর হইতে কে যেন হাঁকিল,

'মিসেস বল, আপনারা মন্দিরে যাবেন না ? আমি যে আপনাদের নিতে এসেছি।' লটি তখনও গাহিতেছে—

একি পরম ব্যথায় পরাণ কাঁপায়
কাঁপন বক্ষে লাগে
শান্তি সাগরে ঢেউ খেলে যায়
সুন্দর তায় জাগে।
আমার সব চেতনা সব বেদনা—

[এবারে অতি নিকটে শোনা গেল, 'লটি আমি এসেছি, আমি নৃপেন।']

বহিল এযে কী আরাধনা
তোমার পায়ে মোর সাধনা
মরে না যেন লাজে।

যবনিকা

[এখানে আমরা কেবল নাটিকাটির চুম্বক প্রকাশ করিলাম। আসল নাটিকাটি আট আনা মূল্যে স্বপ্নভারতী অফিসে প্রাপ্তব্য।]

সংবাদ-সাহিত্য

পরম্পরায় শোনা যাইতেছে; রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবে দুর্গতগণের জন্য উদ্বৃত্ত তো কিছুই নাই পরন্তু হিসাবনিকাশ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, হাজার কয়েক টাকার ঘাট্‌তি পড়িয়াছে। সম্ভবতঃ কোনও সংবাদপত্রে এখনও হিসাব প্রকাশিত হয় নাই। হইলে আমাদের নজরে পড়িত।

ঘাট্‌তি সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার নাই। হয়তো আশানুরূপ টাকা উঠে নাই, হয়তো আরো অধিক টাকা উঠাইবার প্রত্যাশায় প্রারম্ভেই বিজ্ঞাপন ইত্যাদিতে এমন খরচ করা হইয়াছে যে শেষরক্ষা হয় নাই। ব্যাপারটা যাহাই ঘটুক, জন-সাধারণের নিকট কর্ত্তৃপক্ষ এবিষয়ে জবাবদিহি করিতে বাধ্য। যদি কোনও বিশেষ ব্যক্তির গাফিলতিতে এই কাণ্ড ঘটিয়া থাকে তাহা হইলেও তাহা সাধারণ্যে প্রচার করা আবশ্যক।

আমাদের বক্তব্য দুর্গতগণকে লইয়া। উৎসব-সমিতির একজন সম্মানার্হ সদস্যের নিকট শুনিলাম, দুর্গতদের কথা উঠিয়াছিল অন্য কারণে। 'পথের দাবীর' সব্যসাচী চরিত্রের স্রষ্টা ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নাকি রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে দেশের লোকের নিকট অবলীলাক্রমে চাঁদা তুলিয়া একটি একলক্ষ টাকার থলি রবীন্দ্রনাথকে উপহার দিবেন বলিয়া আশাইয়াছিলেন। একথা রবীন্দ্রনাথকে জ্ঞাপন করাতে রবীন্দ্রনাথ শরৎবাবুকে যে পত্র লেখেন, তাহাই ব্লক করিয়া ছাপিয়া প্রায় সকল বাংলা মাসিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্ররূপে ছাড়া হইয়াছিল। তাহাতে আছে যে শরৎচন্দ্র যে টাকা

তুলিয়া রবীন্দ্রনাথকে দিতে চাহিতেছেন, রবীন্দ্রনাথের নিজের তাহাতে প্রয়োজন নাই। খরচ-খরচা বাদ উদ্বৃত্ত যাহা থাকিবে বাংলাদেশের বন্যা-দুর্ভিক্ষ-পীড়িত দুর্গতগণকে তাহা বিলাইয়া দিলেই রবীন্দ্রনাথ খুসী হইবেন।

অতি ভাল কথা। কিন্তু শরৎবাবুর বেলুন প্রারম্ভেই ফাঁসিয়া যায়, সুতরাং দুর্গতগণের সম্বন্ধে প্রস্তাবও হইয়া যায় বাতিল। একথা যদি বাংলাদেশের জনসাধারণকে তখনই জানাইয়া দেওয়া হইত তাহা হইলে গোলমাল মিটিয়া যাইত। কিন্তু উৎসব-কর্ত্তৃপক্ষের কেহ অথবা কেহ-কেহ অথবা সকলেই দুর্গতগণের দুঃখ-হরণের প্রস্তাবের সুবিধাটুকু পরিত্যাগ করিতে চাহিলেন না; দুর্গতগণের নামে মেম্বরশিপ টিকিট বিক্রয় ও খুচরা দর্শকের ভিড় অধিক হইতে পারে ইহা কল্পনা করা স্বাভাবিক এবং দুর্গতগণের দুঃখ-হরণের প্রস্তাব বাতিল হওয়া সত্ত্বেও শরৎচন্দ্রের নিকট রবীন্দ্রনাথের চিঠির ব্লক ছাপা ও ক্রোড়পত্ররূপে মাসিকে মাসিকে পাঠানো যে বুদ্ধিমানের কাজ হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতে সততা রক্ষা হয় নাই।

হয়তো উৎসব-কর্ত্তৃপক্ষ ভাবিয়াছিলেন যে, উৎসবের খরচ-খরচা বাদ যদি চাঁদা ও টিকিটের টাকা হইতে কিছু বাঁচে তাহা হইলে তাহাই দুর্গতগণকে দেওয়া হইবে। কিন্তু তাঁহাদের এই সদিচ্ছা ও তাঁহাদের কার্য্যকলাপের মধ্যে সঙ্গতি কোথায়? দুর্গতগণের কথা যাঁহারা ভাবিলেন, তাঁহারা কোন্ প্রাণে দুর্গতগণের উল্লেখশূন্য শরৎচন্দ্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রটি ক্রিমরঙের আর্টপেপারে রঙিন করিয়া ছাপিলেন? ক্রোড়পত্র সহস্র সহস্র ছাপা হইয়াছে, সাধারণ কাগজে সাধারণভাবে উহা ছাপিলেই তো অনেক টাকা উদ্বৃত্ত থাকিত! তাহা ছাড়া তিনরঙা পোষ্টারে রবীন্দ্রনাথের ছবি দেয়ালে দেয়ালে মারা না

হইলে কি জয়ন্তী উৎসবে লোক হইত না? কোন্ শ্রেণীর দর্শকের জন্য এই পোষ্টারের ব্যবস্থা হইয়াছিল? অন্যান্য বিভাগেও অজস্র টাকা অনাবশ্যকরূপে ব্যয়িত হইয়াছে। দুর্গতগণের কথা মনে থাকিলে কোনও সহৃদয় ব্যক্তি এইরূপ ব্যয়বাহুল্য করিতেন না।

সুতরাং সমস্ত ব্যাপারটি দুর্গতগণের নামে একটা কুৎসিৎ ব্যঙ্গের রূপ ধারণ করিয়াছে। দুর্গতদিগকে শিখণ্ডী-রূপে সম্মুখে খাড়া করিয়া এরূপভাবে জয়ন্তীযুদ্ধে নামিবার কি প্রয়োজন ছিল?

—

উৎসব-কর্ত্তৃপক্ষের কথা থাক, শুনিলাম ছাত্রজয়ন্তীদল রবীন্দ্রনাথকে একটি ১০০০ টাকার থলি দিয়াছেন এবং নটীর পূজা অভিনয়ের দুই রাত্রির আয় প্রায় হাজার পাঁচেক টাকা রবীন্দ্রনাথ লইয়াছেন। ইহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে বিস্মিত হইবার কারণ আছে। যিনি একলক্ষ টাকার মায়া ত্যাগ করিবার উৎসাহে অমন ঔদার্য্যব্যঞ্জক একখানা চিঠি লিখিয়া ফেলিলেন এবং সেচিঠি ব্লক করিয়া ছাপা হইয়াছে তাহাও দেখিলেন, এই ছয় হাজার টাকা দুর্গতগণকে দিতে তাঁহার বিলম্ব হইতেছে কেন?

—

এই উৎসবে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এমন ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত যে জয়ন্তী-উৎসব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ কোনও ব্যক্তি যদি মফঃস্বল হইতে কলিকাতায় আসিয়া এই উৎসব দেখিতেন, তাহা হইলে তিনি ভাবিতেন যে কোনও কারণে রবীন্দ্রনাথকে একটি বেনিফিট নাইট দেওয়া হইতেছে। একটা নির্দ্দিষ্ট বয়স পার হইলেন বলিয়া রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা-নিবেদন করিলেন দেশের জনসাধারণের নামে কয়েক জন অসাধারণ ব্যক্তি—খুসী হইয়া রবীন্দ্রনাথও তাঁহাদিগকে তাঁহার দলবল

লইয়া খানকয়েক গান শুনাইলেন, তাঁহার আশ্রম-কন্যাদের টানিয়া আনিয়া একটি নাটিকাও দেখাইয়া দিলেন। অবশ্য খরচ-খরচা দরুণ কিছু দক্ষিণা উক্ত ভদ্রলোকদের দিতে হইয়াছিল। কিন্তু রবীন্দ্রজয়ন্তীর কথা যাঁহারা জানেন ব্যাপারটা কি তাঁহাদের কাছে রবীন্দ্রনাথের তরফ হইতে শোভন ঠেকিয়াছিল ?

—

এই সকল মন্তব্যের দ্বারা এই অন্যায়ের কোনও প্রকার প্রতীকার হইবে না, ইহাও আমরা জানি। আগেকার কালের একশ্রেণীর জমিদার ছিলেন আজও তাঁহাদের কিছু কিছু চিহ্ন পাওয়া যায়, ব্যাপার দেখিয়া মনে হয় রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদেরই শেষ বংশধর। ইঁহারা সর্ব্বদা চাটুকার-পরিবৃত থাকিয়া আত্মপ্রসাদরত থাকিতেন। সঠিক খবর বলিতে পারি না, জনরবে শুনিলাম, শনিবারের চিঠি শ্রীরবীন্দ্রনাথের নিকট পৌঁছে না। যদিও এমন এক সময় ছিল যখন কবি এই পত্রিকাকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন (লিখিত প্রমাণ আছে), তথাপি আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-সাহিত্য ও রবীন্দ্র-ব্যক্তি সম্বন্ধে কতকগুলি সমালোচনা বাহির হইবার পর হইতে শনিবারের চিঠি কবি ও কবি-পার্ষদদিগের বিরাগভাজন ও অস্পৃশ্য হইয়াছে।

—

সাধারণ লোকের পক্ষে এই রাগ-বিরাগ অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু যাঁহারা "জননায়ক" হইবার কিছুমাত্র আকাঙ্ক্ষা রাখেন, তাঁহাদের পক্ষে পরমত-অসহিষ্ণু হওয়া দূরে থাকুক, অপরের সমালোচনা নিজ-মত-বিরুদ্ধে হইলেও ধৈর্য্যসহকারে তাহা অনুধাবন করিয়া প্রয়োজন মত প্রতীকারের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

—

পরমত সম্বন্ধে নির্ব্বিকার থাকা প্রাকৃত জনের পক্ষে যেমন অসম্ভব, অভিজাতের পক্ষে তেমনই dramatic. অস্পৃশ্যতাই কৌলীন্যের চরম pose. কিন্তু জননায়ক-যশঃ-প্রার্থীর পক্ষে উহা মারাত্মক। কারণ জনমতের প্রতি যাঁহার শ্রদ্ধা নাই তিনি যত বড়-লোক অথবা কবি-কুলীনই হউন না কেন, জন-নায়ক হওয়ায় এমন কি "জাতীয় কবি" হওয়ার অধিকারও তাঁহার নাই। আমাদের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধার আশা আমরা রবীন্দ্রনাথের ন্যায় ধনীর দুলাল, Fortune's spoilt child জমিদারের নিকট করি না। কিন্তু তাঁহার মত বিজ্ঞ লোকের পক্ষে এই পরমত-সহিষ্ণুতার একান্ত অভাব অথবা নির্গুণ ব্রহ্মের নির্ব্বিকার অবস্থা তাঁহার অন্তর্নিহিত দুর্ব্বলতাকেই লোকচক্ষুর সম্মুখে আরও প্রকট করিয়া তোলে, একথা সময় থাকিতে তাঁহার বুঝা উচিত।

—

যাহাই হউক, আমরা জানি রবীন্দ্রনাথের যে-সব পার্ষদ তাঁহাকে গুরুদেব বলিয়া জানেন ও ডাকেন, তাঁহারা এই সকল গুরুনিন্দা তাঁহাদের শ্রীগুরু-ঠাকুর-কবির নিকট পৌঁছিতে দিবেন না। সুতরাং জয়ন্তী সম্পর্কে আমাদের যাহা বলিবার তাহা কণ্টক-স্পর্শ-দোষশূন্য কুলীন-কবি রবীন্দ্রনাথকে না বলিয়া আমাদের সগোত্র দুর্গত জনসাধারণের নিকটই উপস্থাপিত করিলাম।

—

টাউনহলে জয়ন্তী উৎসব-সম্মিলনী যখন অত্যন্ত জমিয়া উঠিয়াছে, তখন খবর আসে যে পণ্ডিত জহরলাল নেহ্রু রাজদ্রোহ অপরাধে ধৃত হইয়াছেন। শ্রীযুক্তা সরলা দেবীর প্রস্তাবে তখন সমবেত বিদ্বন্মণ্ডলী দুই মিনিটকাল নীরবে দণ্ডায়মান থাকিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করেন। তাহার পর উৎসব যথারীতি চলিতে থাকে এবং সন্ধ্যায়

গানের আসরও জমে। রবীন্দ্রনাথ কবি, দেশের দুঃখ-দুর্দ্দশা তাঁহার কাব্যকে ব্যাহত করে না সত্য কিন্তু সমবেত জনতাও রবীন্দ্রনাথকে পূজা করিতে গিয়া কাব্যমার্গে তাঁহার কাছাকাছি উঠিয়াছিল? ওই আনন্দোৎসবের মধ্যে বিলাতী কেতায় দুই মিনিট দাঁড়াইয়া থাকিয়া দেশ-সেবীকে এই উপহাস করিলেন কেন?

—

যাঁহারা পাঁচ টাকার টিকিট খরিদ করিয়া মজা দেখিতে গিয়াছিলেন, পণ্ডিত জহরলাল ধৃত হইবার পর উৎসব ভাঙ্গিয়া দিলে তাঁহাদের প্রাণে লাগিত সন্দেহ নাই কিন্তু যাঁহারা গিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই কি ওই মজা-দেখা শ্রেণীর?

—

উৎসব-প্রত্যাগত একজন রসিক ব্যক্তি সেদিন সত্যই বলিয়াছিলেন, যে, রবীন্দ্র জয়ন্তী একদিক দিয়া সার্থক হইয়াছে। দেশের এই দুর্দ্দিনেও যে জয়ন্তী-কর্তৃপক্ষ সুস্থদেহে বহাল তবিয়তে উৎসব-শেষে গৃহে ফিরিয়াছিলেন, ইহাতেই দেশের তরফ হইতে রবীন্দ্র-ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখান হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ সত্য সত্যই triumph করিয়াছেন।

—

অনেকগুলি চোরা গাই "জয়ন্তী-উৎসর্গের"র মাঠে আসিয়া কপিলা গাই সাজিয়াছে। এই "জয়ন্তী-উৎসর্গ" গ্রন্থখানির সঙ্কলয়িতা শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত মহাশয়। এই নরেশচন্দ্র মাত্র চারি বৎসর পূর্ব্বে তরুণ সাহিত্যিকদের ওকালতনামা লইয়া আসিয়াছিলেন বলিয়া রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক "চরিত্রগত দুর্ব্বলতা"র অপবাদে কলঙ্কিত হইয়াছিলেন। তাই "পুরোহিত" নামক রূপক-সন্দর্ভে একবার তিনি রবীন্দ্রনাথের দ্বারা বঙ্গ-ভারতীর পৌরাহিত্য অচল করিতেও দ্বিধাবোধ

করেন নাই। সেদিন নরেশচন্দ্র স্পষ্টই বলিয়াছিলেন "বিচিত্র শোভায় সজ্জিত কবির প্রাসাদের পাপোষের ঝাড়া ধূলোর গুঁড়াকে মূর্ত্তিমান আর্ট ব'লে মাথায় তুলে' নিয়ে মাদুলীতে ভ'রে আমরা তার পূজা করি।" সে দিনের বলিদানের ধ্বনি কি আজ জয়ন্তী-উৎসবের ঢক্কা-নিনাদে চাপা পড়িয়া গেল ?

—

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ও "জয়ন্তী-উৎসর্গের" অনেকগুলি পাতার সদ্ব্যবহারের সুযোগ-লাভ করিবার লোভ-সম্বরণ করিতে পারেন নাই ! গুপ্ত মহাশয় ইতিপূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার মানদণ্ডে ওজন করিয়া সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে তাহার বিশদ বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই রবীন্দ্র-পরিমাপের হিসাব-নিকাশ এখনো "সাহিত্যিকা" গ্রন্থের পৃষ্ঠা জুড়িয়া বসিয়া আছে। পরিবর্ত্তনশীল জগৎ। কিন্তু পরিবর্ত্তন হইল কাহার ? "সাহিত্যিকা"য় আলোচিত রবীন্দ্রনাথের, না "জয়ন্তী উৎসবে"র কালোচিত নলিনী গুপ্তের ?

শ্রীমান্ বুদ্ধদেব বসুর "প্রগতি" পত্রে রবীন্দ্রনাথের শতেক খোয়ারের কথা আমরা আজিও ভুলিতে পারি নাই। "প্রগতি" রবীন্দ্রনাথকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া দিয়া সেই সিংহাসনের উপরে কাদা ছড়াইয়া অনেক আগাছা পুঁতিয়াছিল। এই চাষামী "প্রগতি"র পৃষ্ঠায় ফলিয়া আছে। তখনকার রবীন্দ্রনাথ ছিলেন "সাহিত্য-ধর্ম্মে"র পুরোহিত আর আজিকার রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবের প্রতিভার পূজারী স্মুতরাং অধুনালুপ্ত "প্রগতি"র সম্পাদক শ্রীমান্ বুদ্ধদেব বসুও "জয়ন্তী উৎসর্গে" রবীন্দ্র-জয়-গান গাহিয়াছেন।

—

শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এই "জয়ন্তী উৎসর্গে" লিখিয়াছেন—

আমি ত ছিলাম ঘুমে,
তুমি মোর শির চুমে
গুঞ্জরিলে কী উদাত্ত, মহামন্ত্র মোর কানে কানে।

রবীন্দ্রনাথ যদি আর কিছুদিন আগে অচিন্ত্যকুমারের শিরচুম্বন করিয়া কর্ণরন্ধ্রে মহামন্ত্র গুঞ্জরিয়া দিতেন তাহা হইলে আর অচিন্ত্যকুমার কল্লোলের পৃষ্ঠায় "সম্মুখে বসিয়া থাক পথ রুধি রবীন্দ্র ঠাকুর' এ চরণাঘাত করিতেন না। আজ যদি কাব্যবিশারদ বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে "জয়ন্তী উৎসর্গ" গ্রন্থে কিরূপ রবীন্দ্র-বন্দনা গাহিতেন এবং উৎসবানন্দ রবীন্দ্রনাথ কিরূপ উৎসাহভরে তাই শুনিতেন, আমরা তাহাই ভাবিতেছি।

—

জার্ম্মান-মনোবিজয়ী চির-না গৌড়ীয় সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয় এই জয়ন্তী-উৎসর্গে 'যৌবন-মূর্ত্তি রবীন্দ্রনাথ' গড়িয়াছেন। সরকার মহাশয় গৌরচন্দ্রিকায় বলিতেছেন যে, 'সত্তর বৎসরের মুখে মুখে আসিয়া রবীন্দ্রনাথ ইউয়োরামেরিকার খোলা বাজারে নিজ হাতের আঁকা ছবি ছাড়িয়াছেন। লণ্ডন, প্যারিস, মিউনিক, মস্কো, নিউইয়র্কের নরনারী ১৯৩০ সনে দেখিল যে, সত্তর বৎসর বয়সের বুড়া বাঙালী একজন ছোকরার মতন আত্মহারা হইয়া ছবি আঁকিতেছে আর সঙ্গে সঙ্গে একটা নয়া শিল্পের আসরে স্রষ্টারূপে দেখা দিতে সাহসী হইয়াছে!'

বিনয়কুমার যে বাংলা সাহিত্যে ব্যাজস্তুতিতে এতটা হাত পাকাইয়াছেন, ইহা আমরা পূর্ব্বে জানিতাম না। রবীন্দ্রনাথ 'একজন ছোকরার মতন আত্মহারা হইয়া' সাদা কাগজে রঙের তছ্নছ করিয়াছেন এবং তাহার ফলে তাঁহার সেই বালসুলভ রং-তামাসাগুলি

ছবি হইয়া উঠিয়াছে। সরকার মহাশয়ের সত্যবাদিতা প্রশংসনীয়। কিন্তু একজন ছোক্‌রা 'স্রষ্টারূপে দেখা দিতে সাহসী হইয়াছে' কি করিয়া,—ইহা অনভিজ্ঞ আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। বিনয়কুমার পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সেও আজ পর্য্যন্ত 'স্রষ্টারূপে দেখা দিতে সাহসী হইলেন না, আর সাহস করিয়া সেই কার্য্য করিয়া বসিল একজন ছোক্‌রা? সৃষ্টি-কার্য্যে তাঁহার 'আত্মহারা হইয়া'র আমরা সমর্থন করি, কিন্তু 'একজন ছোক্‌রা'—একথা যে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না।

সৃষ্টি-কার্য্য সম্বন্ধে বিনয়কুমার একটি অজ্ঞাত তথ্যের সন্ধান দিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, রবীন্দ্রনাথ 'প্রতিদিন অনন্ত যৌবনের সৃষ্টিক্ষমতা চাখিয়া ধরাতলকে তাহার স্বাদ পরিবেষণ করিতেছেন।' 'অনন্ত যৌবনের সৃষ্টি-ক্ষমতা'র অনেক রকম ব্যবহার-অপব্যবহার সম্বন্ধে অনেক রকমের বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, দেখিতে পাই। কিন্তু বিনয়কুমার রবীন্দ্রনাথকে চাখাইবার পূর্ব্বে 'অনন্ত যৌবনের সৃষ্টি-ক্ষমতা'কে আর কেহ চাখান নাই। সৃষ্টিক্ষমতা চাখাইবার পরে তিনি রবীন্দ্রনাথকে দিয়া 'ধরাতলকে তাহার স্বাদ পরিবেষণ' করাইয়া তবে ছাড়িয়াছেন। ধরাপৃষ্ঠ নয়—'ধরাতল'; ভোজ্য-বস্তু-পরিবেষণ নয়—'স্বাদ-পরিবেষণ।' আর কেহ রবীন্দ্রনাথ হইলে 'জয়ন্তী-উৎসর্গে'র কর্ত্তাদের উপর মানহানির মামলা আনিত।

—

জ্ঞানবৃদ্ধ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয় জয়ন্তী উৎসবে রবীন্দ্রনাথের যে বন্দনাগীতি রচনা করিয়াছেন তাহা 'জয়ন্তী-উৎসর্গ' বহিতে ছাপা হইয়াছে। তাহাতে তিনি রবীন্দ্রনাথকে সম্বোধন করিয়া

বলিতেছেন—'তুমি সুধীদর্পহরণ কেশব' 'তুমি বনমালী' 'তুমি বংশীধারী'। তুমি রাখাল, গোঠে মাঠে ধেনু চরাইয়া থাক—এই কথাটি মৈত্র মহাশয় কি লজ্জায় লেখেন নাই ?

অন্যত্র তিনি বলিতেছেন, 'তুমি নবি !' মৈত্র মহাশয় যে কারণেই হউক আজকাল যেরূপ নবীভক্ত, তাহাতে আরো অধিক কিছু বলিয়া ফেলেন নাই ইহাই আশ্চর্য্য !

—

'মধুমা' 'বেপথুলা' 'অনন্তজ' বুঝি কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে তিনি 'আত্ম-জন্মা' বলিলেন কেন ? তবে কি রবীন্দ্রনাথে নবী ও খৃষ্টের মিলন হইয়াছে !

—

'সঞ্জীবনী'তে রবীন্দ্র জয়ন্তী সম্পর্কে একটি মন্তব্য বাহির হইয়াছে। মন্তব্যটি কৌতূহলোদ্দীপক বলিয়াই উল্লেখযোগ্য। সঞ্জীবনী বলিতেছেন—রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবে কর্ণধাররূপ বেশ লোকেদের বাছিয়া বাছিয়া বাহির করা হইয়াছে ! বারাঙ্গনা-সাহিত্যের পিরামিড শরৎ চট্টোপাধ্যায়, কুৎসিৎ সাহিত্যের মন্দাকিনী নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং চোর-কাঁটা বিহারী চারু বন্দোপাধ্যায় !

আরও কয়েকজনকে 'সঞ্জীবনী' লক্ষ্য করেন নাই দেখিয়া আশ্বস্ত হইলাম।

—

রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্কণ সম্বন্ধে মাঘের 'প্রবাসী'তে যে সম্পাদকীয় মন্তব্য বাহির হইয়াছে তাহাকে এপিক বলিব না লিরিক বলিব ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। ব্যঙ্গ-কাব্যও হইতে পারে !

—

প্রবাসী সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন—

"ছবিগুলির কোন নাম কবি দেন নাই, দেওয়া যায়ও না। কারণ সেগুলি কোন বাস্তব মনুষ্য বা অপর জীব বা অপর জন্তুর প্রতিরূপ নহে; সম্পূর্ণরূপে কবির মানস-সৃষ্টি। এইসব ছবি অন্য কোন চিত্রকর বা চিত্রকর সম্প্রদায়ের ছবির মত নহে; কারণ কবি কোন চিত্রবিদ্যালয়ে বা বাড়িতে কোন চিত্রকরের নিকট শিক্ষালাভ করেন নাই।"

ভয়ানক কথা। মনুষ্য বা অপর জীব বা অপর জন্তুর প্রতিরূপ নহে, আবার তাহা অন্য কোন চিত্রকর বা চিত্রকর-সম্প্রদায়ের ছবির মত নহে; এবং কবি কোন চিত্রবিদ্যালয়ে বা বাড়ীতে কোন চিত্রকরের নিকট শিক্ষালাভ করেন নাই; অথচ তিনি যাহা আঁকিতেছেন তাঁহার নাম দেওয়া হইতেছে চিত্র! এই কারণেই বুঝি জ্ঞানবৃদ্ধ মৈত্র মহাশয় তাঁহাকে 'আত্মজন্মা' আখ্যা দিয়াছেন!

—

সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে আজো তক বহু শিশু যুবা এবং বৃদ্ধ (স্ত্রী ও পুরুষ) ছবি আঁকবার চেষ্টা করিয়া মনুষ্য বা অপর জীব বা অপর জন্তুর প্রতিরূপ আঁকিয়া উঠিতে পারেন নাই। ঐ সকল বস্তু আঁকিতে গিয়া যাহা আঁকা হইয়াছে তাহা চিত্র নিশ্চয়, কারণ ঐগুলি সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের মানসসৃষ্টি। এ বিষয়ে যাঁহার শিক্ষালাভ যত কম হইয়াছে তিনি শিল্পী হিসাবে তত বড়। যিনি একেবারে অশিক্ষিত তিনিই শিল্পী-শ্রেষ্ঠ।

মনে হইতেছে ইহাই প্রবাসী সম্পাদকের অভিমত। যদি তাহা হয় তাহা হইলে এতগুলি আর্ট স্কুলে এত টাকা ব্যয় করা হইতেছে কেন? শান্তিনিকেতনের কলাভবন অবিলম্বেই তুলিয়া দেওয়া উচিত নয় কি?

প্রবাসী সম্পাদক মহাশয় এ বিষয়ে আন্দোলন চালাইতেছেন না কেন ?

—

ছবির নাম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যে কাব্য করিয়াছেন প্রবাসী সম্পাদকের ভক্তিবাহুল্যাৎ বিহ্বলতা হইতেও তাহা মারাত্মক। তিনি লিখিয়াছেন ঃ—

"ছবিতে নাম দেওয়া একেবারেই অসম্ভব। তার কারণ বলি ; আমি কোন বিষয় ভেবে আঁকিনে—দৈবক্রমে কোনো অজ্ঞাতকুলশীল চেহারা চলতি কলমের মুখে খাড়া হয়ে ওঠে। জনক রাজার লাঙলের ফলার মুখে যেমন জানকীর উদ্ভব। কিন্তু সেই একটি মাত্র আকস্মিককে নাম দেওয়া সহজ ছিল—বিশেষতঃ সে নাম যখন বিষয়সূচক নয়। আমার যে অনেকগুলি—তারা অনাহূত এসে হাজির—রেজিস্‌টার দেখে নাম মিলিয়ে নেব কোন্ উপায়ে ? জানি রূপের সঙ্গে নাম জুড়ে না দিলে পরিচয় সম্বন্ধে আরাম বোধ হয় না। তাই আমার প্রস্তাব এই যাঁরা ছবি দেখবেন বা নেবেন, তাঁরা অনাম্নীকে নিজেই নাম দান করুন—নামাশ্রয়হীনাকে নামের আশ্রয় দিন। অনাথাদের জন্যে কত আপিল বের করেন, অনামাদের জন্যে করতে দোষ কি ? দেখবেন যেখানে এক নামের বেশী আশা করেন নি সেখানে বহু নামের দ্বারা ছবিগুলো নামজাদা হয়ে উঠবে। রূপসৃষ্টি পর্য্যন্ত আমার কাজ, তার পরে নামবৃষ্টি অপরের।"

কোনও নির্দ্দিষ্টসমাজে নবজাত শিশুদের নাম দেওয়াই যাঁহার কাজ, পুস্তক ও মাসিক পত্রিকার নাম করিয়া করিয়া যিনি নামজাদা হইয়া উঠিলেন, তাঁহার মুখে একি কথা! প্রবাসী সম্পাদক মহাশয় যে

ঘাবড়াইয়া যাইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! রবীন্দ্রনাথের এই কাব্যকে সত্যভাষণ মনে করিয়া প্রবাসী সম্পাদক লিখিয়াছেন :—

"কবির সমুদয় চিন্তা ও ভাব প্রকাশের জন্ত তাঁহার প্রচুর শব্দসম্পদ ও যথেষ্ট লিপি-নৈপুণ্য আছে। ...তাঁহা অপেক্ষা শব্দ-সম্পদে দরিদ্র কেহ কথার দ্বারা কেমন করিয়া ব্যক্ত করিবে?"

এই দুই খ্যাতনামা ব্যক্তির পরস্পরের "আপ বৈঠিয়ে" "আপ্ বৈঠিয়ে"তে আমরা যে মারা যাই! রবীন্দ্রনাথের ছবির নাম-মাহাত্ম্য যদি প্রবাসী সম্পাদক মহাশয় এমনভাবেই অনুভব করিয়া থাকেন, গরীব পাঠকদিগকে 'এ বাঁশী কে বাজাইতেছেন' জিজ্ঞাসা করিয়া বিপদে ফেলার প্রয়োজন কি? তবে প্রশ্ন তিনি যখন করিয়াছেন, আমরা জবাব দিব।

মুখের নলটিকে বাঁশী suggest করিয়া প্রবাসী সম্পাদক মহাশয় আমাদিগকে ধাঁধায় ফেলিয়াছেন। আসলে বস্তুটি একটি ছোটখাট অক্সিজেন সিলিণ্ডার। চিত্রটির বিষয় বস্তু—যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ। অত উচ্চে নিশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট হয় বলিয়া তিনি একটি অক্সিজেন সিলিণ্ডার সঙ্গে লইয়াছেন, পিছনে কুকুররূপী ধর্ম্ম। দেবতারা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছেন।

ইহাতে যদি কাহারও আপত্তি হয় তাহা হইলে বলিব, ইহা রবীন্দ্র-জয়ন্তীর ছবি। রবীন্দ্রনাথ বাঁশী বাজাইতেছেন, কুকুরটি তো সকলের পরিচিতই; এবং ভারতের জনসাধারণের তরফ হইতে কয়েকজন বিশিষ্ট নরনারী তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছেন। এই অর্থ যদি পছন্দ না হয় তাহা হইলে আমরা পাল্টা প্রশ্ন করিব—কুকুরটি কে? —এই প্রশ্নের সমাধান হইলে বাঁশী বাজাইতেছেন কে, সহজেই বাহির হইয়া পড়িবে।

—

সন্দেশ প্রভৃতি ছেলেদের কাগজেই ধাঁধা দেওয়া হইয়া থাকে জানি। প্রবাসীর বিবিধ প্রসঙ্গে ধাঁধা দিয়া দেশশুদ্ধ সকলকে শিশু বানাইবার চেষ্টা কেন?

—

এইবার 'প্যারিসের চিত্রশালা লুভ্রে লেওনার্ডো ডা ভীঞ্চির আঁকা মোনা লীজা নাম্নী মহিলার বিখ্যাত চিত্র' ও রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত আহ্লাদী পুতুলের তুলনামূলক সমালোচনা! জন্মিয়া অবধি বহু বিচিত্র কথা শুনিয়াছি কিন্তু এ সম্বন্ধে প্রবাসী সম্পাদক মহাশয়ের মন্তব্যটি বিচিত্রতম। তিনি বলিতেছেন—

'রবীন্দ্রনাথের আঁকা যে নারীমূর্ত্তিটির প্রতিলিপি এবার ছাপিয়াছি, তাহার মুখের ভাব মোনালীজার রহস্যাচ্ছন্ন হাস্য আমার মনে পড়াইয়া দিয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট এই নারীর মুখ কি ভাব ব্যক্ত করিতেছে, বলা আরও কঠিন। ইহা কেবল হাসি নয়, কেবল কৌতুক নয়, কেবল বিরাগ নয়, ব্যঙ্গ নয়।'

জিজ্ঞাসা করি বাঙালাদেশের শিল্পীরা কি সকলেই মৃত? ইহার প্রতিবাদ কেহ করিবেন না? প্রবাসী সম্পাদক মহাশয় আমাদের প্রণম্য; যে কথা মনে আসিতেছে, তাহা লিখিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছি।

—

রবীন্দ্রনাথের 'জীবন স্মৃতি'তে দেখিতে পাই তিনি শৈশবে একবার ভৃত্যরাজক তন্ত্রের প্রকোপে পড়িয়াছিলেন। তাঁহার বরাদ্দ জল-খাবারের উপর তাহারা ট্যাক্স বসাইত [প্রথম সংস্করণ 'জীবনস্মৃতি' ১৭—২১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য] ঈশ্বর নামক চাকরের ওইরূপ দুই একটি কীর্ত্তি-কলাপের কথা রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন।

আমরা দেখিতেছি শৈশবেও যেমন, বৃদ্ধ বয়সেও তেমনই। ইহা তাঁহার জন্মদুর্ভাগ্য। শৈশবেও তাঁহার ভৃত্যেরা যেমন বরাদ্দ জল-খাবারে ভাগ বসাইত; যৌবনে, প্রৌঢ় বয়সে ও বার্দ্ধক্যেও তাঁহার মিত্রেরাও তাঁহার বরাদ্দে ভাগ বসাইতেছে। রবীন্দ্রনাথের প্রাপ্য খ্যাতির পুরাটা তিনি পাইতেছেন না, মধ্যপথে মিত্ররাজ-তন্ত্রের তন্ত্রীরা তাহার কিঞ্চিৎ আত্মসাৎ করিতেছে। রবীন্দ্রনাথের ইহাতে দুঃখ করিবার কিছুই নাই—এই দুর্দ্দশা তাঁহার ললাট-লিখন।

—

চোরা গাইয়েরা যে কেবল 'জয়ন্তী-উৎসর্গে'র মাঠে আসিয়া কপিলা গাই সাজেন তাহা নহে, তাঁহারা মাঠবিশেষে ভিন্নযোনিতেও বিহার করিয়া থাকেন। সম্প্রতি 'পরিচয়'-ক্ষেত্রে এইরূপ কোনও বর্ণচোরা গাই হরিণীরূপে ঘাই মারিয়াছেন। কবিতাটির নাম যদিও 'ক্যাম্পে', ধাম কিন্তু ক্যাম্পের বাহিরে। কবিতাচ্ছলে কবি যে বিরহিণী ঘাই-হরিণীর আত্মকথা ও তাহার হৃত্‌তো দা'র মর্ম্মকথা কহিয়াছেন, তাহা পরম রমণীয় হইয়াছে।

—

হৃৎতুতো দা'র কথা পাঠক বোধ হয় বুঝিলেন না। কবি বলিতেছেন যে, বনের যাবতীয় ভাই-হরিণকে 'তাহাদের হৃদয়ের বোন্' ঘাই-হরিণী 'আঘ্রাণ' ও 'আস্বাদে'র দ্বারা তাহার 'পিপাসার সান্ত্বনা'র জন্য ডাকিতেছে। পিস্তুতো মাস্তুতো ভাই-বোনদের আমরা চিনি। হৃৎতুতো বোনের সাক্ষাৎ এই প্রথম পাইলাম।

—

এবং সে ডাক শুনিয়া

একে একে হরিণেরা আসিতেছে গভীর বনের পথ ছেড়ে
দাঁতের-নখের কথা ভুলে গিয়ে তাদের বোনের কাছে অই
সুন্দরী গাছের নীচে—জ্যোৎস্নায় !—
মানুষ যেমন ক'রে ঘ্রাণ পেয়ে আসে তার নোনা মেয়েমানুষের কাছে…

ভাইয়েরা না হয় তাদের বোনের কাছে আসিল, মানিলাম,—আট্‌কাইবার উপায় নাই—কবির তন্ময়তায় না হয় গাছও সুন্দরী হইল, বুঝিলাম—কবির ঘোর লাগিয়াছে—কিন্তু 'মেয়েমানুষ' কি করিয়া 'নোনা' হইল ? নোনা ইলিশ খাইয়াছি বটে, কিন্তু কবির দেশে মেয়েমানুষেরও কি জারক প্রস্তুত হয় ? কবি যে এতদিনে হজম হইয়া যান নাই, ইহাই আশ্চর্য্য !

কিন্তু এতো 'মেয়েমানুষ' নয়, এযে ঘাইহরিণী !

মৃগীর মুখের রূপে হয়তো চিতারও বুকে জেগেছে বিস্ময় !
লালসা-আকাঙ্ক্ষা-সাধ-প্রেম-স্বপ্ন স্ফুট হ'য়ে উঠিতেছে সব দিকে
আজ এই বসন্তের রাতে ;
এইখানে আমার নক্‌টার্ণ—।

এতক্ষণে বুঝিলাম কবিতার নাম 'ক্যাম্পে' হইল কেন ! যাহাই হউক 'নক্‌টার্ণ' শব্দের পরে ড্যাস্ মারিয়া কবি তাঁহার নৈশ রহস্যের সরস ইতিহাসটুকু চাপিয়া গিয়া আমাদিগকে নিরাশ করিয়াছেন।

—

কিন্তু পাঠক ভাবিবেন না, এ শুধু ঘাইহরিণীর ভ্রাতৃপ্রেম। কবি স্বীকার করিয়াছেন তিনিও একজন 'পুরুষহরিণ'। তাই দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন,

কেন এই মৃগদের কথা ভেবে ব্যথা পেতে হবে ?
তাদের মতন নই আমিও কি ?

—

মার্জ্জিনে বন্ধুবর মন্তব্য করিয়াছেন, 'তুমি ছাগল'। এই মন্তব্যে আমাদের ঘোরতর আপত্তি আছে। এই মন্তব্যের দ্বারা সত্যের অপলাপ করা হইয়াছে। ছাগলেরা ভাই-হরিণদের মত 'হৃদয়ের বোনে'র ডাকেও সাড়া দেয় বটে, কিন্তু তদ্ব্যতীত মধ্যে মধ্যে 'হৃদয়ের মা'য়ের ডাকেও সাড়া দিয়া থাকে। অতি-আধুনিকদের বিষয়ে আমরা আজও এত বড় উচ্চাশা পোষণ করিতে পারি না।

—

এই সম্পর্কে একটু অবান্তর কথা বলিব। আমরা জানি যে অনেকে শনিবারের চিঠিকে অশ্লীলতাদোষে দুষ্ট করেন এবং বলেন যে আমরাই পুনরুদ্ধার করিয়া অশ্লীল লেখা ও লেখকের প্রসার ও সম্মান বৃদ্ধি করিয়া দিতেছি। তাঁহাদিগকে একটি কথা মনে রাখিতে অনুরোধ করি।

—

'পরিচয়' একটি 'উচ্চ-শ্রেণীর' কালচার-বিলাসীর ত্রৈমাসিক পত্রিকা। রবীন্দ্রনাথ ইহাকে সস্নেহ অভিনন্দন জানাইয়াছেন এবং হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় ইহাতে লিখিয়া থাকেন। রবীন্দ্রনাথ ও হীরেন্দ্রনাথ প্রমুখ ব্যক্তিরা যে কাগজের সম্পর্কে সম্পর্কিত, তাহাতে কি প্রকার জঘন্য অশ্লীল লেখা বাহির হইতে পারে ও হয় তাহার একাধিক পরিচয় 'পরিচয়' দিয়াছেন। 'ক্যাম্পে' কবিতা তাহার চূড়ান্ত নমুনা।*

* পরিচয়ের এই সংখ্যার 'তিনরাত্রি' গল্পের সমালোচনা আগামী সংখ্যায় করিব।

সুতরাং এ-শ্রেণীর লেখকদের প্রসার ও প্রতিপত্তি কাহাদের আওতায় বাড়িতেছে। পাঠকসাধারণ তাহার বিচার করিবেন।

—

এই সংখ্যায় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় 'যাজ্ঞবল্ক্যের জীববাদ' লিখিয়াছেন। তিনি আর কত কাল পরিচয়-গর্ভে এই জীব-যন্ত্রণা সহ্য করিবেন? নাড়ীর টান কি এতই বেশী?

—

'শিক্ষিতা পতিতার আত্মকথা'র counterblast স্বরূপ শিক্ষিত বারীনদার 'আত্মকথা' বাহির হইয়াছে। মনে হইতেছে বোমাবীরের জীবনকাহিনী এখনও সরকার বাহাদুরের নজরে পৌঁছে নাই; পৌঁছিলে অন্ততঃ বাঙলা দেশের উপর যে সকল অর্ডিন্যান্স তাঁহারা জারি করিয়াছেন, সেগুলি তুলিয়া লইতেন।

—

সাহিত্য-সাধনায় বা অন্য কোন বস্তুর সাধনায় যাঁহারা এখনও সিদ্ধিলাভ করিয়া যশস্বী হয়েন নাই, তাঁহারা যদি নামকা ওয়াস্তে ন্যায়ানুমোদিত পথ মাঝে মাঝে পরিত্যাগও করেন তাহা হইলে ততটা অপরাধ হয় না। কিন্তু যদি দেখি খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিও সুবিধা পাইলে 'শর্ট-কাট' ধরিতেছেন তাহা হইলে তাঁহাদের বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠাতেই সন্দেহ জন্মে। যাঁহার অনেক আছে তিনি সামান্যের প্রলোভনে স্বধর্ম্মকে এত সহজে ত্যাগ করেন কেন?

—

শ্রদ্ধেয় অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় অগ্রহায়ণের প্রবাসীতে 'যাত্রা' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধটির গবেষণা অংশের জন্য বিদ্যাভূষণ মহাশয় খ্যাতিলাভ করিতেছেন। সম্ভবতঃ সেই কারণেই

মাঘের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত প্রবন্ধের আলোচনায় লিখিয়া বসিলেন, "বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রবন্ধে কোনরূপ প্রমাণপঞ্জী পাইলাম না।" তারিখের ভুলও ব্রজেন্দ্রবাবু দেখাইয়াছেন। এইরূপ আলোচনা গাত্রদাহ-সম্ভূত কিনা ভাবিতেছিলাম, এমন সময় হঠাৎ শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা সঙ্কলিত ও প্রকাশিত 'প্রাচীন কবি সংগ্রহ' প্রথম খণ্ড নজরে পড়িল। চমকাইয়া উঠিলাম। বিদ্যা-ভূষণ মহাশয়ও তবে—? বহিখানি ১২৮৪ সালে ছাপা ও ভবানীপুর হইতে প্রকাশিত। শ্রদ্ধেয় অমূল্যবাবুর প্রবন্ধে এই বহির ভাষা পর্য্যন্ত উদ্ধৃত হইয়াছে অথচ বহির উল্লেখ নাই। ইহা কি অনবধানতাবশতঃ?

অমূল্যবাবুর প্রবন্ধের একস্থান ও বহির একস্থান নীচে উদ্ধৃত করিতেছি। আশা করি বিদ্যাভূষণ মহাশয় ইহার জবাব দিবেন।

প্রায় পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্বে ভবানীপুরে 'নলদময়ন্তী' যাত্রার দল ছিল। এই যাত্রার দল করিতে বিপুল অর্থব্যয় হয়। রামবসু যাত্রার গান রচনা করেন। ...১০।১৫ আসর গাহনার পর যাত্রাটি বন্ধ হইয়া যায়।'—প্রাচীন কবি সংগ্রহ—পৃঃ ।৶০

১২৩৪ সালের (১৮২৭ খৃঃ) কাছাকাছি ভবানীপুরে 'নলদময়ন্তী' যাত্রার দল ছিল। এই যাত্রার দল করিতে বিপুল অর্থব্যয় হয়। রামবসু যাত্রার গান রচনা করিয়া দেন। ১০।১৫ আসর গানের পর যাত্রাটি বন্ধ হইয়া যায়।"—প্রবাসী, অগ্রহায়ণ পৃ. ২৬৩।

'প্রায়'-এর পরিবর্ত্তে 'কাছাকাছি' শব্দ প্রয়োগ করিয়া অমূল্যবাবু কি original হইতে চাহিয়াছেন?

—

শ্রীবুদ্ধদেব বসু সম্প্রতি কোনও পত্রিকায় আর একটি গল্প ফাঁদিয়াছেন। নায়িকার হাসির বর্ণনায় তিনি লিখিতেছেন,

'হঠাৎ দু'ঠোঁট ফাঁক হ'য়েই বুঁজে (sic)—যাওয়া, যেন 'আ' ও 'ও'র মাঝামাঝি একটা স্বরবর্ণ উচ্চারণ করতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল।'

পাঠক, হাসিবেন না, এ বড় কঠিন হাস্য। শুনিয়াছিলাম ইংরাজী 'a' অক্ষরের মাথায় ডবল ফুট্‌কী বসাইয়া একটা কিম্ভূত স্বরবর্ণ জার্ম্মান্ ভাষায় আছে। এই অক্ষরটী উচ্চারণ করিতে নাকি যুগবৎ জিভ্‌কে e-এর ঢঙে ও ঠোঁট দুটাকে o-এর ঢঙে বাঁকাইয়া এক প্রকার শব্দ করিতে হয়। একবার এক জার্ম্মান্ অধ্যাপক মহাশয়কে দেখিয়াছিলাম, জিহ্বা, তালু, ওষ্ঠ প্রভৃতির অ্যানাটমি-চিত্রণের সাহায্যে উচ্চারণ-তত্ত্ব সম্বন্ধে সাড়ম্বরে দু'ঠোঁট ফাঁক করিয়া উচ্চারণে'র একটী 'practical demonstration' দিয়াছিলেন। কস্‌রৎকালে তাঁহার বদনমণ্ডলের ক্ষিপ্তশ্রী দেখিয়া হাসি অপেক্ষা কান্নার কথাই মনে পড়িয়াছিল বেশী। হয়ত বা তখন ভুল করিয়াছিলাম ভাবিয়া বুদ্ধবাবুর গল্প পাঠান্তে আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ঝাড়া আধঘণ্টা ধরিয়া 'প্র্যাক্‌টিস্' করিলাম—কা কস্য পরিবেদনা! 'মাঝামাঝি' স্বরবর্ণটা যদি বা আন্দাজে হইল, কিন্তু হাসি ফুটিল না।

—

তাই বলিতেছিলাম, এ বড় কঠিন হাসি। তবে পাঠিকা বলিতে পারেন বটে, তুমি ত নায়িকা নহ, অমিতা চন্দও নহ, সে হাসি হাসিবে কেমন করিয়া?

একথা জজে মানে।

এবং সে কথা বুদ্ধদেব বাবুও জানেন। তাই লিখিয়াছেন,

'ওরকম হাসি সাবিত্রী বোসের আসে না।'

না আসাই সম্ভব। বেচারী সাবিত্রী বোসের দোষ নাই।

—

কিন্তু বাঘেরও ঘোগ আছে। এ-হেন স্বরবর্ণ-রহস্য-হাস্য-কুশলা অমিতা চন্দও 'স্বকুমার সেনের মুচকি হাসি দেখিয়া সাতদিন আয়নায় মুখে ছাখে নি।'

সে 'মুচকি' হাসি কি আমরা একবার দেখিতে পাই না?

রবীন্দ্রনাথ

হিমালয়—
আপনার তেজে আপনি উৎসারিত,
আপনি বিরাট্, আপনি সমুজ্জ্বল,
শিখর, গুহা ও অরণ্য সমাকুল,
যুগ যুগ ধরি সঞ্চিত কত তমিস্রা অনাহত,
পুষ্পস্তবকে বিনম্র তরু, বিচিত্র কত ওষধি গন্ধময়,
ব্যাঘ্র হস্তী বরাহ বন্য, ভীষণ সরীসৃপ,
পুঞ্জিত কত মেঘলোক তার শিখরবিলম্বিত,
হিমালয় তবু হিমে ঢাকা, হায়, তুষারে অসাড় শির।
ভয় করি তায়, বিস্ময় মনে জাগে,
মহিমা বিরাট্, শ্রদ্ধায় করি মস্তক অবনত—
ভালবাসিবারে যত যাই তত সভয়ে ফিরিয়া আসি।

হিমালয়—
নিজ সাধনায় প্রান্তর ত্যজি চুম্বিয়া নীলাকাশ,
অসীম শূন্যে হিমে ঢাকি শির একেলা প্রহর যাপে,
আপনার প্রেমে তিলেতিলে হিম হয়েছে বুকের তাপ—
মাটির উপরে দাঁড়ায়ে রয়েছে, সেকথা গিয়েছে ভুলে।
অতল নিম্নে গুহা-অরণ্যে শ্বাপদ ভ্রমিয়া ফিরে,
সাপেরা চলিছে বুকে পেটে করি ভর—
বিচিত্র কত নরনারী, আর পোষমানা পশু কত,

ঘোড়া ও কুকুর, ছাগল, ভেড়ার পাল,
তারই আশ্রয়ে রয়েচে তবুও তাহা হ'তে কতদূর !
ভয় করি আর শ্রদ্ধায় করি মস্তক অবনত,
ভালবাসিবারে যত যাই তত সভয়ে ফিরিয়া আসি।

হিমালয়—
রৌদ্র-আলোকে তুষার-শিখর সাদা ধব্ ধব করে—
নিম্নে গুহায় কুহেলি অন্ধকার—
উর্দ্ধ শিখরে ধূ ধূ করে হিম-মরু—
নাহিক পাদপ, নাহি পল্লব ছায়া—
নীচে অরণ্য, রৌদ্রকিরণ পশে না ছিদ্রপথে,
ঘননিবিষ্ট তরু ও গুল্ম মেলেছে অযুতবাহু—
নাহি মানুষের পায়ের চিহ্নে আঁকা ক্ষীণ পথরেখা,
সারা বনভূমি রবিকরলেশহীন—
দূর হতে আসি, হিমে ঢাকা শির চকিতে ঝলসি উঠে,
অনাদিকালের বৃদ্ধ যেন রে বসে আছে পাকা চুলে—
ঝলসে তুষার, যেন বৃদ্ধের হা হা হা অট্টহাসি ;
ব্যাকুল হৃদয় আজিও পেল না নরম মাটির ছোঁয়া—
তুষারাবরণে আহত হইয়া ফিরি—
ক্ষোভে কেঁদে ফেলি, শ্রদ্ধায় করি মস্তক অবনত,
ভালবাসিবারে যত যাই তত সভয়ে ফিরিয়া আসি।

হিমালয়—
চিনিতে চেয়েছি, বুকেতে চেয়েছি, ধরিতে চেয়েছি তারে,
আজিও তাহার পাই নাই পরিচয়।

হতাশ হইয়া বসেছি আমার গৃহ-অঙ্গন-ছায়ে—
সম্মুখে আমার সব্জির ক্ষেত তাহারি আড়াল দিয়া,
হিমালয় হতে ঝরণা নামিয়া উপল-চপল পায়ে
ঝিরিঝিরি আর কুলুকুলু রবে ছুটেছে গাঁয়ের মেয়ে।
কোথা হিমালয়, হিমেতে রয়েছে ঢাকা,
পাহাড় গলিয়া নৃত্যচপল এসেছে গাঁয়ের মেয়ে,
বিস্ময় মানি তারি পানে চেয়ে চেয়ে
ঢেউ গুণি আর শুনি কুলুকুলুরব,
ভুলি হিমালয়, ভালবাসি নদীটিরে—
তত ভালবাসি যত কাছে যাই, পুলকে ফিরিয়া আসি।

হিমালয়!
তুমি হিমে ঢাকা থাক, নদীরে কোরো না হিম,
আমার কুটির-আঙিনা ছুঁইয়া তোমার চপল মেয়ে
সবুজ করিয়া যুগে যুগে মোর ছোট সে সব্জি-ক্ষেত
বহিয়া চলুক, তুমি থাক, নাহি থাক—
হিসাব তাহার আমি ত রাখিব না'ক,
আমি ছুটিব না বিস্ময়ে ভয়ে তোমার পরশ খুঁজি,
যুগে যুগে আমি স্নান সমাপন করিব ও নদীজলে—
কোথায় উৎস, কোন্ সমুদ্রে লীন,
হিসাব তাহার যে পারে রাখুক লিখে—
নদীজলে আমি স্নান করি আর তরণী বাহিয়া চলি—
যত ভালবাসি তত কাছে পাই পুলকে ফিরিয়া আসি।

শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ৩২।৫।১ বীডন ষ্ট্রীট, শনি-রঞ্জন
প্রেস হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বঙ্কিম-জীবনী—(৩)

বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যরচনা

বঙ্কিমচন্দ্রের আরও কয়েকটি বাল্যরচনা জীর্ণ সংবাদপত্রের ফাইল হইতে উদ্ধার করিয়া প্রকাশ করা গেল। এগুলিও শ্রীযুত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "বঙ্কিম-জীবনী"তে স্থান পায় নাই। এই-সকল রচনার মূল্য থাক বা না-থাক, সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যরচনা হিসাবে এগুলি সংগ্রহ করিয়া রাখা প্রয়োজন।

(সংবাদ প্রভাকর, ১০ জানুয়ারি ১৮৫৩। ২৮ পৌষ ১২৫৯)

হেমন্ত বর্ণনাছলে স্ত্রীর সহিত পতির কথোপকথন।

পতি

লঘু ত্রিপদী।

রাখ রাখ প্রিয়ে, বসনে ঢাকিয়ে,
জলদ চাঁচর চয়।
দেখে জলধর, ভয়ে শশধর,
হুতাশেতে ম্লান হয়॥
আরো মোর প্রাণ, ভয়ে ম্রিয়মাণ,
দেখে নিজ প্রাণ শশী।
কুমুদিনী সতী, ম্লান প্রাণপতি,
বিষাদিত জলে পশি॥

পেয়ে মনস্তাপ, দেয় অভিশাপ,
যে সতিনী তব কোলে।
সে সতিনী তার, তাহারি প্রকার,
ডুবিয়ে মরিবে জলে॥
তাহে এই ভয়, পাছে সিদ্ধি হয়,
সে পাপ কুমুদিনীর।
সতিনী তাহার, নয়নে তোমার,
পাছে সখি বহে নীর॥
তাইলো সুখদে, জলদ জলদে,
কর কর আচ্ছাদন।
নিশাপতি তবে, ভীত আর নবে,
শাপ হবে বিমোচন॥

নারী।

যেছিল তপন, খর বিলক্ষণ,
যখন শরদ দিবা।
এযে দিনপতি, তেজে ক্ষীণ অতি,
তাহার কারণ কিবা॥

পতি।

দ্বাদশ তপন, বিহরি গগন,
বিতরিত খর কর।
কিন্তু খসি পরে, দশ দিবাকরে,
গেল তব নখোপর॥

এক রবি খাস, তব ভালে পশি,
সিন্দুর বিন্দুর রূপে।
দ্বাদশ দিনেশ, এক অবশেষ,
উজ্জ্বল হবে কি রূপে ॥

নারী।

কেন হে কমল, ত্যজিল কমল,
হেমন্তের আগমনে।
পাছে বা পলায়, প্রাণ পদ্ম তায়,
এ ভয় তা দরশনে ॥

পতি।

করাল মরাল, মনে জানি কাল,
কমল কমল হরি।
ভয় যুক্ত হিয়ে, রহে পলাইয়ে,
তোমারে আশ্রয় করি ॥
হেরিয়ে নখরে, পতি দিবাকরে,
তাহার নিকটে যায়।
তোমার গমন, হংস নিদর্শন,
দেখিলেক সে তথায় ॥
ভয়ে হয়ে ভীত, পলাতে চিন্তিত,
ত্রাণ স্থানে নিরুপায়।
হইয়ে অগতি, তাজে বসুমতী,
শেষেতে পলায়ে যায় ॥

নারী।

শরদ স্বভাব, ত্যজিল স্বভাব,
ধরিল মলিন ভাব।
অতি মনোহর, পদার্থ নিকর,
হইলেক রসাভাব॥
বিধু ম্লান অতি, দীন দিনপতি,
নলিনী মলিনী হয়।
আর তরুদলে, ফল নাহি ফলে,
পূর্ণ পক্ক পত্রচয়॥

পতি।

নালো প্রাণ সখি, বিটপি নিরখি,
হেমন্তে তোমায় প্রাণ।
নব পল্লবিত, ফলে সুশোভিত,
তুমি তরু করি জ্ঞান॥
অধরেতে তব, নবীন পল্লব,
পল্লবিত তরু তাই।
সেই তরুফল, ওদুই শ্রীফল,
তোমাতে দেখিতে পাই॥

নারী।

কেন কেন কান্ত, হয়েছে একান্ত,
নীরব কোকিলকুল।
কিহেতু বলনা, না করে কলনা,
হিমে কেন প্রতিকূল॥

পতি।

শুন প্রাণ বলি, কোকিল কাকলী,
যেহেতু হইল হারা।
মধুস্বরে তব, হইয়ে নীরব,
তোমারে শাঁপিছে তারা॥
তব বিধুমুখ, হইবেক মূক,
যেমন তাহারা হয়।
তাই বুঝি প্রাণ, যবে কর মান,
ওমুখ নীরবে রয়॥

নারী।

কেন ফণিবর, প্রবেশি বিবর,
পাতালে গমন করে।

পতি।

বেণী লো তোমারি, দেখিতে না পারি,
পলাইল বিষধরে॥
যদি বল ধনি, দূর হলে ফণি,
অবনী মণ্ডল হতে।
আর ধরাতল, কিছু হলাহল,
রহিবেনা কোনমতে॥
তা নয় তা নয়, বহু বিষ রয়,
তোমার নয়নে প্রাণ।
সে গরল পারে, সংহার সংসারে,
করিবারে সমাধান॥

কিন্তু চমৎকার, সর্প বিষাধার,
সবে ত্যজে যত্ন করি।
নয়ন গরলে, যতনে সকলে,
বাঞ্ছা করে ডুবে মরি॥
গরল অহির, শুধু কলহির,
ইচ্ছাক্রমে হয় পান।
নয়ন গরল, প্রেমিকে কেবল,
পাম করে ওরে প্রাণ॥
কিন্তু চমৎকার, বিষনাশকার,
অমৃত বিষেরি কাছে।
কেনরে এ বিধি, নয়ন সন্নিধি,
অধরে অমৃত আছে॥
বুঝেছি কারণ, একত্রে স্থাপন,
যেহেতু গরলামৃত।
সর্পের দংশনে, ছিল ওঝাগণে,
গরলে করিতে মৃত॥
নয়ন গরল, করিতে বিফল,
অবনীতে কেহ নাই।
মুখ সুধাধার, নিকটে তাহার,
নাশার্থ রয়েছে তাই॥

নারী।

তাড়ায়ে মলয়, কাল হিমালয়,
এলো কোথা হোতে বল।

হয় অনুমান, জনমের স্থান,
সে গিরি অতি শীতল ॥

পতি।

মোর বোধ হয়, এলো হিমালয়,
কুচ গিরি হোতে তোর।
কেননা সেস্থল, বড়ই শীতল,
স্নিগ্ধ কর হৃদি মোর।

নারী।

কোথায় মলয়, এমন সময়,
রহিলেক লুকাইয়ে।
হেরি হিমালয়ে, বোধ হয় ভয়ে,
সে গেল বা পলাইয়ে ॥

পতি।

হিমালয় ভয়ে, ত্রিভুবন ময়ে,
আর তার স্থান নাই।
পায় তব পাশে, আশ্রয় নিশ্বাসে,
এ সৌরভ তথা তাই ॥

নারী।

কেনহে নীহার, বর্ষে অনিবার,
গগনে রজনীভাগে।
কিবা শোভা মরি, সদা ইচ্ছা করি,
রাখিব নয়ন আগে ॥

পতি।

পতি শশধরে, দরশন করে,
রজনী মলিন ভাব।
বলে কেন নাথ, হেরি অকস্মাৎ,
হোলে হাস্যরসাভাব ॥
করি অপরাধ, দিয়েছে বিষাদ,
বুঝি এই অভাগিনী।
কাতরে নাথরে, এ মিনতি করে,
শেষে কাঁদে সে রজনী ॥
সে রোদন ছলে, নয়নেরি জলে,
নীহার বর্ষণ করে।
এই সে কারণ, নীহার বর্ষণ,
কহে যত মূঢ় নরে ॥
কিন্তু আমি বলি, সে মিথ্যা কেবলি,
সত্য যাহা আমি কই।
শশাঙ্ক গগনে, ওমুখ দর্শনে,
মলিন কাঁদিছে ওই ॥
যত তারাগণে তোমার নয়নে,
কাঁদিতেছে অবিরত।
নয়নের জলে, নীহারের ছলে,
পতন করিতে রত ॥

নারী।

হয়েছে শীতল, দেখিতেছি জল,
পুনশীত কি কারণ।

পতি।

বুঝি কি কারণে, কুরঙ্গ নয়নে,
কেঁদেছিলে প্রাণধন।
সেই অশ্রুজল, বহি বক্ষস্থল,
কুচ হিমালয় শৈল।
সে গিরি পর্শনে, নয়ন জীবনে,
অতিশয় হিম হৈল।
সেই বিন্দু জল, পড়িয়ে ভূতল,
জলে গিয়ে মিশাইল॥
অশ্রু পরশনে, জল সেইক্ষণে,
অতি শীতল হইল।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
হুগলি কালেজ।

কবিতার নীচে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদকীয় মন্তব্য দেখিতেছি :—

"উৎকৃষ্ট প্রং সং।"

(সংবাদ প্রভাকর, ১৮ মার্চ্চ ১৮৫৩। ৬ চৈত্র ১২৫৯)

ছাত্রের রচিত।

রূপক।

কামিনীর প্রতি উক্তি।

তোমাতে লো ষড় ঋতু।

পয়ার।

অপরূপ দেখ একি, শরীরে তোমার।
একঠাই ষড় ঋতু, করিছে বিহার॥

নিদাঘ, বরষা, আর, শরদ হেমন্ত।
নিরখি শিশির আর, দুরন্ত বসন্ত॥
এ সবার সেনা আদি, তোমাতে বিহরে।
গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরদাদি, কহি পরে পরে॥

গ্রীষ্ম।

তপন সিন্দূর বিন্দু, অতি খরতর।
ক্রোধভরে করে কর, বসি মুখোপর॥
সে রবি রক্তিম রাগে, শুন হেতু তার।
নিরখিল নিজ প্রিয়া, চরণে তোমার॥
প্রফুল্লিতা কমলিনী, প্রেমভরে বসি।
নখরের ছলে কোলে, উপপতি শশী॥
নলিনী শশাঙ্ক সহ, করিতেছে বাস।
প্রভাকর করে তাই, প্রকোপ প্রকাশ॥
অতি ক্রোধযুক্ত রবি, হোয়েছে এবার।
তাইলো আরক্ত ছবি, দেখিতেছি তার॥
ঠেকে শিখে দিবাকর, রমণীর রীতি।
সামলিতে অন্য নারী, ধাইল ঝটিতি॥
তোমার পঙ্কজ মুখ, প্রাণের রমণী।
আগুলিতে আগে ভাগে, আইল অমনি॥
বদন সরোজ কোলে, সিন্দূর তপন।
বিশেষ কারণ তার, বুঝেছি এখন॥
পতিরে পাইয়া কোলে, সুখে আনন্দিত।
তোমার বদন পদ্ম, হোলো বিকসিত॥
প্রবল প্রভাবে ঘন, বহে সমীরণ।

তোমা হেরে দীর্ঘশ্বাস, ছাড়িছে পবন ॥
যে অনল নিদাঘেতে, দহে ত্রিভুবনে।
সে অনল আছে ওই, তোমার নয়নে ॥
গ্রীষ্ম ভয়ে হরি সহ, বাস করে করী।
তাহাও তোমাতে সখি, দরশন করি।
করিয়াছে স্থিতি তব, কটিতে কেশরী।
আছে কুম্ভ জাগাইয়া, কক্ষোপরি করী ॥
গ্রীষ্মে তরু সুশোভিত, ফলে অহরহ।
তুমি তরু শোভিতেছ দুই ফল সহ ॥
এ সবেতে পরাভব, নিদাঘ পলায়।
আইল স্বদল সহ, বরষা তথায় ॥

বর্ষা।

নিরন্তর, নীরধর, নিরখি চাচরে।
হাসি ছলে সৌদামিনী, নাচিছে অধরে ॥
হানিছে তাহারা সদা, অশনি আমায়।
হৃদয় বিদরে তায়, জর জর কায় ॥
যে সময়ে ঘাম বারি, ও দেহে নিরখি।
বরষার বারিধারা, তারে বলি সখি ॥
ঘোমটায় যবে ঢাকো, মুখ শশধরে।
বরষার শশী ঢাকা, যেন জলধরে ॥
ধরিতে আমার কর, মুদিয়াছ করে।
কমল মুদিত যেন বরষার ডরে ॥
উপরে ধোরেছে কালো, তব পয়োধর
গিরি শিরে শোভে যেন, নব পয়োধর ॥

বিধুমুখি তাহে এই, বিনতি হে করি।
চাতক হইতে মোরে, দেহ প্রাণেশ্বরি॥
বরষায় মনোহর, তরু শোভাকর।
দাড়িম্ব দেখিলো ধনি, তব পয়োধর॥
গিরি পরি নব লতা, শোভে এসময়।
সে গিরি তোমার কুচ, হার লতা হয়॥
এ সবেতে পরাভব, বরষা পলায়।
আইল স্বদল সহ, শরদ তথায়॥

শরদ।

শরদের সুধাকরে, সুধা করে কত।
সে ভাব নিরখি তব, মুখে অবিরত॥
কিন্তু যে কলঙ্ক কালী, থাকে শশধরে।
সে কলঙ্ক নাহি তব, মুখের ভিতরে॥
যদিও নাহিক মৃগ, আছে কিছু তার।
মৃগের নয়ন করে, বদনে বিহার॥
বসন বারিদ পুন, হইয়াছে দূর।
পুনরায় প্রকাশিত, তপন সিন্দূর॥
কর কমলিনী সদা, আছে বিকসিত।
কঙ্কণের নাদে অলি, গায় সুললিত॥
শরদে মরাল কুল, সুখে কেলি করে।
তোমাতে মরাল ভাব, গমনের তরে॥
চন্দ্রিকা হোয়েছে প্রিয়ে, অতি পরিষ্কার।
নিরখি তাহার আভা, বরণে তোমার॥
প্রফুল্লিতা কুমুদিনী, চন্দ্র মনোহরা।

হেরি তব নয়নেতে, বিস্ময়ুত ভরা।
যদি বল চন্দ্রকোলে, আছে কুমুদিনী।
দূর ঘুচে একত্রিত, অপূর্ব্ব কাহিনী॥
তার হেতু ইন্দীবর, তোমার নয়নে।
শরণ লোয়েছে গিয়ে, পতি নিকেতনে॥
এ সবেতে পরাভব, শরদ পলায়।
আইল স্বদল সহ, হেমন্ত তথায়॥

হেমন্ত।

… … … … [অস্পষ্ট]

কখনো সদয় হও, কভু মান কর॥
নিদাঘ, শরদ, বর্ষা, এই ঋতু চয়।
বিশেষ বসন্ত কাল, হয় রসময়॥
এই হেতু ধনি এই, ষড় ঋতুগণ;
তোমার সরস ভাব, করিছে বর্ণন॥
কিন্তু তাহে বর্ণিত, না হবে, তব মান।
সে মান বর্ণিতে আমি, হই ম্রিয়মাণ॥
এ কথা যদ্যপি তুমি, কহ সুলোচনা।
হেমন্ত, শিশির ছলে, মানের রচনা।
ফলত ঘটিল তাই, আমার কপালে।
মান করি নিজ দেহে হিম দেখাইলে॥
বিরস হোয়েছে তব, মুখ সুধাকর।
মুদিত হোয়েছে দেখি, আঁখি ইন্দীবর॥
এখন কমল কর, নহে বিকসিত।
সিন্দুর রবির ছবি, নহে প্রভান্বিত॥

নীহার কয়ন নীর, নিরবধি বহে।
যে জল শীতল অতি, সে আমারে দহে॥
শীতের স্বভাবে বারি, হোয়েছে শীতল।
কিন্তু তব অশ্রুরূপে, দহে মোরে জল॥
শীতের প্রতাপে বহ্নি, তাপহীন হয়।
মানে তাই জ্যোতি হীন, তব নেত্র দ্বয়॥
এ সবেতে পরাভব, হেমন্ত পলায়।
আইল স্বদল সহ, শিশির তথায়॥

শিশির।

নয়নের দীপ্তি হর, ঘন ঘোর তর।
কুআশায় ঢাকিয়াছে, রবি শশধর॥
ঘোমটা কুআশা ঘোর, করি দরশন।
মুখ শশী, ভালে রবি, করে আচ্ছাদন॥
থর থর কলেবর, শীতে যে প্রকার।
সেরূপ কাঁপিছে দেহ, পরশে তোমার॥
হইতেছে রোমাঞ্চিত, বিকল শরীর।
উহু উহু, ভীম-হিম, করিছে অস্থির॥
যেমন শিশিরে, কালো, স্নিগ্ধ হয় জল।
তেমনি তোমার অঙ্গ, কালো, সুশীতল॥
জল হোতে উঠে ধূম অনল সমান।
তোমার নিশ্বাসে ধূম, যদি কর মান॥
এ সবেতে পরাভব, শিশির পলায়।
আইল স্বদল সহ, বসন্ত তথায়॥

বসন্ত।

সরস বসন্ত রূপে, মুগ্ধ ত্রিভুবন।
তুমিও স্বরূপে মুগ্ধ, করিছ তেমন॥
সুচারু বিমল শশী, তোমার বদন।
ইন্দীবর, নেত্রবর, প্রফুল্ল এখন॥
কমলে কমল কত, কমল কাননে
হাতে পায় পদ্ম, পদ্ম, হৃদয় বদনে॥
প্রকটিত ফুল কুল, সৌরভ কি কব।
কিন্তু সে সৌরভ পাই, মুখপদ্মে তব॥
ভ্রমর ভ্রমণ করে, শুনি গুণ গুণ।
বুঝেছি নূপুর তব, করে রুণ রুণ॥
কিবা কুহু কুহু করে, কোকিল কলাপ।
বুঝেছি সে রব তব, মধুর আলাপ॥
তোমার সুগন্ধ যুক্ত, কমল বদন।
তাহা হোতে আসিতেছে, মৃদু শ্বাস ঘন:
মুখের সৌরভ লোয়ে, আসিছে নিশ্বাস।
না বুঝে কহিছে লোক, দক্ষিণ বাতাস॥
বসন্ত বৃক্ষের ডালে, নবীন পল্লব।
তাহার প্রমাণ দেখি, অধরেতে তব॥
বসন্তে প্রকাশ পায়, স্মরধনু শর।
তা হেরি কটাক্ষে তব, ভ্রূযুগ উপর॥
কিন্তু প্রাণ তব স্থানে, নিজে নাই স্মর।
কেবল রোয়েছে তার, ধনু আর শর॥
বুঝেছি কারণ সখি, যাহে নাহি স্মর।

পলায়েছে মনসীজ, হেরে কুচ দ্বয় ॥
শক্ত নহে শিব সহ করিবারে রণ।
ধনুর্ব্বাণ ফেলে দিয়ে, পলালো মদন ॥
দেখ দেখ বিধুমুখি, ঈশ্বর কৌশল।
স্থাপিত কোরেছে ঋতু, তোমাতে সকল ॥

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
হুগলি কালেজের ছাত্র।

হিন্দু ও কৃষ্ণনগর কালেজের ছাত্রের রচনা পূর্ব্বে প্রকাশ হইয়াছে, অদ্য হুগলি কালেজের ছাত্রের লেখা সর্ব্ব সাধারণের দৃষ্টিপথে অর্পণ করিলাম, আমারদিগের সহযোগি-গণ এবং পাঠক মহাশয়েরা যথাযোগ্য মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করত আপনাপন স্বরূপাভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া কবি ভ্রাতাদিগের কবিত্ব ও রচনা ঘটিত পরিশ্রম ও গুণের পারিতোষিক প্রদান করুন।...

এই রচনাটির জন্য রংপুরের দুইজন জমিদার বঙ্কিমচন্দ্রকে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন; সে-কথা কার্ত্তিক সংখ্যায় লিখিয়াছি।

বঙ্কিমচন্দ্র অনেক সময় ছদ্মনামে লিখিতেন। এই লেখাটিও তাঁহারই রচিত বলিয়া আমার বিশ্বাস।—

(সংবাদ প্রভাকর, ১৩ এপ্রিল ১৮৫৩। ২ বৈশাখ ১২৬০)

ছাত্র হইতে প্রাপ্ত।

—০—

স্বপ্ন। রূপক

যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন মিদং।

সম্পাদক মহাশয়! মদুক্তি কতিপয় পঁক্তি আক্ষেপোক্তি ভবদীয়

প্রবীণ পক্ষপাত বিহীন প্রভাকর। পাঠক প্রান্তে স্থান দান করিয়া উৎসাহ বৃদ্ধি করিবেন।

একদা যামিনীযোগে নিদ্রাবেশে ভ্রমণ করিতে করিতে বিবিধ বিটপি পরিবেষ্টিত কোন নিবিড় বনমধ্যে প্রবেশ করিলাম। তথায় তৎসময়ে কুসুম সময় প্রযুক্ত নানা জাতি প্রসূন তরুণ তরু লতাগণে দ্বিজগণের বেদ ধ্বনি হইতেছিল। আর দক্ষিণ হইতে সুশীতল মলয়বাত অচিরাৎ সুগন্ধ সহিত মন্দ মন্দরূপে বহিতেছিল। স্থানে স্থানে অত্যুচ্চ পর্ব্বত গুহাতে কত শত বনচরগণ পরিভ্রমণ করিতেছিল। মধ্যে মধ্যে মনোহর সুনির্ম্মল জলপূর্ণ জলাশয় নিকর মৃদু মধুর কুল কুল স্বর করত স্রোতোবাহী হইয়া চলিতেছিল। তাহাদের বিমল শরীরোপরি কমল বিভূষণে চপলা চঞ্চল মধুকরের গুণ গুণ রব শ্রবণে চিত্ত আকর্ষিত হইয়া শ্রুতিপ্রিয়কর মধুর বাদ্য জ্ঞানে পদে বিহার পূর্ব্বক তত্র গমন মাত্র স্বভাবের শোভা সন্দর্শন করিতেছিলাম, ইত্যবসরে অকস্মাৎ মেঘ-জাল জড়িত ঘন ঘোর গভীর গর্জ্জন করণক সহসা তমসাবৃত হইয়া এককালে ধরাতল আচ্ছন্ন করিল। পলকে পলকে প্রলয়করী বিঘোরা ঝটিকা সঘন উড্ডীমানা কাদম্বিনী সহচারিণী সৌদামিনী প্রকাশ হইতে লাগিল এবং ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি নানা হিংস্র জন্তু বৃক্ষাদি পতন ভয়ে পলায়ন-পরায়ণ হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করণে ধাবমান হইল। এই সকল ভয়ানক ব্যাপার দর্শন করিয়া জীবন রক্ষার্থ চঞ্চলচিত্তে চতুর্দ্দিগ অবলোকন করিতেছি, ইতিমধ্যে অবিদূরে এক পত্রাচ্ছাদিত কুটীর নয়নগোচর হইবায় ত্বরায় তথায় গমন করত যাহা দর্শন করিলাম, মহোদয় পাঠক-বৃন্দের বিদিতার্থ নিম্ন লিখিত কতিপয় পদ্য পংক্তিতে তদ্বিশেষ ব্যক্ত করিতেছি, কৃপাকণা প্রকটন পুরঃসর নেত্রপাত করিয়া বাধিত করিবেন।

পয়ার।

প্রবেশিয়া তবে সেই, কুটীর ভিতর।
দেখিলাম নারী এক, অতি মনোহর॥
কি কহিব রূপ তাঁর, না দেখি তুলনা।
বর্ণে বর্ণ হীন হয়, করিতে বর্ণনা॥
বিশ্বজন মনোলোভা, অপরূপ রূপ।
ধরাতলে নাহি হেরি, সেরূপ স্বরূপ॥
চরণ কিরণে চমকিত সম ভয়ে।
মেঘাশ্রিত হয় রবি, সলজ্জিত হয়ে॥
নখর নিকর তাহে, প্রখর শোভিছে।
ভয়ে বুঝি শশী আসি, শরণ লভিছে॥
দেখি তাঁর মধ্যদেশ, করিয়া বিদ্বেষ।
হরি হরি করি হরি, পরিহরে দেশ॥
রম্ভাতরু জিনি চারু, উরুর শোভন।
লজ্জাভরা বসুন্ধরা, নিতম্ব কারণ॥
কুচদ্বয় দেখি ভয়, অভিমান ভরে।
পাষাণ হইল গিরি, বাহ্য অভ্যন্তরে॥
করিরাজ কর নিন্দে, ভজ দেখি তাঁর।
লাজ ভয়ে মৃণাল, করিছে পঙ্কসার॥
কমনীয় কণ্ঠ হেরি, কম্বু পেয়ে দুখ।
প্রবেশে অম্বুধি মাঝে, লাজে ঢাকি মুখ॥
সে মুখ তুলনা ধরি, পায় অপমান।
জলে ভাসে পদ্ম শশধর ম্রিয়মাণ॥

নিন্দিয়া কুন্দের পাঁতি, দন্তপাঁতি শোভা।
অলক সুন্দর ওষ্ঠাধর মনোলোভা॥
নয়ন নিরখি লাজ, লভিয়া বিস্তর।
আতঙ্কে কুরঙ্গে রহে, কানন ভিতর॥
খগপতি নিন্দি অতি, নাশা মনোহর।
তাহে পুন শোভা করে, মুকুতা সুন্দর॥
প্রভাতে অরুণোদয়, রবির ছটায়।
নীহার কলিকা যেন, তিল পুষ্প তায়॥
বিশাল জলেতে ভাল, ভুরুর ভঙ্গিমা।
ইন্দুর সমান তাহে, সিন্দুর রঙ্গিমা॥
ফণিবর সুধাধর, অধরের তরে।
বেণী ছলে উঠে বুঝি, পৃষ্ঠ দেশোপরে॥
কহিলাম বিশেষিয়া, কিঞ্চিৎ সেরূপ।
নহে তার শতাংশের, একাংশ স্বরূপ॥
নির্জ্জনে দেখিয়া তাঁরে, করিয়া বিনয়।
চাহিলাম দিতে সবিশেষ পরিচয়॥
শ্রবণে আমার কথা, হয়ে কৃপাবতী।
স্নেহভাবে সম্বোধিয়া, কহিলেন সতী॥

ত্রিপদী।

কেন বাছা পুন আর, জিজ্ঞাসহ বারবার,
প্রদান করিতে পরিচয়।
আমা সম অভাগিনী, নাহি পতি বিরাগিণী,
সদা দুখে দহিছে হৃদয়॥

স্বাধীনতা মম নাম, একদা নগরে ধাম,
সতী মম ভারতী কুটিলা।
সতত স্বশ্রমে মতি, সদানন্দ মম পতি,
নাহি জানি কোথায় রহিলা॥
সুখের ভারত বর্ষে, কত দিন কত হর্ষে,
যাপিলাম সুখে দিবা রাত্রি।
সে সুখ হয়েছে শেষ, দুখ পূর্ণ সব দেশ,
অবশেষ নাহি কিছু মাত্র॥
অধীনতা নিশাচরী, ভয়ঙ্কর বেশ ধরি,
সঙ্গে করি সৈন্য বহুতর।
আসি বঙ্গ বরাবর, নাশি মম অনুচর,
অনুতাপ দিলেক বিস্তর॥
তাদের দেখিয়া রঙ্গ, আতঙ্ক ত্যজিয়া বঙ্গ,
ভঙ্গ দিয়া করিল গমন।
পরে কালে সিন্ধু জলে, আসি সব শীকদলে,
প্রিয় বাক্যে করিল বন্দন॥
মিষ্ট বাক্যে হৃষ্ট হয়ে, তাদের আশ্রয় লয়ে,
কিছুদিন হইল যাপন।
প্রকাশি প্রবল বল, সবার ধবল দল,
সে সম্বল করিল হরণ।
খেদে হয়ে ম্রিয়মাণ, ত্যজিয়া সে প্রিয়স্থান,
প্রয়াণ করিনু সিন্দুপার।
যেন রবি পূর্ব্ব হতে যাইতে পশ্চিম পথে
প্রভা সহ সাগরে সঞ্চার॥

বলিতে বলিতে যার, দুই চক্ষে শত ধার,
বাক্য আর স্ফুরে না বদনে।
তাহে এই করি ধার্য্য, ত্যজিতে ভারত রাজ্য,
কভু তাঁর ইচ্ছা নাহি মনে ॥
দেখ এই হিন্দুস্থানে, নানা দ্রব্য নানা স্থানে,
প্রচুর প্রমাণে লাভ ভাব।
ধন্য ধন্য এই দেশ, স্বভাবের সমাবেশ,
সমভাবে না হয় অভাব ॥
অতএব বন্ধুগণ, রাখ মম নিবেদন,
আগমন যাতে হয় তাঁর।
হেন কার্য্যে অহরহ, কায় মনে রত রহ,
এ দুঃসহ দুঃখে হবে পার ॥

সাং গৌরীভা। শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।
৯ চৈত্র ১২৫৯ সাল। হুগলি কালেজের ছাত্র।

(সংবাদ প্রভাকর, ২৭ এপ্রিল ১৮৫৩। ১৬ বৈশাখ ১২৬০)

বসন্তের নিকট বিদায়

ত্রিপদী।

হা বসন্ত মনোহর, হা মোহন রূপধর,
হারে হৃদি বিচঞ্চলকর।
লইয়ে রূপের ভার, কেন কর পরিহার,
এ মহী মণ্ডল মনোহর ॥

আর কিছু দিন ওরে, রহরে ধরণী পরে,
বিদায় তোমারে নারি দিতে।
জানি জানি মরি মরি, এ পাপ পৃথিবী পরি,
নারো আর দিনেক রহিতে॥
যতেক তোমার শোভা, মোহকর মনোলোভা,
উড়ে যায় নহে স্থিরতর।
খর দিনকর করে, ক্রমেতে মলিন করে,
মোহকর সে শোভা নিকর॥
তাপিত কুসুম ফুলে, মাথা তুলে দুলে দুলে,
মৃদু রবে মরুতেরে কয়।
"পাপ তাপে দহে দেহ, বসন্ত আনিয়া দেহ,
মরি সে কি ফিরিবার নয়॥"
না কুসুম সুন্দরীরে, আসিবে আসিবে ফিরে,
সাধের বসন্ত মনোহর।
কিন্তু সে আসিলে ফের, তোরা তো পাবিনে টের,
আজি যাবে পড়িয়া ভূপর॥
আমরি অমনি দুখে, বিদরে আমার বুকে,
এ অসার সংসারে রহিয়ে।
ফুলের বসন্ত মত, আশার যতন যত,
যে সকল সুখের লাগিয়ে॥
আশা মোর সে বসন্ত, বুঝি আমি হলে অস্ত,
তবে আসি হবেরে ঘটনা।
প্রখর দুখের রবি, চিরদিন বুঝি রবি,
অভাগারে দিবারে যন্ত্রণা॥

মতি আরে কেন আর, কেঁদে মরি এ প্রকার,
মানবেরি এমন কপাল।
ইহ লোকে চির দীন, হৃদি রবে সুখহীন,
মনোদুখে কাটাইবে কাল॥
পরিণামে নিত্য নামে, পাবে সেই নিত্য ধামে,
নিত্যই বসন্ত বিকসিত।
যাই তথা যাই তুর্ণ, পরম প্রণয় পূর্ণ,
পরমেশে প্রেমে করি প্রীত॥
কি ছার মিছার আর, মুখাম্বুজ মহিলার,
মোহ ভরে করি নিরীক্ষণ।
তেমতি মোহিত মতি, সে প্রীতি প্রকৃতি প্রতি,
রাখিবেক করিয়া যতন॥
হা মলয় কেন তুমি, উন্মাদের প্রায়।
বেগ ভরে যাও দ্রুত, যথায় তথায়॥
প্রাণের প্রণয়েশ্বরী, কুসুমের কুলে।
নাহিক নিরখি নেত্রে, জ্ঞান গেছ ভুলে॥
নারে চল ধীরে ধীরে, আসিবে বসন্ত ফিরে,
ফিরে আসি ফুটাইবে ফুল।
ফিরে ফুটাইলে ফুলে, লইও সৌরভ তুলে,
চুম্বিয়া সে কুসুমের কুল।
কিন্তুরে কভুকি আর, আছে আশা ফিরিবার,
মানবের যৌবন বসন্ত।
ফুটায়ে প্রণয় ফুলে, মানবেরে দিবে তুলে,
সুখ রূপি সৌরভ অনন্ত।

যাবে সে কাল কভু আর, নহে কো রে ফিরিবার,
গেলে কাল আর নাহি ফেরে।
কেবলি চলিছে কাল, যে দিনে সাধরে কাল,
ছাড়ায়ে সংসার যত ঘোরে॥

আসিবে সেদিন যবে, কি সুখ দিবারে রবে,
যৌবন সুকৃতি প্রেমসুখ।
শুধু স্মারা দেবে জালা, মন হবে ঝালাপালা,
ভাবিয়া প্রাণের যত দুখ॥

তাই বলি পরিণামে, আদরেতে ধরি নামে,
ঈশ্বরে অন্তরে ভাবে যেই।
পরমেশ প্রেমাস্পদ, লভ্য করি মোক্ষপদ,
নিত্যই বসন্ত পাবে সেই॥

হুগলী কালেজ।
৩০ চৈত্র ১২৫৯। } শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

শচীশবাবুর 'বঙ্কিম-জীবনী' সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা বলিয়া এই দীর্ঘ প্রস্তাবের উপসংহার করিব।—

(১) ১৩৮ পৃষ্ঠায় শচীশবাবু লিখিয়াছেন,—"বঙ্কিমচন্দ্রও এক দিন 'Rajmohan's wife' নামক গল্প ইংরাজি ভাষায় লিখিয়াছিলেন। গল্প শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার ভুল ভাঙ্গিয়াছিল। তিনি 'Rajmohan's wife'...ছাড়িয়া 'দুর্গেশনন্দিনী' লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন।" শচীশবাবু নিশ্চয়ই 'Rajmohun's Wife' দেখেন নাই। ইহা পুরাদস্তুর উপন্যাস, ২১টি অধ্যায়, তাহা ছাড়া CONCLUSIONও রহিয়াছে!

ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের সর্ব্বপ্রথম উপন্যাস। বহু অনুসন্ধানের পর আমি প্রাচীন সংবাদপত্রের ফাইল হইতে উপন্যাসখানি উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছি।

(২) পুস্তকের ১০০ পৃষ্ঠায় বহরমপুরে কর্ণেল ডফিনের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের বিবাদের কথা লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা ঠিক কোন্ সালের ঘটনা তাহার কোন উল্লেখ দেখিতেছি না। ১৮৭৪ সালের ১৯এ জানুয়ারি তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রে প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলে বুঝা যাইবে ঘটনাটি ১৮৭৩ সালের শেষভাগে ঘটিয়াছিল :—

"Sometime ago we received a letter stating that Babu Bunkimchunder Chatterjea, Deputy Magistrate, Berhampore, was assaulted by Lieut. Col. Duffin of that city. Soon after we were requested not to publish the letter, which we consequently withheld. It is now stated that the gallant son of Mars has since made an apology to the Babu."

(৩) ৪২০ পৃষ্ঠায় শচীশবাবু লিখিয়াছেন,—"চুঁচুড়ায় একবার 'লীলাবতী' অভিনীত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র সে সময় বহরমপুরে।...সুদূর বহরমপুরে বসিয়া তিনি ও অক্ষয় বাবু নাটকখানি কাটিয়া ছাঁটিয়া অভিনয়োপযোগী করিয়া দিয়াছিলেন।" ১৮৭২ সালের মার্চ মাসে এই অভিনয় হয়। পরবর্ত্তী ৪ এপ্রিল তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় এই অভিনয় সম্বন্ধে যে দীর্ঘ সম্পাদকীয় মন্তব্য বাহির হইয়াছিল তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"চুঁচুড়ায় সম্প্রতি লীলাবতী নাটক অভিনয় হইয়া গিয়াছে।... অভিনয়টি অতি সুচারু পূর্ব্বক হইয়াছিল।...যদিও ইহা সম্পূর্ণরূপে দোষ শূন্য হয় নাই তথাচ এদেশে যত উৎকৃষ্ট ২ অভিনয় হইয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে এটি একটা।"

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৬ষ্ঠ সংখ্যা] ফাল্গুন, ১৩৩৮ [৪র্থ বর্ষ

সাহিত্য ও যুগধর্ম্ম *

জগতে একটা যুগান্তর চল্‌ছে, একথা আমরা সবাই জানি। আমাদের দেশেও সেই যুগান্তরের হাওয়া ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠ্‌ছে, এ তথ্য আমরা প্রতিদিনকার জীবন-যাত্রায় মজ্জায় মজ্জায় অনুভব কর্‌ছি। ব্যাপারটা কিছু আকস্মিক ব'লে মনে হ'লেও, এর সূচনা হয়েছে অনেক আগে,—যেদিন রাজশক্তির মারফতে য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা পাকা হয়ে গেল। সেই প্রথম ধাক্কাটা আমরা অনেক দিক দিয়ে সইয়ে নিতে পেরেছিলাম, উনবিংশ শতকের শেষ পর্য্যন্ত আমরা আমাদের ধর্ম্ম, সমাজ ও নানা সংস্কারের সঙ্গে য়ুরোপীয় ভাব ও চিন্তা-ধারার একটা আপোষ ক'রে মনের ও প্রাণের উপর তলাটায় নির্ব্বিঘ্নে আত্মপ্রসাদ উপভোগের বন্দোবস্ত ক'রে নিয়েছিলাম। সব জায়গায় কিছু কিছু সংস্কার ক'রে নিয়ে—কোথাও দাগরাজী কোথাও বা চুণকাম, কোথাও বড়জোর এক-আধটা খিলান বদ্‌লে প্রায় নিশ্চিন্ত হয়ে

* এই প্রবন্ধটি প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে লেখা।

বসেছিলাম। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর আরম্ভ থেকেই ভিত নড়্‌তে সুরু হ'ল; তারপর গত দশ পনের বৎসর যাবৎ ব্যাপারটা এমন বেখাপ্পা হয়ে উঠেছে, যে, হালে আর পানি পাচ্চে না, এখন এমন অবস্থা হয়েছে, যে ভয় ভাবনা ক'রে আর ফল নেই, 'যা হবার হবে' মনে ক'রে প্রবল স্রোতের মুখে গা ভাসিয়ে চলেছি। রাষ্ট্র বা সমাজের কথা বল্‌বার অধিকারী আমি নই, কিন্তু সাহিত্যে এই যুগধর্ম্ম যে ভাবে আত্মপ্রকাশ কর্‌বার চেষ্টা করেছে তার সম্বন্ধে, আমার যা মনে হয় তাই আপনাদের কাছে নিবেদন কর্‌তে চাই।

কোনো সাহিত্যই দেশকালের প্রভাববর্জ্জিত নয়। সাহিত্যের জন্ম হয় দেশকালের গণ্ডীর মধ্যে, সেইখান থেকেই তার শিকড়-গুলি রস সঞ্চয় করে; ফুল মাটির উপরে, এমন কি অনেক উঁচুতে সরু বোঁটায় ফুটে ওঠে বটে, কিন্তু সকল জাগতিক সৃষ্টির মত তার বিকাশ হয় পাঞ্চভৌতিক নিয়মে। তারপর সেই বিকাশের চরম ভঙ্গীটি দেখে তার মূল্য নিরুপণ হয়। তখন রসিক ব্যক্তিরা তার সৌন্দর্য্য-রসটুকুরই বিচার করেন, এবং সেই ভাব-রূপটি তার একমাত্র সার্থক লক্ষণ ব'লে স্বীকার করেন। এ বিচার যথার্থ, এর বিরুদ্ধে বল্‌বার কিছু নেই। কিন্তু তথাপি দেশকাল এবং জাতি বা সমাজ-বিশেষের সম্পর্ক তার ক্ষয়-বৃদ্ধির মূলে প্রচ্ছন্ন থাক্‌লেও বেশ ঘনিষ্ঠ হয়েই আছে; নির্ব্বিশেষ রসের বিচারে তাকে বাদ দেওয়া গেলেও, তার উৎপত্তি ও বিকাশধর্ম্মের সঙ্গে এ সকলের একটা নিবিড় যোগ আছে। রসিক-সমাজের রত্নাগারে স্থান পাবার আগে সাহিত্যকে তার কারখানা বা রসশালায় একটা প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে গ'ড়ে উঠ্‌তে হয়। এই কার্য্যকারণতত্ত্ব সাহিত্যের পক্ষেও সমান বলবৎ—জগতের কোনো কিছুই স্বয়ম্ভূ বা ভুঁইফোঁড় নয়।

এই কথাটি মনে রেখে আমি বর্ত্তমান যুগের বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে সামান্য একটু আলোচনা ক'রে দেখতে চাই। এই আলোচনার একদিকে সাহিত্যের শাশ্বত ও সার্ব্বজনীন আদর্শকেও স্বীকার করব, আবার তার সৃষ্টি-বিকাশের অন্তরালে যে যুগধর্ম্মের অমোঘ নিয়ম বর্ত্তমান, তাকেও অস্বীকার করব না। বরং, যে-সাহিত্য প্রত্যক্ষ যুগসাহিত্য, যার বর্ত্তমানটাই প্রকট, ভবিষ্যৎ পরিণতি এখনও দৃষ্টিগোচর হয়নি, তার বিচারে ওই শেষ দিককার আলোচনাই বিশেষ প্রয়োজন। এ কথা কেউ অস্বীকার করবে না যে, বর্ত্তমান যুগে আমরা যে-সাহিত্য-সৃষ্টির প্রয়াস চারিদিকে দেখ্ছি, তা এখনও খুবই কাঁচা; তাতে যেটুকু রং ধরেছে তা রোদ-পাকার রং। এ সাহিত্য এখনও সাহিত্যহিসাবে আলোচনার যোগ্য হয়নি বটে, তবু এর মধ্যে এমন একটা প্রবৃত্তি স্পষ্ট হয়ে উঠ্ছে, যেটাকে আর কিছু না হোক, একটা নূতনতর কালের ইঙ্গিত ব'লে মনে করা অন্যায় নয়। এ সব লক্ষণ হয়ত খুব বাহিক ও ক্ষণিক, হয়ত অল্পদিনেই গভীরতর স্থায়ী লক্ষণ প্রকাশ হয়ে পড়্বে। তবুও একে আর উপেক্ষা করা যায় না। এর মধ্যেই এগুলিকে লক্ষ্য ক'রে সাহিত্য-সমাজের নানা পাড়ায় নানা রকমের দুর্দ্দান্ত আলোচনা আরম্ভ হ'য়েছে, এবং সেই আলোচনায় সাহিত্যের নিত্য স্বরূপ সম্বন্ধে নিদারুণ সংশয়ের সৃষ্টি হচ্ছে। একটা ঘূর্ণীপাকের মধ্যে হাবুডাবু খেতে থাক্লে কোনো কল্যাণই হবে না; সৃষ্টির চেয়ে অনাসৃষ্টিই বেড়ে যাবে, এবং যে যুগান্তর অনিবার্য্য তাকে ঠেকিয়ে রাখ্তে গিয়ে মিছামিছি শক্তিক্ষয় করা হবে।

কিছুকাল আগে আমি 'নব্যভারত' পত্রিকায় আধুনিক সাহিত্য নাম দিয়ে কয়েকটা প্রবন্ধ লিখেছিলাম। সেগুলিতে একটা কথা আমি খুব স্পষ্ট ক'রে বলতে চেয়েছিলাম। সেটা হচ্ছে এই যে,

বাংলা সাহিত্যে একটা যুগের অবসান হয়েছে। ইংরেজী আমলের প্রথম দিক্‌কার যে সাহিত্য তার প্রবৃত্তি রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত পৌঁছে নিঃশেষ হয়ে এসেছে। সেটা ছিল চিত্তচমৎকার ও কল্পনা-বিলাসের যুগ। সে যুগে আমরা লাভ করেছি—এক অভিনব সাহিত্যকলা, কাব্যসৃষ্টির উন্নত আদর্শ ও তার উপযোগী ভাষা। সে যুগের যেটা সত্যকার প্রেরণা ছিল তার ফসলও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ফলেছে। এখন সে প্রবৃত্তি ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে একটা নূতনতর চেতনার সংঘর্ষে প্রায় লুপ্ত হয়ে এসেছে। একটা নূতন ভাব-সত্যকে আশ্রয় করবার জন্য আজকালকার সাহিত্যবুদ্ধি অধীর হয়ে উঠেছে। এই নূতন ভাব-সত্য যে কি তা আমি 'নব্যভারতে'র প্রবন্ধে বিশদ ক'রে বল্‌বার চেষ্টা করেছিলাম, এখানে তার পুনরাবৃত্তি কর্‌ব না। আশা করি, আজকের আলোচনায় আপনা হতেই সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌বে। তখনকার দিনে, ইংরেজী শিক্ষার প্রথম আক্রমণে সমাজ ও ব্যক্তি-জীবনে যে সংঘর্ষ উপস্থিত হ'য়েছিল তা মুখ্যতঃ ভাবপ্রধান। সর্ব্বত্র 'একটা আদর্শনির্ণয়ের ব্যাকুলতা, নূতনের সঙ্গে পুরাতনের সামঞ্জস্য চেষ্টা, এবং নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় আত্মসম্মান ফিরিয়ে পাবার অসীম আগ্রহ—এই ছিল সে যুগের প্রধান প্রবৃত্তি। তখন বাস্তব জীবন অনেকটা স্বচ্ছন্দ ও নিশ্চিন্ত ছিল, জীব-জীবনের গভীরতম চেতনা, নিপীড়িত প্রাণধর্ম্মের আর্ত্তনাদ, দেহ-দুঃখ,—এসব তখনকার দিনে জাগ্রত হয়ে ওঠেনি। তাই সে যুগের প্রতিভা ও মনীষা শাশ্বত সত্য-সুন্দরের মন্দির গড়্‌তেই ব্যস্ত ছিল। কিন্তু পায়ের তলাকার মাটি আর এই সব চেয়ে প্রত্যক্ষ ও বাস্তব দেহটাকে ভালো ক'রে বুঝে দেখ্‌বার প্রয়োজন তখন হয়নি। কিন্তু সহসা যুগান্তর উপস্থিত হল, নানা প্রত্যাশিত ও অপ্রত্যাশিত ঘটনা-পরম্পরায় জগতের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশটাও শুকিয়ে

কাঠ হয়ে উঠ্‌ল ; রস আর বাইরে কোথাও রইল না, নিজের বাস্তব দেহমনটা নিংড়ে যেটুকু পাওয়া যায় তাও তিক্ত ও বিস্বাদ হয়ে উঠেছে,—দেহ সাড়া দিয়েছে, কিন্তু সে দেহ অতিশয় দুর্ব্বল ও রুগ্ন। তার ফলে আজকালকার সাহিত্যের যে চেহারা দাঁড়িয়েছে, তা সকলেই দেখ্‌তেই পাচ্ছেন।

যুগান্তরের সঙ্গে সঙ্গে যে আদর্শ বদল হবে—এ তো স্বাভাবিক। বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে যা সত্য, তাকে অবহেলা কর্‌লে সাহিত্য-প্রেরণা মিথ্যা হয়ে যায়। যিনি সাহিত্য সৃষ্টি করবেন, তিনি দেশ-কালকে উপেক্ষা ক'রে যতবড় কল্পনাকেই আশ্রয় করুন না তা জীবন্ত বা প্রাণময় হবে না। সত্যকে আমরা দেশকালের প্রত্যক্ষ রূপের মধ্যেই উপলব্ধি করি—সেই প্রত্যক্ষ অনুভূতিই প্রতিভার শক্তি-বলে শাশ্বত ও সার্ব্বজনীন হয়ে ওঠে। আমাদের দেশেও যুগান্তরের সঙ্গে সঙ্গে সত্যের রূপটি বদ্‌লেছে। গত যুগে তাকে যে ভাবে যে দিক দিয়ে ধারণা করতে চেয়েছিলাম, আজ আর তাকে ঠিক তেমনি ভাবে সন্ধান কর্‌তে গেলে তার নাগাল পাব না, সে যুগের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে এ যুগের আশা-আকাঙ্ক্ষার মিল নেই—তাই সে যুগের সাধনমন্ত্র এ যুগে অচল। যাঁরা সাহিত্যের সম্পর্কে এই যুগধর্ম্মকে স্বীকার করেন না, তাঁরা এ কালের এই আদর্শ-বিপর্য্যয়, চিত্তবিক্ষেপ ও দ্বন্দ্ব-সংশয়ের মধ্যে, দিশাহারা হয়ে পড়বেন—যাঁরা রসিক তাঁরাও নূতন পানপাত্রকে সন্দেহের চক্ষে দেখবেন, কারণ অভ্যাস জিনিষটা রসিকের পক্ষেও সমান অন্তরায়—রসিকও যে মানুষ।

আমি এই যুগধর্ম্ম মানি। কিন্তু এই নবযুগের প্রারম্ভেই সাহিত্যের অজুহাতে যা সৃষ্টি হচ্ছে তাতে আশান্বিত হতে পারিনি, বরং যথেষ্ট শঙ্কিত হচ্ছি। একথা আমিও বুঝি যে, এই নব্য সাহিত্য সবে জন্ম

লাভ করেছে, এর সাবালক হওয়ার এখনও অনেক দেরী। এ যাবৎ এই সাহিত্য-রচনার যে প্রবৃত্তি প্রকট হয়েছে, তাতে কোনো ধর্ম্মেরই লক্ষণ নেই। এখনও তা সজ্ঞান সপ্রতিভ নয়। এখনও তার ভাষা ও প্রকাশভঙ্গী, form বা রূপ, নির্দ্দিষ্ট হয়ে ওঠে নি। কেবল একটা বালসুলভ উত্তেজনা ও অস্ফুট ভাব-বিদ্রোহ ক্রমেই প্রসার লাভ করছে। তার মধ্যে বালকোচিত স্ফূর্ত্তি ও স্বাস্থ্যের একান্ত অভাব। এই আধুনিক সাহিত্য-কর্ম্মীরা আপনাদের 'তরুণ' 'সবুজ' ব'লে নামকরণ করেছেন। কিন্তু তারুণ্য ও চির-হরিতের যে গূঢ় ও সত্য অর্থ আছে সে অর্থে তাঁরা এ পদবীর উপযুক্ত নন্, বরং তাঁদের কীর্ত্তির তুলনায়, ওই শব্দ দুটির অর্থ একটু হাস্যকর হয়ে পড়ে। যদি বয়সের নবীনত্ব বা দেহের যৌবনই একমাত্র দাবী হয়, তবে সে দাবী পশু-পক্ষীরও আছে এবং সর্ব্বকালে সর্ব্বজীবেরই একটা কচি ও কাঁচা অবস্থা থাকে। যদি ওই তারুণ্যটুকুই একমাত্র সম্বল হয়, তবে তার থেকে অন্ততঃ সাহিত্যের সৃষ্টিশালায় তাঁদের কাছ থেকে বেশী কিছু আশা করা যায় না। যৌবনই বিধাতার শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ, জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তির অনুকূল। কিন্তু যে যৌবন বিশ্বগ্রাস করবার জন্যে শক্তি সঞ্চয় করে না, যার সাধনা বা তপস্যা নেই, যে যৌবন সত্যের জন্য কঠোর কৃচ্ছ্র-সাধন করে না—দুঃখ যার বিলাসমাত্র, সুলভ-মতবাদ ও সহজপাঠ্য নিকৃষ্ট সাহিত্য যার কৃত্রিম কল্পনার আশ্রয়, অতিশয় অলস ও দুর্ব্বল মস্তিষ্কের ভাবোন্মাদ এবং কালিকলমই যার সাহিত্য-রচনার একমাত্র উপকরণ—সে যৌবন সাহিত্যের কোন্ কাজে লাগবে? সবুজ রংটা খুব সুন্দর, তার সঙ্গে যেসব ভাব মনে আসে তাও উপাদেয়—কিন্তু পুকুরের পানাও ত সবুজ, কোন কোন সাপের রং সবুজ—সবুজ ব'লে গর্ব্ব করবার সময় একথাটাও মনে রাখতে হবে। মোটের

উপর তরুণ ব'লে বা সবুজ ব'লে প্রবীণদের সঙ্গে ঝগড়া করলেই সাহিত্যের উপকার হবে না। তারুণ্য বা adolescence জীবধর্ম্ম বটে; তার সঙ্গে সাহিত্য-প্রতিভার কোন সুনিশ্চিত কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ নেই।

আমি গোড়াতেই বলেছি, যে নূতনকে বরণ ক'রে নিতে আমার কিছুমাত্র দ্বিধা নেই; বরং পুরাতনের আসনই টলেছে, এবং সেই আসনে নূতনের আবির্ভাব যে আসন্ন হয়ে উঠেছে—এ বিশ্বাস আমি করি। যার প্রতিষ্ঠার লক্ষণ এখনো দেখতে পাচ্ছি নে, তার সূচনা লক্ষ্য করেছি বলেই আজ এ আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি। আমি সাহিত্য Corporationএর Health Officer নই, ঢিলা পায়জামাধারী সিগারদংশী অভিজাত সাহিত্যের dilettanteও আমি নই। সাহিত্য-বৃক্ষের মূল থেকে তার শাখার ফুলটি পর্য্যন্ত সমস্ত বিকাশ ব্যাপারকে আমি সমান শ্রদ্ধার চক্ষে দেখি; বরং ওই শিকড়গুলোকেই খুব ভালো ক'রে বুঝে দেখবার আগ্রহ আমার আছে। শুধু ফুল শুঁকে গাছটাকে অবহেলা করবার প্রবৃত্তি আমার নেই। তাই রসবিচারে Aesthetics-এর দাবীও যেমন মানি, তেমনি সেই রসসৃষ্টির গভীর রসাতলের সন্ধানও রাখতে চাই। আমি বিশ্বাস করি, এই আগামী সাহিত্য একটু স্বতন্ত্র হবে, সে সাহিত্য পুষ্টিলাভ করবে জীবনের আর এক ক্ষেত্র থেকে। যেমন প্রত্যেক কবির কল্পনায় একটা স্বাতন্ত্র্য আছে, এই স্বাতন্ত্র্য যার যত বেশী তাঁর প্রতিভাও তত মৌলিক এবং এই স্বাতন্ত্র্য নির্ব্বিশেষ রসসৃষ্টির পক্ষে বাধা না হয়ে, তার প্রকৃত সহায়—তেমনি প্রত্যেক যুগের একটা বিশিষ্ট প্রেরণা আছে, যদি সে প্রেরণা সাহিত্যসৃষ্টির প্রতিকূল না হয়, তবে তার থেকে যে সাহিত্যের জন্ম হয়, যুগবৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও তা সর্ব্বকালের সাহিত্য হয়ে ওঠে। মানুষের প্রাণের মধ্যে সত্যকার সাড়া না জাগলে কোনো সত্য বস্তুর জন্ম হয়

না, এই সাড়া জাগে বাস্তবজীবন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার তাড়নায়। সাহিত্যও শুধু Aestheticsএর ধ্যান নয়—সেটা দেহচেতনাহীন আত্মার আনন্দ-গান নয়; অতি নিবিড় ও গভীর দেহ-চেতনাই সাহিত্যের জন্মহেতু। সেই চেতনা দেহকে অতিক্রম করে বটে, তবু দেহের ভিতর দিয়েই তার জন্ম হয়। নিছক মনঃকল্পিত কোনো বস্তুই মানুষের জীবনের সত্য হতে পারে না, তাই যেখানেই সেই রকম কিছু দেখি তাকেই কৃত্রিম ব'লে মনের মধ্যে একটা অশ্রদ্ধা জাগে। এই বাস্তব ভিত্তি যতই প্রচ্ছন্ন হোক্, যা প্রকৃত সাহিত্য তার তলায় এটা থাকবেই; নইলে সাহিত্য যে কি ক'রে সম্ভব হয়, তা বোঝা কঠিন।

এখন প্রশ্ন এই—এ যুগের সেই বাস্তব প্রেরণা কি? সেটা এখনও খুব প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে নি সত্য, তবু সেটা আমরা নানা দিক্ দিয়ে অনুভব করছি। রাষ্ট্রে ও সমাজ-জীবনে তার আভাস যতটা স্পষ্ট, এ যুগের সাহিত্য-সাধনায় সেটা এখনো তত সুনির্দ্দিষ্ট হয়ে ওঠেনি। একথা মনে রাখতে হবে যে, যুগধর্ম্মের সঙ্গে সাহিত্য-ধর্ম্মের বিরোধ ঘটতে পারে—যে যুগে এই রকম বিরোধ ঘটে সে যুগে সাহিত্য ভালো ক'রে গড়ে উঠতে পারে না। যে অবস্থার গুণে বাংলা সাহিত্য এত দিন এমন অবাধে পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছিল, আদর্শবাদ ও ভাবুকতার এমন আশ্চর্য্য ফসল ফলেছিল—সে অবস্থা আর নেই। তবু অন্য কারণে আমরা আর একটা সাহিত্যের পত্তন এ যুগেও আশা করতে পারি। এখন অনেক দিকে আমাদের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে, আমরা এখন এমন একটা বাস্তবের সম্মুখীন হয়েছি, যা আমাদের দেহচেতনাকে অতিমাত্রায় প্রবুদ্ধ করেছে—সত্যের আর একরূপ অদ্ভুত অপ্রত্যাশিত মূর্ত্তিতে প্রকাশ হয়ে আমাদের যেমন ভয়ব্যাকুল, তেমনি বিস্ময়-বিহ্বল

ক'রে তুলেছে। নিছক আদর্শবাদ মনকে এখনও মুগ্ধ করে, কিন্তু প্রাণে তেমন সাড়া জাগে না! একটা নূতন ক্ষুধা, নূতন বেদনারসের আনন্দ আমাদের চিত্তকে অধিকার করেছে। কিন্তু সেই অনুভূতি এখনো সাহিত্যের প্রেরণা হয়ে ওঠেনি। তার কারণ, শুধু অনুভূতি হ'লেই হবে না—সাহিত্য সৃষ্টির জন্যে প্রতিভার প্রয়োজন। মানুষ যে শক্তিবলে বন্ধনের মধ্যেই মুক্তির আনন্দ আস্বাদন করে—সেই শক্তি বাণীর প্রসাদযুক্ত হ'লে কবি-প্রতিভায় পরিণত হয়। আমি রসতত্ত্বের আলোচনা এখানে করব না, ক'রে কোন লাভ নেই। 'রস'কে ইঙ্গিতে আভাসে নির্দ্দেশ করা যায়—ও জিনিষটা অনির্ব্বচনীয়। আমার বক্তব্য, যুগধর্ম্ম-বলে সাহিত্যের উপাদান, বা প্রাণস্পন্দনের রীতি যেমনই হোক, কোন যুগের বস্তুসম্পদকে রসসম্পদে পরিণত করতে হ'লে কেবল দরদী হ'লেই চলবে না—চাই সেই প্রতিভা যা যুগবিশেষের সম্পত্তি নয়, সব যুগের পক্ষেই এক—চাই সেই প্রাণশক্তি প্রজ্ঞা ও কল্পনা। কতকগুলি মত বা যুক্তির দোহাই দিলে হবে না, কোনো নজীরের জোরেই যা কাব্য নয় তাকে কাব্য ব'লে প্রমাণ করা যায় না। প্রত্যেক সাহিত্য-কীর্ত্তি ভাবে রূপে ও প্রকাশরীতিতে স্বতন্ত্র, তার প্রমাণ সে নিজে, অলঙ্কার শাস্ত্রও তার প্রমাণ নয়, ইতিহাসও তার প্রমাণ নয়—কারণ সাহিত্যের মূল প্রবৃত্তি 'নিয়তিকৃত নিয়ম-রহিত'; তার বহিরঙ্গে যে কালের যে চিহ্নই থাক তার মর্ম্ম-কোরকের রূপটি স্বয়ম্প্রভ ও স্বয়ংপ্রকাশ। আমাদের জীবনে যে নূতন দেহ-চেতনার সাড়া জেগেছে, যে আদর্শ পরিবর্ত্তনের লক্ষণ বাহিরে দেখতে পাচ্ছি, তার সাড়া সাহিত্যের মধ্যে এখনও সত্যকার সৃষ্টিশক্তি হয়ে দাঁড়ায়নি।

'তরুণে'র দল যে জিনিষটাকে সাহিত্য ব'লে প্রচার করছেন,

তার ভাবে ও ভাষায়, এই প্রতিভার কোন লক্ষণ নেই—আছে কেবল দুর্ব্বলের চিত্তদাহ, অজ্ঞানের দুঃসাহস কিছু-না-মানার বাহাদুরী। তার কল্লোল যতখানি, ততটা সে গভীর নয়। তাতে আশ্চর্য্য হবার কোন কারণ নেই। সে সাহিত্য যদি 'তরুণের' সাহিত্য হয়, তবে তার কাছে এর চেয়ে বেশী কি আশা কর্‌বার আছে। আগে অভিভাবকদের শাসন প্রবল ছিল, এখন সেটা নেই বল্‌লেই চলে, বরং অভিভাবক-বয়সীরা হঠাৎ কি ভেবে এদের সঙ্গে যোগ দিয়ে, নিজেদের বিগত ও বিস্মৃত যৌবনের রোমন্থন আরম্ভ করেছেন। সস্তা ছাপাখানা, পাঠকপাঠিকার অত্যধিক সংখ্যা বৃদ্ধি; আর ব্যবসাদারী কাগজ—একদিকে এই তিন যুগমহিমা, আর একদিকে অনাহার ও অস্বাস্থ্য, সাময়িক ও রাষ্ট্রীয় দুর্দ্দশা, এবং গত ১৫।২০ বৎসর যাবৎ বাংলা দেশের স্কুল কলেজে শিক্ষাদানের অবনতি, এই সব কারণে বাঙালীর মনঃপ্রকৃতি দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে—সাধারণ শিক্ষার বিস্তার হ'লেও, 'কালচার' জিনিষটা বড্ড নেবে গেছে। তাই সাহিত্যের আসরে ছেলেবুড়ো সকলে মিলে একটা 'বোল্ হরিবোল' সুরু করেছে। একদল বল্‌ছেন, লেখাতে অধিকার সকলেরই আছে, বিশেষতঃ যুবকদের ওটা ত জন্মগত সংস্কার—লেখার মধ্যে অজস্রতা ও অবাধ অসংশয় স্বেচ্ছাচারই প্রাণের লক্ষণ। অতএব মাভৈঃ। কারো কথায় কাণ দিও না, আমরা আছি, আমাদের বয়স বিদ্যাবুদ্ধি অনেকের চেয়ে বেশী, অথচ প্রাণটা তোমাদেরই মত 'সবুজ'—'সবুজ' কথাটা ত' আমাদেরই আবিষ্কার, যৌবনের জয়যাত্রার বাজনা ত আমরাই প্রথমে সুরু করেছিলাম। আর এক পক্ষ সাহিত্য-সৃষ্টির কোনো ধারই ধারেন না—কেবল শাসনটাই বোঝেন, ও জিনিষটা তাঁদের কাছে শুক্‌নো হর্‌তুকি—আহারান্তে চর্ব্বনীয়, মাত্রা বেশী হ'লেও

বিপদ আছে। একদিকে ড্রয়িংরুমবিহারী dilattante, আর একদিকে অশ্বত্থবৃক্ষবাসী জরদ্গব, এই দু'য়ের মধ্যে প'ড়ে সাহিত্য খাবি খাচ্ছে।

এই গণ্ডগোল কানে ওঠায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এবার শান্তিমন্ত্র উচ্চারণ করেছেন। তিনি সাহিত্য ধর্ম্ম কি, সাহিত্যের শাশ্বত আদর্শ কি তারই আলোচনা করেছেন। সে আলোচনা তিনি অনেকবার অনেক প্রবন্ধে করেছেন—যাঁরা সাহিত্যরসিক ও পণ্ডিত তাঁদের সে কথা না বল্‌লেও চলে। কিন্তু শিক্ষা ও সাধনাবিমুখ, প্রাণধর্ম্মের নামে রিপুর উপাসক, অতি দুর্ব্বল ও বিকৃতমস্তিষ্ক তরুণ ও প্রবীণের দল, অর্দ্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত পাঠক সমাজের উৎসাহে যে শিবের গাজন সুরু করেছে, তাতে গুরুমন্ত্রের দরকার নেই—সকলেই গলায় পাটা প'রে মহা মহা সাধক হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের উপদেশে বা কশাঘাতে যে কোনো ফল হবে না, তার অন্য কারণ আছে। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-ধর্ম্মেরই ব্যাখ্যা করেছেন, সাহিত্য-প্রকৃতির আলোচনা করেন নি। কিন্তু কেবলমাত্র Aesthetics বা রসতত্ত্বের মূল সূত্রটির আলোচনা করলে সাহিত্যের বহিরঙ্গটা মূল্যহীন হয়ে পড়ে। যে বাস্তব উপাদান আমি সকল সাহিত্যকীর্ত্তির মূলভিত্তি বলেছি, যার সঙ্গে দেহমনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় না হ'লে, পূর্ণপ্রেরণা সঞ্চার হয় না, তাকে উপেক্ষা ক'রে একেবারে রসতত্ত্বে আরোহণ করলে দেহধর্ম্মী মন নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ যে শাসন জারী করেছেন, তা অবশ্য তাঁর উপযুক্ত হয়েছে—তাঁর চেয়ে সত্যকথা তেমন ক'রে বল্‌বার শক্তি আর কারো নেই, সে আদর্শ থেকে কোনো যুগের সাহিত্যই এতটুকু বিচলিত হতে পারে না। এ কথা মানি। কিন্তু কথাটা আধুনিক সাহিত্যের পন্থা নির্দ্দেশের পক্ষে আর একটু বিশদ ও সবিশেষ হ'লে ভাল হত। বোধ হয় সেটা রবীন্দ্রনাথের

কাছে আশা করাও যায় না। তিনি তত্ত্ব বা শাস্ত্র হিসাবে কিছু বলেন নি, নিজেরই অলোকসামান্য কবিধর্ম্মের মর্ম্মকথাটি খুব স্পষ্ট ক'রে সংক্ষেপে জানিয়েছেন। এ নিয়ে তর্ক চলে না। একে ত কথাটা খুবই সত্য, তার উপর সেটা আবার অত বড় কবির জীবন-ব্যাপী সাধনার উপলব্ধি। ওকালতী বুদ্ধি বা নৈয়ায়িক বিদ্যার সাহায্যে তাঁর কথার ছল ধ'রে, ভ্রম প্রতিপাদন করতে যাওয়া শুধু যে পণ্ডশ্রম তা নয়—নিতান্ত হাস্যকর। তাঁর বক্তব্যের মূল মর্ম্ম, যে কোন রসিক ব্যক্তি বিনা প্রমাণে হৃদয়ঙ্গম করবেন।

কিন্তু একটু গোল হয়েছে। তিনি উপাদানের কথাটা অনেকখানি ক'রে বলেছেন এবং তার নির্ব্বাচন-নীতিরও উল্লেখ করেছেন। নিম্নতর জীবধর্ম্মের প্রয়োজন রসবোধের অনুকূল নয়, একথা সত্য। কিন্তু মানুষের অনুভূতিমার্গে বিশ্বের প্রবেশাধিকার আছে, কোন বস্তুই সেখানে অগ্রাহ্য নয়; সেই অনুভূতিই, রসবোধের না হোক—রসকল্পনার মূল প্রেরণা, একথা বললে রসতত্ত্বের হানি হয় না। গাছের মাথায় উঠে শিকড়কে অস্বীকার করলে চলে কি? তার দোষ হয় এই যে মাটির কথাটা মনেই থাকে না। ফুল ফুটল না, গাছ কেটে দাও,—আপত্তি নেই; সেটা মালীর দোষ হতে পারে গাছেরও দোষ হতে পারে—কিন্তু তাই ব'লে মাটির সীমানা নির্দ্দেশ ক'রে দিলে হয় না, সব জায়গার মাটিই চাষ ক'রে দেখতে হবে। রবীন্দ্রনাথের মতে এক রকমের বাছাই করা হচ্ছে সাহিত্যের একটি বিশেষ ধর্ম্ম—এই বাছাই করায় কোনো 'বস্তু'র খোঁচা নেই, অর্থাৎ প্রয়োজনের তাড়না নেই—এটা আমার আত্মার অতি সহজ স্বাধীন আনন্দ-বোধের পছন্দ। কিন্তু তার জন্য নির্ব্বাচনের প্রয়োজন কি? ও ধর্ম্ম ত বস্তুগত নয়, ওটা রসিকের আত্মগত। প্রয়োজন-বোধও আত্মগত, বস্তুগত

নয়; সাধারণ জীবধর্ম্মে যে বস্তুটির অতিশয় প্রয়োজন—ব্যক্তি বিশেষের রস-কল্পনায় সেই বস্তুই প্রয়োজনাতীত—অতএব সুন্দর হয়ে উঠ্‌তে পারে। 'আব্রহ্মস্তম্ব' যদি 'সৎ' হয়, তার আত্মার আনন্দবোধের কোথাও বাধা থাক্‌তে পারে না, যদি আমার সেই আত্মীয়তা-শক্তি থাকে। কিন্তু আরও একটু মুস্কিল হয়েছে। জীবধর্ম্ম ও প্রয়োজনের কথা তিনি যে ভাবে বলেছেন তা'তে তাঁর মতে আত্মার আনন্দ-বোধ কি দেহ-তাড়নাকে একবারে বাদ দিয়ে? না, দেহচেতনার ভিতর দিয়েই, তাকে অতিক্রম ক'রে? এই কথাটা স্পষ্ট হওয়া দরকার। তার কারণ রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রকৃতির যে পরিচয় আমরা পাই, তাতে দেহঘটিত কোন ব্যাপারই তাঁর কল্পনায় এক মুহূর্ত্তের জন্য আত্মার সঙ্গে বিরোধ ক'রে থাক্‌তে পারে না, তাঁর অপূর্ব্ব প্রতিভায় সে তন্মুহূর্ত্তেই আত্মার দ্বারা পরাজিত হয়ে শাশ্বত সৌন্দর্য্য-লোকে দীপ্তি লাভ করে। তিনি ভারতীয় ঋষির আনন্দবাদকে বাংলা কাব্যে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কিন্তু এ অদ্বৈতবাদ যত সত্য হোক, সাধারণ মানুষ কখনও একে প্রাণের মধ্যে স্বীকার কর্‌বে না, কারণ, এত বড় প্রজ্ঞা ও কল্পনাশক্তি মানবসাধারণের তত্ত্বগত অধিকার হ'লেও বস্তুগত অধিকার নয়। সাহিত্য এই আনন্দবাদে পৌঁছতে না পার্‌লেও তা উপাদেয় হতে পারে, জগৎ-সাহিত্যের অনেক উৎকৃষ্ট কাব্য তার প্রমাণ। অনেক উৎকৃষ্ট ট্রাজেডি, এই বাস্তব দুঃখ ও দেহ-চেতনার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। কবির নির্লিপ্ত চিত্তের কল্পনা-শক্তিই তার থেকে রস সৃষ্টি করেছে বটে, কিন্তু তার উপাদান হয়েছে অতি তীক্ষ্ণ দেহচেতনা, বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে মানবাত্মার নানাধরণের বিরোধ—তা সে যুদ্ধক্ষেত্র যত বড়ই হোক, আর সে যুদ্ধঘোষণা যত উচ্চ ভাবেরই হোক। প্রয়োজন অপ্রয়োজনের কথা স্রষ্টার মনের

কথা—সেটা বাহিরের কথা নয়। Shakespeare তাঁর নাটকের villain গুলোকে চাবুক মারবার তাড়নায় সৃষ্টি করেন নি, একথা সত্য। তাঁর মনে সেই ন্যায় অন্যায় প্রভৃতি সামাজিক নীতির তাড়না নিশ্চয়ই ছিল না, ছিল কেবল সেগুলোকে সৃষ্টি করার আনন্দ। কিন্তু এমন কথা যদি কেউ গোড়া থেকেই ব'লে বসেন, যে, ওই রকম চরিত্র আমাদের বাস্তব জীবনের উপদ্রব, আমাদের জীবধর্ম্মের স্বাচ্ছন্দ্যবোধের সঙ্গে ওর একটা বিরোধ রয়েছে, অতএব ওটা রস-সৃষ্টির অনুকূল নয়—তবে কথাটা বড় অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। অতএব দেখা যাচ্চে রসসৃষ্টির উপাদান ও রসবোধের নিয়ম, এ দু'য়ের সামঞ্জস্য হয় কবির প্রতিভায়। কাঁকর চারিদিক থেকে খোঁচা দেয় ব'লে, আর পদ্ম সেই প্রত্যক্ষ দেহানুভূতির অনেক বাইরে ব'লেই, যে এ দু'য়ের মধ্যে সাহিত্যের উপাদান হিসেবে একটা সুস্পষ্ট প্রভেদ আছে এমন কথা বললে, রসতত্ত্বের হানি হয় না বটে, কিন্তু রসসৃষ্টির গোড়ার কথায় একটু গোল বাধে। এই রসসৃষ্টির প্রসঙ্গে আমাদের দেশে একটি প্রাচীন উপমা চ'লে আস্‌ছে। একখানা শুক্‌নো অস্থিখণ্ড চর্ব্বণ ক'রে আপনারই মুখনিঃসৃত রক্তে যখন সেখানা বেশ সিক্ত হয়ে ওঠে, তখন কুকুর সেটাকে সেই অস্থির রস মনে ক'রে পরমানন্দে উপভোগ করে। ওই শুক্‌নো হাড়ের সঙ্গে তার জিহ্বা ও মুখগহ্বরের ঘনিষ্ঠ পরিচয়—সেই কঠিন ঘর্ষণই এখানে রসসৃষ্টির কারণ। উপমাটি সার্থক উপমা বটে। বাইরের ওই হাড়-খানার মধ্যে রস নেই, রসটা আস্‌ছে কুকুরের নিজের থেকেই—কিন্তু ওই হাড়খানাও দরকার, এমন কি তার দ্বারা মুখটা ক্ষত হওয়ারই প্রয়োজন!

মূল রসতত্ত্বের আলোচনায় Realism বা Idealism প্রভৃতি

নামকরণের কোনও সার্থকতা নেই—কোনো কাব্যই একেবারে Real বা একেবারে Ideal হতে পারে না। তবে যদি স্থূলভাবে কবি-কর্ম্মের বিশিষ্ট লক্ষণ বুঝে নেওয়ার বা বুঝিয়ে দেবার জন্য একটা ভেদ নির্দ্দেশ করা দরকার হয়, তবে একথা বললে দোষ হয় না যে, আমাদের সাহিত্যে এ-যাবৎ কাল Idealismই প্রবল হয়ে এসেছে, তার মধ্যে আবার রবীন্দ্রনাথে Idealism যে কত বড়, কত গূঢ় ও গম্ভীর—তা বিশেষ ক'রে ধারণা করা চাই। এতবড় সজ্ঞান ও শক্তিশালী Idealist কোনো যুগের কোনো সাহিত্যে আছে কিনা সন্দেহ। তাঁর সেই অতি প্রবল ও একান্ত বস্তুভেদী কল্পনায়, বাস্তব তার যত কিছু বাস্তবতা নিয়েই রূপান্তরিত হয়ে গেছে। প্রয়োজন বা দেহ-তাড়নাকে তিনি কখনো তাঁর কল্পনায় ভালো ক'রে আমল দেন নি; এ দিক দিয়ে মানুষের জীবনে যে সব জটিল ও দুর্ব্বার সমস্যা আছে, তার বাহ্য উগ্র রূপকে, এক উৎকৃষ্ট প্রজ্ঞার দ্বারা তিনি আবৃত ও অপসারিত করেছেন। তাই যেটা দেহঘটিত চিত্তবিক্ষোভ, যা নানা যুগে, নানা ঘাত-প্রতিঘাতে জীব-জীবনের সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়, সেটা সাহিত্যের নিত্য বিষয় হতে পারে না—একথা রসতত্ত্বের উচ্চ কথা হ'লেও রবীন্দ্রনাথের মুখে এ কথার তাৎপর্য্য আরও গভীর। রবীন্দ্রনাথ নিজের কবি-ধর্ম্মের কথা অনেকবার অনেক কবিতায় স্পষ্ট ক'রে ঘোষণা করেছেন। যাঁদের সে সম্বন্ধে এখনও কোন সন্দেহ আছে, তাঁদের অবগতির জন্য তাঁর 'ভাষা ও ও ছন্দ' নামক কবিতা থেকে গুটি কয়েক ছত্র এখানে উদ্ধৃত কর্‌ছি। আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথের কবিধর্ম্ম সম্বন্ধে এর চেয়ে পরিষ্কার ধারণা আর কিছু থেকেই হবে না।—

"মানুষের ভাষাটুকু অর্থ দিয়ে বদ্ধ চারিধারে,
ঘুরে মানুষের চতুর্দ্দিকে। অবিরত রাত্রিদিন
মানবের প্রয়োজনে প্রাণ তার হ'য়ে আসে ক্ষীণ।
পরিস্ফুট তত্ত্ব তার সীমা দেয় ভাবের চরণে;
ধূলি ছাড়ি' একেবারে ঊর্দ্ধমুখে অনন্ত গগনে
উড়িতে সে নাহি পারে—সঙ্গীতের মতন স্বাধীন
মেলি' দিয়া সপ্তস্বর সপ্তপক্ষ অর্থভারহীন।

*　　　*　　　*

কোথা সেই অনন্ত আভাস
কোথা সেই অর্থভেদী অভ্রভেদী সঙ্গীত উচ্ছ্বাস
—আত্মবিদারণকারী মর্ম্মান্তিক মহান্ নিশ্বাস।
মানবের জীর্ণবাক্যে মোর ছন্দ দিবে নব সুর,
অর্থের বন্ধন হ'তে নিয়ে তারে যাবে বহু দূর
ভাবের স্বাধীন লোকে, পক্ষবান্ অশ্বরাজ সম
উদ্দাম সুন্দর গতি,—সে আশ্বাসে ভাসে চিত্তে মম।
সূর্য্যেরে বহিয়া যথা ধায় বেগে দিব্য অগ্নিতরী
মহাব্যোম-নীলসিন্ধু প্রতিদিন পারাবার করি'
ছন্দ সেই অগ্নিসম বাক্যেরে করিব সমর্পণ
যাবে চলি' মর্ত্ত্যসীমা অবাধে করিয়া সন্তরণ,
গুরুভার পৃথিবীরে টানিয়া লইবে ঊর্দ্ধপানে,
কথারে ভাবের স্বর্গে, মানবেরে দেবপীঠস্থানে।"

আমরা এ যুগের মানুষ, কিছু বেশী বাস্তব-পীড়িত ও দুর্ব্বল; কাজেই এত বড় আদর্শকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করবার আগ্রহ বা শক্তি, কিছুই আমাদের নেই। 'মর্ত্ত্যসীমা অবাধে' 'সন্তরণ ক'রে' যাবার ভাণ আমরা করতে পারি, অনেকে হয় ত এখনও করছেন কিন্তু সেটা এ যুগের সত্যকার প্রবৃত্তি নয়। এতে যদি সাহিত্য-সৃষ্টি সম্ভব

না হয়, তবে সে সম্বন্ধে এখন থেকেই নিরাশ হওয়া ছাড়া উপায় নেই। আমাদের একমাত্র আশা এই যে—কোন সমস্যাই রসের আধার হতে পারে না বটে, তবু মানুষের সমগ্র দেহ মন প্রাণকে সে নাড়া দিতে পারে। মানুষ যখন সেই সমস্যাকেই বড় ক'রে তাকে নিত্য সত্যের পূজা দেয়, তখন সে সাহিত্য সৃষ্টি করে না, আপনার জীবধর্ম্মেরই একটা নূতন পরিচয় সে ইতিহাসে রেখে যায়। কিন্তু ওই সমস্যার তাড়নায় সে যখন নিজের মধ্যেই ডুব দেয়, নিজের গভীরতম অনুভূতিক্ষেত্রে নিজের সঙ্গেই তার একটা নূতন ক'রে পরিচয় হয়। সে পরিচয়ের রহস্য-বিস্ময় যখন তার বহুদিনের অভ্যস্ত সংস্কারকে নাড়া দিয়ে প্রাণের জড়তা দূর করে, তখন কি সেই বাহিরের প্রভাব, সেই অনিত্য যুগধর্ম্মের তাড়না তাকে সঞ্জীবিত করে না? রবীন্দ্রনাথ যে যুগের মানুষ সে যুগও একটা বড় সমস্যার যুগ ছিল; সে সমস্যা বাহিরের দিকে খুব প্রবল না হ'লেও অন্তরের ভাবনায় খুব বড় হয়ে উঠেছিল। সেই যুগমন্থনের ধন্বন্তরী তিনি, সর্ব্বশেষে অমৃত-পাত্র হাতে ক'রে উঠে এসেছিলেন। তেমনি আজ যে সমস্যা আমাদের দেহমনকে আক্রমণ করেছে তার মধ্যে বাইরের তাড়নাটাই বেশী ব'লে হতাশ হবার কারণ দেখি নে। বরং মনের অত্যধিক প্রভুত্ব থেকে মুক্ত হয়ে, কিছুদিন দেহের অধীন হয়ে, নিত্য সত্যস্বরূপকে আর এক পাত্রে ঢেলে পান করতে ইচ্ছে হয়। যা মিথ্যা যা অনিত্য তাকেই নিঃশেষ করতে চাই—যা জীবধর্ম্মের স্থূল দুঃখ, অতএব হেয়,—তারই মশাল জ্বালিয়ে একটু নৃত্য করা যাক না, ক্ষতি কি? নিত্য ত চির-দিনই আছেন, কিন্তু এই অনিত্য যদি যুগধর্ম্মের বশে একবার দেখাই দিয়ে থাকেন, তাঁকে প্রাণের সিংহাসনে বসিয়ে একবার প্রাণ ভরে তাঁর সেই বিচিত্র রস আস্বাদন করায় দোষ কি? রবীন্দ্রনাথ সার্থক

সত্যের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন, সত্যকার মানুষ 'লাখে না মিলিল এক !' কথাটা চিরযুগের বটে, কিন্তু আপাতত: এযুগে আমরা রসানুভূতিকে অতটা সূক্ষ্ম ক'রে সত্যের অত বড় সাধনা করব না। তিনি যাকে সাধারণ সত্য বলেছেন সেই সাধারণ সত্যের মানুষকে তার জীবধর্ম্মের শাসনের মধ্যেই নির্ব্বিচারে বরণ করব—অনাত্মার দ্বারা আচ্ছন্ন আত্মার নিদারুণ দৈন্য তার যত কিছু অগৌরব, দেহ-দুঃখের দুর্গতি ও কুশ্রী আকার এই সব ব্যাপারকেই—সূক্ষ্ম রসবিলাস নয়—প্রত্যক্ষ দেহচেতনার দ্বারাই আত্মসাৎ করব ; সেই হবে এ যুগের সাহিত্যের উপাদান। তারপর যদি সেই চেতনার পরিপূর্ণ আবেগে কারো 'চোখের জল ফেলতে হাসি পায়', এবং তার সেই প্রতিভা থাকে, তবে তার থেকে অভিনব রসসৃষ্টি হবে। এ কথা বললে ত রসতত্ত্বের কোন বিঘ্ন হয় না, শেষ পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কথাই ত বজায় থাকে। এতে আপত্তি করতে পারেন দুই শ্রেণীর লোক—এক, যাঁরা রবীন্দ্র-সাহিত্যের আভিজাত্যে মুগ্ধ, যাঁদের কাছে জগৎ ও জীবনটা "শূন্যায়মান ডিক্যাণ্টারের" মত বৈঠকী রসালাপের উপকরণ ; আর যাঁরা আধুনিক য়ুরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান-চিন্তার অল্লাধিক অনুসরণ ক'রে বাংলা-দেশের Don Quixote হয়েছেন, চারিদিকে নানা সমস্যার বিভীষিকা দেখে ঝুটা মনস্তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও যৌনতত্ত্বের তালপাতার তলোয়ার হাতে দেশের দানা দৈত্য ও ভূত ঝাড়াতে বেরিয়েছেন। এঁরা দু' দলই বর্ত্তমান যুগের উপসর্গ-মাত্র, এঁদের দ্বারা যুগ-প্রতিষ্ঠা ত পরের কথা—নব যুগের উদ্বোধনও হবে না।

অথচ দেশে যুগান্তর হয়েছে। জাত যদি এই মন্বন্তর উত্তীর্ণ হয়ে বেঁচে ওঠে, যদি দেহে মনে প্রাণে সুস্থ হবার অবকাশ পায়, তবে আমি যে সাহিত্যের আভাস দিয়েছি, তা ভাষায় মূর্ত্তিমান হয়ে উঠবে।

এখনি যে তা' একেবারে একটুও হয়নি তা' নয়। যুগসন্ধি স্থলে আমরা শরৎচন্দ্রকে পেয়েছি। তাঁর রচনায় পূর্ব্বযুগের Idealism পূরা মাত্রায় বর্ত্তমান, অথচ অনাগত ভবিষ্যতের ইঙ্গিতও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাঁর আকস্মিক উদয়ে বাংলার পাঠক সমাজ যে নাড়া পেয়েছিল তা' এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছে তাঁর রচনা সম্বন্ধে প্রশংসা ও নিন্দা দুই সমান হয়ে একটা স্তম্ভিত ভাব ধারণ করেছে—সেটা স্বাভাবিক নিয়মের প্রতিক্রিয়া। অতি সঙ্কীর্ণ বাঙ্গালী সমাজের যেখানে যেটুক বাঁধন খোলা ছিল, সেইখান দিয়ে তিনি কতকটা প্রত্যক্ষ পরিচয়, কতকটা তীক্ষ্ণ সহানুভূতি ও কল্পনার সাহায্যে নরনারীর হৃদয়দ্বার অসীম শ্রদ্ধায় ও সমবেদনায় উদ্ঘাটন করতে চেয়েছেন। গতযুগের আদর্শ-সূত্র তাঁর মধ্যে ছিন্ন হয়নি, কারণ, রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ ও উপন্যাস তাকে সঞ্জীবিত করেছে, সন্দেহ নেই; কিন্তু তাঁর হৃদয়-রাধিকা প্রেমকেই একমাত্র পাথেয় ক'রে অন্ধকারে দুর্গম গহনে দুঃসাহসিক অভিসারে যাত্রা করেছে—কোনো সুস্পষ্ট সমস্যার তাড়নায় নয়, নৈরাশ্য-কাতর বিরহীর বংশীরব শুনে। কাব্য-সাহিত্যের কথা আমি বল্‌ব না, সত্যকথা বল্‌লে তা আমার পক্ষে শোভন হবে না। কিন্তু কথা-সাহিত্যের অকথ্য উপদ্রব্যের মধ্যেও একটু ক্ষীণ আশার রেখা আমি যেন দেখ্‌তে পাচ্ছি। সে কথা এখনও উল্লেখ কর্‌বার সময় হয়নি। হয়ত সে সম্ভাবনা অর্দ্ধপথেই নির্ম্মূল হ'বে—কে বল্‌তে পারে? ক্রিটিক্‌কে কতকটা prophet এর কাজ কর্‌তে হয়, কিন্তু সে শক্তি আমার নেই। তবু যাকে আমি নব যুগের সাহিত্য-প্রবৃত্তি বলেছি তার প্রমাণ স্বরূপ দুই একটি তরুণ লেখকের নাম হয়ত এখানে করা উচিত ছিল; কিন্তু থাক্‌, তার সময় এর পরে অনেক হবে।

সাহিত্য ধর্ম্ম ও যুগধর্ম্ম এ দু'য়ের দাবী আমি সমান স্বীকার করি; নইলে শুধু রসতত্ত্বের উচ্চ অধিকারের কথা নিয়ে কোনো যুগের সাহিত্য-চেষ্টার গতি নির্ণয় বা দিক নির্দ্দেশ করা যায় না। আমি সেই কথাটাই বল্‌তে চেয়েছি। যদি সে কথাটা একটুও পরিষ্কার ক'রে বলতে পেরে থাকি তবেই আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। যদি আমার মতামতের কোনো মূল্য নাও থাকে, তাতেও ক্ষতি নেই, কেবল এর মধ্যে কোনো ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়গত উষ্মা আছে—এইটুকু কেউ মনে না কর্‌লেই আমি ধন্য হব।

বাংলাছন্দে প্রবোধচন্দ্রোদয়

বাংলাছন্দে প্রবোধচন্দ্রোদয় হইয়াছে। কিছুকাল পূর্ব্বে একবার প্রবোধচন্দ্রের উদয় দেখিয়াছিলাম; সেবার কিন্তু অর্দ্ধোদয়, এবার পূর্ণোদয় দেখিতেছি। রবির সঙ্গে চন্দ্রের একটু ঠোকাঠুকিও হইয়াছে; রবি কবি, তিনি আপন আবেগে গতি-পথে ছন্দ সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন; চন্দ্রকে গজ-কাঠি হাতে তাঁর পিছু পিছু 'ফেউ' লাগিতে দেখিয়া রবি কিঞ্চিৎ রুষ্ট হইয়াছেন; হইবারই কথা। ধ্বনিতত্ত্ব-বাগীশেরা যদি ছন্দকে গণিতের শাসনে বাঁধিয়া তাঁহাদের বনিক-মনোভাবের তুষ্টি সাধন করেন—স্বর্ণ-রৌপ্যের নিক্কণমাত্রে প্রীত না হইয়া তাঁহারা যদি সেগুলিকে মুদ্রারূপে বাজাইয়া লইতে চান—তাহাতে ব্যবহার ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা হয় বটে, কিন্তু সেই বাজনাটাকে যখন

ধ্বনিসঙ্গীতের আদর্শ বলিয়া তাঁহারা শাসনাধিকার দাবী করেন, তখন সে স্পর্দ্ধা অমার্জ্জনীয় হইয়া পড়ে। বাংলাছন্দের আলোচনায় কেবল ধ্বনির গণিতবিশারদ হইলেই চলিবে না—ধ্বনিরসরসিক হওয়ারও প্রয়োজন আছে; এইজন্য এ পর্য্যন্ত সে ছন্দের রীতিমত শাস্ত্র কেহ গড়িতে পারেন নাই। প্রবোধচন্দ্র সেই কার্য্যটি সাধন করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। সঙ্কল্প যে সাধু তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু সঙ্কল্পসাধনে যেরূপ অকুতোভয় দেখা যাইতেছে, তাহাতে চন্দ্রের প্রতি এই রবি-রোষ অকারণ নহে।

*　　　*　　　*

অধুনা বাংলাদেশে সাহিত্যচর্চ্চা বা কাব্যানুশীলনের যে আদর্শ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে অগত্যা সাহিত্যের ব্যাকরণ-অভিধানের দিকটি লইয়া যাঁহারা পরিশ্রম করিতেছেন তাঁহাদিগকে অন্ততঃ কাজের লোক বলিয়া শ্রদ্ধা করিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু অপরদিকে ভারসাম্য রক্ষা করিবার কেহ না থাকায় এই সকল বৈয়াকরণিক মাত্রাজ্ঞান হারাইয়া বসেন—সাহিত্যের উপরেও শাসনজারী করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না। কিছু কাল যাবৎ এই ধরণের পণ্ডিতগণের স্বাধিকার মত্ততার ফলে বাংলা বানান রীতির যে সংস্কার হইয়াছে, তাহাতে আর যাই হোক, ছাপা-লেখার বড়ই বাহার খুলিয়াছে—কাণের সঙ্গে চোখের এই সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ স্থাপন করায় চক্ষুকর্ণের চিরন্তন বিবাদ ঘুচিয়াছে। যাহার যাহা সাধ্য তাহাতেই সিদ্ধিলাভ ঘটে, কিন্তু যাহা সাধ্য নয়, তাহাতেও অভিমান-বুদ্ধি থাকিলে অনর্থ ঘটে। বৈয়াকরণ যদি ভাষার তন্তুবায়-বৃত্তি ত্যাগ করিয়া সরস্বতীর আসন-পদ্মের দলগুলি ছাঁটিয়া সমান করিতে চান তবে তাঁহার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা উচিত?

*　　　*　　　*

সম্প্রতি বাংলাভাষার ধ্বনি-রূপের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ চলিতেছে। এরূপ বৈজ্ঞানিক গবেষণার মূল্য কেহই অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু ভাষার অস্থি-কঙ্কালের গ্রন্থি সংস্থান ও তাহার দেহের রূপ-লাবণ্য এক বস্তু নহে—একের বিচারে অপরটির উপর শাসন জারী নিতান্তই অপকর্ম্ম। বানান সম্বন্ধে নবরীতির প্রবর্ত্তন করিয়া তাঁহারা যে আত্ম-প্রসাদ লাভ করিয়াছেন তাহারই উৎসাহে, এক্ষণে ধ্বনিতত্ত্বের ধ্বজা তুলিয়া, এবং চল্‌তি বাংলা বা ভাষার বালিগঞ্জী রূপে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহারা বাংলাছন্দেরও আদর্শ নির্ণয়ে অবহিত হইয়াছেন। বাংলা বুলির চল্‌তি উচ্চারণে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয়, কবিতার ছন্দে তার এতটুকু ব্যতিক্রম চলিবে না; কবিতা পাঠকালে কোনও রূপ সুরের অবকাশ থাকিবে না। চল্‌তি ভাষার ধ্বনি-রূপ বজায় রাখিয়া কবিতা পড়িতে হইবে, অর্থাৎ কবিতা পাঠে ভাবের সুর উচ্চারণের আভিজাত্য অথবা পাঠক কবির নিজস্ব কণ্ঠস্বরসৃষ্টির মৌলিকতা—এ সব থাকিলেই কবিতাপাঠ অশুদ্ধ হইবে, বাংলা বুলির চল্‌তি উচ্চারণ বজায় না রাখিলে কাব্যরস নষ্ট হইবে। এই কথাগুলি মনে রাখিলে শ্রীমান প্রবোধচন্দ্রের 'ছন্দবিশ্লেষ' বা 'ছন্দজিজ্ঞাসা'র অন্তরালে যে ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়গত অরসিকসুলভ মতবাদের গোঁড়ামি আছে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যাইবে। তাঁহার ছন্দোবিশ্লেষের মূলে আছে বাংলাভাষার আভিজাত্য নাশের দুষ্প্রবৃত্তি। তিনি কাব্যে ও ভাবনির্ব্বিশেষে এবং ছন্দনির্ব্বিশেষে প্রাকৃত বাংলার প্রচলন কামনা করেন; তাঁর বড় দুঃখ এই যে, এ পর্য্যন্ত এমন কোনও বিদ্রোহীর আবির্ভাব হইল না যিনি 'করছি' 'হচ্ছে' প্রভৃতিকে পয়ারের ছন্দে গাঁথিয়াছেন, অথবা চল্‌তি ভাষার ছন্দে অমিত্রাক্ষর রচনা করিয়াছেন। প্রবোধচন্দ্রের হতাশ হইবার কারণ নাই—বাংলাকাব্যের যে 'ছিন্নমস্তা' রূপ দেখা

দিতেছে; তাহাতে শীঘ্রই ছন্দ ও ভাষার সেই বিপরীত-রতির মূর্তি হাটে বাটে সুলভ হইয়া উঠিবে; পায়ে ঘুঙুর বাঁধিয়া রাইবেশে নৃত্য সহকারে আমরা শীঘ্র সেই অমিত্রাক্ষর আবৃত্তি করিতে পারিব।

*   *   *

প্রবোধবাবুকে ইতিমধ্যেই সার্টিফিকেট দিয়াছেন শ্রীমৎ প্রমথ চৌধুরী; রতনেই রতন চেনে! বাংলা ছন্দশাস্ত্রকে যে সুবোধ শিশু চল্‌তি ভাষার আদর্শে সংস্কার করিতে লাগিয়া গিয়াছেন, তাঁর মত স্নেহভাজন আর কে হইতে পারে? কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বড়ই মুস্কিল হইয়াছে। কবিমানুষদের সকল মতই মেজাজ মাফিক হইয়া থাকে। এককালে 'সবুজপত্রে'র সবুজ-মন্ত্রের উদ্গাতা ছিলেন তিনিই। তখন 'বাংলা প্রাকৃত ভাষার কাব্যে স্বরধ্বনির যে প্রাণবান্ স্বচ্ছন্দতা আছে' তিনি তাহার নেশায় মশগুল ছিলেন—আর কিছুকে যেন আমল দিতেই চাহিতেন না। স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ দত্তও একঝোঁকে ও এক রোখে কেবল ইহারই সাধনা করিয়াছিলেন—তিনি বলিতেন, অক্ষর গুনিয়া কি কবিতা রচনা হয়? কিন্তু লীলাময় রবীন্দ্রনাথের লীলা সকলে বুঝিতে পারে না, যে ছন্দ তাঁহার কবিতার উৎকৃষ্ট ভাবাবেগের বাহন, যাহার দৌলতে তিনি বাউল-বৈরাগী বা কবিওয়ালা টপ্পাকার-দিগের উন্নততর বংশধর না হইয়া বাংলাভাষায়—কাব্যের মহিমময়ী মূর্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাহাকে তিনি ভালরূপেই জানেন; তাই এতকালপরে লীলাভিনয় ত্যাগ করিয়া, স্পষ্ট অকপটভাবে প্রবোধচন্দ্রের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছেন। আজ তাঁহাকে বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে আসল কথাটা প্রকাশ করিয়া বলিতে হইয়াছে। প্রাকৃত বাংলার ছন্দ ও পয়ারছন্দে যে প্রভেদ তাহা মর্য্যাদা ও গাম্ভীর্য্যের। "দুষ্মন্ত যখন শকুন্তলাকে রাজান্তঃপুরে নিয়েছিলেন তখন তাঁকে নিশ্চয়ই বাকল

পরান নি। তখন শকুন্তলার স্বাভাবিক শোভাকে অলঙ্কৃত করেছিলেন, সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য নয়, মর্য্যাদা-রক্ষার জন্যে। রাজরাণীর সৌন্দর্য্য ব্যক্তি বিশেষে বিচিত্র, কিন্তু তার মর্য্যাদার আদর্শ সকল রাজরাণীর মধ্যে এক।" পয়ারের অন্তর্নিহিত যে ছন্দতত্ত্বের সন্ধান তিনি এই প্রবন্ধে ('পরিচয়') দিয়াছেন, তার সম্বন্ধে শেষে একথাও বলিতে বাধ্য হইয়াছেন—"এই তত্ত্বটির মধ্যে অসামান্যতা আছে। অন্য কোনো ভাষার কোনো ছন্দে এ রকম স্বচ্ছন্দতা এতটা পরিমাণে আছে বলে' আমি তো জানি নে।"

*　　*　　*

কিন্তু একথা শোনে কে? বাংলাভাষার কাব্যরসরূপ যে কবি প্রাণে ও কাণে গপৎ উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁর পক্ষে যাহা অস্বীকার করা অসম্ভব, খাঁটি কবিমাত্রেই বাংলাছন্দের যে ধ্বনিটিকে তাহার পরম গৌরব বলিয়া স্বীকার করিবে—নব সংহিতাকার প্রবোধচন্দ্র ও তাঁহার গুরুজনেরা বাংলাছন্দে সাম্য প্রতিষ্ঠার উৎসাহে তাহাকে পৃথক আসন দিতে প্রস্তুত নহেন। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "শুক্‌নো আমসত্ত্বের মধ্যেই সাম্য, কিন্তু সরস আমের মধ্যে বৈচিত্র্য, ভোজে কোনটার দাম বেশী তা নিয়ে তর্ক অনাবশ্যক।" কিন্তু আমের রসকে আমসত্ত্বে পরিণত করিতে না পারিলে প্রবোধচন্দ্রের ছন্দশাস্ত্রে যে ছিদ্র থাকিয়া যায়! পয়ারকে যেমন করিয়া হৌক অন্য ছন্দের সঙ্গে এক সঙ্গে জুতিয়া না দিলে, চলতি বাংলা ও তাহার ধ্বনিতত্ত্ব যে সর্ব্বেসর্ব্বা হইতে পায় না! তথাপি, শ্রীমান প্রবোধচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের নিকট অপ্রত্যাশিত ধমক খাইয়া যেমন অবাক হইয়াছেন, তেমনি রবীন্দ্রনাথকেও একটু বিপদে ফেলিয়াছেন। প্রবোধচন্দ্রের সহিত দ্বন্দ্বে তিনি ছন্দসম্পর্কে ভাষাসঙ্কট স্বীকার করিতে বাধ্য

হইয়াছেন, এবং পরিশেষে 'স্বোকর্ত্তবৌ' বলিয়া অব্যাহতি পাইয়াছেন। একথাটা একটু স্পষ্ট করিয়া সেই সবুজপত্রের যুগে ঘোষণা করিলে আজ বোধ হয় এ বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইত না—পয়ারের বিরুদ্ধে এই অনড়ান-সুলভ মনোভাব এমন প্রশ্রয় পাইত না। এখন আর প্রবোধচন্দ্রের মত পণ্ডিতকে নিরস্ত করা মুস্কিল; তিনি ছন্দে সর্ব্বত্র সাধুভাষা ও চলতি ভাষার সমান অধিকার সাব্যস্ত করিতে—বরং, চলতিভাষাকেই অধিকতর সম্মান দিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন; শিষ্য আর মহাগুরুকে মানিতেও রাজি নয়।

* * *

এইবার আমরা বাংলাছন্দে প্রবোধচন্দ্রোদয়ের কিছু পরিচয় দিব। কিছুকাল পূর্ব্বে প্রবোধচন্দ্র 'প্রবাসী'তে ছন্দ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন—সে সময় তাহাই যথেষ্ট মনে হইয়াছিল। রবীন্দ্রযুগে বাংলাকাব্যে যে দুইটি নূতন ছন্দধারার প্রবর্ত্তন হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন ছিল। সে আলোচনা কবি সত্যেন্দ্রনাথ যেভাবে করিয়াছিলেন, সাধারণ পাঠকের পক্ষে তাহা অপেক্ষা বিশদতর ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল—প্রবোধচন্দ্র সেই কাজটি করিয়া ধন্যবাদভাজন হইয়াছিলেন। কিন্তু তখনই লক্ষ্য করিয়াছিলাম, ছন্দবিশেষের প্রতি প্রবোধচন্দ্রের একটা ব্যক্তিগত পক্ষপাত আছে; তত্ত্বানুসন্ধানে এইরূপ পক্ষপাত ভয়াবহ। তখন যাহা বীজরূপে বিদ্যমান ছিল, এতদিনে তাহাই একটি সুকঠিন কণ্টকবৃক্ষরূপে মাথা তুলিয়াছে। বস্তুত পয়ারের জাতি মারিবার চেষ্টাই তাঁহার এবারকার এই দ্বিগুণিত উৎসাহের কারণ বলিয়া মনে হয়। পয়ারের দুইটি মহৎ দোষ আছে—প্রথম, উহা শাস্ত্রশাসন-বিরোধী, উহার সঙ্গীতস্বাচ্ছন্দ্য বা উদার গতিপ্রবাহকে কোনও রূপ বাঁধা-ধরা নিয়মের অনুগত বলিয়া এ

পর্য্যন্ত কেহ বুঝাইতে পারে নাই—'অক্ষরে'র চোখ ঠারিয়া কাণের উপর বরাত দেওয়াই চলিয়া আসিতেছে; দ্বিতীয়, উহা সাধুভাষার পক্ষপাতী, চলতি শব্দকেও উচ্চারণ-শুদ্ধ করিয়া তবে পৈঠায় উঠিতে দেয়; এ দোষটি আগে কেহ লক্ষ্য করে নাই, চলতি ভাষার পুরোহিত প্রবোধচন্দ্র আগে ইহাতে বিষম আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি যেমন ইহার হসন্ত ও সংযুক্ত অক্ষরের 'মাত্রা'-সাম্য সহ্য করিতে পারেন না, তেমনি ইহার মধ্যে কতকগুলি 'যুগ্ম-স্বরে'র জুয়াচুরী আবিষ্কার করিয়া মহা সোরগোল আরম্ভ করিয়াছেন। এ ছন্দের ভাষায় 'হউক' 'হইল' 'লইনু' প্রভৃতির তিন-অক্ষরের বেয়াদবী, 'চলিলা' 'গেলা' প্রভৃতির ন্যাকামী, এবং 'কর্‌ব' 'ধর্‌ব' প্রভৃতিকে জাতিচ্যুত করার গোঁড়ামী তিনি বরদাস্ত করিতে পারেন না—কারণ, উহাতে বাংলা ভাষাতত্ত্ব ও ধ্বনিতত্ত্বের নিয়ম লঙ্ঘন হয়!

* * *

রবীন্দ্রনাথ বাংলাভাষার দুই রূপ অনুসারে বাংলাকাব্যে দুই ছন্দ-প্রকৃতির দ্বৈত-শাসন স্বীকার করিয়াছেন; তার কারণ, তিনি ভাষার এই দুই ধ্বনিরূপকেই প্রাণে ও কাণে অবগত আছেন—না থাকিলে, এত বড় কবি হওয়া ত' পরের কথা, আধুনিক কালের উল্লেখযোগ্য কবিও হইতে পারিতেন না। যাহারা এই দুইকে একাকার করিতে চায়, তাহারা যত বড় পণ্ডিত বা বৈয়াকরণ হউক, বাংলাকাব্যের সঙ্গে তাহাদের সত্যকার পরিচয় ঘটে নাই। প্রবোধচন্দ্রের এত দীর্ঘ চুল-চেরা আলোচনা পড়িয়াও বেশ ধারণা হয়, তাঁর এই ধ্বনিবৈচিত্র্য-বোধ নাই। তাই তিনি এমন বাতিকগ্রস্ত হইয়াছেন যে, তাঁহার মতে বাংলায় যুগ্ম-স্বরের পৃথক ধ্বনি-চিহ্ন না থাকার জন্য 'পাই' 'চাই' প্রভৃতির 'ই'-ধ্বনি পৃথক অক্ষরে লেখা হইয়া থাকে; 'হইল' 'হউক'

লিখিবার প্রয়োজন নাই—লেখা উচিত, 'হৈল' 'হৌক'। তাহা যে হয় না, সেটা কবিদের অক্ষর পূরণের প্রয়োজনে। উদাহরণস্বরূপ তিনি দেখাইয়াছেন—

হে অপ্সরি,
তোমার নয়নজ্যোতি প্রেমবেদনায়
কভু না হৌক ম্লান—লৈনু বিদায়।

—অর্থাৎ 'লইনু' ও 'লৈনু' এক ওজনের শব্দ! তিনি বলেন 'যাইল' —'য'-এ আই-কার এবং 'ল'—এইরূপ লেখা যায়; এবং আবশ্যকমত এইরূপ যুগ্মস্বরকে দুই মাত্রা ধরিলেই ছন্দ-গণনা ঠিক থাকিবে। অতএব পয়ারের এই ফাঁকি অতিশয় সুস্পষ্ট।

* * *

সবই মানিলাম; এত বড় গণনাশক্তি ও ধ্বনি-বিশ্লেষণশক্তি না মানিয়া করি কি? কিন্তু উচ্চারণের কথাই যদি হয়, তাহা হইলে, আমরা ত' যাই-ব, যাই-ল, হৌক, লৈনু বলি না, বলি—যাব, গেল, হোক, নিলাম। অতএব যখন 'যাইব' পড়ি, তখন 'যাই-ব' বলিব কি জন্য? ঔকার বা ঐকার বিকল্পে ব্যবহার করি বটে—ছন্দের প্রয়োজনে, কিন্তু তাহাতে এ ভাষার কোনও হানি হয় নাই—সেকালেও নয়; একালেও নয়। 'যাইব' 'হইব' প্রভৃতির উচ্চারণে যে একেবারে য-শ্রুতি লোপ করিতে হইবে, ইহা কোন্ জেলার কাব্য-রীতির অনুশাসন? আরও একটা কথা; 'সইল' (সহিল) কথাটির যদি 'সৈল' বানান হয়, তবে 'তৈল' 'শৈল' প্রভৃতির বানান কি হইবে? উভয়ত্র ঐ-কারের ওজন কি এক? প্রবোধবাবু 'চাই' শব্দটিতে 'চ'-এ আইকার দিয়া লিখিবার অদ্ভুত প্রস্তাব সমর্থন করেন; যেন ও-শব্দে 'ই'-টা

পূরা হসন্ত ! 'চা'-এর আকারে রীতিমত ঝোঁক (stress) না থাকিলে, 'ই' পূরা হসন্ত হইতে পারে না ; এখানেও য-শ্রুতি একেবারে লোপ হয় নাই—অন্ততঃ আমাদের উচ্চারণে, অর্থাৎ বাংলাভাষার শিষ্ট উচ্চারণ-পদ্ধতিতে ; প্রবোধবাবুর উচ্চারণ কিরূপ জানি না। কলিকাতা-বাসী কোনও ধ্বনিতত্ত্ববিদ্ তাঁহার এরূপ উচ্চারণের সমর্থন করিলেও আমরা সেই পণ্ডিতকে আমাদের সমাজে এরূপ উচ্চারণের জন্য 'এক-ঘরে' করিয়া রাখিব।

* * *

পয়ারছন্দে সকল বাংলা শব্দই—সাধুই হোক আর চল্‌তিই হোক—পূরা হসন্ত উচ্চারণ স্বীকার করে নাই। রবীন্দ্রনাথ প্রাকৃত বাংলার স্বরধ্বনিকে জীবন্ত বলিয়াছেন, কিন্তু সেটা আসলে স্বরের শক্তি নয়—হসন্তের প্রাচুর্য্য। আমার মনে হয়, ব্যঞ্জনের পশ্চাতে ব্যঞ্জনের সেই দ্রুত অনুধাবনে স্বরধ্বনি অপেক্ষা ব্যঞ্জনধ্বনিই স্ফুটতর হইয়া উঠে, অতএব স্বরধ্বনির যে লীলায়িত ভঙ্গির প্রশংসা করিয়া ইংরাজ কবি বলিয়াছেন—'Vowels that elope with ease', তাহা প্রাকৃত বাংলাছন্দে নাই। পয়ারে এই হসন্ত-জনিত ব্যঞ্জনসংঘাত ছন্দের প্রকৃতিকে ক্ষুণ্ণ করে। খাঁটি চলতি উচ্চারণের হসন্ত-মধ্য ক্রিয়াপদ-গুলির ও অন্যান্য শব্দের পয়ারে অচল হওয়ার ইহাও একটা কারণ। এমন কি পয়ারের যে শাখায় যুক্তাক্ষরের জন্য ফাঁকের ব্যবস্থা করিতে হয় সেখানেও পূর্ব্ববর্ণে যে জোর পড়ে তাহাও ঠিক প্রাকৃত বাংলার হসন্তপূর্ব্ব বর্ণের অনুরূপ নহে। তাহা যদি হইত, তবে এই-রূপ হসন্ত-ধ্বনিকে উভয়ত্র সমান ধরিয়া প্রাকৃত বাংলার ছন্দও এইরূপ পয়ারছন্দকে একই পর্য্যায়ভুক্ত করা যাইত—একটু হিসাব করিয়া

পদ্য রচনা করিলেই প্রাকৃত ছন্দেও এইরূপ ত্রৈমাত্রিক পয়ারের বাহ্যিক রীতি বজায় রাখা যায় নিম্নে তাহার নমুনা দিতেছি—

(১) তব মঞ্জীরে | বাজিবে ছন্দ | সুন্দর সঙ্গীতে (৬+৬+৮)

(২) তোমার সঙ্গে | যাচ্ছিনে ভাই | আজকে এমন সাঁজে (৬+৬+৮)

এই দুইটিকে কি কেহ এক ছন্দ বলিবে ? কিন্তু একরূপ গণনার দ্বারা ত' দুইটাই এক বলিয়া প্রতিপন্ন হয় ! প্রবোধচন্দ্র ত' এইরূপ গণনারই পক্ষপাতী,—এবং যুগ্ম ও অযুগ্ম ধ্বনির পার্থক্যই তাঁহার সমগ্র ছন্দ-শাস্ত্রের মূল উপজীব্য। হিসাব যাহাই হৌক—সমগ্র বাংলাছন্দের যে সাধারণ নিয়মসূত্রই আবিষ্কৃত হৌক, আমাদের কাণে বাংলাছন্দের ত্রিবিধ ধ্বনিরূপ কখনও একাকার হইবে না, ছন্দের জাতিভেদ থাকিবেই ; এবং সেই কারণে ভাষারও। খাঁটি পয়ার চলে গজগমনে ; ত্রৈমাত্রিক পয়ার চলে দুল্‌কি চালে ; আর, প্রাকৃত বাংলার ছন্দকে আমরা বলিব 'ভেক প্রলম্ফী'।

* * *

আবার ইহাও দেখা যায় যে, দুল্‌কি চালের পয়ারে রচিত কবিতার ভাষায় যদি অতিরিক্ত হসন্ত-ধ্বনি থাকে, তাহা হইলে সে ক্ষেত্রে ভাষা-সঙ্করের মত এক প্রকার ছন্দ-সঙ্করও উৎপন্ন হয়, সেখানে এই ছন্দ প্রাকৃত বাংলাছন্দের নিকটবর্ত্তী বলিয়া মনে হয়। ইহা অতিশয় ক্ষিপ্রগতি ও চটুল ; পড়িবার সময় সহসা প্রাকৃত বাংলার ছন্দ বলিয়া মনে হয়। উদাহরণ স্বরূপ 'ক্ষণিকা'র একাধিক কবিতার উল্লেখ করা যাইতে পারে।—

(১) নীলনবঘনে | আষাঢ় গগনে | তিল ঠাঁই আর | নাহিরে
ওগো আজ তোরা | যাস্‌নে ঘরের | বাহিরে |

(২) ছুটি বোন তারা | হেসে যায় কেন |
যায় যবে জল | আন্‌তে ?

(৩) আমি, হবনা তাপস | হবনা হবনা |
যেমনি বলুন | যিনি

আবার, প্রাকৃত বাংলার ছন্দে যদি হসন্ত-শেস ধ্বনিগুলিকে একটু নিয়মিত করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে পাঁচ বা ছয় মাত্রার একটি অভিনব চালের সৃষ্টি হয়, অভিনব বলিতেছি এইজন্য যে, ইহাতে ব্যঞ্জন সংঘাতের ধাক্কাগুলির সঙ্গেই ত্রৈমাত্রিক পয়ারের দুল্‌কি ভঙ্গি আসিয়া পড়ে, এমন কি সহসা মনে হয়, ইহা বুঝি ত্রৈমাত্রিক পয়ারেরই কবিতা। কিন্তু ইহাকে ত্রৈমাত্রিক পয়ার বলা যায় না এই জন্য যে, ইহাতে প্রাকৃত বাংলা শব্দের সন্নিবেশে, উচ্চারণ স্বাতন্ত্র্যহেতু, যুগ্ম ও অযুগ্ম-ধ্বনির বিন্যাস নিয়ম কতকটা শিথিল হইলেও, ছন্দরক্ষা হয় ; তা ছাড়া অযুগ্মধ্বনির উপরে আবশ্যক মত ঝোঁক দেওয়া চলে বলিয়া যুগ্মধ্বনির পরিবর্ত্তে অযুগ্মধ্বনি বসাইয়া দেওয়া যায়। এরূপ ছন্দের দৃষ্টান্ত দিতেছি।

(১) বল্‌চে—কবি তোমার ছবি
আঁকচে গানে,
প্রণয়গীতি গাচ্চে নিতি
তোমার কানে ;
নেশায় মেতে ছন্দে গেঁথে
তুচ্ছ কথা
ঢাক্‌চে শেষে বাংলা দেশে
উচ্চ কথা। (ক্ষতিপূরণ, ক্ষণিকা।)

(২) চৈত্ররাতি, আকুল রতি ফুলশরে !
ঘর ছেড়ে চল্, তমাল-বীথির পথ ধরে’ ।
কোন্ পুলিনে নীল সলিলে,
খেল্‌বি খেলা সবাই মিলে,—
মন্ত্র নিবি বন-বিহারীর মন্তরে—
সে যে বাঁশীর ভাষায় ডাক দিয়েছে নাম ধরে’ ।

(বসন্ত-অভিসার, ধান-দূর্ব্বা ।)

(৩) কম্‌লাফুলি ঘোম্‌টা খুলি’ এলিয়ে দিয়ে চুল,
এক্‌লা ঘরে বাদ্‌শাজাদী ছিঁড়্‌তেছিল গুল ।
আচম্‌কা সে ফিরিয়ে গ্রীবা ঝর্কাপানে চায়,
সুরকি-রাঙা রাস্তা থেকে দেখ্‌ল যুবা তায় ।

(বাদ্‌শাজাদী, ধান-দূর্ব্বা)

উপরিউদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলিতে প্রায়শঃ পাঁচের চাল ধরা পড়িয়াছে ; কিন্তু প্রাকৃত বাংলাছন্দের কল্যাণে, কোনোখানে চার, কোনোখানে ছয়ও পাওয়া যাইবে। তথাপি দুইটি হিসাব মনে রাখিলে, এখানেও একটা সঙ্গতি বিধান করা অসাধ্য নয়।—

(ক) এ ভাষার উচ্চারণে অযুগ্মধ্বনিকে ও যুগ্মধ্বনির ওজন দেওয়া যায়।

(খ) বাক্যের প্রথম ধ্বনিটিতে বিশিষ্ট ঝোঁক দিতে পারিলে অন্তের হসন্তধ্বনি প্রায় লোপ পায়। যথা—

(১) ঢাকা দিয়ে রাখিস্‌নে মুখ, তাকা তোরা চোখ তুলে’

(ধান-দূর্ব্বা)

* * *

'আমি নাব ব মহাকাব্য
সংরচনে
ছিল মনে, (ক্ষণিকা)

(২) ঘর ছেড়ে চল্ তমাল-বীথির পথ ধরে
* * *
মন্ত্র নিবি বন-বিহারীর মন্তরে।

প্রথম দৃষ্টান্তটিতে চারের ও দ্বিতীয়টিতে ছয়ের হিসাব পাওয়া যাইতেছে; কিন্তু প্রধানতঃ আমরা এই সকল কবিতায় পাঁচের চালই লক্ষ্য করি। মনে হয়, এরূপ ছন্দে—চার, পাচ ও ছয়, এই ত্রিবিধ হিসাবের মধ্যে নিয়ম একটাই আছে; অর্থাৎ ত্রৈমাত্রিক পয়ার ও প্রাকৃত বাংলার ছন্দে, মূলে এক নিয়মই বর্ত্তমান; অতএব ত্রৈমাত্রিক যদি পয়ার হয়, তাহা হইলে, পয়ারের সঙ্গে প্রাকৃত ছন্দের একটা সগোত্রতা আছে। কথাটা আর একটু ভালো করিয়া বুঝিবার প্রয়োজন আছে। রবীন্দ্রনাথ প্রাকৃত বাংলার ছন্দকেও ত্রৈমাত্রিকরূপে বিশ্লেষণ করিয়া এই সগোত্রতার সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার মতে—

বৃষ্টি | পড়ে | টাপুর | টুপুর | নদেয় | এল | বান

—এ পদ্যের এইরূপ পংক্তি বিচ্ছেদ হইবে। ঝোঁক বা স্বর-সংযোগে প্রত্যেক পর্ব্বটিতে আবশ্যক মত তিনের পূরণ হইতেছে। সত্যেন্দ্রনাথের মতে ইহার পংক্তিবিচ্ছেদ হইবে এইরূপ—

বৃষ্টি পড়ে | টাপুর টুপুর | নদেয় এল | বান

অর্থাৎ প্রত্যেক পংক্তি-পর্ব্ব 'ছয়ের ঘরাণা',—চারিটি পূর্ণধ্বনি ও দুইটি 'ভাংটা' ধ্বনি লইয়া এক একটি পর্ব্ব সম্পূর্ণ; ফাঁকগুলি ভাঙটার ফাঁক। এখানেও এই ছয়কে দুইভাগ করিলেই তিন হয়,—তাই

রবীন্দ্রনাথ আরও গোড়ায় ঘেঁসিয়া এ ছন্দকে ত্রৈমাত্রিক বলিয়াছেন। এক্ষণে উপরি-উদ্ধৃত কবিতাগুলিকে পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে, যে প্রত্যেকের পংক্তিচ্ছেদে ছয়টি ধ্বনিমাত্রা আছে—চল্‌তি হিসাবে, চার, পাঁচ বা ছয় হইলেও, রবীন্দ্রনাথের ত্রৈমাত্রিক ও সত্যেন্দ্রনাথের 'ছয়ের ঘরাণা' (পূর্ণ-পাঁচ) দুই হিসাবই ঠিক আছে। ইহার দ্বারা ত্রৈমাত্রিক পয়ার ও প্রাকৃত বাংলার ছন্দ সমজাতীয় হইয়া পড়ে বটে, কিন্তু খাঁটি ত্রৈমাত্রিক পয়ারে সুর করিয়া বা ঝোঁক দিয়া তিনের হিসাব পূরণ চলে না। ইহাতেই প্রমাণ হয়, ওই দুই ছন্দ এক উচ্চারণের ছন্দ নয়, এই উচ্চারণভেদ যেমন ধ্বনি-পার্থক্যের সৃষ্টি করে, তেমনি ইহা হইতেই প্রাকৃতবাংলা ও সাধুবাংলার প্রভেদ বুঝা যায়—তথাপি আমি উপরি-উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলিতে একটা মিশ্রছন্দের পরিচয় পাই—একই কবিতায় দুইরূপ ধ্বনি কাণে ধরা পড়ে; যেমন ত্রৈমাত্রিক পয়ারের এই পংক্তি—

'কাদের কণ্ঠে গগন মন্থে' (কথা ও কাহিনী)

এবং প্রাকৃত বাংলা ছন্দের পংক্তি—

'বিশ্বশুদ্ধ যতেক ক্রুদ্ধ' (ক্ষণিকা)

—ইহাদের ধ্বনি-প্রকৃতি হুবহু এক; অথচ সম্পূর্ণ পৃথক ছন্দ—প্রবোধ-বাবুও তাহা স্বীকার করিবেন। তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথের 'ত্রৈমাত্রিক' জাতিভেদটাই একমাত্র ভেদ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। তথাপি পয়ারের ত্রৈমাত্রিক ও প্রাকৃত বাংলার ত্রৈমাত্রিক কখনই এক নহে—কাণ কখনই তাহা স্বীকার করিবে না। কিন্তু এই দুই প্রকার ত্রৈমাত্রিকে এক অভিনব মিশ্র ছন্দের উৎপত্তি সম্ভব, স্বীকার করিতেই হইবে।

* * *

আবার—'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' ও 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই (বলি)' এই দুইটির প্রথমটিকে তিনের তালে পড়া অসঙ্গত নয়, কিন্তু দ্বিতীয়টিকে তেমন করিয়া পড়িলে অস্বাভাবিক শুনাইবে। এই জন্যই ছন্দের কবিতা ও সুরের ছড়া এক নিয়মে চলে না; কাশীদাসী পয়ার ও আধুনিক পয়ারও ঠিক এই জন্য এক ধ্বনি-নিয়মের অধীন নয়। এজন্য ছন্দের মূল তত্ত্ববিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথের ত্রৈমাত্রিক নীতির প্রয়োগ প্রাকৃত বাংলাছন্দে যথার্থ হইলেও, উহা পাঠরীতির পক্ষে প্রযুজ্য নহে। তাহা যদি হইত, তবে নিম্নোদ্ধৃত পয়ার-পংক্তিটিতেও ঐ নিয়ম অব্যর্থ থাকিত, যথা—

চিম্‌নি | ভেঙ্গে | গেছে | দেখে | গিন্নী | রেগে | খুন

ইহার সঙ্গে—বৃষ্টি | পড়ে | টাপুর | টুপুর | নদেয় | এল | বান

এই ছড়ার সুরের কোনও পার্থক্য থাকিবে না। কিন্তু আসলে ওই পংক্তির পাঠভঙ্গি এইরূপ—

চিম্‌নি—ভেঙ্গে গেছে দেখে | গিন্নী—রেগে খুন

* * *

খাঁটি পয়ার সম্বন্ধে আমি এখানে কিছুই বলিব না। বাংলা ছন্দের জাতিভেদ আমি মানি; কোনও রূপ ধাপ্পাবাজীর দ্বারা এক ছন্দের আদর্শে অন্য ছন্দকে বিচার করা চলিবে না, এখানে আমি কেবল এই কথাটাই বলিতে চাই। খাঁটি পয়ারের ভাষা ও ধ্বনির আদর্শ এত বিভিন্ন যে, কোনও এক সাধারণ সূত্র রচনা করিয়া বাংলা কাব্যের ছন্দবৈচিত্র্যকে একাকার করিবার চেষ্টা নিষ্ফল। খাঁটি

পয়ারকে ছাড়িয়া দিয়া, আমি প্রবোধবাবুর নির্দ্দিষ্ট 'মাত্রাবৃত্ত' ও 'স্বরবৃত্ত' বিভাগ তুলনার আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি যে অঙ্ক কসিয়া হিসাব করিতে গেলে 'স্বরবৃত্ত'কেও 'মাত্রাবৃত্তে'র অতি নিকটবর্ত্তী প্রমাণ করা যায়, তথাপি যেমন দুই ছন্দ এক নহে (যদিও উভয়ের এক রূপ মিশ্রণ সম্ভব), তেমনই পয়ার একটি সম্পূর্ণ বিভিন্নজাতীয় ছন্দ—তাহার প্রধান কারণ, যে ভাষায় ওই ছন্দরচনা হয় তাহার ধ্বনিপ্রকৃতি অতিশয় বিলক্ষণ; দ্বিতীয়তঃ, যতি-বৈচিত্র্যই উহার প্রাণ বলিয়া, এবং সেই যতি তাহার সঙ্গীতকে পর্য্যস্ত নিরূপিত করে বলিয়া, উহার সঙ্গে বাংলা আর কোনও ছন্দের তুলনাই হয় না। এই জন্য, রবীন্দ্রনাথের মানসী, সোণার তরী, চিত্রা প্রভৃতি কাব্যের ত্রৈমাত্রিক পয়ার এবং ক্ষণিকার ত্রৈমাত্রিক পয়ারে এত পার্থক্য। অতএব রবীন্দ্রনাথ যদি বাংলা ছন্দকে, সাধু ও প্রাকৃত, এই দুই ভাষারীতির অনুসারে ভাগ করিতে চান, তাহাতে আপত্তি করিবার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। প্রবোধচন্দ্র আপত্তি করিয়াছেন, তাহার কারণ, তাঁহার কাণে বাংলাভাষার বালিগঞ্জী সংস্করণটাই একাধিপত্য করিতেছে। প্রবোধচন্দ্র বড় মুখ করিয়া ত্রৈমাত্রিক পয়ারে চলতিবাংলার দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন—

কিন্তু, তাহা 'ক্ষণিকা' হইতে নয়, অপরাজিতা দেবীর 'বুকের বাঁশী' হইতে; ফলে হইয়াছে এই যে ভাষার শ্রী দেখিয়া এরূপ বিজাতীয় কবিতার প্রতি অশ্রদ্ধা আরও বাড়িয়া যায়।

"সন্ধ্যা না হোতে সন্ধি কোর্‌তে আস্‌বে সে নিশ্চয়"

'ক্ষণিকা'র দৃষ্টান্ত (পূর্ব্বে উদ্ধৃত) এবং এই দৃষ্টান্ত তুলনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে, কিরূপ শব্দবিন্যাস-কৌশল জানা থাকিলে প্রাকৃত বাংলায় ত্রৈমাত্রিক পয়ার রচনা সার্থক হইতে পারে—যদিও

তাহা খাঁটি ত্রৈমাত্রিক পয়ারের ধ্বনিবৈশিষ্ট্য লাভ করিবে না। প্রবোধচন্দ্রের উদ্ধৃত দৃষ্টান্তটি কি মনোরম! কিন্তু তাহাতে প্রবোধচন্দ্রের মত কাব্যরসিকের ভ্রূক্ষেপ নাই,—চল্‌তি বাংলা ত' বটে, অতএব বগল বাজাইতে দ্বিধা কি? রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, এরূপ পদ্যকে "প্রহসন বলে' হয় ত' পাঠক মাপ করতে পারেন।" আরও, রবীন্দ্র-নাথ যথার্থই বলিয়াছেন—"কিন্তু সংস্কৃত বাংলায় বাচবিচার খুব কড়া। আধুনিকদের হাতে পড়ে ম্লেচ্ছপনা কিছু কিছু সয়ে গেছে, কিন্তু সেটুকু বড় জোর বাইরেরই রোয়াকে,—ভিতর মহলে রীত রক্ষা সম্বন্ধে কষা-কষি"।

কিন্তু প্রবোধচন্দ্র সব চেয়ে ছন্দবোধের পরিচয় দিয়াছেন তাঁহার "অক্ষরবৃত্ত" ছন্দের স্বরূপ ব্যাখ্যানে। রবীন্দ্রনাথ দুই চারিটি কথায় যে ছন্দের প্রকৃতি সম্বন্ধে অতি মৌলিক চিন্তার পরিচয় দিয়াছেন, এবং যেন বিদ্যুতালোকে তাহার বহুদূর আলোকিত করিয়াছেন—ছন্দঃশাস্ত্রকার-রূপে কবির প্রতিদ্বন্দ্বী এই পণ্ডিতটি অজস্র বাক্যব্যয় ও একরাশি অঙ্ক কসিয়াও কিছুই করিতে পারেন নাই; তাঁহার হাতের তৈলপ্রদীপটি অন্ধকারে আলেয়ার মত বিচরণ করিতেছে; অথচ স্পর্দ্ধার শেষ নাই। রবীন্দ্রনাথ বাংলাছন্দের যে-দ্বৈমাত্রিক ও ত্রৈমাত্রিক ভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং প্রাকৃত বাংলার যতি-বন্ধন ও পয়ারের যতি-স্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে যে অপূর্ব্ব বিচারণা করিয়াছেন, তাহাতে বাংলা ছন্দঃতত্ত্বের যে দুইটি কত বড় স্তম্ভনির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন—প্রকৃত ছন্দজিজ্ঞাসু মাত্রেই তাহা স্বীকার করিবেন। ইহা যদি তিনি না করিতেন, তবে এই প্রবোধ চন্দ্রোদয়ের মত বিপদ যে কত বাড়িয়া চলিত কে জানে। 'অমিত্রাক্ষর' পয়ারের আলোচনায় প্রবোধচন্দ্র বলেন—এ ছন্দের আসল কথাটা মিল-অমিলের কথা নয়; প্রবহমানতাই ইহার প্রকৃত স্বরূপ। রবীন্দ্রনাথ

ছন্দের এই প্রবহমানতাকেই আরও অলঙ্কৃত করিয়াছেন মিলের দ্বারা! হায়! হায়!—অর্থাৎ লাইন ডিঙ্গাইলেই হইল; একাজ রবীন্দ্রনাথের মিত্রাক্ষর পয়ার ত করিয়াছেই, চল্‌তি বাংলার 'টরে টক্কা' ছন্দও একাজ অনায়াসে করিতে পারিবে, এবং ইতিমধ্যেই কিছু কিছু করিয়াছে। অতএব 'অমিত্রাক্ষর' নামটাও একটা ধাপ্পাবাজী। অমিত্রাক্ষর যে কি বস্তু, বেচারীর সে জ্ঞানও নাই! রবীন্দ্রনাথের লাইন ডিঙ্গানো মিত্রাক্ষর যে উনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজী কবিতার নকল, আর মাইকেলের অমিত্রাক্ষর যে মিল্‌টনের Blank verse এর নকল—এবং ইংরাজী ছন্দশাস্ত্রেও যে Leigh Hunt এর Riminia ছন্দ ও মিল্‌টনের ছন্দকে এক পর্য্যায়ভুক্ত করে না, ছন্দশাস্ত্রী প্রবোধচন্দ্রের সে জ্ঞান নাই পয়ারে মিল বাদ দিয়া ছন্দসঙ্গীত সৃষ্টিকরা যে কি ব্যাপার, তাহ রবীন্দ্রনাথ জানেন, এবং ভুক্তভোগীও বটেন। মিলযুক্ত পয়ারে যাহা সহজ-সাধ্য, মিলহীন পয়ারে তাহা যে কত দুঃসাধ্য, আধুনিক বাঙ্গালী কবিরা তাহা হাড়ে হাড়ে জানেন বলিয়াই অমিত্রাক্ষরের ছায়া মাড়াইতেও প্রস্তুত নহেন। যাহারা ছুঁচোর কীর্ত্তনে অভ্যস্ত তাহারা মধুসূদন দত্তের সেই অভাবনীয় কীর্ত্তির মাহাত্ম্য কি বুঝিবে? প্রবোধচন্দ্র বলেন কিনা, ও দুয়েরই আসল ধর্ম্ম উহাদের প্রবহমানতা! তাই, তাঁহার মতে প্রাকৃত বাংলার ছন্দও এই রূপ লাইন ডিঙ্গাইতে পারিলেই অমিত্রাক্ষর পয়ারকে হারাইয়া দিয়া গর্ব্বে নাচিয়া বেড়াইবে। অর্থাৎ ব্যাং হাতির চলন অনুকরণ করিবে এবং বলিবে, আমিও কেমন হাতি হইয়াছি।

'পরিচয়ে'র সেই অপূর্ব্ব প্রবন্ধে অমিত্রাক্ষর ছন্দের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে অতিসংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহাতে এ ছন্দের মূলসূত্রের আভাস থাকিলেও, তাহার সবিস্তার আলোচনার প্রয়োজন বিশেষ করিয়া অনুভূত হয়। বাংলা পয়ারের এই রূপ তাহার, ও তথা বাংলা

কাব্যের, যে কত বড় সম্পদ, তাহা কোনও প্রকৃত কাব্যরসিকের অবিদিত নাই। এ ছন্দের আলোচনায় বাংলা পয়ারকে একেবারে overhaul করিয়া পরীক্ষা করিতে হইবে, আধুনিক (আবৃত্তিমূলক কবিতা-পাঠের) পয়ারছন্দের মূলরহস্য সন্ধান করিতে হইবে, এবং সেই সঙ্গে বিশেষ করিয়া অমিত্রাক্ষরের যতিবিন্যাস ও সঙ্গীতপ্রকৃতির আলোচনা করিতে হইবে। পয়ারের ছন্দগণনায় প্রবোধচন্দ্র যে নিয়মটি আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় আছে। তিনি গণনাসঙ্কটে পড়িয়া সহসা ঠিক করিয়া ফেলিয়াছেন, এ ছন্দ 'মাত্রা' ও 'স্বরে'র একটা মিশ্রছন্দ—ইহাতে কাশী ও মক্কা পাশাপাশি বিরাজমান। পয়ারকে এত সহজে বিধিবদ্ধ করা যায় তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না, কাজেই চমৎকৃত হইয়াছি। এইরূপ একটা বিধি গড়িয়া না লইলে প্রবোধচন্দ্রের বাংলা ছন্দ-শাস্ত্র যে অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়!

* * *

'মাত্রা' ও 'স্বর'—ত্রৈমাত্রিক পয়ার ও প্রাকৃত বাংলার ছন্দ—এ দুইএর মিশ্রণ যে কিরূপ হইতে পারে, এবং তাহার কারণ কি, এ প্রসঙ্গে তাহার আলোচনা করিয়াছি। পয়ারের চাল যে ত্রৈমাত্রিক নয়—দ্বৈমাত্রিক, তাহা বাংলা ছন্দে সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ-স্রষ্টা ও সমঝদার রবীন্দ্রনাথ অবিসংবাদিত ভাবে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন; 'স্বরবৃত্তে'র হসন্তধ্বনি যে পয়ারে নাই তাহাও আমি সম্যকরূপে জানি; তথাপি প্রবোধচন্দ্র পয়ারকে এইরূপ একটা সূত্রে গণনা-যোগ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। আসল কথা, প্রবোধচন্দ্র তাঁহার ব্যক্তিগত পক্ষপাত বশে সর্ব্ববিধ বাংলা ছন্দকে চল্‌তি ভাষার ধ্বনি-নিয়মের অধীন করিতে চান। পয়ারের যুক্তাক্ষরের মূল্য তিনি বুঝেন না; পদের অন্তস্থিত হসন্ত ধ্বনিকে তিনি সর্ব্বত্র কেবল একমাত্রার ওজন দিয়াই নিশ্চিন্ত;—সে

মাত্রার ধ্বনি-প্রকৃতি, তাহার পরিমাণ যদি সর্ব্বত্র এক না হয়, তবে তাহাকে একটা 'অক্ষর' এবং যুক্তাক্ষরকেও একটা 'অক্ষর' হিসাবে গণনা করিতে আপত্তি কি, তাহাও বুঝিতে পারা গেল না। পয়ার পংক্তির মধ্যে যতি বা বিরামের যে অনির্দ্দিষ্ট ফাঁকগুলি আছে সে গুলির কি হিসাব হইবে, অক্ষরধ্বনির হরণ-পূরণে সে ফাঁকগুলির প্রয়োজনীয়তা কতখানি অথবা, পয়ারের ছন্দ-স্রোতে যে বহুবিচিত্র ধ্বনি-তরঙ্গের উৎপত্তি হয় তাহাতে 'মাত্রা' বা 'স্বরের' সুনির্দ্দিষ্ট ও সুপরিমিত ধ্বনি-শ্রুতিগুলির সার্থকতা কোথায়—এ সকল কিছুই চিন্তা না করিয়া তিনি পয়ারের কি অপূর্ব্ব ছন্দসূত্রটি বাঁধিয়া দিয়াছেন! পয়ারকে 'স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্তের মিশ্রন জাত একটি মিশ্র ছন্দ' বলিয়াই তিনি সকল জিজ্ঞাসার শান্তি করিয়াছেন।

* * *

আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই, প্রবোধচন্দ্রের নিকট ইহার অধিক কিছু আশা করাই অন্যায়। তথাপি, ছন্দ-শাস্ত্র রচনার ব্যপদেশে যে ব্যক্তি কাব্যকেও ভাষার আদর্শভ্রষ্ট করিতে প্রয়াস পায়, তাহার সেই অশুচি মনোবৃত্তি সুধীসমাজে উদ্ঘাটিত করিয়া দিবার প্রয়োজন আছে বলিয়াই, আমরা এই প্রসঙ্গে এত কথা বলিতে বাধ্য হইলাম; নতুবা 'ছন্দো-বিশ্লেষ' আমাদের মতে আজিকার দিনে খুব প্রয়োজনীয় কর্ম্ম নহে, যিনি সে কীর্ত্তি অর্জ্জন করিবার জন্য মাসিক হইতে মাসিকান্তরে গন্ধ-মাদন চাপাইতেছেন, তাঁহার সেই তুচ্ছ কর্ম্মে উচ্চ পারিতোষিক লাভ হইলে, আমরা কিছু মাত্র আপত্তি করিব না।

প্রসঙ্গ-কথা

(১)

এবারকার প্রবন্ধ 'সাহিত্য ও যুগধর্ম্ম' সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। প্রবন্ধটি প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে লেখা। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে ঐ সময় অতি 'আধুনিক সাহিত্য' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'বিচিত্রায়' একটি প্রবন্ধ লেখেন, তার নাম 'সাহিত্য-ধর্ম্ম'; এবং উক্ত প্রবন্ধ লইয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে বিশেষ বাদ-বিসম্বাদ ঘটিয়াছিল। শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ও শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিশেষ করিয়া তরুণ লেখকদিগের সমর্থন করিয়া রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ করেন। সেই বাদ-প্রতিবাদে স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচি মহাশয় যোগ দিয়াছিলেন, এবং শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্রের লেখনী দ্বারা লাঞ্ছিত হইয়া প্রত্যুত্তর দিবার পূর্ব্বেই ইহধাম পরিত্যাগ করেন। * কোনও একটি রবীন্দ্রভক্ত সুবিখ্যাত ব্যক্তি অতঃপর বর্ত্তমান লেখককে রবীন্দ্রনাথের পক্ষ হইতে উক্ত প্রতিবাদ সমূহের প্রতিবাদ করিতে অনুরোধ করেন—রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তখন দেশে ছিলেন না। অমি উক্ত বাদ-প্রতিবাদে সাক্ষাৎভাবে সংশ্লিষ্ট না হইয়া, কেবল সাহিত্যের আদর্শ সম্বন্ধে মতবিরোধটির আলোচনা করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলাম—এবং এই প্রবন্ধটি লিখিয়াছিলাম। আমি, সাহিত্যের সনাতন আদর্শ ও যুগ-সাহিত্য, এই উভয়ের দাবীই সমর্থন করিয়াছি—ইহাতে কোনও পক্ষের গোঁড়ামী নাই; কারণ, এরূপ আলোচনায় কোনও বিশেষ দলের পক্ষভুক্ত হইলে আসল সমস্যাটির সম্যক মর্য্যাদা রক্ষা হয় না বলিয়াই আমার বিশ্বাস। তরুণদের সাহিত্যকেই যেমন আমি এযুগের খাঁটি সাহিত্য বলিয়া বিশ্বাস করি না, তেমনই রবীন্দ্রনাথের

---

* স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ মৃত্যুশয্যায় শরৎচন্দ্রের উত্তরের প্রত্যুত্তরে যে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন তাহা শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই—সেই অসম্পূর্ণ প্রবন্ধ আমাদের নিকট আছে এবং ভবিষ্যতে কখনও তাহা প্রকাশ করিতেও পারি—স. শ. চি.।

'সাহিত্য ধর্ম্ম' প্রবন্ধে যে কয়েকটি আদর্শবাদমূলক উক্তি ছিল, তাহাও উপস্থিত সমস্যার সমাধানে চূড়ান্ত বলিয়া মনে হয় নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতামতের যেটুকু আলোচনা ইহাতে করিয়াছি, তাহাতে আশা করি পাঠকগণ কিছুমাত্র শ্রদ্ধার অভাব লক্ষ্য করিবেন না। তথাপি এই প্রবন্ধ সে সময়ে গ্রাহ্য হয় নাই, রবীন্দ্রপৃষ্ঠপোষিত একখানি 'অভিজাত' পত্রিকায়, এই প্রবন্ধ প্রকাশের উপযুক্ত নয় বলিয়া গৃহীত হয় নাই। নিতান্ত বিরক্ত হইয়াই আমি প্রবন্ধটি এ-যাবৎ ফেলিয়া রাখিয়াছিলাম।

* * *

'শনিবারের চিঠি'র অভিপ্রায় ও আদর্শ স্বতন্ত্র। তথাপি এতকাল পরে এই প্রবন্ধটি 'শনিবারের চিঠি'তেই মুদ্রিত করার একটি বিশেষ কারণ আছে। সাহিত্যের সম্পর্কে 'শনিবারের চিঠি'র শ্রদ্ধাহীন কঠোর সমালোচনা যাঁহারা বরদাস্ত করিতে পারেন না তাঁহাদের নিকটে আমার প্রশ্ন এই—আমার এই প্রবন্ধটি এককালে,—এবং বোধ হয় এখনও, কোনও অভিজাত শিষ্ট সাহিত্য-পত্রিকায় প্রকাশ-যোগ্য না হওয়ার কারণ কি? কারণ কি ইহাই নয় যে, উহাতে পক্ষপাতের অভাব আছে এবং রবীন্দ্রনাথের মত সাহিত্য-দেবতার প্রতি অন্ধভক্তির অভাব আছে? আমার মনে আছে, প্রায় ঐ সময়েই অথবা কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে 'বঙ্গবাণী'-পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে তিনি তরুণদিগের পক্ষ সমর্থন করিয়া রবীন্দ্রনাথকে অন্যায়রূপে আক্রমণ করেন। সেই প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়া আমি 'বঙ্গবাণী'তে যে লেখাটি পাঠাইতে চাহিয়াছিলাম—তাহা প্রকাশ করিতে তাঁহারা সাহসী হন নাই, পাছে তাহাতে শরৎচন্দ্রের অভিমান হয়! সত্যকার শিষ্টতা (তোষামোদ

নয়) শ্রদ্ধা ও অপক্ষপাতের মূল্য আজিকার বাংলা মাসিকের ব্যবসায়-ক্ষেত্রে যদি এইরূপই দাঁড়াইয়া থাকে, এবং সত্যনিষ্ঠ সাহিত্যসেবীর এই অসহায় অবস্থার যদি কোনও প্রতীকার ক্ষমতা কাহারও না থাকে, তবে অপরদিক হইতে সাহিত্যিক শিষ্টাচার লঙ্ঘন, তীব্র কঠিন কশাঘাত প্রভৃতির বিরুদ্ধে এই সকল মোহগ্রস্ত সত্য-ভীরু নির্ব্বীর্য্য সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের কোলাহলে বিচলিত হইবার কোনও প্রয়োজন আছে ?

* * *

পাঁচ বৎসর পরে, সেই বাদবিসম্বাদের যে অভাবনীয় পরিণাম ঘটিয়াছে, তাহাও এ স্থলে উল্লেখ-যোগ্য। আজ সাহিত্যের কোনও সমস্যাই নাই। রবীন্দ্রনাথই এখন তরুণ-সাহিত্যের সর্ব্বপ্রধান পৃষ্ঠপোষক। তাঁহার আশীর্ব্বাদে আজ তরুণেরা অভিজাত সাহিত্য সমাজে পরম সমাদরে অর্চ্চিত হইতেছে ; 'বিচিত্রা' 'পরিচয়' প্রভৃতি রবীন্দ্রানুগৃহীত পত্রিকায়, আধুনিকতম সাহিত্যের যে রূপ-বিকাশ হইতেছে, তাহার প্রচারে ও পশারে রবীন্দ্রনাথের সস্নেহ উৎসাহ অল্প কাজ করিতেছে না ! আজ নরেশচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র তাই রবীন্দ্র-নাথের সহিত একমত, পরস্পর অনাবিল প্রীতি ও ভক্তির প্রবাহে বাংলার সমগ্র সাহিত্যিক-গোষ্ঠী টল্‌মলায়মান। কি অপূর্ব্ব দৃশ্য ! তরুণেরা আজ প্রাণ খুলিয়া রবীন্দ্র-বন্দনা করিতেছে ; রবীন্দ্রনাথ প্রাণ ভরিয়া তরুণের প্রশস্তি পাঠ করিতেছেন ; ওদিকে শরৎচন্দ্র 'পথের দাবী'র তারুণ্য পরিত্যাগ করিয়া উপন্যাসে বিশ্বতারুণ্যের বিশ্ব-সত্য প্রচার করিতেছেন। কোথায় সাহিত্য ! কোথায় তাহার ধর্ম্ম, কোথায় বা তাহার সত্য ! আধুনিক কালের সাহিত্যিক জীবনের সার সত্যটি সাধনা করিয়া সকলেই নিজ নিজ ধর্ম্ম বজায় রাখিয়াছেন।

* * *

এখন অভিজাত সাহিত্য বলিতে তরুণ-সাহিত্যই বুঝায়; বাংলা সাহিত্য বলিতে বিশ্বসাহিত্য অর্থাৎ আধুনিক য়ুরোপীয় সাহিত্যের উচ্ছিষ্ট বুঝায়; বাংলা ভাষা বলিতে যে কি বুঝায় তাহা বলা কঠিন, কারণ, তাহাকে নূতন করিয়া তৈয়ারী করিতে হইতেছে, নতুবা বিশ্বের 'পরিশীলন' বহন করিবার যোগ্যতা তাহার কোথায়? রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক বংশধরেরা বাংলা ভাষায় বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার সুমহৎ সংকল্প লইয়া, কামচারী ও কালচারীতে মিলিয়া, অতিশয় উদার আদর্শ প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বা ঐতিহ্য, বাংলা ভাষার সুচিরাগত বাগ্‌বিন্যাস রীতি—এ সকল আর গ্রাহ্য করিবার নহে; ইঁহারা নূতন করিয়া সে ভাষা ও সে সাহিত্যের পত্তন করিতেছেন। এ সাহিত্যের ভাব আর যাই হৌক অতিশয় আধুনিক; এবং ভাষা আর যাই হৌক, ইংরেজী ফরাসী বা জর্ম্মান ভঙ্গির অনুকূল। রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রমথ চৌধুরী প্রভৃতি যত দিক্‌পাল আছেন তাঁহারা সকলেই এ বিষয়ে একমত। বাংলা সাহিত্য এখন বিশ্বপ্রেমে ভরপূর; তাই এ সাহিত্যের কোনও একটা বিশিষ্ট ধর্ম্ম নাই—ইহাতে সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় হইয়াছে। এ মহোৎসবে যত 'নাড়াবুনে' 'কীর্ত্তনে' হইয়াছে। এ ধর্ম্ম যুগধর্ম্ম বটে, কিন্তু সাহিত্য-ধর্ম্ম নহে। তাই এ সময়ে 'সাহিত্য ও যুগধর্ম্মী' বিষয়ক আলোচনা প্রকাশ করিয়া আমরা যে উপহাসাস্পদ হইয়াছি তাহা জানি, জানি বলিয়াই পাঠকগণের নিকট জবাবদিহি করিতে হইল।

২

এ সংখ্যায় আমরা ছন্দসম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছি সে সম্বন্ধেও পৃথক কিছু মন্তব্য করার প্রয়োজন আছে। বাঙালী পাঠকসাধারণের

পক্ষে এরূপ আলোচনার কোনও মূল্য নাই—বিষয়টি সকলের রুচিকর হইতে পারে না। তাই এখানে পুনরায় সংক্ষেপে দুই চারিটি কথা বলিব। মাসিক পত্রগুলি যাঁহারা পাঠ করেন, তাঁহারা অবশ্যই লক্ষ্য করিয়াছেন যে সম্প্রতি কয়েকমাস ধরিয়া বাংলাছন্দ লইয়া মাসিকে মাসিকে একই লেখকের বহুতর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে। ইহা দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, বাংলাছন্দের একটা কিছু গুরুতর তত্ত্বের আবিষ্কার হইয়াছে, এবং সে বিষয়ে কোনও মূল্যবান গবেষণা চলিতেছে। উক্ত প্রবন্ধগুলির বিস্তার দেখিয়া, এবং বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকগণের মধ্যে সেগুলিকে লইয়া কাড়াকাড়ি দেখিয়া, অনেকের সে ধারণা হইতে পারে। কিন্তু আসলে এই সকল প্রবন্ধের লেখক কোনও নূতন কথাই বলিতে সমর্থ নহেন ; আধুনিক বাংলাছন্দ সম্বন্ধে যেটুকু আলোচনা পূর্ব্বেই হইয়াছিল—সেই মামুলী দুই চারিটি মূল কথা, যাহা একটি প্রবন্ধেই শেষ করা যায়, তাহাই একবার এই লেখক পল্লবিত ও বিস্তারিত করিয়া 'প্রবাসী'তে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার পর এ বিষয়ে আর কিছু বলিবার আবশ্যকতাও ছিল না; বলিবার ক্ষমতাও তাঁর নাই। তিনি কেবল কয়েকটি অতিশয় সোজা কথা লইয়া ক্রমাগত সরু কাটিতেছেন—বৈজ্ঞানিক প্রণালী ও পরিভাষার দোহাই দিয়া সেই সামান্য বস্তুকে 'ফালাও' করিয়া মাসিক-সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করিতেছেন। এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, যাঁহারা বাংলা কাব্য পাঠ বা রচনার অনুরাগী তাঁহাদের যতটুকু বোধশক্তি থাকা সম্ভব, তাহাতে এ ছন্দ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে যতটুকু আলোচনা হইয়াছে, তাহাতেই তাঁহাদের ছন্দজিজ্ঞাসা পরিতৃপ্ত হইবে। সত্যই এ সম্বন্ধে বেশি কিছু বলিবার নাই, তা' ছাড়া আধুনিক কালে এইরূপ সামান্য বস্তুসম্বল লইয়া এতখানি পাণ্ডিত্যবিস্তারের প্রয়াস

যেমন নিরর্থক, তেমনিই হাস্যকর। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন বাংলাছন্দ সম্বন্ধে যেরূপ স্কুলমাষ্টারী বিদ্যার পরিচয় দিতেছেন, তাহাতে, পরিমাণ-জ্ঞানহীন এবং যাহা তাহা লইয়া হুজুগ-প্রত্যাশী একদল হস্তী-পণ্ডিতের বাহবা তিনি পাইবেন। কিন্তু ভয় হয়, যাহারা বাংলাছন্দ সম্বন্ধে কোন সংবাদ রাখে না—রাখিবার প্রয়োজনও নাই, অথচ 'কুল-চুরী'র মোহে সর্ব্ববিধ নূতন-কিছুর উৎসাহে অধীর, তাহারা আবার একটি ঝুঁটাকে প্রশ্রয় দিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে আর একটি ফ্যাশনের সৃষ্টি করিবে। বাংলাছন্দ সম্বন্ধে যাঁহাদের কোনও জিজ্ঞাসা আছে, তাঁহারা স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথের 'ছন্দ সরস্বতী' এবং তাহারই সুনিপুণ বিস্তৃত ভাষ্য—প্রবোধচন্দ্রের পূর্ব্ব প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধ, পাঠ করিলেই সফল-মনোরথ হইবেন। যাঁহারা বাংলাছন্দ সম্বন্ধে তদধিক দৃষ্টিলাভ করিতে কিছু মৌলিক গবেষণার মন্ত্রলাভ করিতে চান, তাঁহারা 'পরিচয়'-পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব আলোচনা পাঠ করিলে কৃতার্থ হইবেন; বরং সেই মন্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথ অনুসরণ করিয়া যিনি এই ক্ষেত্রে বিচরণ করিবেন, তিনিই বাংলাছন্দের যথার্থ পরিচয় সুবিস্তারে লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন। রবীন্দ্রনাথের এই একটি প্রবন্ধে যে ইঙ্গিতগুলি আছে তাহার সমান মূল্যবান একটি কথাও প্রবোধচন্দ্রের 'বৈজ্ঞানিক' বিশ্লেষণের কুত্রাপি নাই—আছে কেবল কয়েকটি পূর্ব্ব-প্রাপ্ত তথ্যের অনাবশ্যক জটিলতা-বিস্তার।

* * *

বাংলাছন্দের যে তত্ত্বটি এখনও সুমীমাংসিত হয় নাই—সেই পয়ারের রহস্য-সন্ধান যিনি করিতে পারিবেন এবং সে সম্বন্ধে কোনও সূত্র নির্ম্মাণ করিতে পারিবেন—এ গবেষণায় তাঁহারই কৃতিত্ব প্রমাণিত হইবে। আর যাহা কিছু, তাহার বিচারে মৌলিকতার অবকাশ

আর নাই। প্রবোধচন্দ্রের সে শক্তির প্রমাণ এ পর্য্যন্ত আমরা পাই নাই। তিনি পয়ারের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া—সে ছন্দের ভাষার ছল ধরিয়াছেন, এবং পরম মুরুব্বিয়ানার সহিত চল্‌তি বাংলার ধ্বনিতত্ত্ব ও উচ্চারণ-পদ্ধতির দোহাই দিয়া বাংলা পয়ারকে একটা কিম্ভূতকিমাকার ছন্দ বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন—উহা 'মাত্রাবৃত্ত' ও 'স্বরবৃত্তে'র মিশ্রণে উৎপন্ন একটি মিশ্রছন্দ, ইহাই তাঁহার গবেষণার শেষ সিদ্ধান্ত! দেখিয়া শুনিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়—

কিছু না, কিছু না, নাই জানাশুনা
বিজ্ঞান কানাকৌড়ি,
লয়ে কল্পনা লম্বা রসনা
করিছে দৌড়াদৌড়ি।

তবু কথাটা বোধ হয় একেবারে ঠিক হইল না—কারণ, এ গবেষণায় বিজ্ঞানের বুলি যথেষ্ট আছে, ছন্দ-বিজ্ঞান আছে, নাই ছন্দ-জ্ঞান। পয়ারকে যে 'মাত্রাবৃত্ত' ও 'স্বরবৃত্তে'র কোঠায় টানিয়া আনে, তাহার কাণ মাপ-কাঠির কাজ করিতে পারে, কিন্তু সে কাণ যে ছন্দ-সঙ্গীত ধরিতে পারে না, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু গবেষণার ক্ষেত্রেও প্রবোধচন্দ্র যে ধাপ্পাবাজীর পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে আমাদের দেশের বহু মৌলিক গবেষণাকারীও হার মানিবে। পয়ারছন্দের কোনও বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যার অভাবে, এতদিন একটা অক্ষর-গণনার নিয়ম চলিয়া আসিতেছিল; প্রবোধচন্দ্র তাহার পরিবর্ত্তে কি অপূর্ব্ব ও সর্ব্ব-সংশয়-ভঞ্জনকারী বৈজ্ঞানিক গণনাপদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন! তাঁহার মতে, পয়ারের 'চৌদ্দ' অক্ষর গুণিয়া পূরণ করিবার আবশ্যক নাই—পদমধ্যস্থ যুক্তাক্ষরের হসন্ত-অংশটি না গণিয়া, এবং পদ-শেষের হসন্তবর্ণটি বাদ দিয়া ও তৎপরিবর্ত্তে তাহার পূর্ব্ববর্ণটি ডবল ধরিয়া

লইলেই সেই 'চৌদ্দ'ই মিলিবে, অথচ বিজ্ঞান ও পরিভাষার মান রক্ষা হইবে। অর্থাৎ মুড়িকে 'মুড়ি' না বলিয়া 'ভাজাচাল' বা 'Puffed Rice' বলিলেই সব দুঃখ দূর হইবে। বেগুনগাছে আঁকৃশি লাগানোর কথা শুনিয়াছিলাম মাত্র—সে কার্য্যটিকে এমন করিয়া ইতিপূর্ব্বে চাক্ষুষ করি নাই। এইরূপ 'ছন্দোবিশ্লেষ'এর দাপটে বাংলার দুই-দুই বড়দরের মাসিকপত্রিকা একই কালে বানচাল হইতে বসিয়াছে। বাংলামাসিকের যাঁহারা সম্পাদক, তাঁহাদের সম্পাদন-বুদ্ধি এবং পাঠক-গণের প্রতি ধর্ম্মবুদ্ধি দিন দিন কত উন্নত হইতেছে!

শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্ন' শেষ প্রশ্নই বটে। ইহার পর আর কোনও প্রশ্নের বালাই থাকিবে না। শরৎচন্দ্র যখন ঔপন্যাসিক রূপে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, তখন যে তাঁহার মনে সর্ব্বশেষে এই প্রশ্নটি জাগিবার সংকল্প ছিল, তাহা কে জানিত? প্রথমে বেশ করিয়া আসর জমাইয়া তুলিয়া বোকা বাঙালী পাঠকের মন ভুলাইয়া তাহার হৃদয় মনের যত কিছু দুর্ব্বলতা আছে সেগুলিকে বেশ করিয়া খুঁচাইয়া তুলিয়া, পরিশেষে, যখন তাহারা তাঁহাকে সাহিত্যসম্রাট পদে বরণ করিয়া লইল, তখন শরৎচন্দ্র অবসর বুঝিয়া এই বেতালের প্রশ্নটি তাহাদের মস্তিষ্কের উপর নিক্ষেপ করিলেন। এখন আর বলিবার যো নাই—এ কি হইল? উপন্যাস কই? এ যে নবধর্ম্ম প্রচারের প্রশ্নোত্তরমালা! এ ত' নর নারীর জীবন যাত্রার কাহিনী নয়,—এ যে কড়া নেশার ধোঁয়ায় আধুনিক চণ্ডীমণ্ডপের বাগ্‌বিতণ্ডা! কিন্তু তাহাতেই কাজ হইয়াছে; শরৎচন্দ্র এতদিন বৃথাই লেখনী ধারণ করেন নাই—বাঙ্গালী পাঠকের রসবোধ সম্বন্ধে তাঁহার নাড়ী-জ্ঞান অসাধারণ! বায়ু পিত্ত এবং কফের মধ্যে এখন কোন্‌টা কুপিত

হইয়াছে তাহা তিনি বিলক্ষণ বুঝিয়া লইয়াছেন। না বুঝিয়া লইলে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক আসরে যে আর 'কল্কে' পাইবার আশা নাই। দেখিতেছেন না?—তরুণেরা দিগ্‌বিজয় করিতেছে কোন্ অস্ত্রের সাহায্যে? রবীন্দ্রনাথের কোন্ ধরণের কবিতা ও উপন্যাস আজ বাঙ্গালীকে শিব-নেত্র করিয়া তুলিয়াছে? যুগ-সমস্যা—যুগ-সমস্যা! সমস্যাই প্রাণ, সমস্যাই ধ্যান, সমস্যাই জ্ঞান। যে যত সমস্যার উদ্ভাবন করিতে পারিবে তারই তত জয় জয়কার। শরৎচন্দ্র যে সমস্যাটির ভিয়ান করিয়াছেন, তাহার পাক এমনই সূক্ষ্ম, তাহা এমনই দানাদার, যে মুখে দিলেই রস কাটিতে থাকে, সমস্যার এমন রস-বড়া পূর্ব্বে আর কোনও সাহিত্য-মোদক প্রস্তুত করিতে পারে নাই।

* * *

কিন্তু এ কি হইল?—'শেষ প্রশ্ন' লইয়া বাংলা সাহিত্যের সদরে মফঃস্বলে যে চুলাচুলি বাধিয়া গেল! শরৎচন্দ্র আলবোলার নলটি আবার বাগাইয়া ধরিয়া চক্ষুঃ নিমীলিত করিয়া পরম প্রশান্তি ভাব ধারণ করিয়াছেন। তিনি ক্রমেই সাহিত্য-লোকের কত উর্দ্ধে আরোহণ করিতেছেন তাহা নিজেও হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন। এককালে 'গৃহদাহ' ছিল তাঁহার সাহিত্য কীর্ত্তির চূড়ান্ত, তারপর হইল 'পথের দাবী'; এখন সর্ব্বোচ্চ শিখর হইয়াছে 'শেষ প্রশ্ন'। ইহাই স্বাভাবিক—যেটা যত পরে সেইটাই যে তত পরিপক্ক। স্বর্গারোহণ করিতে হইলে পিছনের পানে তাকাইলেই সর্ব্বনাশ। কিন্তু তরুণদের কি অকৃতজ্ঞতা! তাহারাও 'শেষ প্রশ্ন'কে কাব্য বলিতে প্রস্তুত নয়! তরুণ-শিরোমণি অন্নদাশঙ্কর হাকিম হইয়া শেষে এই ব্যবহার করিলেন! এ যেন রাজপাটে বসিয়া দুষ্মন্তের শকুন্তলা-প্রত্যাখ্যান! এইটাই আমাদের সব চেয়ে বেশী বাজিয়াছে।

* * *

কিন্তু মজার কথা এই,—ভক্ত হনুমানদের কথা ছাড়িয়া দিলেও, অনেক প্রবীণ রস-পিপাসু 'শেষ প্রশ্ন' পড়িয়া 'বাউরা' হইয়াছেন—মাসিকে সাপ্তাহিকে, ইংরেজী দৈনিকে পর্য্যন্ত 'শেষ প্রশ্নে'র অতল রহস্যের তল-সন্ধান-চেষ্টা দেখা যাইতেছে। ভক্ত হনুমানেরা বলিতেছে—'শেষ প্রশ্নে'র কমলা নিখিল-চরিত্র-সাগর-মন্থন-করা একটি সাত রাজার ধন মাণিক—এমনটি আর হয় নাই, হইবে না। একজন স্বধর্মনিষ্ঠ খ্রীষ্টান ভদ্রলোক 'শেষ প্রশ্নে'র কমলা-চরিত্রে যীশুর বাণীকে মূর্ত্তি ধরিতে দেখিয়াছেন। শরৎচন্দ্র নাকি নবযুগের সেণ্টপল। ভদ্রলোক পড়াশুনা করিয়াছেন বটে, যীশুর ধর্ম্মশাস্ত্র ও আধুনিক ফ্রয়েডীয় কামশাস্ত্রের সমন্বয়-সাধন করিবার মনীষাও তাঁহার আছে। এ-হেন ধর্ম্মপিপাসু ও রসপিপাসু পণ্ডিতগণ যখন একবাক্যে শরৎ-চন্দ্রের ঋষিত্ব ঘোষণা করিতেছেন, তখন অপর পক্ষে যে বিরুদ্ধ সমালোচনা চলিতেছে, তাহার সমর্থন করিবে কে? দুই পক্ষের মধ্যে দাঁড়াইয়া সব চেয়ে যে মতটি সহজে ব্যক্ত করা চলে, তাহা এই যে, শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্ন' যেমনই হৌক, একটা আন্দোলন, একটা সাড়া জাগাইয়াছে। অতএব 'শেষ প্রশ্নে' শক্তির প্রমাণ আছে।

* * *

কথাটা আমরাও স্বীকার করি। কিন্তু স্বীকার করি না যে, তাই বলিয়া 'শেষ প্রশ্ন' একটি সুরচিত উপন্যাস-কাব্য। শরৎচন্দ্র সরস গদ্য লিখিতে পারেন, তাঁহার লিখনভঙ্গি চিত্তাকর্ষক। গদ্য দুই কাজই করে—উভচরবৃত্তি তার পক্ষে সহজ। তাই গদ্যে যখন কাব্য রচনা হয়, তখন পদ্য অপেক্ষা তাহার যেমন অনেক বেশী সুযোগ সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্য আছে দেখা যায়, তেমনই একটি বড় বিপদও আছে; সে সহজেই কাব্যের সীমানা লঙ্ঘন করিতে পারে, রস-সৃষ্টির ভার লইয়া

সে তত্ত্ব-চিন্তা বিজ্ঞান-ব্যাখ্যায় ব্যাপৃত হইবার ঝোঁক সামলাইতে পারে না। গদ্যের সেই যে অপরা প্রবৃত্তি তাহাই যদি রসসৃষ্টির ব্যপদেশে প্রকট হইয়া ওঠে তবেই একটা গোলযোগের সৃষ্টি হয়। একই পাঠক খাঁটি গদ্যবস্তু ও খাঁটি কাব্যবস্তুর অনুরাগী হইতে পারেন, কিন্তু যাঁহার রসবোধ জাগ্রত থাকে তিনি দুই বস্তুর দুইটি পৃথক ক্ষেত্র ও বিভিন্নরূপ সম্বন্ধে সদা সচেতন থাকেন; তাঁহাকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। শরৎচন্দ্রের 'শেষপ্রশ্নে' খাঁটি গদ্যের সরস ভঙ্গি আছে, তাহার বিষয়-বস্তুর মূলে আছে তত্ত্ববিশ্লেষণ। এ গ্রন্থের প্রেরণা, কাব্যসৃষ্টির প্রেরণা নয়—প্রবীন সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের সমাজ সম্বন্ধে কতকগুলি চিন্তাই ইহার প্রধান উপাদান। শরৎচন্দ্র তাঁহার সেই চিন্তাকে আর কোনও রূপে প্রকাশ করিতে না পারিয়া—উপন্যাসই তাঁহার একমাত্র অভ্যস্ত প্রকাশরীতি বলিয়া—কতকগুলি কাল্পনিক চরিত্রসৃষ্টি দ্বারা তাঁহার সেই নিজ মানসের উত্তেজনা এই রূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। মানুষের জীবন, তাহার চরিত্র ও নিয়তির চিরন্তন রহস্য—যাহা দেশে ও কালে বিচিত্র হইলেও, কবিকল্পনার সত্যসন্ধানী দৃষ্টিতে চিরকাল একই রসের উৎস—এ গ্রন্থে তাহার আভাস মাত্রও নাই; ইহার যাবতীয় পাত্র পাত্রী সেই মানুষ নয়, সৃষ্টির অতি জটিল দুর্ভেদ্য নিয়ম-জাল যাহার মধ্যে একটি অনির্ব্বচনীয় রসরূপে সরল অথচ চিররহস্যময় হইয়া প্রকাশ পায়। দৈন্য, দুঃখ, অজ্ঞতা, পাপ-তাপের মধ্যে আমরা যাহাকে স্রষ্টার চরমতম কাব্যসৃষ্টি বলিয়া মানি, যাহার আত্মাভিমান বা জ্ঞানস্পৃহা নয়,—মূক-মৌন জীবনাবেগই বিপুল বিস্ময়ের নিদান, যাহার প্রকৃত স্বরূপ আমাদের চিন্তার খোরাক যোগায় না, বরং—"teases us out of thought"—সেই মূল মনুষ্যপ্রকৃতির পরিচয় এ গ্রন্থে নাই। 'শেষ-প্রশ্নের' এই সকল নরনারীকে আমরা অতিশয় ক্ষুদ্র বলিয়াই অনুভব

করি, ইহাদের জীবনে সৃষ্টির সাগর-স্রোতের গূঢ় সঞ্চার লক্ষ্য করি না—ইহারা কেবল চিন্তা করে, এবং চিন্তার দ্বারা মরজীবনের নিয়তি-নিয়মকে ভূমিসাৎ করিতে চায়। 'কমলা' চরিত্র সেই জীবন-রহস্যের বিরুদ্ধে—বিধাতার চিরচমৎকার কবি-কল্পনার বিরুদ্ধে একজন চিন্তাভিমানী মানুষের বিকট দন্তবিকাশ বলিয়া মনে হয়। প্রকৃতির উপরে জয়ী হইবার আকাঙ্ক্ষা মানুষ চিরদিনই করিয়াছে, দুই স্কন্ধে মোমের পাখা বাঁধিয়া ঊর্দ্ধাকাশে উড়িবার চেষ্টাও করিয়াছে, এবং শেষ পর্য্যন্ত উড়িয়াছেও বটে, কিন্তু তথাপি মানুষ পাখী হইতে পারে নাই। কমলা সমস্ত নীতিবিধান ও সমাজ-বিধানকে অস্বীকার করিয়া যে নীতিহীনতার আস্ফালন করে—তাহা সামাজিক সত্য নয় বলিয়াই, এবং সমাজও মূলে প্রকৃতির তাড়নার ফলে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া, তার সেই চমকপ্রদ মিথ্যা উক্তিগুলি শরৎচন্দ্রের চিন্তাবিলাস মাত্র—সেই উক্তিগুলিকে যে চরিত্রের দ্বারা তিনিও বাঁধিয়া দিয়াছেন, সে চরিত্রটি কতকগুলি বাক্য-স্ফুলিঙ্গের আতস-বাজি মাত্র। সে কোনও সংস্কার মানে না, সত্যের সংস্কারও নয়; কোনও কিছুকে ধ্রুব বলিয়া ধরিয়া থাকিতে সে রাজী নয়। কিন্তু এ ত' মানুষের সম্মতি-অসম্মতির কথা নয়—প্রকৃতি চুলের মুঠি ধরিয়া তাহাকে যে একটা কিছু মানাইবে, তাহার রক্ত-মাংসের মধ্যে আকর্ষণ-বিকর্ষণের নিয়ম কাজ করিতেছে—তর্ক করিয়া সে হারাইবে কাহাকে? শরৎচন্দ্রের কল্পনায় কমলা যে কৃত্রিম জীবন যাপন করিতেছে—সংসারে সেরূপ জীবন-যাত্রা অচল। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে সে শুধু বাঁচিয়া নাই, মহিমান্বিত হইয়াছে, তার কারণ, ইহাতে জীবনের সত্য নাই—ইহা কাব্য নয়, ইহা পুরাতন সমাজনীতির উচ্ছেদ মূলক একটি অতিশয় মৌলিক গবেষণা। কমলা নাম্নী তর্ককুশলা বাগ্‌ব্যবসায়িনী আর যাহাই হৌক, জীবনান্বিত নারী বা নরজীব নহে, তাহাকে

আমরা জীবন-নাট্যের কোনও একটি বিশেষ চরিত্র বলিয়া চিনিতে পারি না; তার তুলনায় একজন অতি সাধারণ বারবনিতাও চরিত্র হিসাবে সত্য ও বরণীয়।

* * *

কিন্তু তথাপি 'শেষ প্রশ্ন' বাংলা সাহিত্যের হাটে এমন কোলাহল সৃষ্টি করিয়াছে কেন? ইহার সম্বন্ধে এমন সুস্পষ্ট মতবিরোধ হইবার কারণ কি? পূর্ব্বেই বলিয়াছি—রচনাটি গদ্যকাব্য না হইলেও গদ্য-রচনা বটে; গদ্যরচনায় সকলেই কাব্য চায় না; বরং গদ্য খাঁটি রসরচনা না হইয়াও যদি বেশ রসাল হয়, অর্থাৎ, খাঁটি কাব্যসৃষ্টির পক্ষে যাহা অবান্তর সেই সকল চিন্তা, তর্ক ও সূক্ষ্ম মত-বিশ্লেষণ বা সমস্যাসৃষ্টি যদি তাহাতে কাব্যের আকারে উপস্থাপিত হয়, তবে অনেক সমস্যাবিলাসী তত্ত্বপিপাসু অরসিক ব্যক্তির তাহাতেই কাব্যপাঠস্পৃহা পরিতৃপ্ত হয়; যেমন নিরামিষ 'চপ' খাইয়া অনেক আমিষাহার-বঞ্চিত হতভাগ্যের কতকটা সান্ত্বনা লাভ হয়। যে-রসে ভগবান তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছেন—যাহা ভোগ করিবার ইন্দ্রিয়ই তাহাদের নাই, সে বস্তুর নামাঙ্কিত, অথচ তাহাদেরই আস্বাদন-যোগ্য কিছু পাইলে, তাহারা যে দাতাকে দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে? আশ্চর্য্য হই ইহাই ভাবিয়া যে, কবি-পদবী হইতে দার্শনিক পদবীতে শরৎচন্দ্র এত শীঘ্র ডবল প্রমোশন পাইলেন কি করিয়া? এ সকলই যুগধর্ম্মের মহিমা—যাহার প্রতাপে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর পর্য্যন্ত কম্পমান, তাহার নিকট মানুষ—তাও আবার বাংলা ঔপন্যাসিক—কোন্ ছার!

* * *

প্রায় একই কালে আর একখানি বাংলা উপন্যাস রসিক-সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' বহু পাঠকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করিয়াছে। ইহাতে মনে হয়, বাঙালীর রসবোধ এখনও জাগ্রৎ আছে; মনে হয়, আধুনিক কালে কুসাহিত্য বা অ-সাহিত্যের যে এত প্রসার তার কারণ ইহাই নহে যে, দেশে সাহিত্যবোধ একেবারে লুপ্ত হইয়াছে। বুভুক্ষু পাঠক-সমাজ ভাল কিছু না পাইয়া যাহা তাহা গলাধঃকরণ করে বটে, কিন্তু ভালো কিছু পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে সাদরে বরণ করিয়া লয়। ইহা আশার কথা বটে। 'পথের পাঁচালী'র রচনা-রীতি সম্পূর্ণ নূতন, ইহাতে মনস্তত্ত্ব নাই, সমস্যা নাই, গল্পবস্তুর চমৎকারিত্ব নাই, তথাপি ইহাতে কাব্যসৃষ্টি হইয়াছে। বাঙ্গালী জীবনের তুচ্ছতম উপকরণকে আশ্রয় করিয়া, অতিশয় অনাদৃত, উপেক্ষিত, বৈচিত্র্যহীন পল্লী-প্রকৃতির জন্মভূমিকায়, এই যে একটি সুস্থ প্রাণবান মর্ত্ত্যতীর্থ-যাত্রীর অন্তরকাহিনী এ কাব্যে চিত্রিত হইয়াছে, তাহা পুণ্যবান রসিকের চিত্তে কি অপূর্ব্ব রসের সঞ্চার করে! কোনও খানে ভাববস্তু বা কল্পনার অসামান্যতা নাই, আছে কেবল—অতি সাধারণ নিত্যকার অনুভূতিকে অকপটে বর্ণন করিবার আগ্রহ; তাহাতেই বিস্ময়ের যেন অবধি নাই। মনে হয়, যেন অনন্ত তমিস্রা-গর্ভ হইতে বাহির হইয়া এই চিরাভ্যস্ত অতি পুরাতন সূর্য্যোদয়দৃশ্য দেখিতেছি—যে আলোকে পৃথিবীর ধূলিকণাটি পর্য্যন্ত সম্ভ্রম উদ্রেক করে। যেখানে যে-কেহ আছি সেইখানেই তাহার চক্ষে তৃণলতাগুল্মকণ্টক পর্য্যন্ত একটি অনর্ঘ্য প্রীতির মূল্যে মূল্যবান হইয়া উঠে, সমস্ত চরাচর যেন বৈদিক ঋষির স্তবগানে প্রসন্ন হইয়া উঠে; সকলই মধুময় বলিয়া মনে হয়। এই উপন্যাসের যে নায়ক, তাহার চির-অজর শিশু হৃদয়কে—

আহার সেই ক্ষুদ্র জীবন-লীলাকেই—কেন্দ্র করিয়া, সুখ দুঃখ ভাব-অভাবের ছন্দে, বিপুল কালের পরিধি আবর্ত্তিত হইতে থাকে; সর্ব্বদেশের, সর্ব্বকালের, এমন কি সর্ব্বজীবের যে জীবন-রহস্য তাহারই বিরাট ছায়ায় একটি চির-সদ্যোজাত মানব-প্রাণ অমৃত পিপাসায় অধীর হইয়াছে। জীবনের সকল তুচ্ছতার অন্তরালে নৃত্যপরায়ণ মহাকালের সেই ব্যোম-বিভ্রান্ত জটাজাল দেখিয়া, সেই তুচ্ছতাকেও প্রাণের প্রণাম নিবেদন করিতে ইচ্ছা হয়; মৃত্যুর এপার হইতে মৃত্যুর ওপারে, জন্ম হইতে জন্মান্তরে, এ প্রাণের কাহিনী যেন বাড়িয়াই চলে, শেষ হইতে চাহে না। দারিদ্র্যের পীড়নে এই জীবন-চেতনা আরও গভীর হয়, স্নেহ মমতার তন্তুগুলি দৃঢ় হইয়া উঠে; অতৃপ্ত কামনার আবেগে কল্পনা দিগন্ত লঙ্ঘন করে, ক্ষুদ্র পল্লীর ক্ষুদ্র ভূ-সীমার মধ্যেই ভূমণ্ডলের আভাস জাগে—সাগর-মেখলা অরণ্যকুন্তলা পৃথিবীর স্বপ্ন অধীর করিয়া তোলে। যাহা কিছু ক্ষুদ্র, যাহা কিছু গ্লানিকর, যাহা কিছু মুক্তির অন্তরায়, তাহাই অতি সবল সরল মানবাত্মার আনন্দ-চৈতন্য প্রবুদ্ধ করে। 'পথের পাঁচালী'র সেই শুদ্ধসত্ত্ব অপাপবিদ্ধ শিশু-নায়কের জীবন-লীলা পাঠককেও শিশু করিয়া তোলে; মনে হয়, যেন কেবল শৈশবই নয়, জন্মান্তরের জাতিস্মরতা লাভ করিয়াছি। মনে হয়, মানুষ যেন ললাটে অমর-আত্মার রাজটীকা ধারণ করিয়া এই পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়, সংসার সেই রাজ-অতিথির সেবায় আপনার খুদকুঁড়া নিবেদন করিয়াই ধন্য হয়; তাহারই অমৃত-ভিক্ষার আকিঞ্চনে বিশ্ব তাহার বিপুল বিভব তাহার সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিতে বাধ্য হয়। মনে হয়, ইহাই জীবন, ইহাই যুগ-যুগান্তরের শাশ্বত সত্য,—মানুষ ছোট নয়, জীবন তুচ্ছ নয়; কালের পারাবারে যে অগণিত মন্বন্তর-তরঙ্গ আছাড়িয়া পড়িতেছে, তাহার মুখে, সেই

অনন্তবিস্তার ভূমি-সৈকতে, আমার সুখ দুঃখের শঙ্খ-শুক্তির যেমন হিসাব নাই, তেমনই তাহাদের সে বর্ণ-গরিমাও ব্যর্থ নয়!

* * *

ইহাই বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'। সকল কাব্যের যাহা শ্রেষ্ঠ প্রেরণা এ উপন্যাসে তাহা আছে। চরিত্রসৃষ্টি বা ঘটনাবিবৃতিই এ রচনার রসবৈশিষ্ট্য নয়; জটিল মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ, বা আধুনিক কালের অতি সজ্ঞান নর-নারীর বিষম মানস-বিষের ব্যাখ্যান ইহাতে নাই। মানুষ যে দৃষ্টি হারাইয়াছে সেই চিরতরুণ গাঢ়নীল চক্ষুতারকার অনাবিল দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিয়া তিনি তাহার জীবনকে গভীরতর ভাবে দেখিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন; কোনও তর্ক নাই, কোনও সমস্যা নাই—সুখের উন্মাদনা নাই, দুঃখেরও হাহাকার নাই, আছে কেবল দুইটি বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষু দিয়া এই জীবন-দেবতার দীপারতি। তথাপি এই দৃষ্টির অন্তরালে একটা বিশেষ কল্পনা, একটা বিশেষ ভাবনাভঙ্গি আছে—থাকিবারই কথা, না থাকিলে এ কাব্য এমন একটি সুসম্পূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করিত না। কিন্তু সেটাও তত্ত্ব নয়, সমস্যার ইঙ্গিত নয়—সে একটা মনোভাব, জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে কবিচিত্তের একটা বিশেষ রসোপলব্ধি। সেই মনোভাবটি এই কাব্যের পরিকল্পনায় প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। পাঠক সেটিকে বুদ্ধির দ্বারা ধারণা করে না, কোনও একটি তত্ত্বরূপে গ্রহণ করে না—একটি অনুরূপ ভাবাবস্থার দ্বারা অনুভব করে মাত্র। জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান নয়, একটা নূতন ধরণের চেতনা যেন পাঠককে মুগ্ধ ও আশ্বস্ত করে। একবার ইহার একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থকার নিজে আমাকে জানাইয়াছিলেন—এই ভাবকে একটি নির্দ্দিষ্ট চিন্তার আকারে সুস্পষ্ট করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি বলেন, এই উপন্যাস-রচনার প্রেরণায় কোনও বিশেষ

স্থান-কাল-পাত্রের প্রতি পক্ষপাত নাই; সমস্ত বিবৃতি ও বর্ণনার মধ্য দিয়া তিনি যে ধারণাটিকে অনুভূতিগোচর করিতে চাহিয়াছেন তাহা—'vastness of space and passing time'—এই বিপুল রহস্যের অনুধ্যানে জীবনের স্বরূপ-উপলব্ধি। হইতে পারে, এই উপলব্ধিই তাঁহার কল্পনার মূলে কাজ করিয়াছে; কিন্তু স্থান-কাল-পাত্রের প্রত্যেক খুঁটিনাটির মধ্য দিয়াই সেই ভাবচিন্তা বস্তু-মমতা রূপেই এমন কাব্য-সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে—রূপে, রঙে, রেখায় ভাবানুভূতির সহস্র ইঙ্গিত-ব্যঞ্জনায় যে রসমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহাকে কোনও অর্থের বাঁধনে বাঁধা যায় না। কবি যাহা অনুভব করিয়াছেন তাহার পৃথক ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ হয় ত' হইতে পারে কিন্তু কাব্যে তাহাকে জ্ঞান-গোচর করিবার চেষ্টা না করিয়া একটি অনুভূতি রূপে তিনি যে তাহাকে পাঠকের হৃদয়গোচর করিয়াছেন তাহার কারণ, তিনি বিশেষের মধ্যেই সেই নির্ব্বিশেষকে দেখিয়াছেন; বেশ বুঝা যায়, সে ধারণা কবির কল্পনা-বীজমাত্র—এ বীজ জীবনের সাক্ষাৎ উপলব্ধি হইতেই কবিচিত্তে উপ্ত ও অঙ্কুরিত হইয়াছে।

* * *

সকল খাঁটি কাব্যের লক্ষণ ইহাই। কবি-কল্পনার প্রকৃতি যেমনই হোক, তাহার প্রকাশভঙ্গি যতই বিশিষ্ট হোক—কাব্য কোনও সমস্যার উদ্ভাবন বা সমাধান করে না। শরৎচন্দ্র 'শেষ প্রশ্নে' যাহা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার কবি-প্রতিভার পরাজয় লক্ষ্য করা যায়; তিনি কবির আসন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইহার কারণ তাঁহার যৌবনশক্তির সঙ্গে সঙ্গে কল্পনা শক্তিও মন্দীভূত হইয়াছে। আর একটা কারণ তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভার মধ্যে বীজ রূপে নিহিত ছিল। তিনি যে-শক্তিবলে এককালে উপন্যাস রচনায় এমন সিদ্ধি লাভ করিয়া-

ছিলেন, তাহার অনুরূপ অশক্তিও তাঁহার কবিধর্মের একটি লক্ষণ। অত্যধিক emotion বা হৃদয়-দৌর্ব্বল্যই তাঁহার কবিশক্তির সহায় হইয়াছে—তিনি মানুষকে দেখিতে ও দেখাইতে পারিয়াছেন তাহার হৃদয়-বেদনার সূত্রটি ধরিয়া। তাঁহার কল্পনা কখনই সেই জাতীয় সহমর্ম্মিতার সাহায্য ব্যতিরেকে বিচরণ করিতে পারে নাই; তিনি মানুষের জীবনকে সমগ্রভাবে দেখেন নাই; গৃহপ্রাঙ্গণ বা সমাজ-সীমানার বাহিরে যে বিরাট জগৎ তাহার বিপুল রহস্য লইয়া বিরাজ করিতেছে তাহার দিকে তিনি কখনও দৃষ্টি করেন নাই; একমাত্র শ্রীকান্ত ভিন্ন আর কোনও উপন্যাসে প্রকৃতির সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সাক্ষাৎকারের তেমন পরিচয় নাই—এবং শ্রীকান্তেও প্রকৃতির সে-রূপ ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের রূপ হইলেও, তাহা যেন জীবনের বহির্দ্দেশে, সে যেন আগন্তুক, অন্তরঙ্গ নহে। এরূপ সংকীর্ণ কল্পনার পক্ষে সাহিত্যসৃষ্টির যে প্রেরণা যতটুকু সফল হইবার, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে তাহা হইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে কোনও রসিক পাঠকেরই নালিশ নাই। কিন্তু এ কল্পনা শীঘ্রই নিজেকে নিঃশেষ করিয়া ফেলে; কেবলমাত্র emotion এর শক্তি কবিকেও বেশি দিন জীয়াইয়া রাখিতে পারে না। জীবনের দুঃখ দৌর্ব্বল্যের দিকটাই তাঁহার যে কল্পনাকে একদিন অপূর্ব্ব-সহানুভূতিরসে পুষ্ট করিয়াছিল, আজ সে কল্পনা যখন আর নাই, অথচ সেই খণ্ড, ক্ষুদ্র, বিক্ষিপ্ত জীবনের দৈন্য তেমনই তাঁহাকে অভিভূত করিতেছে, তখন জীবনের মূলনীতিকে অস্বীকার করা, এবং মানুষের আত্মাভিমানকে জয়ী করিবার প্রবৃত্তি আদৌ আশ্চর্য্যজনক নহে। তাই শরৎচন্দ্র এখন উপন্যাস রচনার ছলে, জীবন-রহস্যের পরিবর্ত্তে, মানুষের মানস-ব্যাধির ঔষধ সন্ধান করিতেছেন।

মন-জুয়ান

স্কট টমসন লিখিত

[বায়রণের 'ডন জুয়ানে'র সহিত এই কাব্যের কোনই সংশ্রব নাই]

বাংলার কবিদল বসিল টেবিলে
টেবিলের পাশে কিনা অর্থাৎ চেয়ারে,
কাব্যামৃত রস আহা উদরে সেবিলে
স্থানাস্থান জ্ঞান আর কে করিতে পারে !
জ্ঞান হয় শুধু যবে দারুণ pay-billএ
চোখের সম্মুখে আহা পকেটটি মারে !
কাব্য-মদ্য চিরদিন এক সাথে বাস,
কত অর্থ ধরে দেখ একই সমাস !

সেই মদ্য ঢোকে যবে কবির মগজে
হৃদয়ে জাগেরে কত অসম্ভব সাধ,
আরোহিয়া মাসিকের ঐরাবত গজে
সাহিত্যের উপবনে ঘটায় প্রমাদ !
পাইকারী দরে কিনি, ডিমাই কাগজে
বসে যায় করিবারে কাব্য অনুবাদ।
তব লাগি 'গুরুদাস' খাবে দই-আম
বেঁচে থাক্ কালিদাস—ওমর খৈয়াম !

জাগ জাগ বীণাপাণি, (পায়ে পড়ি মাতঃ
জাগিও না আজকাল—তোমার দোহাই,)
অকালে জাগিয়া হের হইলরে কাত
কুম্ভকর্ণ রাবণের সহোদর ভাই !
তবে যদি বেশি ঘুমে ধরে পায়ে বাত
গোপনে জাগিতে পার, কোনো ক্ষতি নাই।
দিনে হেরি পথে পথে পুলিশের লাঠি,
নিশীথে শাসায় মাতঃ, তীক্ষ্ণ সিঁধ-কাঠি।

বাংলার কবিদের লিখিব কাহিনী
এখনি দেখিতে পাবে, বিস্তরে অলম্,
এতদিন তব কাজে কিছুই চাহিনি,
হংসপুচ্ছ ছিঁড়ি দেহ একটি কলম !
মগজে করিয়া ভিড় ভাবের বাহিনী,
ফুলাইল মাথা, দাও হাকিমী মলম !
আমার এ দুঃসাহস, ক্ষমিও রসিক,
বর্ণনাটা হইল না মোটেই ক্লাসিক।

ভূমিকা লিখিব নাগো এই ছিল পণ,
তবু দেখ দীর্ঘ কত পড়িল হৈয়া,
আষাঢ়ে দেখেছ কি গো কেতকীর বন
অবিরল বায়ু যবে বহে পূরবৈঁয়া !
কেয়াফুলে শুধু পাতা, ভূমিকা-মতন
ফুল তার এতটুকু দেখো হাতে লৈয়া ॥

ভূমিকায় স্পেসালিষ্ট আছে জি, বি, এস,
ঘড়ি হ'তে দামী তার ঘড়িটির কেশ!

বাংলার কবিদল জুটিল দ্বিতলে,
ত্রিতলেও জুটিবারে পারিত নিশ্চয়,
প্রভেদ কে করে বল রোহিতে চিতলে
স্নানান্তে মধ্যাহ্ন বেলা ক্ষুধার সময়—
স্থান জ্ঞান থাকে কার বল চিৎ হলে,
অন্তত একথা সত্য তারা কবি নয়।
মূর্খতাই কবিত্বের বেনামী মুখোস,
না হয় পুছিয়া এস গিরিন্দির বোস।

কারে ছেড়ে কারে ধরি সমস্যা বিচ্ছিরি,
সকলেই কবিত্বের ফুলে ভরা সাজি,
তবু যিনি খুলিলেন বেহেস্তের সিঁড়ি—
তাঁর কীর্ত্তি বাখানিতে সর্ব্ব আগে রাজি।
ফুলের বাগানে শোভে নেভা-অগ্নি-গিরি—
ছাই চাপা আগুনের হল্‌কা যে আজি!
অগ্নি আজি জল হ'ল নয়নের কোণে,
বঁধু আর বিরহের গান কে না শোনে?

পণ্ডিতেরা বলেছেন, কি বলিতে পার?
কাল দীর্ঘ—জীবনের দিন নহে কোটি,
শব্দশাস্ত্র পারাবার নিতান্ত প্রগাঢ়—

সাগু বার্লি ভুলে যাও, ভুলিও না শটি !
এঁর সাথে তুলনা যে করিব না কারো,
কবি-মাঝে সেরা ইনি, মোমসেক বটি !
বাংলার নীলাকাশ হয়েছে সজল—
সকলেই জানে মেরে' গজাল-গজল ।

দোহাই পাঠকগণ, বলে রাখি আগে,
হয় তো উচিত ছিল, আরো আগে বলা,
মাঝে মাঝে ভুল হবে, যদি মন্দ লাগে
মনে রেখো এর নাম চারু শিল্প-কলা,
জেনো ইহা ওল নয়, অশ্রু এতে জাগে
পড়িতে পড়িতে কভু ধরে যদি গলা—
দোহাই পাঠকগণ করো মোরে ক্ষমা,
মাঝে মাঝে পড়ে মোর যাবে দাঁড়ি কমা ।

আর যদি ভাগ্যক্রমে জোটেন পাঠিকা
বক্ষ পরে রাখিবেন, আরে না না, ভয়
নাই নাই, মোরে নয়, আমার নাটিকা
দুপুরে বিশ্রাম-কালে পড়ার সময় ।
মাঝে মাঝে মার্জ্জিনেতে এঁকে দিবে টীকা
তাম্বুলরঞ্জিত স্মিত অধরোষ্ঠদ্বয় ।
ধীরে ধীরে হইবেন শয়নে শহীদ—
আসিবে নয়ন ভরি স্বপ্নময় নিদ্ ।

লেক রোডে বসিয়াছে সভা, কলিকাতা
নগরীর দক্ষিণেতে সেই দূর লেকে,
দেখো নাই আজো তাহা ? হায়রে বিধাতা,
করিয়া ট্যাক্‌সি ভাড়া আজই এসো দেখে।
কিন্তু যদি থাকে তব সন্তানের মাতা
সঙ্গে নিয়ো নাকো তারে, ঘরে যেয়ো রেখে।
কি দিব বর্ণনা তার, কি দিব নমুনা,
বাংলার কবিদের হৃদয়-যমুনা।

সাহিত্য-বান্ধবী তব লইও বামেতে
অন্ততঃ বহিন্‌ এক সঙ্গে নিয়ো ক'রে—
পত্নী তব পাইল না ফ্রেশ হাওয়া খেতে
এই ভেবে দুঃখ হ'লে হৃদয়-কন্দরে,
দুঃখ নাই দুঃখ নাই, দেখিবে মোড়েতে
তিনি চলেছেন চাপি অন্যের মোটরে।
আধুনিক যমুনায় সকলি নূতন—
নাহিক তমাল আর কদম্বের বন।

মধ্যখানে বসিয়াছে কবি, মুখে হাসি—
রুমালে মুছিছে ঘন প্রতিভার ঘাম,
সংখ্যায় পাশেতে যত বসে শূন্য রাশি
গণিতে বাড়িয়া যায় তত তার দাম—
তেমনি কবির পার্শ্বে বসেছেন আসি
জীবন্ত গজল যত—করিব না নাম।

তিনকে তেইশ দিয়ে করে নিয়ো গুণ—
কালিতো কলমে আছে, গুদামেতে চুণ !

. . .

একা কবি, কিন্তু আজ একা ন'ন তিনি,
বসিয়াছে চারিপাশে কবিতর দলে,
শুদ্ধোদন পুত্র বুদ্ধ সিদ্ধি লাভ যিনি
করিলেন ইন্দ্রিয়ের বোধিদ্রুম তলে—
হনুমন্ত অনুপ্রাস—যাঁর কাছে ঋণী
হুইটম্যান হামসুন ইত্যাদি সকলে—,
মনু না ছাড়িতে তিনি ধরিলেন বেদে,
পড়িল তাঁহার প্রেমে স্ত্রীপুরুষ ভেদে।

. . .

ভারতবর্ষের যুগ্ম আদর্শের মত
সস্ত্রীক শ্রী গোবর্দ্ধন জুড়ি এক কোণ,
কুমারী বালিকা কবি, পত্নীত্বে বিব্রত—
দুষ্ট লোকে কহে ভাল তার চেয়ে বোন !
সভায় ঘরের কথা কহা অসঙ্গত—
কারবারে গুপ্ত থাকে কার কত লোন্ !
এক যজ্ঞে সমুদ্ভূত প্রদ্যুম্ন-দ্রৌপদী—
ক্লাসিক কাব্যের মত হয়েছে চৌপদী।

. . .

যাযাবর, পাক, পথে-প্রবাসে-সঙ্কর
যাজ্ঞবল্ক্যপুত্র কিবা 'পরিচয়' তার—

আছেন তমাল তলে বেঁটে পীতাম্বর—
টাকে ভালে প্যাক্ট্ করি যাঁতে একাকার—
আর আছে নামে যার এত লাগে ডর
শ্রীবিষ্ণু উচ্চারি তবে পাইবে নিস্তার—
আরো যারা আছে ক্রমে হইবে প্রচার—
ধীরে ধীরে বাড়ে গাছ মূলে দিলে সার।

অবশেষে পঁহুছিল দিয়ে মৃদু লাফ—
নন্দিনীর পিছে পিছে যেনরে দিলীপ—
অঙ্গহতে বাহিরায় দীপকের তাপ—
কবিত্বের যোগিত্বের সরস জিলীপ—
দোহাই সুনীতিবাবু করিবেন মাপ—
পুংলিঙ্গে প্রয়োগ ওটা ব্যাকরণ-স্লিপ্—
তার ছিঁড়ে গিয়ে তাঁর হ'ল ট্র্যাম লেট—
সাগর ডিঙাতে হনু মাথা করে হেঁট।

[ক্রমশঃ]

ঠিকানা পরিবর্ত্তন

শনিবারের চিঠির অফিস ৩২।৫।১, বীডন ষ্ট্রীট হইতে

২সি, রাজেন্দ্র লালা ষ্ট্রীটে

স্থানান্তরিত হইয়াছে

অ-মূল্য গবেষণা

স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় না কি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, এ দেশের মাটির এমনই গুণ যে এখানে কলাগাছের চাষ করিলে কলা না ফলিয়া কচু ফলিয়া থাকে; ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মোপাসনাও এখানে নিরাকার দুর্গা-পূজায় পরিণত হয়! নিতান্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় শ্রদ্ধেয় অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে দেখিয়া ও তাঁহার অমূল্য গবেষণাগুলির সম্বন্ধে কিছু জানিয়া-শুনিয়া মরিতে পারেন নাই; তাহা হইলে, অন্ততঃ মৃত্যুকালেও তিনি এ দেশের মাটি সম্বন্ধে, নিজের মত পরিবর্ত্তন করিয়া বলিয়া যাইতে পারিতেন যে, অদ্ভুত বিচিত্র এই দেশ! এখানে কচু-পরিমাণ সম্ভাবনা লইয়াও লোকে কদলী-পরিমাণ ফল ফলাইয়া ছাড়িতে পারে এবং নিরাকার বিশ্বকোষও আকার পাইয়া "প্রবাসী"র প্রবন্ধশোভা বর্দ্ধন করিতে পারে! বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের 'বড়' বিদ্যার গুণে 'বিশ্বকোষ' হইতে সংগৃহীত রূপান্তরিত প্রবন্ধও যে রূপা ফলাইতে পারে—শুনিয়াছি বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের দক্ষিণা সাধারণ লেখকদের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক—সে কথা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট আমরা নিশ্চয়ই চাপিয়া যাইতাম—কারণ বদরসিক বিদ্যাসাগর মহাশয় এইরূপ আচরণকে নিজেদের তদানীন্তন (স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রণীত প্রথম ভাগ দ্রষ্টব্য) মরাল কোড্ অনুসারে জুয়াচুরী পর্য্যায়ে ফেলিয়া চটি ছুঁড়িয়া মারিতেও পারিতেন। তাঁহার এইরূপ ভ্রমান্ধতার নজিরও আছে। "নীলদর্পণ" নাটকে রোগ সাহেবের অত্যাচারের দৃশ্য দেখিয়া তিনি নাটক ভুলিয়া সত্য সত্যই ঐরূপ কোনও ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতেছেন ভাবিয়া

একবার নিজের একপাটি চটি ছুঁড়িয়া মারিয়াছিলেন ; সেই চটির পাটিটি এখনও তেলিপাড়ার কাছাকাছি কোনও অধুনামৃত বিখ্যাত নটের গৃহে রক্ষিত আছে। অমূল্যবাবু তেলিপাড়াতে থাকেন এবং যাবতীয় প্রাচীন ব্যাপার সম্পর্কে তাঁহার গবেষণা যখন সমাপ্ত-প্রায় হইয়াছে তখন এ খবরের সত্যাসত্য তিনিই নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন।

প্রায় দশ বৎসরের কথা, আমি সবেমাত্র পাড়াগাঁ হইতে আসিয়া কলিকাতার সাহিত্যসমাজের ভিড়ে কোনও গতিকে মাথা গলাইয়া ভিতরে কি ব্যাপার ঘটিতেছে ডিঙি মারিয়া দেখিবার চেষ্টা করিতেছি এবং কলিকাতা ফুটবল গ্রাউণ্ডে ক্যালকাটা-মোহনবাগানের খেলার দিনে বিনি পয়সার দর্শকের মত বার-বার গোরার চাবুক ও ঘোড়ার চাটে লাঞ্ছিত হইয়া এক-আধবার মাথা গলাইতে সক্ষম হইয়া আত্ম-প্রসাদও যে না পাইতেছি তাহা নয়, এমন সময়ে গোপাল-দার সঙ্গে দেখা। তিনি পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন,—সাহিত্যিক হইতে চাস্ ? কুছ পরোয়া নাই ! গল্প-উপন্যাস কবিতার দিন গিয়াছে ; ওসব দিয়া এখন আর নাম করিতে পারিবি!না। গবেষণা করিতে হইবে। পারিবি ?

ঘাবড়াইয়া গেলাম। এক আধটু কবিতা এবং গল্প লিখিতে পারিতাম। একটা উপন্যাসও ফাঁদিয়াছিলাম কিন্তু জলধর সেনের একটা উপন্যাসের প্লটের সহিত প্লট মিলিয়া যাওয়াতে আর শেষ করি নাই। গবেষণা তো করি নাই ! এবং কি করিয়া গবেষণা করিতে হয় তাহাও জানিতাম না। বিনীতভাবে গোপালদাকে বলিলাম,—গবেষণা যে কিছুই জানি না গোপাল-দা !

গোপাল-দা টেবিলের উপর একটা জ্যাক ডেম্পসী-মার্কা কিল মারিয়া হুঙ্কার দিয়া কহিলেন,—রাস্কেল, তুই না পাড়াগাঁয়ের ছেলে ? গবেষণা জানিস্ না ?

দ্বিগুণ থতমত খাইয়া গেলাম, পাড়াগাঁয়ের ছেলে ত কি! ফ্যালফ্যাল করিয়া গোপালদার মুখের দিকে চাহিয়া আছি—গোপাল-দা চীৎকার করিয়া বলিলেন, কখনও গরু হারায়নি তোদের?

—হারায়নি আবার! সেবার সেই বুধিটা, দুবেলায় সাড়ে ছ-সের দুধ দিত—বাগালটা সোনাডাঙার মাঠে নিয়ে গেল চরাতে, সন্ধ্যে হ'ল, সবাই ফিরল, বুধি আর ফেরে না। মা তো কেঁদেই খুন। বল্‌লেন, রাত্রে আজ নিশ্চয়ই বুধিকে বাঘে খাবে।

—তারপর?

—লণ্ঠন আর মশাল হাতে আমরা সকলে তো বের হলাম বুধির খোঁজে। খুঁজতে খুঁজতে নামোপাড়ার তাম্‌লিদের খামারে—

—হ্যাঁ হ্যাঁ—বুধিকে পেলি?

—পেলাম বই কি। না পেলে কি আর রক্ষে থাক্‌ত! বাগালটাকে ছাড়িয়ে দিলাম।

—ওরে ইডিয়ট্, তবু বল্‌ছিস্ তুই গবেষণা জানিস্ না? এই তো গবেষণা; বিদ্যারূপ লণ্ঠন ও বুদ্ধিরূপ মশাল নিয়ে মাঠে মাঠে গরু-রূপ বস্তু খোঁজাই ত গবেষণা! কেউ পায়, কেউ পায় না। তোরা বুধিকে না পেতেও পারতিস্! অমূল্য বিদ্যাভূষণের নাম শুনেছিস্?

তখন শুনি নাই। বলিলাম,—না।

গোপালদার চোখেমুখে বিস্ময়, বলিলেন,—সে কি রে? অত বড় পণ্ডিত, গবেষণার রাজা! একবার পল্‌কা নাচের সম্বন্ধে গবেষণা করতে করতে কি একটা খট্‌কা লাগে। গেলাম বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বাড়ী। তিনি তেল মেখে চান করতে চলেছেন। বললেন, কি চাই? বললাম—পল্‌কা। তিনি তিনবার মাথা চুল্‌কে, দু-বার কর্ণরন্ধ্রে আঙুল ঢুকিয়ে একটা অদ্ভুত ধরণের হাসি হাসলেন। চাকর রামধনকে

ডেকে বললেন,—'ঙর' ঘর, তেত্রিশ নম্বরের র‍্যাক, তেরোর তাক—বাঁদিক থেকে ছয়। রামধন মিনিট পাঁচ-সাত পরেই প্রায় পল্‌কা নাচতে নাচতে একখানা প্রকাণ্ড ফাইল বই এনে হাজির করলে, বিদ্যাভূষণ মশায় বললেন, তেল হাত, আমি আর ছোঁব না। তুমি ৩৮২ পাতা দেখ। অদ্ভুত! ঠিক ৩৮২ পাতায় 'পলকা'—১৮৪২ সালের বিলিতি একটা কাগজের কাটিং! তিনবার সেলাম ঠুকে ভক্তিগদ্গদচিত্তে ফিরব ভাবছি, বিদ্যাভূষণ মশায় বললেন—বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে আমার গবেষণা শেষ হয়েছে, ১৮ ভ্যলুম লেখাও হয়ে গেছে, এইবার বের করব। এবং তারপর আরও যা বললেন, তাতে দুর্গাদাস লাহিড়ী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার, যদুনাথ সরকার, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি ঐতিহাসিকের দুর্ভাগ্য কল্পনা করতে করতে বাড়ী ফিরে সেদিন থেকে আজ পর্য্যন্ত প্রত্যেক মাসেই ভারতবর্ষের সাহিত্য-সংবাদটা খুলে একবার দেখি। বাংলার ইতিহাসের নাম দেখতে না পেয়ে ভাবি, এদ্দিনে আঠারো ভ্যলুম বোধ হয় আটষট্টি ভ্যলুমে এসে ঠেকেছে—তবু কিছু বাকী আছে! হ্যাঁ গবেষক বটে! তাঁর কাছে যেতে হবে, এখন সাহিত্যিক হ'তে হ'লে তিনিই একমাত্র গতি।

সাহিত্যিক হইবার লোভ কম ছিল না, গোপালদার কথা শুনিয়া লোভে লোভে একদা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। গোপাল-দা উল্লিখিত সেই বাংলার ইতিহাসের কথা খোদ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট শুনিয়া পুলকিত হইলাম। আমাকে বহুবিধ আশ্বাস দিয়া বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন, চাবির রিং সম্বন্ধে একটা গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখ, কোন্ দেশে প্রথম আঁচলে চাবিবাঁধা-প্রথার প্রচলন, কোথায় কি ধরণের রিং ব্যবহার হয় ইত্যাদি বহুবিধ পয়েণ্টস্ বলিয়া দিলেন। সেই হইতে আমার সাহিত্য-সাধনার সূত্রপাত। এবং বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখক

যে সেই নয় বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত সুপ্রসিদ্ধ 'চাবির রিং' প্রবন্ধের গবেষক তাহাও পাঠকেরা বুঝিতে পারিতেছেন।

গবেষণা-রাজ্যে আমিও আজ কেউ-কেটা নহি। আমার নাম কোন কোন ক্ষেত্রে বিদ্যাভূষণ মহাশয়কেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। গোপাল-দা দেখিয়া খুশী হইয়াছেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় এখন আমার প্রতিদ্বন্দ্বী। আমার গবেষণা যে সম্প্রতি তাঁহার গবেষণাকেও অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে, তাহা দেখাইবার জন্যই অদ্যকার এই প্রবন্ধের অবতারণা। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের গবেষণায় ইহা গুরু-মারা বিদ্যা বলিয়া আখ্যাত হইবে তাহা জানি, তবু গবেষণা-রাজ্যে আমি যে প্রায় দিগ্বিজয় করিয়া ফেলিয়াছি তাহা দেখাইবার লোভ সম্বরণ করা আমার পক্ষে দুরূহ। গুরুদেব, ক্ষমা করিবেন।

গাঁয়ে থাকিতে বুধি গাইকে খুঁজিবার জন্য একদা অন্ধকার রাত্রে কর্দ্দমাক্ত মেঠো পথে মশাল-হাতে যে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলাম সকল গবেষকই যদি সেই প্রকার লাঞ্ছনা সহিয়া গবেষণা করিতেন তাহা হইলে গবেষকের গবেষণা লইয়া এরূপ প্রহসনের সৃষ্টি হইত না। কিন্তু এই যুগটাই কি না ওঝা ও ঝাড়ফুঁকের যুগ। সকলেই চায় জলপড়া-চালপড়ার সাহায্যে গরু খুঁজিতে—ফাঁকি দিয়া গবেষক হইতে। গবেষণা-সম্রাট বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও যে সে সহজ রাস্তা ত্যাগ করিতে পারেন নাই, পরের গবেষণা বেমালুম আত্মসাৎ করিয়াই যে আজ তিনি গবেষণা-সম্রাট, আমার গবেষণার দ্বারা যদি তাহা আজ প্রমাণ করিয়া দিতে পারি তাহা হইলে আমার পরবর্ত্তী গবেষকগণ ভবিষ্যতে গবেষণা-কার্য্যে অনেক বেশী উৎসাহিত হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি?

আমি বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সকল গবেষণার প্রতিই কটাক্ষপাত

করিতেছি সেই চিরপ্রচলিত ভাত সিদ্ধ হওয়ার গল্পের নজিরে। যে পাকা রাঁধুনী, সে একটি ভাত টিপিয়াই বলিয়া দিতে পারে হাঁড়ির সকল ভাত সিদ্ধ হইয়াছে কি না। আমিও গবেষণা করিতে করিতে হাত পাকাইয়াছি—একটি চোরাই মাল দেখিয়া অনেক কিছুই সন্দেহ করিবার দাবী আমার আছে।

ভূমিকা থাক্, এবার গবেষণা। ১৩৩৮, অগ্রহায়ণের 'প্রবাসী'তে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের 'যাত্রা' নামক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। মিথ্যা বলিব না, মাঘ সংখ্যা শনিবারের চিঠির সংবাদ-সাহিত্যের একটি মন্তব্য দেখিয়াই উক্ত প্রবন্ধটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ঐ প্রবন্ধে কোনওরূপ স্বীকারোক্তি না করিয়া গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাচীন কবিসংগ্রহ' হইতে কিয়দংশ বিদ্যাভূষণ মহাশয় উদ্ধৃত করিয়াছেন—ভাবিলাম, সম্ভবতঃ অনবধানতাবশতঃ এইরূপ ঘটিয়াছে। গবেষণাকর্ম্মে আমি মধ্যলীলা শেষ করিয়াছি, সুতরাং প্রবন্ধটি লইয়া পড়িতে বসিলাম। পড়িতে পড়িতে মগজে হাঁফ ধরিল—মগজের দম বন্ধ হইবার উপক্রম! ভাবিলাম স্বপ্ন দেখিতেছি, গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাচীন কবি-সংগ্রহ' হইতে চুরির জন্য নহে, যে দুই একটি তারিখের ভুল পৌষ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দেখাইয়াছেন, তাহার জন্যও নহে,—সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে আমার মগজে কেমন যেন গোলযোগ সুরু হইল। ভাবিলাম, 'যাত্রা' পড়িতে পড়িতে এ যাত্রা বাঁচিলে হয়! গবেষণা-কার্য্যের জন্য বহুবার 'বিশ্বকোষ' ঘাঁটিতে হইয়াছে—মনে হইল, তবে কি বিশ্বকোষকার শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব মহাশয় বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন! কিন্তু তাহাই বা কি করিয়া হয়? বিশ্বকোষ বাহির হইয়াছে কবে, আর প্রবাসী অগ্রহায়ণ ১৩৩৮-এর। তবে?

তবে আবার কি ? মাথা সাফ হইয়া গেল, গবেষণার তড়িতালোক চিন্তাকাশে চমক হানিতে লাগিল। অকস্মাৎ বোধ হইল, বিশ্বকোষ, প্রবাসী ও বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই তিনে মিলিয়া কেমন একটা মিকশ্চার তৈয়ারী হইয়াছে। সুকৌশলে বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে তফাতে রাখিয়া, বিশ্বকোষ ও প্রবাসী, দুই কাঠগড়ায় দুই জনকে দাঁড় করাইয়া চোখ বুজিয়া কলম হাতে লইয়া বসিলাম। হাকিমী কণ্ঠে কহিলাম, তোমাদের যাহা বলিবার আছে বলিয়া যাও—

ব্যস, আর বলিতে হইল না; উভয়েই তারস্বরে চীৎকার সুরু করিল; বিশ্বকোষ যাহা বলে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের কৃপায় প্রবাসী হুবহু সেই কথাই বলিয়া যায়, কমা সেমিকোলন ও ক্রিয়াপদের সামান্য একটু যা পার্থক্য; বহুস্থলে উভয়ে একই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিল। তাহাদের সেই কৌতুকাবহ কথোপকথন নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল। সহৃদয় পাঠক-সাধারণ ইহা হইতেই বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের গবেষণার বহর দেখিয়া চমৎকৃত ও পুলকিত হইবেন সন্দেহ নাই। ব্র্যাকেটের মধ্যস্থিত পদাঘাতগুলি আমার।

বিশ্বকোষ, পৃ. ৭১০ :—"মদন মাষ্টার…সখের যাত্রার দল সংগঠন করেন।…সখের দল চালাইবার ব্যয় সঙ্কুলানে অসমর্থ হইয়া তিনি এ দল পেসাদারী করিতে বাধ্য হন।…মদনবাবু সর্ব্বপ্রথমে যাত্রার দলে জুড়ীর গাওনা প্রবর্ত্তন করেন। জুড়ির গানের সুর কবিভাঙ্গাই ও কোমলকণ্ঠ বালকদিগের গান কীর্ত্তনাঙ্গ ছিল। তিনি প্রথমে 'দক্ষযজ্ঞ' ও পরে 'মদনভস্ম' 'ধ্রুবচরিত্র' প্রভৃতি পালা গান করেন।…বিখ্যাত বাজনদার মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী তাঁহার দলে ঢোল বাজাইতেন। পরে মহেশবাবু একটি স্বতন্ত্র দল করিয়া… ।"

'প্রবাসী', অগ্রহায়ণ, পৃ. ২৬৪ :—"মদন মাষ্টারের সখের দল ছিল, পরে

পেশাদারী হয়। যাত্রার পালা ছিল—দক্ষযজ্ঞ, মদনভস্ম, ধ্রুবচরিত্র। বালকদের গান ছিল কীর্ত্তনাঙ্গ। মদন মাষ্টার যাত্রার দলে জুড়ীর গানের প্রবর্ত্তক। জুড়ীর সুর ছিল কবিগান-ভাঙ্গা।…বিখ্যাত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী তাঁহার দলে ঢোল বাজাইতেন। পরে নিজে দল করেন।"

বিশ্বকোষ, পৃ. ৭১১ :—"মদন মাষ্টারের পর, তৎপুত্র নবীন ঐ দল চালাইয়া আসেন।…নবীনের মৃত্যুর পর, তৎপত্নী, স্বীয় ব্যয়ে ঐ দল চালাইতে থাকেন। তদবধি উহা 'বউ-মাষ্টারের দল' নামে সর্ব্বত্র পরিচিত হয়।…কালী ও কৃষ্ণ নামক দুই ভ্রাতা বিশেষ দক্ষতার সহিত ঐ দল পরিচালিত করিয়াছিলেন।…বউ-মাষ্টারের অনুকরণে নবদ্বীপের বিখ্যাত যাত্রার দলের অধিকারী নীলমণি কুণ্ডের পত্নীও যাত্রার দল চালাইয়া আসিয়াছেন। এখনও ঐ দল 'বউ-কুণ্ডে'র যাত্রা নামে কলিকাতায় থাকিয়া গাওনা চালাইতেছে।"

'প্রবাসী', অগ্রহায়ণ, পৃ. ২৬৪ :—"মদনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নবীন দল পরিচালনা করেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার স্ত্রী নিজেই দল চালান—দলের নাম হয় বৌ-মাষ্টারের দল। কালী ও কৃষ্ণ নামে দুই ভাই ঐ দল পরিচালন করিত। বৌ-মাষ্টারের অনুকরণে নবদ্বীপের যাত্রার দলের অধিকারী নীলমণি কুণ্ডের স্ত্রী যাত্রার দল চালান। নাম হয় বৌ-কুণ্ডুর দল। যাত্রা হইত কলিকাতায়।"

বিশ্বকোষ, পৃ. ৭০৭ :—"গোপাল উড়ের মৃত্যুর পর ভোলানাথ দাস ওরফে ভুলো ও উমেশ মিত্র ঐ পালা লইয়া দুইটী স্বতন্ত্র দল করে। পরে উমেশের দল ভাঙ্গিয়া যায়।"

'প্রবাসী', পৃ. ২৬২ :—"গোপালের মৃত্যুর পর উমেশ ও ভুলো দুইজনে

বিদ্যাসুন্দর যাত্রার দুইটী দল পরিচালনা করে। উমেশের দল উঠিয়া যায়।"

বিশ্বকোষ, পৃ. ৭০৭ :—"গোপাল উড়ের সমসময়ে···কলিকাতার বিখ্যাত ধনী গুরুচরণ সেনের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীনাথ সেন একটি সখের বিদ্যা-সুন্দরের দল গঠন করেন। ঐ দলে বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ মোহনচাঁদ বসু ও গঙ্গানারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন।···ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় গান বাঁধিতেন।

এই সময়ে ধনেখালির নিকটবর্ত্তী বোসোগ্রামে একটী সখের দল হয়।···জনৈক নিরক্ষর বাগ্‌দী ঐ [বিদ্যাসুন্দর] সাটের গান বাঁধিয়া দেয়।···

[পৃ. ৭০৪] কলিকাতা এবং তাহার উত্তর ও দক্ষিণ উপকণ্ঠদ্বয়ে বিদ্যাসুন্দর গাওনার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে বরাহনগরের ৺রামজয় মুখোপাধ্যায়ের পুত্র ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় সখের বিদ্যাসুন্দরের দল প্রতিষ্ঠা করেন।···প্রাণকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার, নিমাই মিত্র, রাধামোহন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বিখ্যাত অভিনেতৃগণ ঐ দলের পরিচালক ছিলেন।···রামধন মিস্ত্রী ঐ দলে ঢোল বাজাইতেন। তাহার মত ঢুলি তৎকালে ছিল না বলিলেও চলে।···ঐ সময়ে ঐ দলের একটী অভিনয় জনাইগ্রামেও হইয়াছিল।···ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের গঠিত দলের প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে দক্ষিণ বরাহনগরে তৎকালে আর একটী দল গঠিত হয়।··· [পৃ. ৭০৮] গোপালের প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে···ঠাকুরো যুগী ও শিবে যুগী দণ্ডায়মান হয়।··· ঠাকুরো যুগীর দল উঠিয়া গেলে পর, কৈলাসচন্দ্র বারুই সেই সকল লোক লইয়া···একটী দল সংগঠন করিয়াছিলেন।···চুটকি রাগিণী মিলাইয়া স্বভাব বর্ণনা করায়

কৈলাসের বেশ হাতযশ ছিল।...কৈলাসের প্রতিষ্ঠিত দলের গাওনার সহিত...গোপালের যাত্রার দলেরও 'টক্কোর' (প্রতিদ্বন্দ্বিতা) চলিয়াছিল। [১০৫] ভবানীপুরের বেলতলায় শিবঠাকুরের বিদ্যাসুন্দরযাত্রার উল্লেখ পাওয়া যায়।...ইহার পর বেলতলায় প্যারীমোহনের দল বিশেষ দক্ষতার সহিত বিদ্যাসুন্দর পালা গান করে।"

'প্রবাসী', পৃ. ২৬২, পাদটীকায় :—

"গোপাল উড়ের সময়ে গুরুচরণ সেন কলিকাতার একজন বড় ধনী ছিলেন। তাঁহার ভাইপো শ্রীনাথ বিদ্যাসুন্দর যাত্রার একটী সখের দল গঠন করেন। ঐ দলে মোহনচাঁদ বসু ও গঙ্গানারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত গান বাঁধিতেন।... এই সময় ধনেখালির নিকটে বোসো গ্রামে এক সখের দল হয়। এক বাগ্দী বিদ্যাসুন্দর সাটের গান বাঁধিয়া দিত।...কলিকাতা ও তাহার উত্তর-দক্ষিণে বিদ্যাসুন্দর যাত্রা চলিতেছিল। ১৮২২ সালে বরাহনগরের রামজয় মুখোপাধ্যায়ের পুত্র ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় বিদ্যাসুন্দরের এক দল প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রাণকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার, নিমাই মিত্র, রামমোহন চট্টোপাধ্যায়—ইহারা সাজিতেন, দলও চালাইতেন। রামধন মিস্ত্রি ঢোল বাজাইত। অমন ঢুলী আর ছিল না। ঐ সময় জনাই-এও যাত্রা হয়। বরাহনগরে ঠাকুরদাসের দলের প্রতিদ্বন্দ্বী দল হয়। এই দলে ঠাকুরো যুগী, শিবে যুগী দাঁড়াইয়া খুব প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তারপর ইহাদের দল উঠিয়া গেলে কৈলাস বারুই সেই সব লোক লইয়া যাত্রার দল গড়ে। কৈলাস ছিল চুটকী রাগিণীর ওস্তাদ। কৈলাস ও গোপাল উড়েতে পাল্লাপাল্লি চলিত। ভবানীপুরে বেলতলায়

শিবঠাকুরের বিদ্যাসুন্দরের যাত্রা হয়। পরে বেলতলায় প্যারী-মোহনের যাত্রার দল ছিল।”

[অহহো, গবেষণা বটে ! সমস্তটাই মূল প্রবন্ধে বসাইয়া দিলে নিজের কেরামতি দেখানো হয় কি করিয়া ! পাদটীকায় দিয়া বুঝান হইতেছে যেন অমূল্য বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার অমূল্য স্মৃতিসমুদ্র মন্থন করিয়া এই সংবাদগুলি আহরণ করিয়াছেন—আসলে প্যাঁচ অতি সহজ, সেই চিরন্তন পুকুর-চুরির প্যাঁচ ! তবু 'রাধামোহন' 'রামমোহন' হইয়া পড়িয়াছে !]

বিশ্বকোষ, পৃ. ৭০৮-০৯ :—“নীলকমল সিংহ···'প্রহ্লাদচরিত্র' পালা অভিনয় করেন।···এই দল ভাঙ্গিয়া নারায়ণ দাসের দল গঠিত হয়।”

'প্রবাসী', পৃ. ২৬৪ :—“নীলকমল সিংহের···পালা ছিল প্রহ্লাদচরিত্র। এই দল ভাঙ্গিয়া নারায়ণ দাসের দল হয়।”

বিশ্বকোষ, পৃ. ৭১৫ :—“কএকটী যাত্রাওয়ালার···নাম ও পালা ভিন্ন অন্য পরিচয় অনাবশ্যক বোধে এখানে উদ্ধৃত হইল না।

৮ ঈশ্বর চক্রবর্ত্তী—খানাকুল কৃষ্ণনগর।

১২ কৃত্তিবাস মণ্ডল—হুগলী, গোপীনাথপুর। গয়াসুরের হরিপাদ-পদ্মলাভ।

৪ দুর্ল্লভ দাস—শাহনগরে বাস, কৃষ্ণযাত্রা।

১০ মাধব দাস—সিঙ্গুড়ের নিকটবর্ত্তী পলাশপোই গ্রামে বাস। কৃষ্ণযাত্রা।

১৫ রাইচরণ বেরা—মহাকালপুর। কৃষ্ণযাত্রা।

৩ বলাই ঠাকুর—'কালিয়দমন' যাত্রা।

২ গোবিন্দ পাঠক— ···ইনি হরিশ্চন্দ্র, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস, কীচক বধ, শিখিধ্বজ, দানপরীক্ষা ও নরমেধযজ্ঞ অভিনয় করেন।

১৮ পীতাম্বর পাইন্—কংসবধ, হরিশ্চন্দ্র।

১৯ বক্কেশ্বর পাইন্—নরমেধ যজ্ঞ।

১৪ নবীন ডাক্তার— ...সীতার পাতালপ্রবেশ... ।

১৬ শ্যামাচরণ গাঙ্গুলী—লক্ষ্মণের শক্তিশেল।

'প্রবাসী', পৃ. ২৬৫ :—"খানাকুল কৃষ্ণনগরের প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

হুগলী—গোপীনাথপুরের কৃত্তিবাস মণ্ডলের গয়াসুরের হরিপাদ-পদ্মলাভ পালা মন্দ ছিল না।

কৃষ্ণযাত্রায় নাম কিনিয়াছিলেন—দুর্লভদাস (শাহনগর), মাধব-দাস (সিন্দুর—পলাশপাই) ও রাইচরণ বেরা (মহাকালপুর)।

বলাই ঠাকুরের কালিয়দমন,—গোবিন্দ পাঠকের হরিশ্চন্দ্র, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস,কীচকবধ, দানপরীক্ষা ও নরমেধযজ্ঞ,—পীতাম্বর পাইনের কংসবধ, হরিশ্চন্দ্র,—বক্কেশ্বর পাইনের নরমেধযজ্ঞ,—নবীন ডাক্তারের সীতার পাতাল প্রবেশ, এবং শ্যামাচরণ গাঙ্গুলীর লক্ষ্মণের শক্তিশেল—এগুলি বেশী পুরাতন না হইলেও মন্দ ছিল না।"

[এখানে গবেষক বিদ্যাভূষণ মহাশয় সাঁটে সারিয়াছেন !]

বিশ্বকোষ, পৃ. ৬৯৭ :—"ভবভূতি লিখিয়া গিয়াছেন, কালপ্রিয়নাথের যাত্রায় (উৎসবে) উত্তররামচরিত, মালতীমাধব প্রভৃতি অভিনীত হইয়াছিল।"

'প্রবাসী', পৃ. ২৫৯ :—"ভবভূতির মালতী-মাধবে 'ভগবান্ কালপ্রিয়-নাথের যাত্রা'ভিনয়ের কথা আছে।"

[পাণ্ডিত্য বটে ! ভবভূতির উত্তররামচরিতের ১ম অঙ্ক ২য় শ্লোকে আছে (বঙ্গার্থ)—অদ্য ভগবান্ কালপ্রিয়নাথের যাত্রায় কিনা উৎসব

দিনে···ভবভূতি নামক একজন পূজনীয় কবি···তৎপ্রণীত উত্তররাম-চরিত নামক নাটক আমরা অভিনয় করিব।" আর যায় কোথা! পণ্ডিতপ্রবর 'যাত্রা' শব্দটি পাইয়াই একেবারে তুড়ি লাফ মারিলেন; লিখিলেন—···'যাত্রাভিনয়ের কথা আছে।' বিদ্যাভূষণ মহাশয় যে 'যাত্রা' দেখিয়া মহাভারতের 'ঘোষযাত্রা' করিয়া বসেন নাই, ইহাই আমাদের সৌভাগ্য বলিতে হইবে! আর প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয়—নামের মোহ তাঁহার কবে ঘুচিবে?]

বিশ্বকোষ, পৃ. ৭০২ :—"শ্রীদাম সুবল অধিকারীর···সমসাময়িক লোচন অধিকারী 'অক্রুর সংবাদ' ও 'নিমাই-সন্ন্যাস' গাইয়া শ্রোতৃবর্গকে বিমোহিত করেন।···কলিকাতার বিখ্যাত বনমালী সরকার ও মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুরের বাড়ীতে গাইয়া অনেক টাকা পারিতোষিক লাভ করিয়াছিলেন।"

'প্রবাসী', পৃ. ২৬৩ :—"শ্রীদাম সুবল অধিকারী।···ইহার সমসাময়িক লোচন অধিকারী 'অক্রুর-সংবাদ' ও 'নিমাই-সন্ন্যাস' পালায় শ্রোতাদের মুগ্ধ করিতেন।···বনমালী সরকার ও মহারাজা নবকৃষ্ণের বাড়ী তাঁহার কয়েকবার যাত্রা হইয়াছিল। লোচন অনেক পুরস্কার পাইয়াছিলেন।"

বিশ্বকোষ, পৃ. ৭০২ :—"বদন অধিকারীর···শালিখাগ্রামে বাস ছিল।···গোবিন্দ অধিকারী ইহার দলে এক জন গায়ক ছিলেন। বদন অধিকারীর যাত্রার পালা দান, মান ও মাথুর লইয়া গঠিত।"

'প্রবাসী', পৃ. ৬৬৪ :—"বদনের 'দান' 'মান', 'মাথুরে'র খুব নাম। বদন থাকিতেন শালিখায়।···গোবিন্দ অধিকারী বদনের দলে গান করিতেন।"

বিশ্বকোষ, পৃ. ৭০৩ :—"কাঁটোয়াবাসী পীতাম্বর অধিকারী ও বিক্রম-

পুরনিবাসী কালাচাঁদ পাল শ্রীকৃষ্ণযাত্রার অবনতিকালে স্ব স্ব রচিত পালা গাইয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। পাতাই-হাটের (পাঁইতাহাট) প্রেমচাঁদ অধিকারী মহীরাবণবধ পালা যাত্রা করিয়া তদ্বিষয়ে অদ্বিতীয় বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। থরকাটা প্রেমচাঁদ নামে আর একজন···যাত্রাওয়ালার নাম পাওয়া যায়।”

'প্রবাসী', পৃ. ২৬৪ :—“কাটোয়ানিবাসী পীতাম্বর অধিকারী ও বিক্রম-পুরের কালাচাঁদ পাল কৃষ্ণযাত্রায় সুনাম অর্জ্জন করেন। [পৃ. ২৬৩] পাতাইহাটের প্রেমচাঁদ অধিকারী···'মহীরাবণবধ' পালায়···খুব পটু। থরকাটায়ও একজন প্রেমচাঁদ ছিলেন।”

বিশ্বকোষ, পৃ. ৭০৭ :—“গোপালচন্দ্র উড়ে কলিকাতানিবাসী ৺বীর-নৃসিংহ মল্লিকের ভৃত্য ছিল। এই বীরনৃসিংহ বাবু বহু অর্থব্যয়ে বিদ্যাসুন্দর যাত্রার দল সংগঠন করেন। সিঙ্গুড়নিবাসী ভৈরবচন্দ্র হালদার ঐ পালা ও গান রচনা করিয়াছিলেন। বীরুবাবু একখানি বাড়ী বেচিয়া লক্ষাধিক টাকা পান। ঐ অর্থে যাত্রা চলে। তিন আসর মাত্র গাওনা হইয়াছিল।”

'প্রবাসী', পৃ. ২৮২ :—“কলিকাতায় যোড়াসাঁকোর বীরনৃসিংহ মল্লিক বিদ্যাসুন্দর যাত্রার দল খোলেন। সিঙ্গুরের ভৈরবচন্দ্র হালদারকে দিয়া বিদ্যাসুন্দরের পালা রচনা করিয়া ল'ন।···যাত্রার অভিনয় হইয়াছিল মাত্র তিন রাত্রি। এই যাত্রার আয়োজন-ব্যাপারে মল্লিক মহাশয়ের লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।”

বিশ্বকোষ, পৃ. ৭০৮ :—“গজার ভট্টাচার্য্য-জমিদারদিগের যত্নে একটি সখের দল প্রতিষ্ঠিত হয়।···ইহার পর টাকীর সুপ্রসিদ্ধ জমিদার মুন্সী ৺বৈকুণ্ঠনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের আগ্রহে তথায় একটি সখের দল স্থাপিত হয়।···হাবড়া জেলার অন্তর্গত কোণার জমিদার

দীননাথ চৌধুরীর প্রতিষ্ঠিত একটী সখের দলের খ্যাতি বিস্তৃত হয়।…[পৃ. ৭১৪] উলুবেড়িয়ার নিকটবর্ত্তী ফুলেশ্বরনিবাসী আশুতোষ চক্রবর্ত্তীকে যাত্রার আসরে পালা গাইতে দেখি।… আশুবাবু সখের জন্য…সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন,… ।”

‘প্রবাসী’, পৃ. ২৬৪ :—“গজার ভট্টাচার্য্য জমীদারদের সখের যাত্রার দল ছিল। টাকীর রায় বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরীদের, হাওড়ায় কোণার জমীদার দীননাথ চৌধুরীর, উলুবেড়িয়ার নিকট ফুলেশ্বরের আশুতোষ চক্রবর্ত্তীর সখের দল ছিল। আশুতোষ চক্রবর্ত্তী শেষে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পেশাদারী দল চালান।”

বিশ্বকোষ, পৃ. ৭০৯ :—“দুগো ঘড়েলের (দুর্গাচরণ ঘড়িয়াল)…সমধিক খ্যাতি লাভ করে। ইনি দত্তবংশীয় কায়স্থ সন্তান,… । দুর্গাচরণের দলে বয়োবৃদ্ধ দোয়ারের পরিবর্ত্তে, সুমধুর কণ্ঠ বালক দোয়ারের বিলক্ষণ প্রসার হইয়াছিল।…দুইজন করিয়া চারিদিকে আট জন বালক দাঁড়াইয়া… । ঐ দলস্থ…লোকনাথ দাস ও কালীনাথ হালদার নামক দুইজন বালকের নামই উল্লেখযোগ্য। তাহারাই উত্তরকালে দুইটী স্বতন্ত্র যাত্রার দলের অধিকারী হইয়াছিল।… লোকনাথ দাস ওরফে লোকাধোপা (ইনি চাসাধোপা জাতীয়, কলিকাতা বেণেপুকুরে বাস)…লক্ষপতি হইয়াছেন।”

‘প্রবাসী’, পৃ. ২৬৪ :—“…দত্তবংশীয় কায়স্থ দুগো ঘড়েলের (দুর্গাচরণ ঘড়িয়াল) যাত্রার দল নামজাদা। ইনি বয়োবৃদ্ধ দোয়ারের স্থানে বালক দোয়ার আট জন রাখেন।…বেণেপুকুরের লোকা ধোবা (লোকনাথ দাস—চাষাধোবা) ও কালীনাথ হালদার ইঁহার দলে গায়িতেন।…শেষে তাঁহারা নিজের নিজের দল করেন। লোকা ধোবা যাত্রা করিয়া প্রায় দুই লক্ষ টাকা রাখিয়া যান।”

বিশ্বকোষ, পৃ. ৭০৮ :—"কৈলাসচন্দ্র বারুই…ঋষড়া গ্রামে কৈলাসের বাস ছিল,…। তিনি…গোপাল উড়ের চেলাগিরি করিয়াছিলেন। [পৃ. ৭১৪] মাকড়দহনিবাসী বেণীমাধব পাত্র এক যাত্রার দল গঠন করে।…বোকো [মুসলমান] ও সাধু উভয়েই সহোদর…ইহারা তৎকালে একটি প্রসিদ্ধ যাত্রার দলের অধিকারী ছিল।…বাগবাজার নিবাসী শ্রীঝড়ুদাস অধিকারী…কোণানিবাসী গোপীনাথ দাস একজন অধিকারী ছিলেন।"

'প্রবাসী', পৃ. ২৬৪ :—"গোপাল উড়ের চেলা ঋষড়ার কৈলাস বারুই-এর দল, মাকড়দহের বেণীমাধব পাত্রের পেশাদারী দল, সাধু ও বকো মুসলমানের দল…। বহুবাজারের ঝড়ুদাস অধিকারী, কোণার গোপীনাথ দাস যাত্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।"

[গবেষণানবিশ বিদ্যাভূষণ মহাশয় 'বাগবাজার' টুকিতে গিয়া 'বহুবাজার' টুকিয়া ফেলিয়াছেন ! মৌলিক গবেষণার ঠ্যালায় 'বাগ্'(?) 'বহু' হইবে ইহাতে বিচিত্র কি ?]

বিশ্বকোষ, পৃ. ৭০৯ :—"কেশেমালিনী হইতেই সম্ভবতঃ যাত্রায় খেম্‌টা নাচের প্রচলন হইয়া থাকিবে।"

'প্রবাসী', পৃ. ২৬২, পাদটীকা :—"এই কেশে মালিনী হইতেই খেমটা নাচের উৎপত্তি।"

বিশ্বকোষ, পৃ. ৭১৫ :—'বালক সঙ্গীত' যাত্রার অধিকারী রসিকলাল চক্রবর্ত্তীর…যশোহর জেলার কালীগঞ্জ থানার অধীন রায় গ্রামে… বাস ছিল।"

'প্রবাসী', পৃ. ২৬৩ পাদটীকা :—"রসিকলাল চক্রবর্ত্তী 'বালক সঙ্গীত' যাত্রা খোলেন। এই রসিক অধিকারীর বাড়ী যশোহরে—কালীগঞ্জ থানার এলাকায় রায় গ্রামে।"

আশা করি, যথার্থ মৌলিক গবেষণা কাহাকে বলে পাঠকগণ এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছেন! 'প্রবাসী' পত্রিকায় কুত্রাপি ভ্রমক্রমেও বিশ্বকোষের নামোল্লেখ নাই; থাকিলে মৌলিকতা নষ্ট হইবার আশঙ্কা ছিল। হায় বুধি গাই, তোমার কপালে এতও ছিল!

প্রবাসীতে এই প্রবন্ধ লিখিয়া যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য দক্ষিণা লইয়া বিদ্যাভূষণ মহাশয় নিরেট মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার অপ্রকাশিত বাংলার ইতিহাস দীর্ঘজীবী হউক—আমি 'যাত্রা' বিষয়ে গবেষণা করিতে করিতে গবেষণা ব্যাপারের অন্ত্যলীলায় উপনীত হইয়াছি। ভাবিতেছি, যদি বেশী দিন বাঁচিয়া থাকি তাহা হইলে হয় তো একদা বিদ্যাভূষণ মহাশয়কেও সর্ব্বাংশে অতিক্রম করিয়া অক্ষয়-কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারিব। বিদ্যাভূষণ মহাশয় কৃপাপরবশ হইয়া কোনও গ্রন্থ রচনা করেন নাই বটে, * কিন্তু ইতস্ততবিক্ষিপ্ত মাসিকে সাপ্তাহিকে তাঁহার অমূল্য গবেষণাগুলি এখনও অক্ষতদেহে বিরাজ করিতেছে।

'চাবির রিং' আজ পুরুষের অঞ্চলেও ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিতেছে দেখিয়া পুলকিত হইয়াছি। ভাবিতেছি, পাড়াগাঁ হইতে শহরে না আসিয়া কর্দ্দমাক্ত পিচ্ছিল মেঠো পথে লণ্ঠন অথবা মশাল হস্তে বিপন্ন বুধিগাইয়ের সন্ধান করাই ছিল ভাল; শহরে পেট্রোল ও পীচের গন্ধে উত্যক্ত হইয়া বিশ্বকোষ লেন ও আপার সার্কুলার রোডে ছুটাছুটি করিয়া—

কি লাভ হইল ইথে পদীর পিসীর!

---

* এই গবেষণা সমাপ্ত হইবার পরই শুনিতে পাইলাম, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের জীবন-ব্যাপী গবেষণার ফল বাংলার ইতিহাসের পাণ্ডুলিপিটি অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছে। হায় পাবক!

১১ই মাঘের আশ্বাস

['বাস্তবিকা'র সদস্য কুমারী বিশ্বরতী রাহার ডায়ারী হইতে]

জানিলাম এই দেহ একেবারে মরু না,
ঋতুপতি আজো দেখি করে তারে করুণা।
এই মাঘে দেবতা গো, কর মোরে বর দান,
যে আসে আসুক কাছে আগাইয়া গর্দান!
তাল বুঝে পেণ্ট করি, প্রৌঢ়া কি তরুণা
বুঝিবে না, রবে আঁখি প্রেম-রাগে অরুণা।

সে বছরে বেবি বোস আশা দিল হতাশে
তুলেও তোলেনি মোর বয়সের কথা সে—
বুলার বিয়ের রাতে রায়েদের আঙিনায়,
একটু মচ্‌কে ছিনু তবু আজো ভাঙি নাই;
রূপে রঙে গরবিণী মিস্ মণি-লতা সে,
মোর কাছে মার খেয়ে হ'ল অবনতা সে।

শ্রীচটক চাকী মোরে ভাল ক'রে জানে যে,
বিবাহ-অধিক টানে সে আমারে টানে যে,
মধু কর * বন্দিতে আসে রোজ সহ car,
ষাট মাইলের বেগে মুখ চাহে কহ কার!
লেক রোডে মোর সাথে কথা কানে কানে যে,
হয় তো উধাও হায়, সে আমারি গানে যে।

---

* সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার মধুসূদন করের সহিত ইহার কোনও যোগ নাই।

বেবি বোস, মধু কর ক'রে নিক বনিতা,
'আমি' রূপ গান শেষে যার খুসী ভণিতা!
বোবা বোকা চাটুয্যে ফেরে হেথা সেথা হায়,
প্রোপোজ করে সে যদি না বলিবে কে তাহায়!
ক'রে নিক বধূ মোরে কঙ্কণ-ক্বণিতা,
দেহবীণা কতকাল রবে স্বর-ধ্বনিতা!

চিঠিপত্র

এক

সম্পাদক মহাশয়,

জয়ন্তীসংখ্যা শনিবারের চিঠির দু-এক স্থলে আমার কিছু বক্তব্য আছে। বক্তব্য আপনার কাগজেই পাঠাইলাম। আশা করি, ছাপাইবেন। মনে রাখিবেন, দেশে মাসিকপত্রের অভাব নাই, এবং স্বদেশী বিড়ির কল্যাণে আমারও টাকার অভাব নাই। আমার লেখা অন্য কোন সম্পাদক প্রত্যাখ্যান করিতে সাহস করিবেন না।

১। হুত্তুতো ভাইবোন লইয়া রসিকতা জমাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, দেখিলাম। আপনাদের হয়ত জানা নাই কবি এখানে biology-র একটি তত্ত্ব উদ্ঘাটিত করিয়াছেন মাত্র। Biology একটি Science. Science-এ অশ্লীলতা নাই।

অবশ্য, এখানে কবি মৃগের biology-ই আলোচনা করিয়াছেন। কাঁকড়াবিছাও হুত্তুতো ভাইকে কামনা করে,—কেবল গর্ভাধানের জন্য নয়, তাহাকে গর্ভজাত করিবার জন্যও। অতটা কবির অভিপ্রেত নয়। তিনি নিজেকে জোর মৃগ পর্য্যন্ত নামাইতে প্রস্তুত। ইহাতে আপনাদের গাত্রদাহ হয় কেন? তিনি ছাগলই বা ন'ন কেন? ছাগলও ত মৃগ। একেবারে সংস্কৃত মৃগ।—"জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ"এর-মলে।

নোনা মেয়েমানুষের অর্থ কি salted মেয়েমানুষ? হরি, হরি! নোনাফলের নাম শুনেন নাই কখনও? গন্ধ পাইয়া কাছে আসিতে হয় কি salted meat-এর, না, পাকা ফলের? নারীকে apple বলা চলে, peach বলা চলে, আর স্বদেশী নোনা বলিলেই মহাভারত অশুদ্ধ হইল!

২। অনেক কসরৎ করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, 'আ' আর 'ও' এই দুয়ের মাঝামাঝি স্বরবর্ণ উচ্চারণের মত মুখ করিয়া হাসা অসম্ভব। ভুলিয়া গিয়াছেন, এ গল্পটি লেখা হইয়াছে শীতকালে। সে সময়ে অনেকেরই ঠোঁট ফাটে। ফাটা ঠোঁটের হাসি যদি কখনো লক্ষ্য করেন ত বুঝিবেন বুদ্ধদেববাবুর এ হাসি কত realistic! এবার শীত ফুরাইয়া আসিল। পরের বারে চেষ্টা করিয়া দেখিবেন, আশা করি।

'আ' আর 'ও'এর মাঝামাঝি স্বরবর্ণ জার্ম্মাণ ভাষায় আছে,—এ বিদ্যা বাহির করিবার কি প্রয়োজন ছিল? আপনারা কি মনে করেন, বুদ্ধদেববাবু ঐ অক্ষরের খবর না জানিয়াই অমন হাসির আবিষ্কার করিয়াছেন!

মুচ্‌কি হাসির নমুনা দেখিতে চাহিয়াছেন। কখনও দেখেন নাই না কি? কোন হাস্যপ্রবণ বন্ধুকে যদি একবার বলিতে পারেন, 'ভায়া তোমার মুখে বড় গন্ধ! বোধ হয়, আজ দাঁত মাজ নি', তবে দেখিবেন যে, সে সময়ের মত হাসি বন্ধ হইলেও, পরে যতবার হাসি ফুটিবে সব মুচ্‌কি হাসি।

একটা কথা আমিও বুঝিতে পারিলাম না। মুচ্‌কি হাসি দেখিয়া সাবিত্রী চন্দ আয়নায় মুখ দেখা বন্ধ করিল কেন? শুনিয়াছি, ভাল গাইয়ের গান শুনিবার পর ছোট গাইয়েরা কিছুকাল মুখ খুলিতে পারে না। ওস্তাদী মুচ্‌কি দেখিয়া novice-ই মুচ্‌কির চর্চ্চাও সেই নিয়মে বন্ধ হইতে পারে। কিন্তু আমাদের সাবিত্রী ত সতীশের মেসের মুচ্‌কি-হাসিনী সাবিত্রী ন'ন। ইনি সাবিত্রী চন্দ। এঁর হাসি কুকুরের গিট্‌কারী মনে করাইয়া দেয়। ইনি মুচ্‌কিতে দমিলেন কেন? হায়! স্ত্রীচরিত্রের এইরূপ অসংখ্য 'কেন'র উত্তর কে দিবে?

৩। 'আমি বসে থাকি বোকার মতন, শঙ্কিত।' এই চরণের প্রথম অংশে আমার কোন আক্ষেপ নাই। ঐরূপই হয়ত আপনাদের স্বভাব। যখন যেখানে বসেন ঐ ভাবেই বসেন। অন্য কোন ভাব আনা হয়ত আপনাদের ধাতে নাই।

কিন্তু শঙ্কিত হইলেন কেন? বড় বড় kick থাকিলে হয়ত ভয়ের কারণ ঘটিতে পারিত। কিন্তু বিলাতী kick ত এদেশে সম্ভব নয়। বঙ্গ-অঙ্গনা Hip-এর কাছে ত তত ভঙ্গ না। আপনারাই স্বীকার করিয়াছেন তাঁহাদের সব ভঙ্গিমা Lumbo-Sacral region-এ। তথাপি শঙ্কা! জয়েন্ট খসিয়া পড়িবে মনে হইয়াছিল? বলিহারি যাই! ইতি

বিনীত

শ্রীবংশলোচন গুঁই

দুই

শনিবারের চিঠির সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু,

আপনার অগ্রহায়ণ ও পৌষের শনিবারের চিঠিতে 'শ্রীপদামৃত মাধুরী'র সমালোচনা পাঠ করিয়া আমার আক্কেল গুড়ুম হইয়া গিয়াছে। এত বড় নামজাদা অধ্যাপক অমৃত মন্থন করিতে গিয়া কেবল গরলই তুলিয়াছেন! কিন্তু নীলকণ্ঠ হইবার মত সাহস ও স্পর্দ্ধা তিনি ছাড়া বোধ করি, বাংলার মধ্যে আর কাহারও নাই। যাহা জানি না তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার দুর্নিবার সাহস মানুষের যে কেমন করিয়া হয় তাহা গভীর গবেষণার বিষয় এবং তাহা মনস্তত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা আশা করি ভাল বলিতে পারেন। তিনিও না একজন দার্শনিক? তবে? অনধিকারচর্চ্চা করিয়া একটা বাহাদুরী লইবার স্পৃহা ধৃষ্টতা ছাড়া আর কি মনে হয়? অধ্যাপক ও ব্রজবাসী মহাশয়েরা যেরকম 'মাধুরী' লিখিয়াছেন তাহাতে আমার মত ক্ষুদ্রবুদ্ধির মনে হয়, 'সাধারণ পাঠক' ত দূরের কথা অসাধারণ পাঠকও শিরে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক বসিয়া পড়িবে। শশী কি রাহুগ্রস্ত? 'বহুশ্রম সহকারে' পদাবলীর অর্থ ও টীকা তিনি যদি না করিতেন তাহা হইলে বাঙ্গালার, বাঙ্গালীর ও বাঙ্গলা ভাষার যথেষ্ট মঙ্গল হইত। আমার দেশেও অনেক কীর্ত্তনীয়া নানা স্থান হইতে আসিয়া পদ-কীর্ত্তনাদি করিয়া থাকেন এবং শিশুকাল হ'তে চিরকাল' আমি এই কীর্ত্তনাদি শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু এমন 'সাধারণ পাঠকের' বোধগম্য, সরল (?) 'মাধুরী' ত কখনো শুনি নাই! দুর্ভাগ্য আমাদের আর পদকর্ত্তাদের! এখন জিজ্ঞাস্য, এই 'মাধুরী' কাটিবে কি 'ধারে, না ভারে'? ইতি

বিনীত

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ

শান্তিপুর

তাতে কি?

নাই বা রহিল বৃক্ষ-পাদপ, দ্রুম হয়ে আছে এরণ্ড,
অণ্ড হইতে পক্ষী ফুটিয়া, কাঁচিয়া হতেছে ফের অণ্ড!
আরসোলা হেথা পক্ষী,
পেচক উধাও, রাজাকাটুরায় দক্রবাহন লক্ষ্মী।
বস্তি-পঙ্কে স্বস্তি হারায়ে যারা নাক ঢাকে গন্ধে,
সে পঙ্ক নিয়ে গোপনে তারাই হোলি খেলে মহানন্দে!
সন্ধ্যা ঘেঁষিয়া বে-পাড়ায় যারে দেখিলে উঠিত আঁৎকে,
মোটরে এবং ড্রইং-রুমেতে তারেই দেখিয়া কাৎ কে!
অদ্ভুত অতি অদ্ভুত,
জলে ও গোবরে ছুঁৎ নহে হেথা, বুলি ও ব্লাউজে হয় ছুঁৎ!
গান শিখাইতে গান-দাদা হয় ঘরের মেয়ের প্রাণ-দার,
বাদশাজাদীরা মোটরাভিসারে প্রণয়িনী হয় বান্দার—
কে বুঝিবে এর অর্থ,
পাঁচের শাসন নাহিক সমাজে, শাসন করিছে অর্থ!
সিনেমা সতীর মহিমা কিনে মা, তুই কি চারিটি শুটিং-এ,
ঘরের শিলেরে বাহির করিছে রাস্তার ওঁচা ঘুটিং-এ।
কে বসে তথ্‌ত-তাউসে,
উলটি গণেশ কুলুঙ্গি-লীন, তবু বাহুড়ায় বাহু সে।

———

চলচ্চিত্র

অন্ধকারে

"বজ্র আঁটন ফস——"
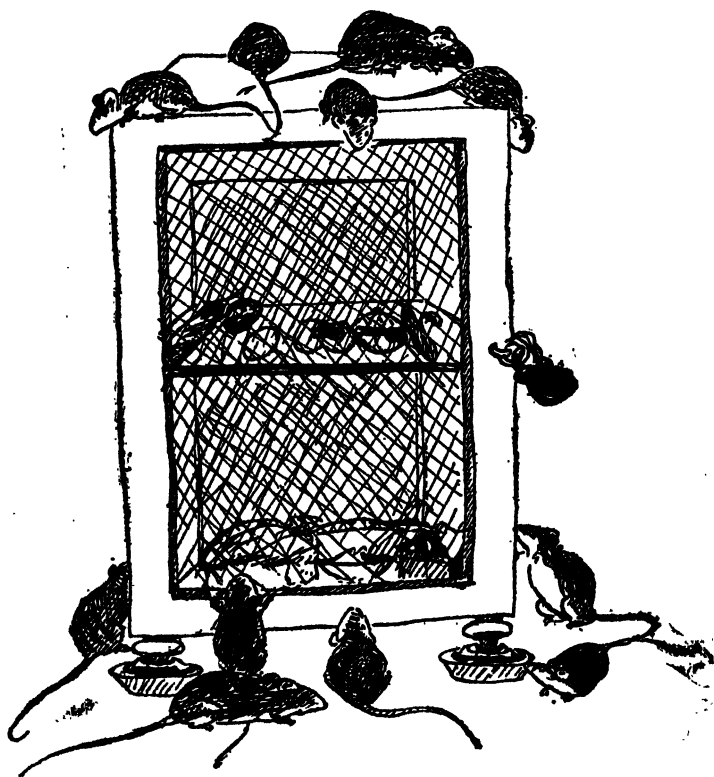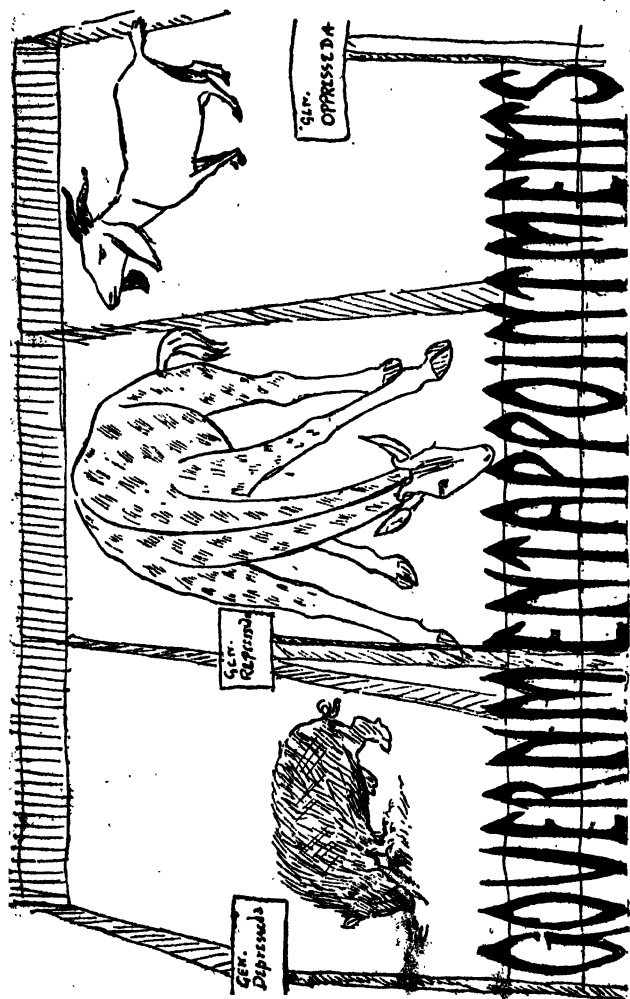
পরিত্রাণায়—

[Where protection is essential]

বিনাশায়—

[Where protection is harmful]

১৯১৪

1932
INTERNATIONAL
SETTLEMENT
১৯৩২
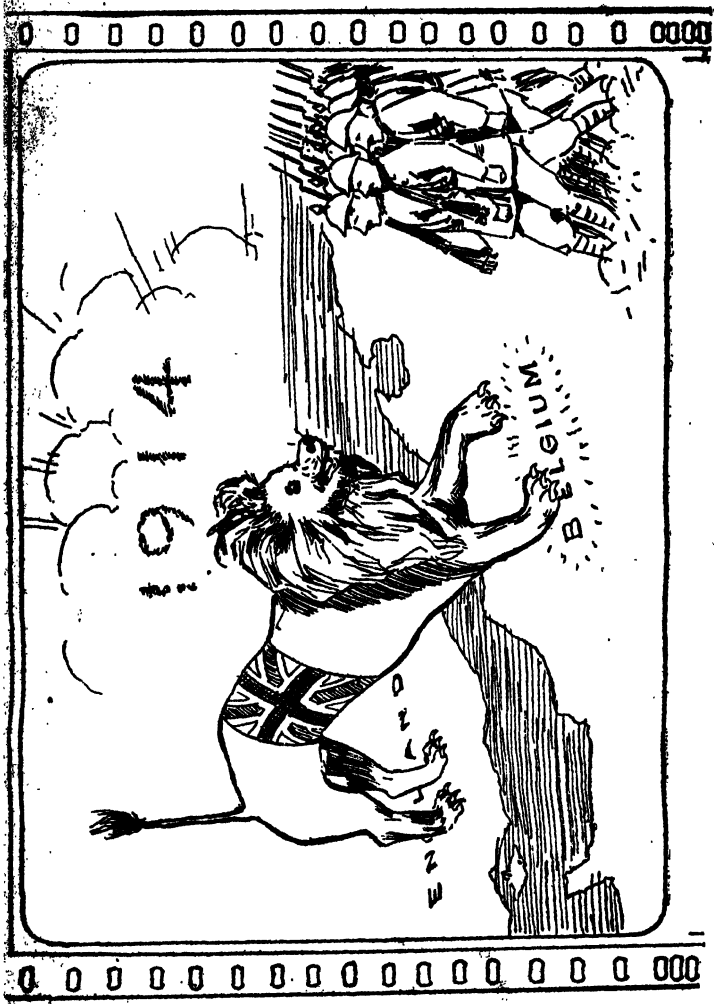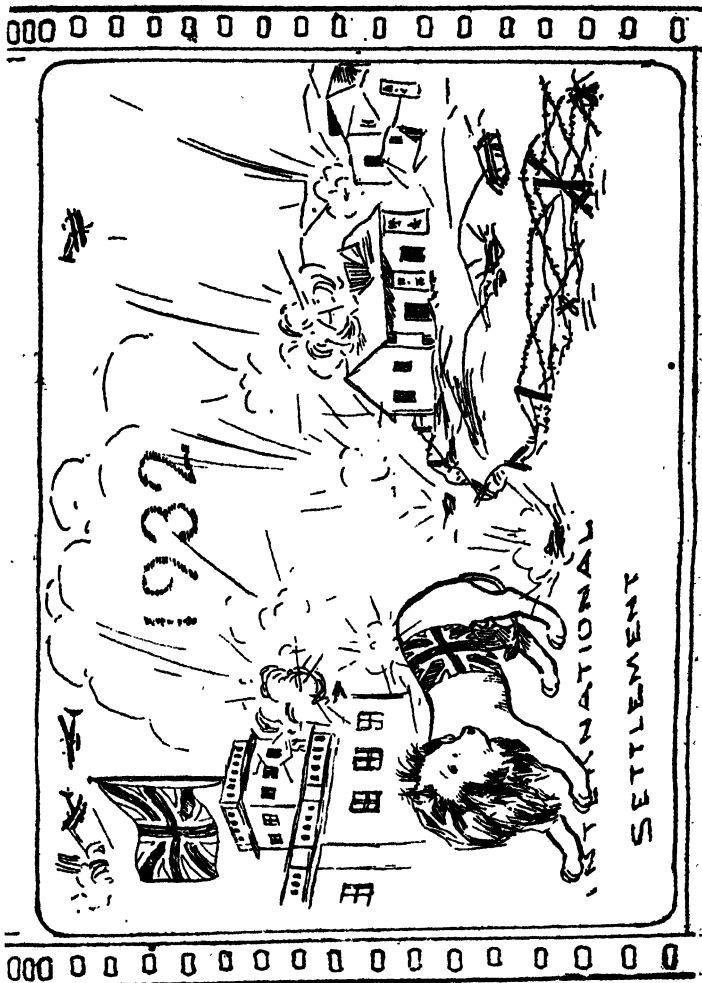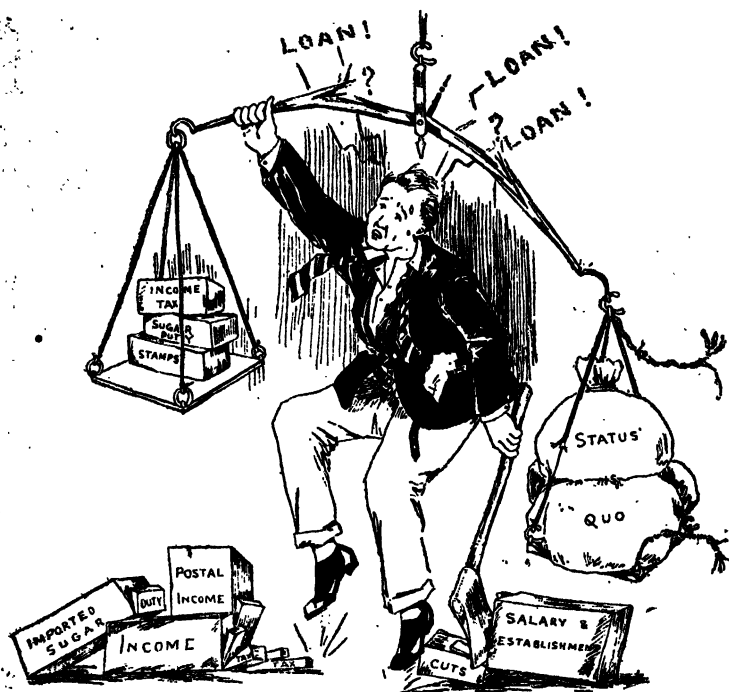
কাঁটা

তুমি যত ভার দিয়েছ সে ভার
করিয়া দিয়াছ সোজা,
আমি যত ভার গড়িয়া তুলেছি
সকলি হয়েছে বোঝা !

ঘুঁটে ও গোবর

ঠ্যাঙাঠেঙি করবে যদি কর একটু তফাৎ গিয়ে,
চাচা কহে, আপন বাঁচা—শ্যামখুড়ো কয়, নে সামলিয়ে।

বাল্‌মীকি

যৌবনে ছিলেন কবি রসলিপ্স, রূপরত্নাকর
সৌন্দর্য্যের দস্যুরাজ ;—আষাঢ়ের মেঘে মেঘে ফিরি
আনিতেন বিদ্যুৎ আহরি ; লঙ্ঘি তুঙ্গ হিমগিরি
সিংহের নখর হতে হরিতেন গজমুক্তাবর।

তরুণ গরুড় সম চন্দ্রপানে বিস্তারিয়া পাখা
ছিনাইয়া আনিতেন সোমসুধা অমর-কাঙ্ক্ষিত ;
কঠিন মন্থনে তাঁর মহাসিন্ধু ক্ষুব্ধ তরঙ্গিত
সঁপিত উর্ব্বশীরত্ন—বিশ্বের প্রেয়সী পলাতকা।

তারপর একদিন কোথা হতে এল রামরূপী
জীর্ণজরা, বসিলেন তত্ত্বের সাধনে কবিবর ;
দেহ তার ছাইল বল্মীকে, ক্ষুদ্র কীট চুপিচুপি
রচিল সর্ব্বাঙ্গে তাঁর আপনার মৃত্তিকা-বিবর।
কোটি কীট পরিপূর্ণ স্তূপ হতে আজি অবিশ্রাম
উঠে আত্মগ্লানিভরা জরামন্ত্র—'মরা' 'মরা' নাম

সংবাদ-সাহিত্য

ফাল্গুনের মাসিক বসুমতীতে একটি অপরূপ প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, বাংলাসাহিত্যের প্রতি যাঁহাদের শ্রদ্ধা আছে তাঁহাদের প্রত্যেকেরই এই প্রবন্ধটি পড়া উচিত। প্রবন্ধটির নাম "সাহিত্যিক মোরগের লড়াই"—লেখক স্বনাম প্রকাশ না করিলেও আত্মগোপন করিতে পারেন নাই। এইরূপ সুচিন্তিত এবং ভদ্র প্রতিবাদ-প্রবন্ধ আমরা বহুকাল পাঠ করি নাই। প্রবল ও অতিজীবিত রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে মৃত ও অসহায় বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষ সমর্থন করিয়া লেখক বঙ্গভাষা-ভাষীমাত্রেরই শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। এই প্রবন্ধ প্রকাশের সৎসাহস দেখাইয়া বসুমতীও গৌরবান্বিত হইয়াছে।

—

সংক্ষেপে এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা করিব না; মূল প্রবন্ধই সকলের পাঠ্য। বৃদ্ধবয়সে যে বকধর্ম্মভাব দেখাইয়া রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যক্ষেত্রে সকলপ্রকার বাদানুবাদকেই মোরগের লড়াই বলিয়া দূরে ঠেলিয়া আপনার প্রাধান্য জ্ঞাপন করিতেছেন—সে ভাবটা যে তাঁহার শৈশব যৌবন ও প্রৌঢ়বয়সের কার্য্যকলাপের সহিত খাপ খায় না প্রবন্ধকার তাহাই দেখাইয়াছেন। নখরদন্তহীন বার্দ্ধক্যেও রবীন্দ্রনাথ সকল সময় জৈনমতে চলেন না, গত দুই বৎসরের সাময়িক সাহিত্যের সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারাই ইহা অবগত আছেন। কোনও পক্ষকে বড় করিতে হইলেই তিনি আর একটি সত্য বা কল্পিত পক্ষ খাড়া করিয়া বক্রোক্তি প্রয়োগে তাহাদের ধূলিসাৎ করেন। বছর কয়েক ধরিয়া তথাকথিত সাহিত্যিক মোরগের

দলই তাঁহার সেই কল্পিত বিপক্ষরূপে তাঁহার চক্ষু কর্ণের পীড়া জন্মাইতেছে। প্রবন্ধকার দেখাইয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই মোরগের লড়াইয়ে যথারীতি অভ্যস্ত এবং একদা বঙ্কিমচন্দ্রের উপরই মোরগ-রবীন্দ্রনাথ কি ভাবে চঞ্চুপ্রয়োগ করিতে গিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়াছিলেন প্রবন্ধটি তাহারই ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিপট যে পাঠশালার পড়ুয়ার শেলেটের মত বারবার মুছিয়া যায় ইহাই বাঁচোয়া!

—

এই প্রবন্ধ সম্পর্কে আমরা একটু বিপদে পড়িয়াছি। প্রবন্ধটির শেষে জয়ন্তীসংখ্যা শনিবারের চিঠির কভারের মুরগীর একটি একরঙা ছবি ছাপিয়া বসুমতীর কর্তৃপক্ষ আমাদিগকে মুস্কিলে ফেলিয়াছেন। উহা আমাদেরই তরফ হইতে লেখা এইরূপ কানাঘুষা শুনিতেছি। ইহা সত্য নয়, তবে প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে আমাদের আন্তরিক সমর্থন আছে।

—

বাংলাদেশের ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে যেমন কুইনিন ও শেল টক্স বাংলার মেয়েদের সতীত্বরূপ কঠিন ব্যাধির বিরুদ্ধে তেমনিই শ্রীপ্রবোধ সান্যাল ও শ্রীজগৎ মিত্র। প্রথমটি অরিজিন্যাল ও দ্বিতীয়টি অনুবাদ। সতীত্ব-প্রতিষেধক এই দুইটি ঔষধ প্রচারের জন্য বাংলা মাসিকপত্রের সম্পাদকেরা যেরূপ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন তাহাতে আশা হয় অচিরাৎ এই প্রাণঘাতী সতীত্ব-ব্যাধি সমূলে ধ্বংস হইবে; এবং অদূর ভবিষ্যতে শ্রদ্ধেয় কালিদাস নাগের ন্যায় প্রত্নতাত্ত্বিকদিগকে গবেষণা দ্বারা স্থির করিতে হইবে সতীত্ব নামক কোনও বস্তু এ দেশে ছিল কি না। ডি গুপ্ত ও জারমলিনের মত বারীনদা ও বুদ্ধদেব বসুতে আর শানাইতেছে না।

—

শ্রীযুক্ত প্রবোধ সান্যাল মহাশয়ের পিতা জীবিত আছেন কি না এবং সান্যাল মহাশয় স্বয়ং বিবাহিত কি না আমরা অবগত নহি। সান্যাল মহাশয়ের পিতাঠাকুর মহাশয় জীবিত থাকিলে, তিনি পুত্রের বিবাহ দিয়া থাকিলে এবং পুত্রবধূ সুন্দরী হইলে ফাল্গুনের স্বদেশ হইতে নিম্নলিখিত অংশটি তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়া ইহা পাঠে তাঁহার মনোভাব কিরূপ হইল জানিয়া লইতাম।

"জহর কহিল, 'অল্প বয়স নাকি লোকটার?'

সুখলতা কহিল, 'চুল পেকেছে মনে হল, অল্প বয়েস হলে লোকে যে সন্দেহ করত। সন্দেহজনক বয়েস যার কেটে গেছে, সেই বেশী সন্দেহজনক।'

জহর বলিল, 'হ্যাঁ, এ দেশে ছেলের বাপরা ছেলেদের জন্য পরমা-সুন্দরী মেয়ে খোঁজে, তার কারণ—' "

এই তো গেল বাপান্ত! সতীত্বের বিরুদ্ধে ইন্‌জেক্‌শনও আছে!

—

"সুখলতা কহিল, 'মেয়েদের সঙ্গে শুতে আমার ভাল লাগত না। পুরুষ মানুষের সঙ্গে থাকার একটি (?) বিশেষ (?) আনন্দ মেয়েরা পায়।' তারপর হঠাৎ রুক্ষকণ্ঠে সে কহিল, 'তুমি এই নিয়ে তিনবার বললে যে আমি সতী সেজে বসি, তার মানে?'

'মানে তুমি চল্‌তি ভাষার সতী নও।'

'হওয়া উচিতও নয়। আমি বরং অসতী হ'তে রাজি আছি কিন্তু ক্ষণভঙ্গুর সতীত্বকে পাহারা দিয়ে দিনরাত লুকিয়ে থাকতে রাজি নই।"

তাহার স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ কথাগুলা সমস্ত ঘরময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।"

এইখানে সাণ্ডাল মহাশয়ের একটু ভ্রম হইয়াছে। লেখা উচিত ছিল—

"তাহার স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ কথাগুলা সমস্ত ঘরময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া উর্দ্ধে উঠিতে উঠিতে একেবারে রাজা রামমোহন রায়ের কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া কহিল, 'বাবা, সতীদাহ প্রথা রদ করাইলে কেন?' "

—

আছেন আছেন, নারী-জগৎ-মিত্রও আছেন! এবং ভয়ানক রাগিয়া আছেন; এ দেশের মেয়েদের দ্বারা জন্মশাসন তিনি করাইবেনই এবং 'প্রেমকে গভীরতর হওয়ার সুযোগ না দিয়ে তিনি বিবাহ ঘটিতে দিবেন না! তিনি লিখিতেছেন—

"যৌন আকাঙ্ক্ষার ফলে সন্তানের জন্ম।...নারী দেখেছে একটি মাত্র পুরুষকে গ্রহণ করলে তার সন্তান সুখে লালিত পালিত হবে। পিতৃত্ব নিয়ে ঝগ্‌ড়া বাধলে সন্তানেরই ক্ষতি। সুতরাং নারীকে সংযত হতেই হয়।...যে মাতৃত্ব নারীকে পরাধীন হতে বাধ্য করেছে, নারীকে অশেষবিধ দুঃখ দিয়ে তাঁর স্বাধীন অস্তিত্বকে লোপ করেছে, পুরুষের চোখে তাকে জড়পিণ্ডে পরিণত করেছে, সে মাতৃত্বের কোন প্রয়োজন নেই—তা' অন্যায় পাপ।"

সুতরাং কর জন্ম-শাসন, ঘুচাও মাতৃত্ব! ভাল। কিন্তু হায়, জগৎ মিত্র! এক পুরুষ পূর্ব্বে যদি এই আন্দোলন চলিত!

—

ফাল্গুনের ভারতবর্ষে কবিশেখর কালিদাস রায়ের একটি কবিতা বাহির হইয়াছে—দেখিতে শুনিতে কবিতা, কিন্তু ইহা আসলে একটি দীর্ঘশ্বাস! কবি বলিতেছেন—

"ভূত মান' না কি ? ভূত কি আছে রে ?
ভূত থাকিলে ত ভালই হ'তো,
তাদের নিয়েই নব সংসার
গড়ে' তুলিতাম মনের মত।"

'রসচক্র' কি তবে উঠিয়া গিয়াছে !

—

অন্যত্র, "আমি ত তেমনি রয়েছি খাড়া,
আমার বুকের শিবলিঙ্গ
আজিকে সেবক পূজারীহারা।"

বেচারী বুক ! বুকের শিবলিঙ্গটি কি চায় ?

"শিবরাত্রিতে একটি সলিতা,
বোশেখে দু'কোশা ঝারার জল।"

আমরা আশা করি, কবির আবেদন আগামী বৈশাখেই পূর্ণ হইবে।

—

"আঃ বাঁচা গেল।" এ নব ফাল্গুনের দিনে "ভারতবর্ষে" শ্রীবুদ্ধদেব বসুর "পুনরাগমন" হইল। কিন্তু লক্ষণ ত সুবিধার মনে হইল না! প্রথমেই "চার ডিগ্রী জ্বরের তীব্র সম্মোহন।" তার পরেই ঘাম! সে কি ঘাম! যদিও সে "শারীরিক ঘাম" তবুও পাঠক ভাবিবেন না যে এ ঘাম আপনার আমার ঘামের মত অত্যন্ত সাধারণ দৃশ্যমান্ বস্তু, এ যে কবির ঘাম, "ভেতরে ভেতর ঘাম!" গোপন প্রেমের কথা পাঠক শুনিয়াছেন, গোপন ঘামের কথা জানেন কি ? না জানিলে বুদ্ধবাবুকে জিজ্ঞাসা করিবেন। ভারতবর্ষের এই অবিরল ঘর্ম্মবর্ষণে শীতল হইয়া আমরা জিজ্ঞাসা করি, জ্বর ছাড়িল কি ?

—

ভারতবর্ষ অনেকগুলি অমূল্য রত্ন আবিষ্কার করিয়াছেন। কবি পীযূষকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম। সম্প্রতি তিনি 'বেদুইন' নামে একটি উচ্চাঙ্গের কবিতা লিখিয়াছেন, ভাবে ভরা, অনুপ্রাসে ঠাসা। দুইটি নমুনা দিলাম (১) "জ্যৈষ্ঠের রোদে রোদন ভুলিয়া আমি যেন পথে মরি।" (২) "বেদের বেপথু প্রাণে লাগে ভাই—বপু নহে বেপমান।" বেশ লাগিল। সব চেয়ে ভাল লাগিয়াছে—"পথের কুকুরে মোর সাথে মিশে আনন্দ যেন পায়।" পথের কুকুরের মেশামেশির দৃশ্য মাঝে মাঝে দেখিয়াছি বটে কিন্তু তাহাদের মধ্যে পীযূষবাবুকে ত তখন চিনিতে পারি নাই। অচিন্ত্যবাবু নালিশ করিবেন না ত!

—

কিছুদিন হইল ভূতপূর্ব্ব জীবনানন্দ দাশগুপ্ত (জীবানন্দ নহে) মহাশয় তাঁহার গুপ্তাংশটি কাটিয়া নবকলেবরে অর্থাৎ সংক্ষেপে শ্রীজীবনানন্দ দাস (জীবানন্দ নহে) নামে পরিচয়-পত্রে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। গেল বারে আমরা "ঘাইহরিণী" সম্পর্কে তাঁহার বোন্-complex-এর কথঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছিলাম। বর্ত্তমান সংখ্যায় শ্রীধীরাজ হাল-দার মহাশয়ের বৌদি-complex-কাহিনী কীর্ত্তন করিবার বাসনা করিয়াছি। পুণ্যবান্ পাঠকগণ ধৈর্য্যসহকারে এই অমৃতকথা পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন।

—

"একটি ছেলে। ধর তার নাম একস্।"

অমিট্রে'র ভাই হইলে পুরা নাম হইত X-Ray. নামটি কিন্তু সার্থক হইত। কারণ "ছেলেটি"র কার্য্যকলাপ দ্বারা বৌদিদের ঠিক চিনিতে না পারিলেও আসল "হাল-দার" মহাশয়ের ছবিটি যেন

হাড়-মাস সমেত ধরা পড়িয়া গিয়াছে মনে হইল। ভুল হইতেও বা পারে। যাক্ গে'।

—

বৌদি কিন্তু একটি ন'ন—"আট-দশ জন।" আমরা বলি যত হয় ততই ভাল। তাও আবার নানাজাতীয় ও নানাবয়সী, অর্থাৎ—"খুড়তুতো, জাঠ্‌তুতো, পিস্‌তুতো ইত্যাদি···।" (কি ভাগ্যি বাপ্‌তুতো বাদ পড়িয়াছে!) "কেউ বা তার মায়ের সমবয়সী; আবার কেউ সম্পর্কে বড় হ'লেও বয়সে প্রায় কাছাকাছি ব'লে সামনে বেরোয় না।" সংখ্যা ও 'তুতো" বিষয়ে লেখক অত্যন্ত উদারভাবাপন্ন সন্দেহ নাই (অবশ্য জীবনানন্দের মত নয়, cf. হৃৎতুতো), কিন্তু দুঃখের বিষয়, বয়স সম্বন্ধে তিনি আদৌ দূরদর্শী নহেন, নতুবা গল্পে উপরন্তু দু' চারি গণ্ডা শিশু-বৌদিদির সাক্ষাৎ পাইতাম নিশ্চয়।

—

বক্ষ্যমান্ "তিনরাত্রি" গল্প ইঁহাদেরই অন্যতম এক "পিস্‌তুতো" বৌদিকে লইয়া। ভরসা আছে ভবিষ্যতে অন্যান্য-তুতো-বৌদি-ঘটিত তিন-কম হাজার, অর্থাৎ ৯৯৭ রাত্রির কাহিনী ক্রমশ জানিতে পারিব, অথবা একেবারে পরিচয়-পৃষ্ঠে গ্রন্থাকারে Bowdian Nights (Tuto)-র দিলীপ-ভাষ্য-সম্বলিত "পুস্তক-পরিচয়" পাঠ করিয়া ধন্য হইব। আশায় রহিলাম।

—

নায়িকার নাম "হাসি-বৌদি"। নায়কের নাম লেখক দিয়াছেন X. আমরা Equation কসিয়া দেখিলাম, নাম হওয়া উচিত "কান্না-ঠাকুরপো"। তিনরাত্রির তিনটি "step"-এ এই অঙ্কফল বাহির হইয়াছে।

—

পয়লা রাত্রি।

রেশের বাড়ীর প্রকাণ্ড "উঠানে সখের দলের থিয়েটার হচ্ছে। লোকে লোকারণ্য। খানিকটা জায়গা চিক দিয়ে আড়াল করা মেয়েদের জন্য। সেখানে লোকসংখ্যা বড় কম নয়। রাত যখন প্রায় বারোটা বাজে, আমি উঠে পড়লাম। তার পরের দিন সকালেই ফিরতে হবে, তাই রাত্রে একটু ঘুমের দরকার ছিল।

চিক ঘেরা জায়গার কাছে এসে ডেকে বললাম, জ্যাঠাইমা, আমি এখন শুতে যাচ্ছি।

জ্যাঠাইমা বললেন—চল্, তোর মশারিটা ফেলে দিয়ে আসি। ধরো তো বৌমা এই খুকীটাকে। অত নেড়ো না, ঘুম ভেঙে যাবে, তাহ'লে আর কারো দেখ্‌তে শুন্‌তে হবে না।

চট্ করে হাসি-বৌদি উঠে পড়ে বল্লেন—আপনার উঠতে হবে না, বড় মামীমা। আমি ঠিক্‌ঠাক্ করে দিয়ে আসছি।"

তারপরে নির্জ্জন ঘরে মশারি ফেলা, গল্প।

সরস গল্প যখন বেশ জমিয়া উঠিয়াছে তখন হঠাৎ "দেখি আমি তাঁর উন্মত্ত আলিঙ্গনে আবদ্ধ। * * * আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। * * আমার কেমন ভয়ে কান্না আসতে লাগল। * * * ধীরে ধীরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পাশ ফিরতে ফিরতে বল্লাম—আমার বড় ঘুম আসছে। আমি ঘুমুই।

কিছুক্ষণ কোন কথা নেই। স্বধু দ্রুত নিঃশ্বাসের উষ্ণ স্পর্শ।

—নেহাৎ কাঁচা, শুধু মুখ-সর্ব্বস্ব। এই বলে তিনি উঠে গেলেন।"

—

দোসরা রাত্রি। এবার হাসিবৌদির নিজস্ব বাড়ীতে, সশরীর হাসি "দাদার" সাক্ষাৎ বর্ত্তমানে।

"বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বলে গেলেন—ঘুমিয়ো না, আস্‌ছি। অপেক্ষায় রইলাম। * * *

মশারি তুলে বিছানায় ঢুকতে ঢুকতে বৌদি বল্লেন—চোর! একটা মাথার বালিশে বুক রেখে আমরা দুজনে শুয়ে। দেহ দুটী সমান্তরালভাবে লম্বিত। মুখ অত্যন্ত কাছাকাছি। নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে জড়িয়ে যাচ্ছে। আমরা মশগুল হয়ে পড়ছি, এমন সময়ে দরজা খুলে দাদা ঘরে এসে বল্লেন, তোমাদের কথা কি এখনও ফুরোয় নি? রাত্ত দুটো যে বেজে গেল।

বৌদি তৎক্ষণাৎ আমার দিকে চেয়ে বললেন—কীগো বল, কাকে চাও? ঘুমকে না আমাকে? * * * "

তারপর দাদার প্রতি উক্তি—

" * * তাই বলে ভেবো না যেন তোমার কাছে আমার যা কিছু পাওনা, সব তোমার ভাইয়ের কাছে দাবী করছি।

দাদা ত ভয়ে ঘর ছেড়ে দৌড়—* * * "

বেচারা দাদা! [জনান্তিকে—হাল-দার মশাই এরূপ দু'চারিটী "দাদা"র সন্ধান দিবেন কি? সংবাদ গোপন থাকিবে।]

—

তেস্‌রা রাত্রি। আবার দেশের বাড়ী। "বৌদি যেতে লিখলেন।" "এবারে দাদার খাটের বিছানায় শুলাম আমি। * * * (congratulations!) বৌদি মশারির বাইরে বস্‌লেন। (দীর্ঘশ্বাস!)

আমি বললাম বড় অসুবিধা; ভেতরে আসুন। তিনি বল্লেন—না। (অধরস্ফুরণ।) হাত ধরে টানাটানি করতে লাগলুম। কিছুতেই এলেন না। (নির্দয়া!) শেষে অভিমান করে বল্লাম—তবে আপনি যান।

বৌদি উঠলেন। * * আলো নিবিয়ে নিজের বিছানায় চলে গেলেন। সেই অন্ধকারে আমার সমস্ত শরীর উত্তপ্ত, রক্ত চঞ্চল হ'য়ে উঠল * * * ধীরে ধীরে চুপে চুপে বেরিয়ে পড়ে অন্ধকারে হাৎড়াতে হাৎড়াতে বৌদির বিছানায় এলাম। ঘুম-জড়ানস্বরে বৌদি বল্লেন—এসো। (আশা)

উত্তর না দিয়ে এমন ভাবে তাঁকে জড়িয়ে ধরলাম যে, আমার প্রচণ্ড আবেগ ও উন্মত্ত বাসনা একেবারে অনাবৃত স্পষ্টতায় প্রকাশ হ'য়ে পড়ল। তিনি বল্লেন—ও কি! আমি বল্লুম—ছাড়ব না।

তিনি বল্লেন আসচি। * * তারপর তিনি ধীরে ধীরে উঠে এসে বেশ সংযত করে নিয়ে, খোকার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন।"
(বক্ষে করাঘাত ও ক্রন্দন।)

[যবনিকা পতন]

—

এই হইল কান্না-ঠাকুরপোর তিন রাত্রির কাহিনী। গল্প পড়িয়া আমাদের দেশের একটি শোচনীয় ঘটনার কথা মনে পড়িল। আমাদের পাড়ায় নীরেন বলিয়া একটি ছেলে ছিল, ডাকনাম হাব্লা। ছেলেটি একটু ভীতু প্রকৃতির। তার ভারি সখ বেলে মাছ খাইতে। অন্য মাছও খায়, তবে বেলে পাইলে আর কিছু চায় না। এক দিন ঝিলের ধারে হাব্লা বসিয়া আছে এমন সময়ে হঠাৎ একটা বেলে মাছ তাহার কোলে লাফাইয়া উঠিল। হাব্লা সাপ ভাবিয়া "মাগো বলিয়া আঁৎকাইয়া উঠিতেই মাছটা পলাইয়া গেল। তখন হাব্লা আপনার ভুল বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত অনুতপ্ত হইল।

তাহার লোভ বাড়িয়া গেল। অতঃপর সে ছিপহস্তে রোজ ঝিলের ধারে গিয়া বসে। সকাল-সন্ধ্যা বসিয়া থাকে, ছিপে বেলে মাছ আর

পড়ে না। এইরূপে মাস কাটিল, বছর ঘুরিল। মাঝে মাঝে মনে হয় ফাৎনা নড়ে, টান মারে—শূন্য বঁড়শী! কোথায় বেলে মাছ! হায়, এখন আমাদের সেই হাব্‌লা পাগল হইয়া গিয়াছে! ছিপ-হস্তে হাব্‌লাকে দেখিয়া যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, 'হ্যা রে হাবলা, কি করছিস্‌?' হাব্‌লা জবাব দেয়, 'গেল, গেল গেল গেল—ঐ বেলে মাছটা পালিয়ে!' বলিয়াই ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠে।

—

ব্যর্থতা chronic হইলে বড় বিষম রোগে দাঁড়ায়। উপসর্গ অনেক। বিজ্ঞাপন দেখিয়া মনে হয়, হাল-দার মহাশয় Pelman course লইলে, অথবা মাসাধিক কাল স্বরবল্লী কষায় সেবন করিলে সুফল পাইবেন। Kruschen Salt-এও কাজ দিতে পারে।

—

রবীন্দ্রনাথের আওতায় পড়িয়া বাংলা দেশের কবিদের প্রতিভা নাকি ফুটিতে পারিল না,—মাঝে মাঝে এইরূপ দীর্ঘশ্বাসপূর্ণ অভিযোগ আমরা শুনিতে পাই। কিন্তু যে-প্রতিভা-অণ্ডে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তা'দিয়া থাকেন, যথাকালে ফুটিয়া তাহার ভিতর হইতে কিরূপ পরমহংস-বাচ্চা বাহির হয়, তাহার পরিচয় আমরা মাঝে মাঝে মাসিক-পত্রের মারফৎ জানিতে পারি। সম্প্রতি শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর প্রতিভা-অণ্ড হইতে "তীর্থচ্ছায়া" নাম্নী একটি শাবকী প্রসূত হইয়াছে। এই শাবকী বলিতেছে—

"দেবালয়, বাঁধা ঘাট, বেলগাছে পথ ছায়া-ঢাকা
নিভৃত গঙ্গার তীর, একা সাধু গাহিছে দেউলে,
মধ্যাহ্ন আকাশে চিল সঞ্চারি বেড়ায় মেলি পাখা
শীতল প্রবাহে নৌকা দু'চারিটি ভাসে পাল তুলে।"

সহর হইতে, প্রিয় এবং প্রিয়া পলাতকা হইয়া পল্লীগ্রামে পৌছিয়া উক্তভাবে বিভোর হইয়াছে। "একা সাধু" যখন "গাহিছে দেউলে" তখন তাহাদের উদ্দেশ্য হয়তো সাধু। কিন্তু "বেলগাছে পথ ছায়া-ঢাকা" দেখিয়া একটু সন্দেহেরও উদ্রেক হয়। অশ্বত্থ, বট প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া অমিয়বাবুর শ্রীফল-প্রীতি এতটা জাগিয়া উঠিল কেন ?

—

পাঠকেরও মনে প্রশ্ন জাগিতে পারে—তাই ত, কবি এত গাছ থাকিতে শ্রীফল-বৃক্ষের প্রতি অনুরাগী হইলেন কেন ? কিন্তু আর একটু অগ্রসর হইলেই বুঝিতে পারা যায় যে, বেলগাছের ছায়ায় পথ ঢাকুক আর নাই ঢাকুক, তাহাতে লেখকের বক্তব্য বিষয়ের পারিপার্শ্বিকতা-সৃষ্টি হয়। কেন না, তখনকার ব্যাপারটি এইরূপ—

"সহস্রের ভিড় ত্যজি পূর্ণমাঝে দোঁহে সঙ্গকামী
পথে পথে ঘুরে সেথা গিয়েছিনু তুমি আর আমি।"

এই ভাবের পারিপর্শ্বিকতা সৃষ্টি করিতে শ্রীফল, কদম্ব দাড়িম্ব প্রভৃতি গুটিকতক গাছ বাংলা দেশে আছে। সুতরাং অমিয় বাবু তালে ঠিক আছেন।

—

কবিতাটির শেষে অমিয়বাবু ওস্তাদের মার মারিয়া সমস্ত ব্যাপারটিই জলের মত পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন—

"আজ শুনি সর্ব্বমাঝে দূরস্মৃত প্রদোষের ভাষা
মর্ম্মরিত বেদনায়, স্বজনের নিত্য যাওয়া-আসা।
স্তব্ধ-চিত্ত কালহীন পূর্ণ করি' ব্যথার আগ্রহে
যে-নাই তাহারি খোঁজে মোর পানে বিশ্ব চেয়ে রহে॥"

কবিতার প্রথমাংশে "অনন্ত বিশ্বের চলা" দাঁড়াইয়াছিল—দ্বিতীয়াংশে তাহা সৃজনের জন্য যাওয়া-আসা করিতেছে। সুতরাং আপাততঃ "যে-নাই" বা ভবিষ্যতে যে-আসিবে, "তাহারি খোঁজে বিশ্ব চেয়ে রহে।" সুন্দর ফিনিশ !

—

শ্রীমতী ইলা দেবী একটি যুগোপযোগী খাসা গল্প লিখিয়াছেন। রুচিরাকে তার বাবা ইংরাজী, ফরাসী, ল্যাটিন ও সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষিতা করিয়া তুলিয়াছিলেন। "পশ্চিম হ'তে প্রসিদ্ধ দু'জন ওস্তাদ" আনাইয়া "কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীত শিক্ষার জন্যে" ব্যবস্থা করিতেও কসুর করেন নাই। এইরূপে মেয়ের শিক্ষার জন্য "প্রচুর ডিগ্রীধারী ও প্রচুর বেতনভোগী গৃহশিক্ষক নিযুক্ত" করিতে রুচিরার "মহামহা পণ্ডিত ও মহামহা অমিতব্যয়ী" পিতার "সঞ্চয়ের খাতা সম্পূর্ণ শূন্য, ঋণের বোঝা ভারী" হইয়া গেল। কাজে কাজেই পিতার মৃত্যুর পর "বিধবা মাতা ও অসহায় ভাই বোনের একটা উপায়ের জন্যে" রুচিরাকে ব্যারিষ্টার যোগানন্দের বাড়ীতে সেবিকার কার্য্য করিতে হইল। নামে যোগানন্দ হইলেও কার্য্যতঃ তিনি ভোগানন্দ ছিলেন বোধ হয়। বয়স পঞ্চাশের উর্দ্ধ হইলেও "যোগানন্দের দেহ যথেষ্ট সবল,—এখনও ঋজু। তাঁর ঈষৎ শুভ্র কেশ, বলিরেখাহীন মুখ, বলিষ্ঠ দেহ দেখলে বোঝা যায় এক সময় তিনি সুপুরুষ ছিলেন।" এহেন যোগানন্দ একদিন রুচিরাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রুচিরাকে সরাসরি প্রস্তাবটা জানাইয়াও দিলেন। লেখিকা বলিতেছেন।—

"যোগানন্দের বয়স তার তুলনায় এমনই কি আর অশোভন এখন। যোগানন্দের চাঞ্চল্যহীন মূর্ত্তিরও এক ধরণের গৌরব আছে অস্বীকার করা যায় না।"

এইরূপ ভাবনা চিন্তার পর "সে যোগানন্দকে সম্মতি জানিয়ে দিল।" বিবাহের দিন যেমন আগাইয়া আসিতে লাগিল, তেমনই আগাইয়া আসিল যোগানন্দের ভাই-পো ধ্রুব। কিন্তু তাই বলিয়া রুচিরা তেমন মেয়ে নয়,—"যোগানন্দের বাগদত্তা বধূ সে,—এতই কি লঘু চিত্ত তার?" ধ্রুব কিন্তু একদিন অরক্ষণীয় হইয়া বলিয়াই ফেলিল—"আচ্ছা জেঠামশায়কে বিয়ে করতে সত্যই আপনি সম্মত?" রুচিরা তার নিজের যুক্তিমত জবাবও দিল। কিন্তু ধ্রুব ভাবী জ্যেঠাই-মাকে ছাড়িল না। অনেক কথাকাটাকাটির পর রুচিরার মুখ দিয়া বাহির করাইল—

" 'কী আমার করবার আছে এখন?'

—'সবই ত রয়েছে'—ঝুঁকে পড়ে আগ্রহ-নিরুদ্ধ স্বরে ধ্রুব বল্লে—'ও ভুল পথ ছেড়ে দাও রুচিরা,—আসতে পারবে আমার সঙ্গে? ভুলকে ভেঙে দিয়ে চলে আসতে পারবে কি?

দীর্ঘ নীরবতার পর রুচিরা একটা করবীর পাপড়ি খসিয়ে ছিন্ন করতে করতে অতি ধীরে বল্লে—'পারব বোধ হয়...', তারপর বল্লে' 'জেঠামশায় আপনার ভারি রাগ করবেন কিন্তু আপনার উপর।'

উচ্ছ্বসিত আনন্দে ধ্রুব সহাস্যে বল্লে, 'তা করুন। সমস্ত জগৎটার রক্তচোখ উপেক্ষা করা যায় যার গুণে, সেই মাণিকের সন্ধান যে আজ পেয়েছি।' "

সাবাস ধ্রুব,—আজ জ্যেঠামশাইএর মাণিকের মালিক! আর যোগানন্দ! তোমাকে কি বলিব—অতঃপর কই-মাগুর বাজার হইতে আনিলেও সঙ্গে সঙ্গে খাইয়া ফেলিও—জীয়াইয়া রাখিয়ো না। দেশে ভাই-পোর অভাব নাই।

—

কবি কালিদাস রায় ফাল্গুনের উপাসনায় 'কবির দুঃখবাদ' শীর্ষক কবিতায় বলিতেছেন—

কবি জড়যন্ত্র নয়, গাহে না সে স্বর-যন্ত্র প্রায়—

সত্য। কিন্তু ষড়যন্ত্র করে বলিয়াই যত কিছু গোলযোগ বাধে।

—

প্রবাসী, মাঘ, ১৩৩৮। 'দীপান্বিতায় জয়পুরের আভাস'—ভ্রমণ-কাহিনী, লেখিকা শ্রীশান্তা দেবী। শেষাংশ এইরূপ—

"দুইজনের জন্য দুইটি ডিম, তিনরকম তরকারী, দুই পেয়ালা চা ও নয়খানা রুটির বিল হইল ৸৵৫। বাকি (?) ৵১৫ বালকটিকে বকশিস দেওয়াতে সে খুশী হইয়া আমাদের দুই একটা কাজ করিয়া দিল।"

কিছুকাল পূর্ব্বে কোনও বিষয়ে বাদানুবাদ প্রসঙ্গে প্রবাসী সম্পাদক মহাশয় বাহিরের লোকের লেখা ছাপিতে লাইন পিছু কত খরচ হয় তাহার একটা হিসাব দিয়াছিলেন। সে হিসাব আমরা বুঝিতে পারি নাই। শ্রীমতী শান্তা দেবী হিসাবটি সরল করিয়া দিয়াছেন। আমরা দেখিতেছি প্রবাসীর চার লাইনে তিন পয়সা টিপ্‌স্ দিয়াও মাত্র ৸৵৹ খরচ হইতেছে, সুতরাং লাইন পিছু খরচা চৌদ্দ পয়সা করিয়া।

—

বিচিত্রার ব্যাপারখানা কি? 'প্রমত্ত-সন্ধ্যায়' মাথা ঠিক না থাকিবারই কথা, কিন্তু গোলযোগ কি এতখানি হয়?

"ফুলবান ছুড়িল মদন!
তুমি তাহা বক্ষপাতি
করিলে গ্রহণ!
যে রক্ত ঝরিল তাতে
সুকোমল সুনিবিড়
তব বক্ষ হ'তে
তুমি তাহা দু'হাতে নিঙাড়ি
আমার কপোলখানি
দিলে রাঙাইয়া
ওগো মোর প্রিয়া!"

কথায় বলে, 'কোথাকার জল কোথায় গড়ায়'—এখানে কোথাকার রক্ত কোথায় গড়াইল দেখুন।

—

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংঘর্ষে ফেরঙ্গ—পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের ভাষার সংঘর্ষে—

"খাঁচার ভিতর তোতার কিচের মিচের, চালের উপর কবুতরের বক্‌বকাবকুম—কোন্ অজানা অনির্দ্দেশ জগত থেকে একটি সাড়া তীরের মতো ছুটে এসে বাতাসের বুক চিঁরে ভেসে যায়।" জয়তী, কার্ত্তিক-পৌষ।

হায় নির্ম্মম লেখক, বুক শুধু বাতাসেরই নাই!

—

বৎসরাধিক কাল নবশক্তির পৃষ্ঠায় বাংলার আসল এবং ঝুটা মেয়েদের বাংলার তথাকথিত পুরুষদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও সঙ্গে সঙ্গে 'দুহাতিয়া বাড়ি' মারার কৌশল দেখিয়া আসিতেছিলাম; গত ২৭শে ফাল্গুনের নবশক্তিতে দেখিলাম পুরুষ ক্ষেপিয়াছে। ক্ষেপিয়াছে তবু রস মরে নাই—

"স্বামীদের অধিকারচ্যুত করিবার জন্য বিশ্বের নারীসঙ্ঘবদ্ধ হইতেছে। স্বামীরা কেন যে আজও পটলচেরা চোখ আর রক্ত বিম্বাধরের অত্যন্ত ঝুঁটা মায়ায় ভেড়া বনিয়া রহিতে চাহিতেছেন ইহা আমার কল্পনায় আসিতেছে না।

স্বামীদের সমূহ বিপদ সমুপস্থিত। পতিকুল জাগো। আপন ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত কর। বিশ্বের স্বামীরা সঙ্ঘবদ্ধ হও। পত্নীদের প্রতাপ ক্ষুন্ন করিতেই হইবে।"

কিন্তু, পত্নীদের প্রতাপ ক্ষুন্ন হইলে বাংলাদেশের থাকিল কি? লেখকের বয়স কি পঞ্চাশোর্দ্ধে?

হিমালয়কে নড়ানো যায় কিন্তু রবীন্দ্র-জয়ন্তীর কর্ত্তৃপক্ষ অনড়। আমরা লিখিয়াছি, অনেকেই লিখিয়াছেন এবং ১৭ই ফাল্গুনের নেহাৎ ভালমানুষ 'সম্মিলনী'ও লিখিতেছেন—

"গত রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবের আয়ব্যয়ের একটা হিসাব-নিকাশ কিছু এ পর্য্যন্ত হইয়াছে কি? উদ্বৃত্ত তহবিলের কতটা বিশ্ব-ভারতী পাইল—কতটাই বা দরিদ্র জনসাধারণ পাইল জনসাধারণকে তাহা জানাইলে ভাল হয়।"

জয়ন্তী-কর্ত্তৃপক্ষ বেহিসাবী নহেন। খরচ যাহা হইবার হইয়াছে— এখন এই অবেলায় বৃথা কালি খরচ করিয়া দরিদ্র জনসাধারণের ন্যায্য পাওনায় তাঁহারা অযথা ঘাটতি পড়াইবেন কেন?

—

শনিবারের চিঠি বিলম্বে প্রকাশ হওয়ার জন্য আমাদের কৈফিয়ৎ একটা রসিকতার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে, এই জন্য কোনও রূপ কৈফিয়ৎ দিতে সঙ্কোচ বোধ হয়। তবু গবর্ণমেন্টের সহৃদয়তায় পোষ্টকার্ডের দাম বাড়িয়াছে বলিয়া গ্রাহকবর্গের নিকট আমাদের নিবেদন এই যে দুই একদিনের বিলম্বে তাঁহারা যেন উৎকণ্ঠিত হইয়া তিন পয়সা ব্যয় না করিয়া ফেলেন। 'জয়ন্তী সংখ্যা' নানা কারণে বিলম্বে বাহির হইয়াছিল—অফিসের ঠিকানা বদলের হাঙ্গামায় ফাল্গুন সংখ্যা বিলম্বে বাহির হইল। আমাদের আশা আছে—চৈত্র সংখ্যা হইতে আমরা মাসের ২০শে তারিখের মধ্যেই কাগজ বাহির করিতে পারিব।

—

১৩৩৬ সালে শনিবারের চিঠির প্রকাশ স্থগিত হওয়াতে যে সকল গ্রাহকের কাগজ পাওনা রহিয়া গিয়াছিল, তাঁহাদের অধিকাংশেরই পাওনা শোধ হইয়া আসিল; কয়েকজনের আর তিনমাসের কাগজ বাকী আছে। যাঁহাদের পাওনা শোধ হইয়াছে চৈত্র মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে তাঁহারা যদি অনুগ্রহ করিয়া জানান যে ইহার পরও তাঁহারা গ্রাহক থাকিবেন কি না, তাহা হইলে আমাদের সুবিধা হয়। মণি অর্ডারে বার্ষিক চাঁদা ৩।০ পাঠাইয়া দিলে উভয় পক্ষেরই সুবিধা। ২০ চৈত্রের মধ্যে পত্র না পাইলে আমরা পুরাতন গ্রাহকগণের নিকট

ভি পিতে কাগজ পাঠাইব। ভি পি ফেরত আসিলে এই দুর্দিনে আমাদের ক্ষতি হইবে গ্রাহকগণ অনুগ্রহ করিয়া যেন তাহা স্মরণ রাখেন।

ফাল্গুন সংখ্যায় চতুর্থ বৎসর শনিবারের চিঠির অর্দ্ধবৎসর পূর্ণ হইল। যাঁহাদের ছয় মাসের চাঁদা দেওয়া ছিল তাঁহাদের চাঁদাও ফুরাইল। তাঁহারাও যেন অনুগ্রহ করিয়া ২০ শে চৈত্রের মধ্যে বাকী অর্দ্ধ বৎসরের চাঁদা পাঠাইয়া দেন অথবা গ্রাহক থাকিতে না চাহিলে যেন একটি পোষ্টকার্ড খরচ করিয়া আমাদিগকে সংবাদ জ্ঞাপন করেন। যাঁহারা গ্রাহক থাকিতে চান তাঁহারা মণিঅর্ডার যোগে ১৷৹ পাঠাইলে ভাল হয়। ২০শে চৈত্রের মধ্যে মণিঅর্ডার অথবা চিঠি না পাইলে আমরা ভি, পি করিয়া চৈত্র সংখ্যা পাঠাইব।

শনিবারের চিঠির অফিস ৫ সি রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটে উঠিয়া আসিয়াছে।

দ্রষ্টব্য

এই সংখ্যার পরিশিষ্টে "সাময়িক পত্রে সেকালের কথা" প্রবন্ধ মুদ্রিত হইবার পর আমি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাকারে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত আর একখানি গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াছি। ইহা—শ্রীমদ্ভাগবত, পুঁথির আকারে মুদ্রিত এবং দুইখণ্ডে সম্পূর্ণ। গ্রন্থের মুদ্রণকার্য্য শেষ হয় ৩১এ বৈশাখ ১৭৫২ শক (১২ মে ১৮৩০), কারণ দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ পৃষ্ঠায় আছে,—"শ্রীমহর্ষিবেদব্যাসপ্রোক্তং শ্রীমদ্ভাগবতং শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়েন প্রযত্নতো বহুযত্নশোধিতং পক্ষশরধরাধরধরাশাকীয় বৈশাখস্যৈকত্রিংশদ্বাসরে কলিকাতানগরে সমাচার চন্দ্রিকাযন্ত্রেণাঙ্কিতং।" ঠিক ইহার পরেই শ্লোকাকারে ভবানীচরণের বংশ-লতা প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ৩২।১।১ বীডন স্ট্রীট, শনি-রঞ্জন প্রেস হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পরিশিষ্ট

সাময়িক পত্রে সেকালের কথা

কালীপ্রসন্ন সিংহের জন্মতারিখ

কালীপ্রসন্ন সিংহের জন্মের সঠিক তারিখ পাইবার উপায় নাই। শ্রীযুত মন্মথনাথ ঘোষ—যিনি কালীপ্রসন্ন সিংহের দুই-দুইখানি জীবন-চরিত রচনা করিয়াছেন—তিনিও এই সংবাদ দিতে পারেন নাই। কিন্তু সে-যুগের ইংরেজী বাংলা সংবাদ পত্রগুলির স্তম্ভ যত্নসহকারে পাঠ করিলে মন্মথবাবু সহজেই এ-সংবাদ বাহির করিতে পারিতেন। ১৮৪০ সনের ২৪এ ফেব্রুয়ারি তারিখের THE CALCUTTA COURIER নামক ইংরেজী দৈনিকে পাইতেছি,—

(Translated for the Calcutta Courier.)

Nautch in Celebration of the Birth of a Child.—Last night a series of Nautches commenced at the residence of Baboo Nundolaul Sing, at Jorasanko, in celebration of the birth of his first child, a boy, which took place lately. There were a large assemblage of native gentlemen and professors of Sanscrit present on the occasion; the former were highly gratified with the musical performances of the nautch girls, and the latter with the valuable presents of Cashmere Shawls, etc.—Prabhakur.

জানা গেল, ১৮৪০ সনের প্রারম্ভে কালীপ্রসন্ন সিংহের জন্ম,—১৮৪১ সালে নয়।

হিন্দুকলেজে মধুসূদন দত্ত

(সমাচার দর্পণ ১২ মার্চ ১৮৩৪)

পুরস্কার বিতরণ।—গত শুক্রবার [৭ মার্চ] টৌনহালে হিন্দু-কালেজের ছাত্রেরদিগকে পুরস্কার বিতরণ করা গেল।...কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা প্রায় অনুপস্থিত ছিলেন না।...

ইহার পরে নাট্যবিষয়ক প্রস্তাব আবৃত্তি হইল। তদ্বিবরণ এই।

* * *

ষষ্ঠ হেনরি ও গ্লাষ্টর

ষষ্ঠ হেনরি। ... ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল।

গ্লষ্টর। ... মধুসূদন দত্ত।

এই মধুসূদন দত্তই স্বনামধন্য মাইকেল মধুসূদন বলিয়া মনে হইতেছে। তিনি ১৮৩৭ সালে হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন বলিয়া তাঁহার চরিতকারেরা লিখিয়াছেন, কিন্তু উদ্ধৃত অংশ হইতে অন্যরূপ জানা যাইতেছে।

১৮৪২ সনের ৭ই জানুয়ারি তারিখের "ইংলিশম্যান্" হইতে নিম্নলিখিত অংশ পরবর্ত্তী ১৩ই জানুয়ারির "ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া" পত্রে স্থান পাইয়াছিল :—

Hindoo College

The annual distribution of scholarships ,and prizes to the students of the Hindoo College took place yesterday at 10 a. m. at the Town Hall......

Students who obtained Junior Scholarships.

... ...

Bhoodeb Mookerjie—Junior Scholarship.
Muddoosoodun Dutt— —do—

অবলাবন্ধু পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ

(সম্বাদ ভাস্কর ২৬ মে ১৮৪৯, শনিবার)

গত বুধবাসরীয় রজনী সাড়ে সাত ঘটিকাকালে হিন্দু বালিকাদিগের শিক্ষাগারে এক সভা হইয়াছিল তাহাতে স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যা শিক্ষার বান্ধবেরা সকলে উপস্থিত হইলে সর্ব্বসামঞ্জস্যে শ্রীযুত বেথুন সাহেব সভাপতি হইয়া প্রায় একঘণ্টার অধিককাল বক্তৃতা করেন, তৎপরে বাবু রামগোপাল ঘোষ ও বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতা সমাধানন্তর বেথুন সাহেব পুনর্ব্বক্তৃতার দ্বারা সভ্য সকলকে সন্তুষ্ট করিয়া আপন টুপী হইতে কাগজ মণ্ডিত এক তাজ এবং একটী থলে বাহির করিলেন, সভ্য মহাশয়েরা তাহা দর্শনে হর্ষ জ্ঞাপন করিয়াছেন, বাবু রামগোপাল ঘোষের কন্যা এতদ্দেশীয় লোকেরদের ব্যবহার্য্যানুরূপ ঐ সুদৃশ্য নবীন তাজ ও ক্ষুদ্র থলে সেলাই করিয়াছেন, ইহাতে সকলেই রামগোপাল বাবুর কন্যার ধন্যবাদ করিলেন, এবং তৎপরেই সভা ভঙ্গ হইল।

উক্ত সভাতে স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যা শিক্ষার বান্ধবেরা কেহ ২ আমারদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন গত মঙ্গলবাসরীয় ভাস্করে আমরা যে প্রস্তাব লিখিয়াছি তাহাতে তাঁহারদিগের অনুভব হয় প্রাচীন মতাবলম্বি ধনি হিন্দুগণ যাঁহারা বিদ্যালয়ে বালিকাদিগের বিদ্যাভ্যাসের বিরুদ্ধাচার করিতেছেন তাঁহারদিগের মধ্যেই কেহ ২ আমারদিগকে ভয় দেখাইয়া থাকিবেন এই কারণ আমরা প্রাচীন মতাবলম্বিদিগের তোষামোদার্থ ঐ প্রস্তাব লিখিয়াছি অতএব আমরা আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করি।

আদৌ বক্তব্য এই যে প্রাচীন মতস্থ হিন্দু মহাশয়েরা কি আমারদিগের বন্ধু নহেন, বালিকাদিগের শিক্ষালয়ের বিষয়ে তাঁহারদিগের কি২ সন্দেহ আছে তাহা ব্যক্ত করণের উপায় নাই, চন্দ্রিকা পত্রে

তাঁহারদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত হইত, চন্দ্রিকা সম্পাদক ভীত হইয়া ধর্ম্মসভার অধ্যক্ষ মহাশয়গণকে দুঃখী করিয়াছেন, হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সর সম্পাদক বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষকে ধর্ম্মসভার অধ্যক্ষেরা অনুরোধ করিবেন না প্রাচীন মতস্থ হিন্দুমহাশয়দিগের অভিপ্রায় হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সর পত্রে প্রকাশ পাইবেক না কিন্তু তাঁহারদিগের অভিপ্রেত জানা আবশ্যক এই কারণ আমরা লিখিয়াছি প্রাচীন মতাবলম্বি হিন্দু মহাশয়দিগের যাহা বক্তব্য থাকে তাহা লিখিয়া আমারদিগের নিকট পাঠাইলে আমরা তাহাও প্রকাশ করিব, এতদ্ভিন্ন আর কোন কারণ নাই, কেহ ভয় দেখাইলে আমরা ভীত হইব এবং তাহাতেই আমারদিগের সত্য মত পরিত্যাগ করিব ইহা কেহ বিশ্বাস করিবেন না, আমারদিগের প্রথমাবস্থাবধি এপর্য্যন্ত কি কেহ কোন প্রমাণ দেখাইতে পারিবেন কখন কোন বিষয়ে মত পরিবর্ত্তন করিয়াছি, আমরা কলিকাতা নগরে উপস্থিত হইয়া রাজা রামমোহন রায়ের সহিত প্রথম সাক্ষাত করি এবং তৎ-কালেই ব্যক্ত করিয়াছিলাম স্বদেশের কুপ্রথা ও সহমরণ নিবারণ এবং বিধবাদিগের বিবাহ, স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাস ইত্যাদি বিষয় সম্পন্নার্থ প্রাণপণে চেষ্টিত আছি, তাহাতেই রাজা রামমোহন রায় আমারদিগকে নিকট রাখেন, এবং সহমরণ নিবারণ বিষয়ে যথাসাধ্য পরিশ্রমে উক্ত রাজার আনুকূল্য করি তাহাতে কৃতকার্য্যও হইয়াছি, সহমরণ পক্ষাবলম্বি পাঁচ ছয় সহস্র পরাক্রান্ত লোকের সাক্ষাতে গবর্ণমেণ্ট হৌসের প্রধান হালে লার্ড বেণ্টিঙ্ক বাহাদুরের সম্মুখে সহমরণের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে যদি ভয় করি নাই তবে এইক্ষণে ভয়ের বিষয় কি, এখন আমরা আপনারদিগকে স্বাধীন জ্ঞান করি ইহাতে দানবকেই ভয় করি না মানব কোথায় আছেন, আর সদ্বংশ্য যুব হিন্দুগণ যাঁহারা বালিকাদিগের শিক্ষালয় স্থাপনে উল্লসিত হইয়াছেন তাঁহারাও কি স্মরণ করেন না

জ্ঞানান্বেষণপত্র যন্ত্রারূঢ় হইলে পর জ্ঞানান্বেষণের শিরোভূষণ কবিতা করিতে তাঁহারাই আদেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা যুব বান্ধবগণের সম্মুখে দণ্ডায়মানাবস্থায় যে কবিতা করিয়াছিলাম সেই কবিতা জ্ঞানান্বেষণের শিরোভূষণ হয়, তাহার অর্থই আমারদিগের অভিপ্রেত, সে কবিতা এই "এহি জ্ঞান মনুষ্যাণা মজ্ঞান তিমিরংহর। দয়াসত্যঞ্চ সংস্থাপ্য শঠতামপিসংহর" গৌড়ীয় ভাষার পয়ারে ইহার অর্থও তৎকালেই ব্যক্ত করিয়াছি "বাঞ্ছা হয় জ্ঞান তুমি কর আগমন। দয়া সত্য উভয়েকে করিয়া স্থাপন॥ লোকের অজ্ঞান রূপ হর অন্ধকার। একেবারে শঠতারে করহ সংহার॥ এই কবিতা দ্বারাই আমারদিগের ভাব ব্যক্ত হইয়াছে এইক্ষণেও সেই ভাবের ভাবক আছি, সহস্র ২ কি লক্ষ ২ লোক যদি আমারদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন তথাচ আমরা বালিকাদিগের বিদ্যালয়ের অনুকূল বাক্যই কহিব, বিশেষত বালিকাদিগের বিদ্যালয় স্থাপন বিষয়ে আমারদিগের একপ্রকার সঙ্কল্পসিদ্ধি হইয়াছে, যেহেতুক বালিকাগণের বিদ্যাশিক্ষার বিপক্ষ কেহ প্রকাশ হয়েন নাই, ধর্ম্মসভার সভাপতি রাজদ্বয় অর্থাৎ রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর, রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর বেথুন সাহেবের সাক্ষাতে মুক্তকণ্ঠে বলিয়া আসিয়াছেন তাঁহারা স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যা শিক্ষার বিপক্ষ নহেন, এবং অন্যান্য মান্য লোকেরাও স্ব২ নিলয়ে বালিকাগণকে বিদ্যাভ্যাস করাইতেছেন, অতএব সকলের অভিমত হইয়াছে বালিকাদিগের বিদ্যাশিক্ষা হয়, তবে বালিকাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইবেন কি না এই বিষয় বিবেচনা হইতেছে,…… ।"

পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি লিখিয়াছেন,—"গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য দেখিতে খর্ব্বকায় ছিলেন। এই নিমিত্ত লোক তাঁহাকে 'গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্য' বলিত। যৌবন-দশায় তিনি সতীদাহ-বিষয়ে রামমোহন রায়ের মতাবলম্বী ছিলেন। একদা

গবর্ণমেণ্ট হাউসে পণ্ডিতগণের সভা হয়। তাহাতে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশই জয়ী হয়। কেহ কেহ এই কথা অবিশ্বাস করেন।...তাঁহার হ্রস্ব দেহ দর্শনে বিবিরা উপহাস করায় গবর্ণর-জেনারেল বলিয়া উঠেন—যিনি স্ত্রীজাতির উকীল তাঁহাকে উপহাস করা অসাধু।" ('জন্মভূমি', অগ্রহায়ণ ১৩০৪, পৃ. ৩৫৬)। কেদারনাথ মজুমদারের "বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য" পুস্তকেও এই ধরণের কথা আছে।

গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ 'সম্বাদ ভাস্করে'র সম্পাদক। তাঁহার লিখিত উপরিউদ্ধৃত অংশ হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে তিনি সহমরণের বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্ট হাউসে পণ্ডিতগণের সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

সাংবাদিক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রাজা রামমোহন রায়ের সমকালিক ব্যক্তি। তিনি সে-যুগের একজন নামজাদা সাংবাদিক। প্রথমে তিনি 'সম্বাদ কৌমুদী' নামক সাপ্তাহিক পত্রের ১৩ সংখ্যা পরিচালন করেন। তৎপরে ১৮২২, ৫ই মার্চ হইতে 'সমাচার চন্দ্রিকা' নামে একখানি সংবাদপত্র তিনি নিজেই বাহির করিতে থাকেন। 'সমাচার চন্দ্রিকা' গোঁড়া হিন্দু সমাজের মুখপত্র ছিল।

"সতীনিবারণের বিরুদ্ধে ইংগ্লণ্ড দেশে আপীলকরণার্থে এবং হিন্দুদিগের ধর্ম্ম বজায় রাখিবার নিমিত্তে" কলিকাতার বড়লোকেরা মিলিয়া ১৮৩০, ১৭ই জানুয়ারি তারিখে ধর্ম্মসভার প্রতিষ্ঠা করেন। ভবানীচরণ এই সভার সম্পাদক হন।

প্রাচীন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা হইতে ভবানীচরণ সম্বন্ধে এযাবৎ যেটুকু জানিতে পারিয়াছি তাহাই সংক্ষেপে বলিতেছি।—

পরিচয়

(সমাচার দর্পণ ১৫ই মার্চ ১৮৩৪)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।

...চন্দ্রিকাকারের পূর্ব্ববসতি পল্লিগ্রাম সেখপুরা নামক স্থানে ছিল। অল্পকাল হইল চন্দ্রিকাকারের পিতা ৺রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ

গ্রামনিবাসি জবনেরদিগের বলাৎকারে উত্ত্যক্ত হইয়া ৺বাবু নিমাইচরণ মল্লিক মহাশয়ের শ্রাদ্ধের পর কলুটোলায় পাকা ইষ্টকনির্ম্মিত বাসস্থান প্রস্তুত করিয়া বসতি করেন। তদবধি চন্দ্রিকাকার কলিকাতা নিবাসী।'

(সমাচার দর্পণ ৮ই ফেব্রুয়ারি ১৮৩৪)

"...শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮১৭ সালের অক্তোবর মাসে সর উলিয়ম গ্রাণ্ট কর সাহেবের সুপারিস চিঠী সর চার্লস ডাইলি সাহেবকে দিয়া [কষ্টম হাউসে] চাকর হন।...চন্দ্রিকা।"

(সমাচার দর্পণ ১৮ জানুয়ারি ১৮৩৪)

শ্রীযুত দর্পণসম্পাদক মহাশয় বরাবরেষু।

আপনকার গত শনিবারের দর্পণ দেখিয়া অবগত হইলাম যে যশোহরের নিমক এজেণ্টার সিরিশ তাদার শ্রীযুত বাবু তারাচাঁদ দত্তের আনুকূল্যে সভ্রাতৃক [কৃষ্ণজীবন] চন্দ্রিকাসম্পাদক কষ্টম হৌসে কখন কর্ম্ম প্রাপ্ত হন নাই লিখিয়াছেন ইহাতে চমৎকৃত হওয়া গেল।

কষ্টম হৌসের দেওয়ানী কর্ম্মহইতে দেওয়ান অভয়চরণ ঘোষ অবসর হইলে কষ্টম বোর্ডের প্রধান মেম্বর শ্রীযুক্ত লার্কিন সাহেবের অতি প্রবল সোপারিশক্রমে শ্রীযুত সরচার্লস ডাইলি সাহেব ঐ অতি প্রধান কর্ম্মে শ্রীযুক্ত তারাচাঁদ দত্তকে নিযুক্ত করেন। তিনি তৎকর্ম্ম প্রাপ্তিতে রীতিমত যে দারোগা মুহুরিপ্রভৃতির বিংশতি কর্ম্ম শূন্য ছিল তাহাতে তাঁহার খাতির্জমার ব্যক্তিরদিগকে নিযুক্ত করিতে সাহেব তাঁহার প্রতি আজ্ঞা করিলেন তাঁহারদের কর্ম্মের দায়ী তিনি নই থাকিলেন। ইত্যবসরে চন্দ্রিকাসম্পাদকের পিতা আম তাঁহার পুত্ত্রেরদিগকে কর্ম্ম দিতে দেওয়ানজীকে অনেক বিনীতি করিলেন। এবং ঐ পরমহিতৈষি দেওয়ানজী মহাশয় শ্রীযুত সাহেবের

হুকুম আনিয়া শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আহিরীটোলার চৌকীতে নিযুক্ত করিলেন।···

কলিকাতার সদর চৌকীর আমীন শ্রীরামজীবন চট্টোপাধ্যায়।"

(সম্বাদ ভাস্কর ১৪ এপ্রিল ১৮৪৯, শনিবার)

গত বৃহস্পতিবাসরীয়া চন্দ্রিকার সহিত আমারদিগের নিকট এক পুস্তক আসিয়াছে,···তাহাতে ৺বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবন বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে, অতএব উক্ত পুস্তক হইতে এক প্রস্তাব গ্রহণ করিলাম ইহাতেই পাঠক মহাশয়েরা এতদ্দেশীয় সম্পাদকদিগের অগ্রগণ্য মান্যবর বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চরিত্রের বিষয় জানিতে পারিবেন।

চরিত্র বর্ণন।

মান্য মহাশয় নবমবর্ষ বয়ঃক্রমে উপনীত ও দশমবর্ষে উদ্বাহিত হন, পরগণা উথড়ার অন্তঃপাতি মল্লিক নওয়াপাড়া গ্রাম নিবাসি ৺কালীকিঙ্কর মল্লিকের কন্যা সহিত তাঁহার প্রথম পরিণয় হয়, তাঁহার বিংশবর্ষ বয়সে প্রথম পুত্র রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাহার দুই বৎসর অন্তরে দ্বিতীয় পুত্র রাজরাজেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার চতুর্বিংশ বয়ঃক্রমে উক্ত পত্নী দৈহিক পীড়োপলক্ষে গতপ্রাণা হন,···। জনকের অনুল্লঙ্ঘ্য অনুমতিতে দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন, তৎপত্নী গর্ব্ভে শ্রীযুত নিমাইচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী সতী নাম্নী কন্যার জন্ম পরিগ্রহ হয়। কথিত মহাশয় অতি দয়াশয় ও নির্ম্মলাশয় ছিলেন দেব দ্বিজ পূজনে স্বধর্ম্ম যজনে তাঁহার নিশ্চলামতি ছিল, তিনি প্রত্যহ প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করতঃ প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক সন্ধ্যা

বন্দনাদি সমাধানান্তে তৈল গ্রহণ সময়ে সমাগত পরিচিতাপরিচিত শিষ্ট সাম্প্রদায়িক জনগণের সহিত ইষ্ট মিষ্টালাপ করতঃ স্নান তর্পণ দেবপূজাদি নিত্যকর্ম্মাবসানে ভোজনোত্তর বিষয় কার্য্য পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন, নিরালম্বে তাঁহার বৃথা কালযাপন হইত না, নিকটে জনশূন্য হইলে পুস্তকাদি পাঠ করিতেন, প্রায় দিবসে নিদ্রা যাইতেন না,…। তিনি পণ্ডিতগণকে লইয়া মধ্যে২ শাস্ত্রীয়ালাপ করিতেন, এবং সর্ব্বদা অধ্যাপকগণের উপকারেচ্ছু ছিলেন, নৈমিত্তিক কাম্য কর্ম্ম দান দেবার্চ্চনাতে তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল,…পরোক্ষে প্রিয়জনের প্রশংসা করা তাঁহার স্বাভাবিক কার্য্য ছিল, পরনিন্দা শ্রবণে অসহিষ্ণু ছিলেন, তন্নিকট বা তাঁহার সমক্ষে অন্যের নিকট কেহ পরদূষণে প্রবৃত্ত হইলে তিনি প্রতিবাদ করিয়া যদ্বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ হইত তাহার গুণানুবাদে নতশিরা হইতেন, তাঁহার এই গুণে কোন ২ বিপক্ষও সপক্ষ হইয়াছিল, তিনি আত্মীয় সজ্জনের ও প্রতিবাসিগণের পীড়া সংবাদ পাইলে কর্ম্মান্তর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পীড়িত জনের ঔষধ পথ্য প্রদান বা প্রদানীয় উপদেশ দান করিতেন, বিপদাপন্ন মনুষ্য তাঁহার শরণাপন্ন হইলে প্রাণপণে তাহার বিশিষ্ট হিতচেষ্টা করিতেন,… তিনি দেবীমাহাত্ম্য পাঠ শ্রবণে নিয়তানুরক্ত ছিলেন, অসাধ্য সাধনে উৎসুকতা ছিল না, যে বিষয়ে প্রবর্ত্ত হইতেন তাহা প্রায় অসিদ্ধ হইত না, এতদ্দেশীয় মনুষ্যকে স্বধর্ম্ম ও স্বভাষানুরাগী করিতে তাঁহার বিশেষ উদ্যোগ ছিল, ধর্ম্মদ্বেষি দেবনিন্দক নাস্তিকাদির সহিত তিনি আলাপও করিতেন না, তাঁহার বাক্‌পটুতা ও বক্তৃতাশক্তি এমত নিপুণা ছিল যে তিনি যে সভায় গমন করিতেন তত্রস্থ সভ্যেরা তাঁহার নব রস বিকসিত বাক্‌শ্লেষে আর্দ্রীভূত হইতেন. তজ্জন্য তিনি ভূরি ভূরি সভায় সদ্বক্তৃতা দ্বারা অগণ্য ধন্যবাদ পাইয়াছেন, তিনি প্রতিদিন সায়ংসন্ধ্যার

পর পুরাণ শ্রবণ পূর্ব্বক নগরীয় যাবদীয়:সংবাদ পত্র পাঠ করিয়া রাত্রি দুই প্রহর পরে নিদ্রা যাইতেন।

গ্রন্থাবলী

ভবানীচরণ শুধু সাংবাদিকই ছিলেন না,—গ্রন্থকারও বটে। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দে কেবলমাত্র দুইখানির সন্ধান করিতে পারিয়াছেন,—১। কলিকাতা কমলালয় (সন ১২৩০ সালে), ২। আচার্য্য উপাখ্যান *। শেষোক্তখানির উল্লেখ তিনি ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির ক্যাটালগে পাইয়াছেন।+ প্রাচীন সংবাদপত্রে আমি এ যাবৎ ভবানীচরণের আরও তিনখানি পুস্তকের বিবরণ পাইয়াছি—দূতী বিলাস, শ্রীশ্রীগয়াতীর্থ বিস্তার, এবং শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম চন্দ্রিকা (ইহার দুইখণ্ড আমি উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরি ও রাজা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে দেখিয়াছি)।

(সমাচার দর্পণ ১৪ জানুয়ারি ১৮২৬)

"ইংরাজী ১৮২৫ শালে শহর কলিকাতার···নানা ছাপাখানাতে যে ২ গ্রন্থ ছাপা হইয়াছে···তাহার জায়।···

শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত নায়ক নায়িকাবিষয়ক দূতী বিলাসনামক গ্রন্থ ছাপা হয়।"

'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে' (চৈত্র ১৭৮০ শক, পৃ. ২৮০) রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখিয়াছিলেন:—

"সুবিখ্যাত শ্রীভবানী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কোন দোষী পরিবারের নিগঞ্জনার্থে দূতিবিলাসনামে এক খানি কাব্য প্রস্তুত করেন। তাহাতে অন্যান্য বাঙ্গালী ব্যঙ্গ্য কাব্যের আদর্শে অনেক জঘন্য অশ্লীলতা আছে, অধিকন্তু তাহার কবিত্ব যৎসামান্য মাত্র।"

---

* পাদরি লঙের ক্যাটালগে (পৃ. ৭৮) একখানি পুস্তকের উল্লেখ দেখিতেছি,—"Aschargea Upakyean, pp. 20, 1834."

+ "Some old Bengali Books and Periodicals in the British Museum," Indian Historical Quarterly, ii. 55.

(সমাচার চন্দ্রিকা ৭ ডিসেম্বর ১৮৪৩)

"শ্রীশ্রীগয়াতীর্থ বিস্তার।—পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে গত ১২৩৮ সালে আমরা গয়াতীর্থ বিস্তার নামক একখানি ক্ষুদ্র বহি রচনা পূর্ব্বক মুদ্রিত করিয়া চন্দ্রিকা গ্রাহকগণের পারিতোষিক প্রদান করিয়াছি এক্ষণে সেই গ্রন্থ এযন্ত্রালয়ে আর না থাকাতে কোন ২ ব্যক্তির অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই তজ্জন্য পুনর্ব্বার ঐ পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করা গেল অতএব সাধারণকে জ্ঞাপন করিতেছি যদি কেহ শ্রীশ্রীধামে যাত্রা করণার্থ ঐ পুস্তক প্রাপণে বাঞ্ছা করেন তবে চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়ে সংবাদ প্রেরণ করিলে তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করা যাইবেক ফলত তাহার মূল্য নাই বিনা মূল্যে সেই বহি প্রাপ্ত হইবেন।... বায়ুপুরাণের সহিত ঐক্য করিয়া স্থান প্রত্যক্ষ করত গৌড়ীয় সাধুভাষায় পয়ার চ্ছন্দে রচনা করা গিয়াছে তাহা তদ্ধাম গামি দিগের উপকার জনক বটে।"

(সমাচার চন্দ্রিকা ১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৪৪)

"শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম চন্দ্রিকা। পাঠকবর্গের স্মরণ আছে আমরা পূর্ব্বে পুরুষোত্তম চন্দ্রিকা চন্দ্রিকা যন্ত্রে মুদ্রিতারম্ভ করিয়া আপনারদিগকে সংবাদ দিয়াছি এক্ষণে বিদিত করিতেছি যে সেই পুস্তক মুদ্রিত সমাপ্ত হইয়াছে...। গ্রন্থের সংক্ষেপ বিবরণ এই প্রথমত শঙ্খক্ষেত্র অর্থাৎ পুরীধামে প্রসিদ্ধ যত দেবমূর্ত্তি আছেন এবং তথায় গমন করিয়া যে২ প্রকারে তীর্থ করিতে হয় ও শ্রীশ্রীমূর্ত্তির দ্বাদশ যাত্রা ছত্রিশ নিয়োগ ইত্যাদি অশেষ বিশেষ রূপে লিখিত হইয়াছে অপর ঐ ধামে প্রতিদিন যে২ কার্য্য নির্ব্বাহ হয় তাহা উড়িষ্যা ভাষায় লিখিত হইয়া থাকে তাহার নাম মাদলা পঞ্জিকা কহে সেই পঞ্জিকা হইতে কলিযুগের আরম্ভা-

বধি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্তে যত রাজা ঐ রাজ্য অধিকার করিয়াছেন ফলত রাজা যুধিষ্ঠিরাবধি বর্ত্তমান রাজা রামচন্দ্র দেবের অধিকারপর্য্যন্ত যত২ নূতন কীর্ত্তি হইয়াছে ও তাঁহারদের রাজ্য কাল শকাব্দ সহিত মিলিত করিয়া এতাবৎ সংক্ষেপে সংগৃহীত হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ আছে রক্ত বাহু কালাপাহাড় ইত্যাদির উপাখ্যান বা ইতিহাস অতি-আশ্চর্য্য। দ্বিতীয় চক্রক্ষেত্র যাহা ভুবনেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ তথায় কোটি লিঙ্গ আছেন। তৃতীয় গদাক্ষেত্র ফলত যাজপুর যে স্থানে নাভিগয়া অর্থাৎ গয়াস্থরের নাভিদেশ তথায় গয়াশ্রাদ্ধ করিতে হয়। চতুর্থ পদ্মক্ষেত্র যাহা কণারক বলিয়া খ্যাত তথায় সূর্য্য ও চন্দ্র মূর্ত্তি ছিলেন তাহা পুরীধামে আনীত হন ইত্যাদি নানা ইতিহাস সম্বলিত উক্ত চারি ক্ষেত্রের বিশেষ বিবরণ অস্মৎ কর্ত্তৃক গৌড়ীয় ভাষায় গদ্য পদ্য রচনায় পুরুষোত্তম চন্দ্রিকা নামে প্রস্তুত হইয়াছে। গ্রন্থের পুষ্প মূল্য ১ টাকা স্থিত করা গিয়াছে ইতি।"

মৃত্যু

(সংবাদ প্রভাকর ১২ এপ্রিল ১৮৪৮। ১ বৈশাখ ১২৫৫)

"ফাল্গুন, ১২৫৪।…৯ই ফাল্গুন রবিবার [২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৮]… প্রাতে আমারদিগের সর্ব্বাগ্রগণ্য সহযোগী চন্দ্রিকা সম্পাদক ৺ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়…অনিত্য সংসার পরিহার করিয়াছেন।"

ভবানীচরণের ভূসম্পত্তি

(সংবাদ প্রভাকর ২৩ আগষ্ট ১৮৫১)

"সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে আগামি ২৮ আগষ্ট বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় সুপ্রিম কোর্ট ঘরের নীচের বারাণ্ডায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার সরিফ সাহেব

মৃত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উইলের লিখিত একজিকিউটর রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বেণ্ডিসিওনৈ এক্সপোনাস নামক পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক সেলে অর্থাৎ প্রকাশ্য নীলামে এই সকল বিষয় বিক্রয় করিবেন।

১ দফা। বিশেষতঃ জিলা চব্বিশ পরগণার উত্তরপাড়ার শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক খণ্ড ও বন্দ বাগাৎ ভূমি তাহাতে যে এক ইষ্টক নির্ম্মিত একতালা বৈঠকখানা এক পাকশালা ও এক আস্তাবল চারিটা পুষ্করিণী এবং নানা জাতীয় বৃক্ষ আছে ভূমি অনুমান ৩২৲ বত্রিশ বিঘা…।

২ দফা। এবং শহর কলিকাতার স্থরতির বাগানে রামমোহন ঘোষের ষ্ট্রীটের শামিল ও তন্মধ্যস্থিত যে এক তেতালা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অথবা পরিবারদিগের বসতি বাটী নং ২০ এবং তাহার সঙ্গে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি অনুমান ॥৩ তেরো কাঠা…।”

‘বিদ্বজ্জন-সমাগম’

ঠাকুর-বাড়িতে ‘বিদ্বজ্জন-সমাগম’ ঠিক কোন্ সময়ে প্রথমে অনুষ্ঠিত হয় তাহার উল্লেখ কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ১৮৭৪ সনের ২০এ এপ্রিল তারিখের ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’ পত্রে প্রকাশিত একটা অংশ নজরে পড়িল যাহা পাঠে মনে হইবে বিদ্বজ্জন-সমাগম সম্পর্কেই উহা লিখিত। অংশটা উদ্ধৃত করিতেছি :—

The Week...Saturday, 18 Apri'

This Evening a Conversazione in regular Bengali style was held at the house of Babu Debendranath Tagore. His sons Babus Dijendranath Tagore and

Satyendranath Tagore invited a select company, composed of the flower of Bengali society, to this entertainment. The amiable hosts provided feast for both the mind and body. There were music, recitations, and literary conversations, and the whole was wound up with a generous repast A young girl of the family, about eight years of age, charmed the company with her angelic voice..."

বহরমপুরে বঙ্কিমচন্দ্র

(মিত্র প্রকাশ, বৈশাখ ১২৭৭। মে ১৮৭০)

উক্ত পত্রিকা [মধুকরী] পাঠে জানা যায়, বহরমপুরে একটী ত্রিভাষিনী-সভা হইতেছে, উহার নাম "বহরমপুর লিটরারির আশোসিসেন" (সাহিত্য-সংসৎ) নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই সভায় সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক ব্যবহারিক ও সামাজিক প্রস্তাব সকল, ইংরাজী, উর্দ্দ এবং বাঙ্গালা ভাষায় আলোচিত হইবে। ইহাতে শ্রীযুক্ত মেঃ লালবেহারী দে, তথা শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন প্রভৃতি অতিযোগ্যব্যক্তি সকল মিলিত হইয়াছেন। এই সভা হইতে "বহরমপুর ম্যাগজিন" নামে একখান পত্র আগামী জুলাই মাস হইতে প্রকাশিত হইতে থাকিবে। উহাতে সভার কার্য্য বিবরণ ব্যতীত অন্যান্য প্রবন্ধ সকলও নিবেশিত হইবে।

যশোহরের দানবীর রায় কালীপ্রসাদ পোদ্দার

(সম্বাদ ভাস্কর ২৪ এপ্রিল ১৮৪৯। ১৩ বৈশাখ ১২৫৬)

"প্রেরিত পত্র।

আমরা অকুল শোক সাগরে নিমগ্ন হইয়া লিখিতেছি যশোহরের অন্তঃপাতি বগচরনিবাসি গুণরাশী রায় কালীপ্রসাদ পোদ্দার মহাশয়

গত ৩০ চৈত্র বুধবার মধ্যাহ্ন কালে…মায়াময় সংসার পরিত্যাগ করিয়াছেন, উক্ত বাবুর মৃত্যু শ্রবণে অত্র জিলাস্থ প্রায় সমস্ত ইংলণ্ডীয় ও এতদ্দেশীয় আবাল বৃদ্ধ বনিতাদি তাবতেই অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন, যেহেতু তাঁহার দয়া ধর্ম্ম নম্রতা বিশ্বব্যাপ্ত ছিল, মিথ্যা বাক্য প্রবঞ্চনাদি তাঁহার জীবনাবধি কখনও নিকটস্থ হইতে পারে নাই, কি ভদ্র, কি নীচ, সকলেই উক্ত বাবুর সহিত মিষ্টালাপে পরম হর্ষচিত্ত হইতেন, যে কেহ তাঁহার সহিত একবার সাক্ষাদালাপ করিয়াছেন তিনি উক্ত মহাশয়ের সৌজন্য কদাপি ভুলিতে পারিবেন না, যথার্থ দাতৃত্ব শক্তি এবং পরোপকারিত্ব চরিত্র উক্ত বাবুতেই ছিল, কেননা তাঁহার অপেক্ষা এই জিলায় এবং অন্য২ স্থানে অনেকানেক ধনাঢ্য ভূম্যধিকারী প্রভৃতি আছেন কিন্তু রায় বাবু যাবজ্জীবন পরোপকারে রত থাকিয়া তাঁহার সঞ্চিত ধনের প্রায় অধিকাংশ কেবল সদ্ব্যয়ে দিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার নাম চিরস্থায়ী হইয়াছে,…১৮৪৬ সালের ৩১ মার্চ্চ তারিখে গবর্ণমেণ্ট গেজেটে শ্রীলশ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুরের আজ্ঞাক্রমে ঐ মহাশয়ের নাম প্রকাশ হইয়াছিল এবং কোর্ট অফ ডাইরেক্টর কর্ত্তৃক সম্মানসূচক, রায় উপাধি ও পরিচ্ছদাদি খেলয়াৎ গোসহরা, ইত্যাদি প্রাপ্ত হয়েন, ঐ মহাশয় এই২ সৎকর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন।

যশোহরের অন্তর্ব্বর্ত্তি নীলগঞ্জ নামক স্থানে সেতু নির্ম্মাণার্থ ৫০০।

নীলগঞ্জের ঐ পুলের ঘাটের জন্য ৫০০ টাকা।

যশোহরের জঙ্গল কাটাই জন্য ৩০০ টাকা।

পশ্চিম দেশের দুর্ভিক্ষ নিবারণ জন্য ১৫০ টাকা।

অত্র জিলার দাতব্য ঔষধালয়ের ও গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত বিদ্যালয়ের সাহায্য কারণ ৭৫০ টাকা।

উক্ত দাতব্য চিকিৎসালয়ের মাসিক চাঁদা ২ টাকা।

নবদ্বীপের অন্তঃপাতি বনগ্রাম হইতে চাকদহ পর্য্যন্ত এক পরিসর রাস্তা এবং ছায়াতে পথিক লোকের বিশ্রাম কারণ বৃক্ষাদি এবং ঐ রাস্তার মধ্যে স্থানে২ সেতু ৩৫টা এবং ঐ রাস্তার বৎসরীয় রাজস্ব ইত্যাদি কারণ ২০০০০ টাকা।

চূড়ামন কাটী হইতে অগ্রদ্বীপ পর্য্যন্ত রাস্তা নির্ম্মাণ কারণ ২৪০০০ টাকা।

তথায় দুইটা সেতু নির্ম্মাণ কারণ ২১০০ টাকা।

অগ্রদ্বীপস্থ শ্রীশ্রী৺ গোপীনাথ জীউর ইষ্টক নির্ম্মিত দুই গৃহ ও আশান নগর দিগরেতে ৪টা পুষ্করিণী খনন জন্য ৫০০০ টাকা, তথায় মানব সকল বারি অভাবে অতিশয় কষ্ট পাইতেন।

৺পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমনীয় পথিমধ্যে আঠারো নালা নামক স্থানে যাত্রি লোকের বাস জন্য প্রস্তর নির্ম্মিত গৃহ নির্ম্মাণ কারণ ২০০০ টাকা।

৺জগন্নাথ দেবের পূজার কারণ বাৎসরিক ৩৬০ টাকা।

জিলা চট্টগ্রামে ৺চন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্দিরের দ্বারদালান নির্ম্মাণ কারণ ৬০০ টাকা।

তথায় পর্ব্বতের উপর গমনাগমনের রাস্তা নির্ম্মাণ হেতুক ১০০১ টাকা।

অত্র জিলার অন্তর্গত দাইতলা ও নীলগঞ্জের সেতু ও পথিকদিগের থাকিবার এক এক বাসস্থান নির্ম্মাণ কারণ ৪৫০০ টাকা।

এই জিলার অন্তঃপাতি ঝিকরগাছা নামক স্থানে লৌহ সেতু প্রস্তুত কারণ ৯০০০ টাকা।

যশোহর হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত এক রাস্তা ও তন্মধ্যে ২ ধর্ম্মশালা প্রস্তুত কারণ ১৭০০০ টাকা।

জিলা নবদ্বীপের অন্তঃপাতি মোং বনগ্রামের পুল কারণ ২০০০০ টাকা।

উপরিক্ত রাস্তা সকল মেরামত জন্য স্বীয় সম্পত্তি হইতে বার্ষিক দান ৩০০ টাকার নিমিত্ত মোনকার নামক এক তালুক গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ।

উক্ত মহাত্মা স্বর্ণবণিক কুলোদ্ভব হইয়াও এমত২ অনেক মহৎ কীর্ত্তি করিয়াছেন, এরূপ সৎস্বভাব মনুষ্যের জন্য পাষাণহৃদয় ব্যক্তিরাও খেদোক্তি করিবেন।

যশোহর নিবাসিনঃ কস্যচিৎ যথার্থবাদি জনস্য।”

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়